সংবর্ধনা স্মারক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইতিহাসবিদ গবেষক সাংবাদিক ব্যাংকার

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সংবর্ধনা

সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার এবার বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ গবেষক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক সর্বোপরি একজন নন্দিত ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-কে সংবর্ধনা জানাচ্ছে।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থের গবেষণার জন্য ইতিহাসবিদ হিসেবে খ্যাতি হলেও ব্যাংকিং, সাংবাদিকতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রূপেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সহজ-সরল, নিরহংকার ও শান্ত- প্রকৃতির মানুষ। বন্ধু-বৎসলতা তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ। বিনয়ী ও হিসেবী মানুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তিনি অত্যন্ত- আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বই মেলাকে সামনে রেখে। আমরা গ্রন্থটির ওপর তখন একটি আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সেই সাথে গ্রন্থ-প্রণেতা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-কে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্যোগ নেই।

দেশে তখন সদ্য (১১ জানুয়ারী ২০০৭) জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে। অনুষ্ঠান পেছানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ঠিক দেড় বছর পর বর্তমানে দেশে জরুরী অবস্থা কিছুটা শিথিল হওয়াতে আমরা শুধুমাত্র 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠান না করে লেখালেখির জগতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বিশেষ অবদানের কথা মনে রেখে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার মনে করে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে ইতিহাসচর্চা, গবেষণাকর্ম, ব্যাংকিং বিষয়ের ওপর লেখালেখি, শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা, সাংবাদিকতা, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে কালাতিক্রম অভিযাত্রার বহু মাত্রিকতায় চিহ্নিত করা যায়। সংবর্ধনা জানানোই যায়।

মনু ইসলাম

সংবর্ধনা স্মারক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ইতিহাসবিদ গবেষক সাংবাদিক ব্যাংকার

সম্পাদনা
মনু ইসলাম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

প্রসেস
ডিজাইন রুট

প্রকাশ
১২ জুলাই ২০০৮

আয়োজক
সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার
৪৩/এ, রোড # ৩/এ, ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান লিখুন মহাভাঙনের কাহিনী

আল মাহমুদ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে সহজেই ইতিহাসবিদ বলতে আমার একটু বাঁধো বাঁধো লাগতো। কিন্তু পরে ক্ষতিয়ে দেখেছি তার কাজ তো ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে কালের শব্দে উচ্চকিত কান খাড়া একজন মানুষ। তিনি বঙ্গভঙ্গের উপর যে কাহিনী লিখেছেন সেখানে একজন দৃঢ়চেতা ইতিহাসবিদকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবদুল মান্নান খুঁটিনাটি অনেক উপাদান জোগাড় করেছেন এবং দেশ ভাগ হওয়ার কাহিনীটা সোজাসুজিভাবে আমাদের হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই কৃতিত্ব তার নিজের জীবনকে অনেকটাই বদলে দিতে পারতো। কিন্তু তিনি নিরহঙ্কারী হওয়ায় একজন ব্যাংকার হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে হয়ত বা ভালোবাসেন। আমি ঠিক জানি না।

আবদুল মান্নানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে অনলস পরিশ্রমের অনেক চিহ্ন। আমার মনে হয় আজ না হোক কাল তিনি তার ইতিহাস রচনার ক্ষমতাকেই প্রধান করে তুলবেন। অবশ্যই এই প্রাধান্য দেয়াটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তারও তো বউ বাচ্চা আছে। সুখ এবং শান্তিও দরকার।

আমার বিশ্বাস আবদুল মান্নান যদি তার অন্যান্য কাজকে ঈষৎ স্তিমিত রেখে শুধু ইতিহাস ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আমাদের জাতি তার কাছে এক দুর্লভ নিরপেক্ষতা নিয়ে একজন ইতিহাসবিদকেই আবিষ্কার করবে। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করে যে ভারত বিভাগের উপর তার কাজ যদি আরো পেছন থেকে শুরু হয় এবং পটভূমিটি সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় তাহলে কে জানে হয়ত তার দ্বারা অনেক অলিখিত সংবাদ যা ইতিহাস হিসাবে রচিত হয়নি তার অনেক ফয়সালা বেরিয়ে পড়বে। আমি যদি তার সুহৃদ হই (তিনি আমাকে তার বন্ধুই মনে করেন) তাহলে আমি তাকে বেশ গোড়া থেকেই শুরু করতে বলব। গোড়া থেকে শুরু করলে বৃটিশ আমলে ভারতের অবস্থাটা কেমন ছিল, রাজ্যহারা মুসলমানদের পরিস্থিতি তখন কোন
পর্যায়ে পৌঁছে ছিল সেটা আবদুল মান্নানের চেয়ে বেশি কে আর জানে।

একজন সেনাপতি যদি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার কোচওয়ানে পরিণত হয় তখন বুঝতে হবে যে দুর্ভাগ্যের মার মুসলমানদের উপর কি মর্মান্তিক পরিণতি সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা মুসলমানদের শুধু পরাজিত করেনি মানসিকভাবে পরাভূত করারও চেষ্টা করেছে। মুসলমানরাও তাদের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনার চেয়ে মাটিতে মিশে যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। ফলে একজন সেনাপতির ঘোড়ার কোচওয়ানে পরিণত হওয়ার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে এটা খতিয়ে দেখার লোক কই।

আবদুল মান্নান যদি ইতিহাসটা সঠিকভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন তাহলে মন্দ কী? আমি জানি ওই ইতিহাস অশ্রু সজল না হয়ে কারো পক্ষে বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে পাঠ করা সম্ভব নয়। আর একথাও সত্য আবদুল মান্নান এই কাজটি করার জন্য যোগ্যতম পাত্র।

আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে গোড়া থেকে পতনের কাহিনীটি সজ্জিত করতে অনুরোধ করি। বঙ্গভঙ্গের মতো ব্যাপারটা হয়ত এতটা পরিচ্ছন্ন হবে না। তবে কেউ না কেউ তো মুসলমানদের পতনের কার্যকারণগুলো সঠিক ব্যাখ্যায় উপস্থিত করবেন। আমরা চাই আবদুল

www.pathagar.com

মান্নানই সেটা করুক। কারণ তার দ্বারাই যেহেতু বঙ্গভঙ্গের কাহিনী সুচারুরূপে লেখা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষেই এটা খুঁজে বের করা সম্ভব যে বৃটিশরা মুসলমানদের কীভাবে মুহ্যমান করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি না। সেটা হলো মুসলমানদের এই অবমাননার কালে সবটাই কি শান্তভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল? বিদ্রোহ হয়নি? আমাদের তো মনে হয় মুসলমানরা অত সহজেই বিষয়টা মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা হয়ত ছোটখাটো বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তার স্বরূপটা আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসটা জানি এবং এর পরিণতিও দেখেছি। সিপাহী বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর অতিশয় নির্মমভাবে সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের দন্ড দেওয়া হয়।

এতে অবশ্য সম্ভ্রম হারা মুসলমানরা প্রশমিত হয়নি। সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর কেন বাঁশের কেল্লা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছিলেন? তিনি কি জানতেন না বাঁশের কেল্লার দ্বারা ইংরেজের কামানের গোলা ঠেকানো যায় না? তবু তিনি বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

আমরা জানি সৈয়দ নিসার আলী অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তার অভিজ্ঞতাও ছিল অসাধারণ। তবু যে তিনি বাঁশের কেল্লা নিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন এর কারণ এই নয় যে, তিনি বোকা ছিলেন। তিনি জানতেন বাঁশের কেল্লা দিয়ে কামানের গোলা ঠেকানো যাবে না। কিন্তু তিনি যদি সেদিন বাঁশের কেল্লা নিয়ে না দাঁড়াতেন তাহলে বাঙালী মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ভবিষ্যতে আগোয়ান হতো না। নিসার আলীর বাঁশের কেল্লা সেদিন বাঙালী মুসলমানদের বুকে বুকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এমন একটাও দিন পার হয়নি যেখানে মুসলমানরা বৃটিশের বিরুদ্ধে তীব্র বিপ্লবের স্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়নি। সব সময় চেষ্টা ছিল হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার। এক দিনের জন্যেও বৃটিশরা মুসলমানদের বিশ্বাস করেনি। তাদের পোশাককে দারোয়ানের পোশাকে পরিণত করে ইংরেজরা আসলে এদেশীয় সংস্কৃতিকে অপমান করতে চেয়েছিল। সেটা অবশ্য খানিকটা সফল হলেও কার্যক্ষেত্রে বিদ্রোহের আগুন সব সময় মুসলমানদের অন্তস্থলে দাউ দাউ করে জ্বলেছে।

ইংরেজের দু'শ বছরের মধ্যে একটি দিনও বৃটিশরা এমন অতিক্রম করেনি যে মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের কোনো ভয় ছিল না। যদি হিন্দু জমিদারদের সহায়তা না থাকত তাহলে ইংরেজদের কোনো স্থায়ী হওয়ার সুযোগই থাকত না। ইংরেজরা হিন্দুদের বিশেষ করে ধনী হিন্দুদের ব্যাপকভাবে সুবিধাবাদি দিয়ে রাজামহারাজা বানিয়ে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে বসিয়ে দেয়। মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের এই ফুলে ফেঁপে উঠা পরিস্থিতি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গিয়েছিলো এবং তাচ্ছিল্যের সাথে তাদের সবসময় অবলোকন করেছেন। বৃটিশরা কলকাতা নগরীর পত্তন করেছিল প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জমিদারদের নিরাপত্তার জন্য। সেটা ইংরেজদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে গড়ে উঠেছিল এবং সেটা রক্ষার জন্য কলকাতার পশ্চাতভূমি হিসেবে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের হাড় মাংস জ্বালিয়ে খেয়েছে। পরে অবশ্য অনেক দিন পরে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক প্রজাসত্ত্ব আইন করে তাদের খানিকটা রক্ষার চেষ্টা করেন এবং সেটা সঠিকভাবে হিন্দুদেরও কাজে লাগে। শেরেবাংলা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কিন্তু মুসলিম প্রজাদের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম উপকারী একটি সংস্কার।

বাঙালী মুসলমানরা একদিনের জন্যেও বৃটিশ শাসন সহ্য করার মতো পরিস্থিতিতে মাথা নত করেননি। অথচ হিন্দু জমিদাররা এমন একটি কুট-কৌশলের সাথে মুসলিম প্রজাদের শোষণ করার প্রয়াস চালাতে শুরু করলেন যে দেশে ধীরে ধীরে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল এবং যেহেতু পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ প্রজাই ছিল মুসলমান তারা অতিশয় হীনবল এবং মাটির সাথে মিশে গেল। তবে বাঙালী মুসলমানদের মাথা তোলার চেষ্টা একদিনের জন্যও স্তিমিত হয়নি। পূর্ব-বাংলার কৃষক বিদ্রোহ বলে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এর কিছু বিবরণ থাকলেও সামগ্রিক অর্থে তা একটি ইতিহাস নয়। মাত্র ইতিহাসের কয়েকটি সূত্র এতে উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমান কৃষকরা সব সময় যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং এই সব বিদ্রোহের সার-সংক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে বৃটিশ শাসন মেনে নেয়ার ব্যাপারে হিন্দু জমিদারগণ যেমন উদার এবং সমর্থক ছিলেন

www.pathagar.com

তেমনি মুসলমান কৃষক প্রজারা কখনো তা মেনে নিতে পারেননি। এই না পারার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত অস্বীকৃতি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যদি গোড়া থেকে এই বিষয়গুলো সূত্রবদ্ধ করে একটি ইতিহাস রচনার প্রয়াসী হন তাহলে সেটা হবে নিঃসন্দেহে তার ঐতিহাসিক অবদান। আমরা তাকে অনুরোধ করি শুধু বঙ্গভঙ্গ নয় অনেক জিনিসই তো ভেঙেছে, আজো তার একটিও জোড়া লাগেনি। সেক্ষেত্রে ভাঙনের কাহিনী যদি লিখতে হয় তাহলে আবদুল মান্নানকে ভাঙনের অনেক বিষয় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে। আমরা চাই আবদুল মান্নান সমস্ত ভাঙন সূত্রবদ্ধ করে একটি মহাগ্রন্থ রচনা করুন। বইটির নাম তিনি কি দেবেন জানি না তবে আমরা এর নাম দিতে চাই 'মহাভাঙনের কাহিনী'।

তিনিই যোগ্য লোক। আমাদের বিবেচনায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একাজটি নির্ভুলভাবে আঞ্জাম দিতে পারবেন।

এর মধ্যে তার যে সব বই বেরিয়েছে। বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, সোনার দেশ বাংলাদেশ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও জামালউদ্দীন আফগানী, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, এসবই দুর্মূল্য কিতাব। আমরা এই সব বইয়ের জন্য তার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। আশা করি আমাদের অনুরোধ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। তাছাড়া প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যা মুসলমানদের স্বার্থে এ পর্যন্ত ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা সেই সব আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে তার কাছে দাবি করি যে মহাভাঙনের ইতিহাসে তিনি অনেক কথাই সূত্রবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন।

লেখক : কবি, কথা সাহিত্যিক, কলামিস্ট, সম্পাদক- দৈনিক কর্ণফুলী

কবি আল মাহমুদের সাথে নাতনী নুয়াইমা-কে কোলে নিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

মায়ের স্বপ্ন-পুত্র মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সম্পর্কে কিছু কথা

প্রফেসর আসকার ইবনে শাইখ

'মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ পেছনে ফিরে দেখা' পাঠ করে যে স্থির সিদ্ধান্তে আমি উপনীত, তা হচ্ছে, রত্নগর্ভা পুণ্যশীলা মায়ের স্বপ্ন-পুত্র হয়ে জন্ম নিল যে স্বল্পভাষী রত্নটি তারই ঔজ্জ্বল্যে আজ পূর্ণ বিকশিত বাঙালী জাতির ভাগ্য-গগনে। প্রতিভাদীপ্ত তারকামণ্ডলীর অন্যতম তারকা আজ এই মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

আমার এ মন্তব্যের সঠিকতার প্রমাণ মিলবে তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যার সংখ্যা ১৯৮৩ থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় চল্লিশ। তিনি যে একজন বিদগ্ধ ইতিহাস গবেষক, তার প্রমাণ মিলে তার রচিত 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' শীর্ষক গ্রন্থটি দ্বারা, যাতে রয়েছে তার আত্মচৈতন্য, আত্মআবিষ্কার ও আত্মপরিচয়ের কঠোর প্রয়াস। এ প্রসংগে আমার কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে বংগ নামক অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্যতম। একদা- যাযাবর আর্যরা ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বংগ- অধিবাসী বাংগালীরা ছিল প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিরই একটি শাখা যা হাজারো বছর ধরে রক্ষা করে আসছিল স্ব-সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য। সাধারণত কৃষিজীবী হলেও তাদের একাংশ ছিল সিন্ধু প্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় অসমসাহসিক বণিক- যারা একদিকে মহাসমুদ্র পথে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অন্যদিকে হিমালয় ভেদ করে তিব্বতাদি দেশে যাতায়াত করতেন।

প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত যখন সিন্ধু বিজয়ী আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল, ওই বঙগবাসীরা তখনও সগর্বে সেই বিজয়ীদের বিরুদ্ধে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। পূর্বাভিমুখে বিজয়বিলাসী আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর থেকে সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এসে নিভে গিয়েছিল, বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। পরে অবিশ্যি নানা কায়দার আশ্রয় নিয়ে বংগদেশ বিজয়েও সক্ষম হয়েছিল তারা। রচিত হয়েছিল নতুন ইতিহাসের যাত্রাপথ। সেই যাত্রাপথের পথিক ছিল বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী, যার মধ্যে সর্বশেষ গোষ্ঠীটির পরিচিতি ছিল সেন-বংশীয় বলে। এবং সেই সেন-বংশের রাজত্বাবসানের মধ্য দিয়েই শক্তির আসন থেকে আর্যশক্তির চিরবিদায়। 'গৌড় রাজমালা'র রচয়িতা রমাপ্রসাদ চন্দ'র কথায়, "লক্ষণ সেন যখন গৌড়াধিপ, তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহড়বাল রাজ জয়চ্চন্দ্র, এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম সমাসীন ছিলেন। ইহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইহাদের সহিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষণসেন গৌড়-রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হয়ে থাকলেও প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই বখতিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন"। (পৃষ্ঠা : ৮২)

এই উদ্ধৃতিটিতে মূল শব্দটি হচ্ছে 'প্রজাপুঞ্জ' অর্থাৎ রাজ্যের প্রজাবৃন্দ বা জনগণ। এবং এই 'প্রজাপুঞ্জ' বা জনগণের সমর্থনই ছিল তখন থেকে রাজশক্তি টিকিয়ে রাখা না- রাখার মূল শক্তি। আর মুসলমান শক্তির শাসনে জনগণকে গুরুত্ব প্রদান তো ধর্মীয় নির্দেশনারই অঙ্গীভূত। এ ব্যাপারে Aryan Rule in India গ্রন্থের লেখক Havell বলেন ঃ "মুহম্মদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আত্মিক মর্যাদা দান করেছে, ইসলামকে রাজনীতি ও

www.pathagar.com

সমাজনীতির মিলন ভূমি করেছে; আর এই মৌল অধিকারের উপর ন্যস্ত করেছে সমাজ শাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসাবে ইসলাম যথেষ্ট।" বস্তুত সাধারণ মানুষের মানবতার স্বীকৃতিই এতদ্দেশে ইসলামের বহুল বিস্তার ও বিজয় লাভের মুখ্য কারণ।

তদুপরি, সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়-এর কথায়, "যে বংগ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের সেই বংগ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিক পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" (ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২২)।

এ বিষয়ে অন্যান্য পন্ডিতজনের বক্তব্য আর তুলে ধরলাম না এ জন্য যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব তাঁর গ্রন্থে সেসব পন্ডিতজনের উদ্ধৃতিসমূহ তুলে ধরেছেন। তবে, জনগণের দ্বারা ব্যবহৃত মুসলমান আমলেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। ডক্টর আবদুল করিম বলেন ঃ "প্রাক মুসলমান আমলে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বলিয়া গণ্য হইত এবং দেবভাষায় অব্রাহ্মণের কোন অধিকার ছিল না। সেকালে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হইত, এবং এই সকল কারণ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অন্তরায় ছিল। কিন্তু দেশ মুসলমানদের অধিকারে যাওয়ায় ব্রাহ্মণদের গৌরব ক্ষুণ্ন হইল এবং বিশেষ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির পথও সুগম হইল।" (বাংলার ইতিহাস [সুলতানী আমল], ডক্টর আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৭২)।

শ্রদ্ধেয় মান্নান সাহেবের অন্যান্য বইয়ের ওপর কোন আলোচনায় না যেয়ে এক্ষণে শিশুদের জন্য লেখা তাঁর 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরতে চাই। কারণ, এই 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' হয়েছে তাঁর এক অত্যুৎকৃষ্ট রচনা। চমৎকার এই শিশুতোষ বইটিতে আছে শতাধিক ছোট ছোট গল্প ঃ উজান ভাটির দেশ, সয়ফুল মুলুক যায় কো'কাফের জঙ্গলে, ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা, সোনার নাও পবনের বৈঠা, টিয়া পাখি ও নূহ নবীর কিশতী ইত্যাদি ইত্যাদি। চমৎকারভাবে আঁকা ছবিসহ যাদুকরী ভাষায় লেখা ছোট্ট ছোট্ট গল্প। গল্প বলতে ঠিক বানানো কথার কল্পকথা নয়, মনোহারি একেকটা ইতিহাস-বার্তা। বাংলাদেশ যে সত্যিই এক সোনার দেশ, সেই অতীতকাল থেকে তারই রসালো বার্তা!

এ চমৎকার বইটির পরিচয় দিতে যাদুকর রচয়িতা লিখেছেন ঃ 'ছবির মতো সুন্দর আমাদের দেশ। নরম, সবুজ গালিচা বিছানো মাঠ। গাছে গাছে ফুল-পাখি। তির তির বয়ে চলা রূপালী নদী। নদীতে নানা রঙের পাল তোলা নাও। নদীর তীর ঘেঁষে সরষের ক্ষেত। উপরে নীল সামিয়ানা। সেখানে রোদ, মেঘ, রঙধনু আর হলদে মিঠা সরষের ক্ষেত।...

প্রিয় বন্ধুরা,... স্বাধীন দেশের নানা দুর্বলতা দেখে আমরা প্রায়ই আফসোস করি। ভাবি, আমাদের দেশকে মিছেই 'সোনার বাংলা' বলা হয়। কি আছে এদেশে সোনার ? এ প্রশ্ন আমাকেও একদিন উতলা করেছিল বলে আমি খুঁজে দেখেছি ইতিহাস। আমাদের সোনায় ভরা অতীত দেখে-শুনে-পড়ে-বুঝে মরে গেছি শরমে। তোমরা কি জানো 'কনক' মানে কি ? না জানলে জেনে দেখ। জানার পর থেকে আমি বুক ফুলিয়ে হাঁটি।

এমনি রচনা-রীতি, এমনি শব্দচয়ন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় দু'জনকে- সুকুমার রায় আর কাজী নজরুলকে। তাঁদেরও ছিল শব্দ চয়নে এমনি বশ্য-ক্ষমতা! এ ক্ষমতা আল্লাহর দান। সবার কপালে জোটে না। শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কপালে জুটেছে।

বুঝতে পারছি- বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। তাই হ্যাঁ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে ভ্রাতৃ-জ্ঞানে আমার এসব স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে অনেকটা বিশ্বাস ও সাহস নিয়েই বলছি, সুকুমার রায় ও কাজী নজরুলের পর, আমার মতে, আপনিই এই বশ্য-ক্ষমতার অধিকারী তৃতীয় ব্যক্তি। কল্যাণ হোক আপনার। আপনার ওপর বর্ষিত হোক মহান আল্লাহর অশেষ রহমত। আল্লাহ হাফিজ।

www.pathagar.com

পেশায় ব্যাংকার, নেশায় ইতিহাস গবেষক

মোহাম্মদ আবদুল গফুর

ছিলেন সাংবাদিক। সেই সুবাদেই ব্যাংকে ঢুকেছিলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে। কিন্তু জনসংযোগ তো ব্যাংকিং এর মূলধারা নয়। অবশেষে ব্যাংকিং এর মূলধারায়ই প্রবেশ করলেন তিনি। এবং প্রতিভা ও একাগ্রতার স্বাক্ষর রেখে এখন এদেশের ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সামনের সারির অন্যতম ব্যক্তিত্ব তিনি। কিন্তু তাই বলে তিনি ভুলে যান নি জাতির প্রতি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দায়দায়িত্বের কথা। ফলে পেশায় ব্যাংকার হলেও নেশায় তাঁর পরিচয় একজন ইতিহাস গবেষক হিসাবে। তিনি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এর জন্ম নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানায় এক ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী পরিবারে ১৯৫২ সালের ১৮ মার্চ। সেই নিরিখে তাঁর বয়স খুব বেশী নয়। এই বয়সে পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রমাণ করে প্রতিভা ও সাধনার সমন্বয় যে কোন মানুষের জীবনে কি অসাধারণ অর্জনের পথ সুগম করে দিতে পারে। অন্যদিকে সাধনা ও উদ্যোগ বিমুখতার কারণে বহু প্রতিভাশালী মানুষের দীর্ঘ জীবনের ময়দানও শেষ পর্যন্ত বিরাণ থেকে যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার জন্য নানান ক্ষেত্র থাকে। কেউ দর্শন, কেউ অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্ব, কেউ বিজ্ঞান, কেউ ধর্ম, কেউ শিল্প-সাহিত্য নিয়েই আজীবন গবেষণা বা সাধনা চালিয়ে যান। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন ইতিহাস ঃ বিশেষভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁর এই ক্ষেত্র নির্বাচন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। ইতিহাসকে সাধারণত জাতির দর্পণ বলা হয়ে থাকে। দর্পণে যেমন আমরা আমাদের মুখচ্ছবি দেখে থাকি, তেমনি জাতির ইতিহাসে উঠে আসে জাতির বেড়ে ওঠার সময়কালের সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী। ইতিহাস গবেষণার মাধ্যমেই আমরা শনাক্ত করতে পারি জাতির শত্রু-মিত্র তথা বৈরী বা সহায়ক শক্তি।

যে জাতি তার সঠিক ইতিহাস জানে না, সে জাতির জীবনে বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশংকা থাকে পদে পদে। এ কারণে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অন্যতম লক্ষ্যই থাকে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জাতির গৌরবজনক সংগ্রামী অতীত সমন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে জাতির মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ গড়ে তোলা। আমাদের জাতির ক্ষেত্রে পলাশীর পূর্বাপর ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে একই লক্ষ্যে। ইতিহাস বিকৃতির সে অপচেষ্টা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে, যদিও ইতিহাসের বহু সত্য ইতিমধ্যেই মিথ্যার খোলস ভেদ করে নির্মমভাবে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের একটি গ্রন্থের নাম 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'। আমার বিবেচনায় এই বইয়ের শিরোনামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আবদুল মান্নানের ইতিহাস গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ তালিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়েই

www.pathagar.com

তিনি আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। আমার এ বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত (পরিকল্পিত) গ্রন্থ-তালিকা এখানে উদ্ধৃত করছি: 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী: একটি সরেজমিন সমীক্ষা, 'এই আমার বাংলাদেশ', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃত ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দিন আফগানী', 'সোনার দেশ বাংলাদেশ', 'শেখ মুজিবের পতন কেন', 'বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন স্মারকগ্রন্থ', 'আমাদের রাষ্ট্রসত্তার বিকাশধারা', 'চারশ বছরের ঢাকা', 'যেভাবে পলাশী আসে', 'পলাশী থেকে লালবাগ', 'ফকীর মজনু শাহ', 'বাংলার কৃষক বিদ্রোহ', 'ফরায়েজী আন্দোলন ঃ শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়া', 'বাঁশের কেল্লার তিতুমীর', 'ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার কুড়ি শতকের রেনেসাঁ', 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণের ধারা', 'মাওলানা ভাসানীর জীবনের শেষ পাঁচ বছর', 'সোনার বাংলার আয়নায় মুজিব আমলের বাংলাদেশ', 'Islam in Bangladesh', 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস', 'আমাদের শিক্ষার ইতিহাস', 'বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' প্রভৃতি।

এই একই লক্ষ্য সামনে রেখে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখেছেন আরও বহু প্রবন্ধ, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। লিখেছেন বহু ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তাকেও বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে বিবেচনা করতে হয় বাস্তবতার নিরিখে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন বাংলা ও বাংগালীর জীবনে সৃষ্টি করে এমন এক বিপ্লব, যার সঙ্গে আজকের বাংলাদেশের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার রয়েছে ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্ক।

বিষয়টিকে একটু খোলাসা করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে যদি ইসলামের আগমন না ঘটতো এবং দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যদি একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ গড়ে না উঠত, তা হলে কি ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা সম্ভবপর হতো? হতো না। সুতরাং উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের সাথে সাতচল্লিশের পার্টিশনের যেমন একটা নিবিড় যোগসূত্র ছিল, তেমনি বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে একটি বিশাল মুসলিম-অধ্যুষিত জনপদ গড়ে ওঠেছিল বলেই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ অঞ্চলে বাংলাদেশ নামের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের গড়ে উঠার পিছনে ইতিহাসবিদরা দুটি উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর একটি ইসলাম, অপরটি বাংলা ভাষা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাংলা ভাষার শৈশবকালে সেনরাজ আমলে সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে যেভাবে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করেন, বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয় এবং মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই বাংলা ভাষা-বিরোধী এই অপপ্রয়াস ভন্ডুল হয়ে যায়। বিখ্যাত গবেষক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত প্রদান করেছেন, বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় এবং এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলা ভাষা তার শৈশবেই সেন রাজ-দরবারের সংস্কৃত পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে অকালপ্রাপ্ত হতো। 'স্বর্গীয় ভাষা' সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে যারা 'মানব সৃষ্ট' বাংলা ভাষা চর্চার স্পর্ধা দেখাবে তাদের স্থান হবে রৌরব নরকে বলেও তারা ফতোয়া দিয়েছিলেন।

সেনরাজ আমলের বিপরীতে মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা চর্চাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হতো। সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে বহু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবি-সাহিত্যিকরা মুসলিম শাসনামলে স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষা চর্চার মারফৎ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এদেশে মুসলিম শাসনের পতন সূচিত না হওয়া পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কুখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা ভাষা থেকে পরিকল্পিতভাবে জনগণের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলা প্রচলনের চেষ্টা চালানো হলে মুসলিম সাহিত্য-সাধকদের অনেকের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এর ফলে মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকেই মীর মশারফ হোসেন, মোজাম্মেল হক,

www.pathagar.com

কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহীম প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা পুনরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ফিরে আসতে শুরু করেন। এভাবে ছোট-বড় অসংখ্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ভীড় জমাতে শুরু করেন বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে। অবশেষে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের আর কখনও পিছনে ফিরে তাকানোর মনোভাব সৃষ্টি হয়নি।

উনিশ শতকে বৃটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়, সেখানে মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। সে নবজাগরণ ছিল প্রধানত হিন্দু-বাংগালীর নবজাগরণ। সে জাগরণের প্রভাবে একদা বাংগালীত্ব আর হিন্দুত্ব এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই প্রভাবের ধারাবাহিকতায়ই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে 'বাঙ্গালী আর মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলার' চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে ধূমকেতুর বেগে নজরুলের প্রবেশের পাশাপাশি বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বাংগালী মুসলমানের মধ্যে যে রাজনৈতিক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, তাতে অতীতের সকল হিসাব-নিকাশই পাল্টে যায়। ক্রমেই বাংগালীত্ব আর মুসলমানিত্ব এক হয়ে দাঁড়াতে থাকে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কথা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার প্রধানতঃ প্রশাসনিক কারণে বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে বিভক্ত করে ঢাকায় রাজধানীসহ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করেন। এর ফলে ইংরেজ শাসন আমলে নির্মমভাবে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের উন্নয়নের কিঞ্চিৎ সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর ফলে কলকাতা-প্রবাসী জমিদাররা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে যাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু) পূর্ববঙ্গে অবস্থিত তাদের জমিদারীতে তাদের প্রভাব হ্রাসের আশংকায় ক্ষিপ্ত হয়ে মহা আন্দোলন শুরু করে দেন। বঙ্গভঙ্গকে তারা গণ্য করলেন 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদের' মতো পাপ কাজ এবং এ পাপ খণ্ডনে কালী মূর্তির সামনে শপথ গ্রহণ করে সন্ত্রাসী আন্দোলন গড়ে তোলা হলো দিকে দিকে। যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ পলাশী থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের সকল বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, যাদের ঋষিতুল্য সাহিত্য সম্রাট (বঙ্কিমচন্দ্র) ইংরেজ আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে একদা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন "ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, আমাদের আসল দুশমন মুসলমান"–তাদের এ আকস্মিক যুদ্ধংদেহি মূর্তি ইংরেজ সরকারকে অপ্রস্তুত করে তোলে। ফলে ছয় বছরের মাথায়ই বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে দিতে বাধ্য হয়।

বৃটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে উন্নয়ের যে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছিল, বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা নির্মমভাবে তা নিভিয়ে দেয়। বৃটিশ সরকার তাদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গবাসীর অন্যতম দাবী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেয়। এর বিরুদ্ধেও কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা ঘোরতর আপত্তি তুললেন। এই আপত্তির সপক্ষে তারা এমন কারণ দেখালেন যাতে তাদের মনের আসল দুরভিসন্ধিই প্রকটভাবে ধরা পড়ে গেলো। তারা বললেন ঃ "পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান চাষাভূষা, তাই তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই!" তাদের এই বিরোধিতার কারণে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই দশ বছর পিছিয়ে গেল না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করে রাখা হলো ঢাকা শহরের মধ্যে। ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

এদের ১৯৪৭ সালের ভূমিকা ছিল আরও বিস্ময়কর, আরও অবিশ্বাস্য। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে যারা "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ" হিসাবে গণ্য করে এই পাপ প্রতিরোধের জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন তাদের উত্তরসূরীরাই এবার "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ" তথা বঙ্গভঙ্গের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এদের অন্যতম মধ্যমনি বাংগালী নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ তো ঘোষণা দিয়েই বসলেন, 'ভারত বিভাগ না হলেও বাংলা বিভাগ হতেই হবে'। বাংগালী হিন্দু নেতৃত্বের মনোভঙ্গীর ক্ষেত্রে মাত্র চার দশকের মধ্যে এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন কীভাবে এলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধিতায় তারা যে 'যুক্তি' (কুযুক্তি) দেখিয়েছিলেন, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হয়। "পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান চাষাভূষা, তাই তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই"–একথা যারা বলতে পারেন, তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নতুন করে কোন ব্যাখা দেয়ার প্রয়োজন আছে কি? নেই।

www.pathagar.com

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ''বাঙ্গালীদের সাথে মুসলমানদের ফুটবল খেলার'' কালে যারা ''বাঙ্গালী'' ছিলেন, তারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন, কারণ এটা ছিল নাকি ''বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ''। কিন্তু ১৯৪৭ সালে এসে তারা ''বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ''-এর জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন কেন, কেন তারা দাবী তুললেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে? কারণ পলাশী-পরবর্তীকালে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতার কল্যাণে বাংগালী হিন্দুরাই ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের জমিদারীতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশংকা ছিল। তাই তারা বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংগালী মুসলমান রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই জেগে উঠে তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছে। বাংগালী মুসলমান বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুদীর্ঘ বৃটিশ শাসন আমলে তাদের সব দিক দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসী জেগে উঠায় বৃটিশ সরকার পাততাড়ি গুটানোর কাজে ব্যস্ত। ১৯০ বছর ধরে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংগালী হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংগালী মুসলমানদের যেভাবে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছিল, তা আর সম্ভবপর হচ্ছে না বলে ''বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ''-এর জন্য শ্যামাপ্রসাদ থেকে জ্যোতি বসু পর্যন্ত সকলে একাট্টা হয়ে প্রমাণ করেছিলেন, বাংগালীর নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাদের আগাগোড়া লক্ষ্য।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থে এই ইতিহাসই বিস্তারিত তথ্য ও দলিলপত্র সহ তুলে ধরেছেন। বলা চলে তাঁর 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' শীর্ষক গ্রন্থের সম্পূরক গ্রন্থ এটি। তবে একথাও কবুল করে নিতে হবে, এ গ্রন্থে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঘটনাবলী যতটা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ঘটনাবলী সেভাবে উঠে আসেনি। পরবর্তী সংস্করণে এদিকটা নজর দেয়া হবে এ আশা আমরা করতে চাই। নইলে তাঁর প্রয়াস কিছুটা হলেও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি "পেশায় ব্যাংকার, নেশায় ইতিহাস গবেষক" বলে অভিহিত করেছি। আমার এ মন্তব্যের প্রমাণ তিনি যেমন রেখেছেন দেশের অভ্যন্তরে, তেমনি রেখেছেন দেশের বাইরেও। ব্যাংকিং এর কাজে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন সৌদি আরবে। এ সময় তিনি আরব জগতের বহু জনপদ ভ্রমণের সুযোগ পান। এ ছাড়াও তিনি সফর করেছেন আরও বহু দেশ। সর্বত্রই তিনি ইতিহাস গবেষকের মন নিয়ে সন্ধান করেছেন ইতিহাসের নানান তথ্য। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনায় উঠে এসেছে বহু ঐতিহাসিক জনপদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। 'পারস্যের প্রান্তরে', 'মাদায়েন সালেহ ঃ অলৌকিক এক উটের দেশে', 'শোয়েব নবীর দেশে' প্রভৃতি গ্রন্থ বাহ্যত ভ্রমণ কাহিনী হলেও ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাধারণভাবে ইতিহাস সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী। এই সুবাদেই তাঁর প্রতি আমাদের কিছু বিশেষ প্রত্যাশা রয়েছে। একথা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এ দেশের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম যুগে আসা ইসলাম-প্রচারকদের সহজ সরল জীবনধারায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশের জাতিভেদ-লাঞ্ছিত মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে বলেই আজ বাংলাদেশের মত এত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে। কিন্তু এ জন্য আরেকটি সত্যও আমাদের ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে মেনে নিতে হয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম এদেশের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

সবাই জানেন, সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই আর্য আগ্রাসনের প্রভাব পড়ে সবচাইতে কম। আর্যদের গ্রন্থাদিতে এ কারণে বাংলা ও বাংলার অধিবাসীদের সম্পর্কে কখনও মর্যাদাব্যঞ্জক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের ঝান্ডা স্বার্থকভাবে উত্তোলনের গৌরব বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত সামাজিক আদর্শে নবী-রসূলদের প্রচারিত সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের যে প্রতিফলন ঘটে তা

www.pathagar.com

এক কথায় অনন্য। উপমহাদেশের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মই সর্বপ্রথম সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা ও মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রীর বাণী তুলে ধরে। এর ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার জাতিভেদ-লাঞ্ছিত মানুষেরা একদা মুক্তির আশায় দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। যার ফলে এখনও উপমহাদেশের সর্বত্র মাটি খুঁড়লেই বৌদ্ধ মূর্তি বেরিয়ে পড়ে।

যে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে একদা সমগ্র উপমহাদেশ সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্মের অনুসারীদের উপমহাদেশে আজ দেখা যায় না কেন? হিন্দু ও মুসলমান বর্তমানে উপমহাদেশের প্রধান ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হলেও এই উভয়ই ধর্মই উপমহাদেশে এসেছে বাইরে থেকে। একটি মধ্য এশিয়া থেকে, অপরটি আরব থেকে। বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম এ উপমহাদেশে হলেও এতদঞ্চলে এ ধর্মের অনুসারীদের দেখা যায় না কেন? কারণ এ দেশে একদা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালানো হয়েছিল। ফতোয়া দেয়া হয়েছিল, যারা একজন বৌদ্ধকে দেখেও তাকে হত্যা করবে না, তাদের অনন্তকাল ধরে নরকবাস করতে হবে। আর কোন বৌদ্ধকে দেখামাত্র যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে অনন্তকাল ধরে স্বর্গবাস করবে। সাম্প্রদায়িক নির্দেশজাত এই গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে উত্তরে চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে, পূর্বে বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এবং দক্ষিণে শ্রীলংকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যারা পালাতে অসমর্থ হয়, তারা অগত্যা হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে নিম্নবর্ণের জিল্লুতির জীবন গ্রহণ করে আপাতত প্রাণে বেঁচে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য, মৈত্রী ও সর্ব জীবে দয়ার আদর্শের স্মৃতি তাদের বিক্ষুব্ধ অন্তর থেকে কখনও মুছে যায়নি।

উপমহাদেশের মুক্তিকামী নির্যাতিত মানুষদের ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে সপ্তম শতাব্দীতে প্রথমে আরবে পরে আশেপাশের দেশসমূহে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে এক সর্বগ্রাসী সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। আরবের এ সমাজ-বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশের উপকূলেও আঘাত হানে। আরব বণিকদের সাথে সমুদ্রপথে আগত প্রথম যুগের সর্বত্যাগী ইসলাম প্রচারকরা এদেশে এসে এদেশের জাতিভেদ-লাঞ্ছিত মানুষদের কাছে ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ তুলে ধরেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এদের আহ্বানে এদেশের জাতিভেদ-লাঞ্ছিত নির্যাতিত মানুষেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নব্য মুসলমানদের বিরাট অংশই ছিল সাবেক বৌদ্ধ, যারা প্রাণ বাঁচাতে বাহ্যিকভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও মনে মনে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল। যেহেতু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার ইতিহাস তুলে ধরতে আগ্রহী, তাঁর কাছ থেকে এদেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের ইতিহাস এবং বাংলাদেশে মুক্তিকামী নির্যাতিত মানুষদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পিছনে বৌদ্ধদের নির্মিত মনস্তাত্বিক পটভূমি তুলে ধরার প্রত্যাশা করাটা খুব অন্যায় হবে না।

যেহেতু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাস গবেষণায় গভীরভাবে আগ্রহী, আমরা আরও একটি বিষয়ে তাঁর সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা যারা বিশ্বাস করি, আদম ও হাওয়া মানবজাতির আদি পিতা-মাতা এবং পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমই (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী, তাদের কাছে মানবজাতির ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাস এক ও অভিন্ন। আর ইসলামের ইতিহাস শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে প্রথম নবী থেকেই। ইসলামের তথা মানবজাতির সে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কোথায়? ইসলাম তথা মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণে মুসলমানরা তাদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

মানবজাতির সঠিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত হয়নি বলে যে যার মত অনুমান ও কল্পনা-ভিত্তিক ইতিহাস লিখে তাকেই মানবজাতির ইতিহাস বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এদের কেউ কেউ কল্পনার জাল বুনে মানবজাতিকে ঘোর মানবেতর প্রাণীর বংশধর প্রমাণের চেষ্টা করছেন। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষেরা ইতিহাসের নামে এ ধরনের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত ধারণা মেনে নিতে পারে না। আমরা জানি, ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতির ইতিহাস রচনা এক বিরাট দুরূহ কাজ । কিন্তু পথ দুর্গম ও বন্ধুর বলেই কি আমরা একটি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকব? আধুনিক ইতহাসবিদেরা প্রাচীন সভ্যতাসমূহের ইতিহাসকে ভিত্তি করে মানব জাতির একটা ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোরআনুল করীম ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যে-

www.pathagar.com

সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও নবী রাসূলের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে কে আধুনিক ইতিহাসের বর্ণিত সভ্যতাসমূহের কোন্ স্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার একটা যথাসাধ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপরেখা নির্মাণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম ইতিহাসবিদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, কাজটা খুবই ব্যাপক। এজন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও প্রয়োজন হবে। এ ধরনের প্রকল্পে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হবে। সরকারী-বেসরকারী যে কোন ধরনের এজেন্সীই একাজে উদ্যোগ গ্রহণ করে অন্যদের সহযোগিতা কামনা করতে পারে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শুধু নেশায় ইতিহাস গবেষক নন, পেশায় একজন ব্যাংকারও বটে। এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সহযোগিতা দানে যদি তিনি তাঁর ব্যাংককে আগ্রহী করে তুলতে পারেন, সেটাও হবে তাঁর আর একটা বড় মাপের কাজ। আমরা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দীর্ঘ সুস্থ জীবন এবং ইতিহাস গবেষণায় তাঁর বিরাট নজীরবিহীন সাফল্য কামনা করি।

মোহাম্মদ আবদুল গফুর : অধ্যাপক, প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক, প্রবীণ সাংবাদিক, গ্রন্থকার

www.pathagar.com

ইতিহাস গবেষণায় আবদুল মান্নানের সাফল্য

ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী

তারেক ফজল নামে পরিচিত স্নেহাস্পদ সহকর্মী ড. তারেক এম তওফীকুর রহমান মারফত বাংলা ও বাংগালি মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা (প্রথম প্রকাশ ১৯৯১), আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪) ও বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ (প্রথম প্রকাশ ২০০৭) শিরোণামের সুন্দর বাঁধাই করা তিনটি গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে এবং এগুলোর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে 'মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : পিছনে ফিরে দেখা' শীর্ষক একত্রিশ পৃষ্ঠার টাইপ করা একটি কাব্যিক লেখা। এ সব মিলে একটি মূল্যায়নধর্মী লেখা তৈরির অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে। আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সজাগ। এতদসত্ত্বেও যখন কিছু লিখতেই হবে তখন প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, উপর্যুক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচয়িতা হলেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং টাইপ করা লেখাটি হলো তাঁর জীবন পরিক্রমার সংৰিপ্ত খতিয়ান। একনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করে বর্তমানে পেশায় তিনি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন একজন ঊর্ধ্বতন ব্যাংক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তার সাথে জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত পরিসরে উদীয়মান ইতিহাস গবেষক। সাবধানতা অবলম্বন করে লেখার পূর্বে তাঁর জীবন পরিক্রমার কলামটি পরখ করলাম এবং বইগুলোর ওপর পাখির দেখার ন্যায় নজর বুলিয়ে নিলাম। এই দেখা থেকে আমার অনুভূতি তুলে ধরেছি।

খবর থেকে ইতিহাস এবং খবরের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংবাদ পরিবেশন করা। সাংবাদিকতার মধ্যে অনুসন্ধান করা যায় ইতিহাসের অন্যতম সূত্র। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যত ইতিহাসের সূত্র হিসেবে সাংবাদিকতা বা খবর পরিবেশনকে তেমন বিশ্বস্ততার পর্যায়ে আমলে নেন না ইতিহাসবেত্তাগণ। খবর পরিবেশন ও সাংবাদিকতায় থাকে আত্মিক আবেগ ও ভাষার লালিত্য। এদিক থেকে সাংবাদিকতা সাহিত্য চর্চার অনেকটা কাছাকাছি একটি অধুনা বিকশিত অভিজ্ঞান। অপরদিকে ইতিহাসচর্চা বস্তুনিষ্ঠতা ও নির্মোহতার দাবিদার। উপকরণের স্তূপ থেকে চুলচেলা বিচার করে সত্য অনুসন্ধান করা এবং তা অনুসন্ধিৎসুদের নিকট উপস্থাপন করা ইতিহাসচর্চার প্রধান লৰ্য বলে মনে হয়। একসময় রাজরাজড়াদের প্রশস্তি ও কর্মকান্ডের মধ্যে ইতিহাসকে গন্ডিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সে ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত ধারণায় মানুষ হলো ইতিহাসের উপাদান। তাই সকল মানুষের অংশ আছে ইতিহাসের পরিসীমায়। এতে সমাজের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততার প্রতিটি বিষয় ওঠে আসে ইতিহাসচর্চার বিশাল পরিমন্ডলে। সমাজকে বিযুক্ত করে ইতিহাস বিনির্মাণ করা যায় না। অথচ ইতিহাসের জনক বলে খ্যাত গ্রিস ঐতিহাসিক হিরোডটাসকে (খ্রিস্ট-পূর্ব ৪৮০ অব্দ) ইতিহাসের সাথে সমাজকে যুক্ত করতে দেখা যায় না। তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে গ্রিকো-পারসিক যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং রাজেন্যদের নিষ্ঠুরতার দৃশ্যমান চিত্র। অপরপৰে যুগ ও কাল পেরিয়ে মুসলমানদের হাতে ইতিহাস চর্চা বিশিষ্টতা লাভ করে এবং জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটে তাতে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিঃ) ইতিহাসের চলমান ঘটনাপ্রবাহকে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেৰ্ষণ করে যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন তা ইতিহাসকে একটি বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞানে দাঁড় করিয়েছে। দর্শন ও জীবনবোধের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও নির্মোহতা ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। কূপমন্ডুকতার বেড়াজাল ভেদ করে আলোকিত মন নিয়ে ইতিহাস লিখলে তা সমকালীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিক-নির্দেশনা হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে- এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে উৎসারিত বাস্তবতার মূলধন পুঁজি করে জনাব আবদুল মান্নান আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার অন্বেষার সাথে সাথে মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার ওপর তথ্যভিত্তিক, অথচ বিশেৰ্ষণমুখী- আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন

www.pathagar.com

তাঁর 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ও 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ে। বাংলা এমন একটি ভূখন্ড যা প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছে তার পলিপড়া উর্বর মাটিতে। ফলশ্রবতিতে নানামুখী সংস্কৃতি ও সভ্যতার বালিয়াড়ি জমেছে এদেশে বসবাসরত নানাবর্ণের জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এ দেশের মাটিতে জনবসতির সন্ধান মিলছে বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মালমসলাতে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সুর অনুরণিত হলেও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর যে স্বকীয়তা ছিল তা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নতুন আংগিকে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরব করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত কালপর্বকে একক সময়ক্রমের আওতায় এনে তিনি সমাজ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক ধারার প্রকৃতি বিশেরষণ করেছেন। জুলুম, নির্যাতন ও মনুষ্যত্ব ধ্বংসের পরের শক্তির বিরবদ্ধে প্রতিবাদী কন্ঠ ও হাত সব সময় সক্রিয় ছিল বাংলার এই মাটিতে। শান্তিকামী জাতি হিসেবে মুসলমানদের আগমন এ দেশে সমাজ বিপরবের যে ধারা প্রবর্তন করেছিল জনমানসে তা প্রশান্তি বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং সহমর্মিতা ও জনগণের সহ-অবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। আবদুল মান্নান মুক্ত মন নিয়ে এসব বিষয়ে তাঁর এই গ্রন্থে যৌক্তিক আলোচনা পেশ করেছেন।

আবদুল মান্নান 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো মূলত ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এবং তাতে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামের চিত্র ভালভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এ দেশের মানুষ ও মাটির পরিচয়ে গড়ে ওঠা মুসলমানদের তাওহীদ ভিত্তিক জীবনবোধ ও সংস্কৃতি তাদের শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রতিকূলতা জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং অন্যায়ের বিরবদ্ধে ইস্পাত কঠিন শক্তি প্রয়োগে সহায়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয়া তারই ধারাবাহিকতার একটি অংশমাত্র। মুসলিম বাত্রশক্তির সাথে এ দেশের উলামা-মাশায়েখ ও মেহনতী জনগণ একই কাতারে দাঁড়িয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের শিকড় উৎপাটনে জীবন দিতে কুন্ঠাবোধ করেননি কখনও। নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশ ভূখন্ডের আপামর জনগোষ্ঠী ইসলামের অমিয় বাণীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তাদের জাতিসত্তার মূল সবক এবং তার রবার জন্য বীর সৈনিক হিসেবে সদা প্রস্তুত। শত প্রলোভন, বঞ্চনা ও নিপীড়নের কঠোরতার মধ্যেও তারা শিখর হিমাদ্রীর ন্যায় অটল। তারা শির দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমামা ছাড়তে মৃত্যুপণে বলীয়ান। আবদুল মান্নানের 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থে এ কথাগুলো ওঠে এসেছে বলে আমার মনে হয়েছে। শিল্পীর কথামালায় ও বলিষ্ঠ লেখনীর অগ্রভাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে আবদুল মান্নানের সংগ্রামী চেতনার এসব অভিব্যক্তি। আকাশ সংস্কৃতির বিষময় ছোবলের বিরবদ্ধে আমাদের তরবণ প্রজন্ম লেখকের এ মূল্যবান লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমি মনে করি।

উপর্যুক্ত দু'টি গ্রন্থের উপসংহার হিসেবে যুক্ত হয়েছে জনাব আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থটি। লেখক অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে সাজিয়েছেন ইতিহাসের ধারাক্রম অনুযায়ী। পত্র-পত্রিকা, বিদগ্ধজন ও মনীষীদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে চিত্র অংকন করেছেন তা নবীন-প্রবীণদের অবশ্যই অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। লেখক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুশীলন গ্রহণের জন্য নিকট-অতীতের বিষয়াবলি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। লেখকের এই তিনটি গ্রন্থ একত্রে পাঠ করলে বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় সন্ধানের একটি চূড়ান্ত পর্যায় উপলব্ধি করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তাঁর কোন কোন মতের সাথে কেউ ভিন্নতা পোষণ করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস রচনার সার্বিক পদ্ধতি বিচারে তাঁর লেখার মধ্যে নির্মোহতার ছাপ স্পষ্ট।

পরিশেষে বলতে চাই যে, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অত্যন্ত শ্রম দিয়ে ও কষ্ট স্বীকার করে উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোর বিচার-বিশেরষণের মাধ্যমে রচনা করেছেন তাঁর এই তিনটি গ্রন্থ। ভাষা সাবলীল, গতিময় ও সুখপাঠ্য। ছাপা পরিচ্ছন্ন ও বাঁধাই মনোরম। আমি এই গ্রন্থগুলোর বহুল প্রচার কামনা করি।

লেখক : প্রফেসর ইমেরিটাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সাংবাদিক, ব্যাংকার ও এক শিকড় সন্ধানী গবেষক

বেলাল চৌধুরী

"আপনাকে এম এ পাস করতে হবে", ছোট্ট একটি শিশুকে আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে দুপতারা সফরকারী তৎকালীন প্রাদেশিক শিল্প মন্ত্রি দেওয়ান আবদুল বাসেত পরম মমতায় কথাগুলো বলেছিলেন। খুশিতে শিশুটির চোখ ভিজে উঠলেও বুকের মধ্যে বড় কিছু হওয়ার যে সুপ্ত বাসনা ছিল তা আরো শাণিয়ে উঠে।

সেদিনের সেই শিশুটিই আজকের মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, যিনি শুধু উচ্চ শিক্ষাই গ্রহণ করেননি, তার ঘটনাবহুল কর্মজীবনের মাধ্যমে সেবা করে চলেছেন দেশ ও জাতির। তার দেহে বয়ে চলেছে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের পক্ষে লড়াইকারী পূর্বপুরুষের রক্ত। তার দাদা মৌলবী আজিমউদ্দিন ব্রিটিশদের পদলেহনকারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজার লড়াইয়ে নেতৃত্ব প্রদানকারী মৌলবী মফিজের পাশে ছিলেন সহযোদ্ধা হিসেবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর এ লড়াই তীব্রতা পায় এবং জমিদারদের সুসজ্জিত লাঠিয়াল বরকন্দাজ দলকে পরাজিত করে বাজবী, তিনগাঁও ও দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের কৃষক-প্রজা সাধারণ মানুষ। এটা ছিল এক অবিস্মরণীয়, এক অভূতপূর্ব বিজয়। শুধু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়। পূর্ব বাংলার ভাষার স্বীকৃতির দাবিতেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের বছর ১৯৫২। এ বছরেরই ৩০ জুন বাবা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মা জোবায়দা বেগমের ঘর আলো করে জন্ম নেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। শিশু বয়সেই মান্নানের মধ্যে দেখা যায় কোন কিছু শেখার প্রতি গভীর আগ্রহ, অদম্য কৌতূহল ও মেধার ছাপ। কামরাঙ্গীর চর প্রাইমারি স্কুল, কখনো মা নেহর মাদ্রাসা এবং তারপর বাজবী প্রাইমারি স্কুল মান্নানকে করে তোলে শিক্ষানুরাগী। বই পড়ার প্রতি তার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালেই। বাবার দেয়া পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়ে তিনি অন্য কিছু না করে কেনেন নাটকের বই 'সোহরাব রুস্তম'। শুধু পড়ালেখা নয় সব কিছুতেই মান্নানের ছিল সমান আগ্রহ। প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালেই তার সুযোগ হয় কবি জসিমউদদীনকে দেখার, ওই সময়কারই সীমাহীন মুগ্ধতা আজো উজ্জ্বল স্মৃতি। বাজবী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল পন্ডিতের অনুপ্রেরণা মান্নানের শিক্ষা জীবনকে করেছে আলোকিত।

প্রাইমারী পাস করে মান্নান দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং তার পরিচয়ের পরিসর বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় মান্নানের স্কুলে আসেন কবি গোলাম মোস্তফার ছেলে শিল্পি মোস্তফা আজিজ, সাথে ইত্তেফাকের তরুণ রিপোর্টার শফিকুল কবির। মান্নান নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে ভাব জমান সাংবাদিক শফিকুল কবিরের সাথে। এ সাক্ষাৎকার ছিল সাংবাদিকতার প্রতি তার প্রথম প্রেম। সাংবাদিকতার প্রতি ভাল লাগাই এক সময় নির্ধারণ করে তার পেশা ও কর্মজীবন। তবে নিছক পেশা হিসেবে তিনি কখনো সাংবাদিকতাকে দেখেননি, তিনি মনে করতেন একজন

www.pathagar.com

সাংবাদিকের গুরুদায়িত্ব রয়েছে দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে লড়াই করার। ১৯৬৫ সালে মান্নান ভর্তি হন পাঁচগাঁও হাইস্কুলে। আড়াই হাজার থানায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম হাইস্কুল। ১৯৬৭ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে মান্নান চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকায় এক বাড়িতে লজিং থেকে শুরু করেন পড়াশুনা, ভর্তি হন শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজে। বই পড়ার প্রতি তার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং বই নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন বিভিন্ন পাঠাগারে।

নেতৃত্ব দেয়ার গুণ মান্নানের মধ্যে ছিল সহজাত। এ কারণে ক্লাস ক্যাপ্টেনের পর শেখ বুরহানউদ্দিন কলেজে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের যৌথ সমর্থনে পান সাহিত্য সম্পাদকের পদ। গড়ে তোলেন 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন। পরবর্তীতে গড়ে তোলেন 'জাতীয় যুব সংঘ'। সতেরো বছরের তরুণ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ সময় আকস্মিকভাবে মাসিক পৃথিবী সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিব-এর সান্নিধ্যে আসেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার সাধারণ বিষয়গুলোর পাঠ তার এ সময়েই শুরু হয়। ঊনসত্তরে উত্তাল দিনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বর্জন করেন।

সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার যে স্বপ্ন মান্নান দেখতেন তা বাস্তবতা পায় ১৯৭০ সালের ২ জানুয়ারি। আবদুল মান্নান তালিব-এর সহযোগিতায় দৈনিক সংগ্রামের প্রুফ রিডার হিসেবে তিনি যোগ দেন। এর পর মান্নানকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মেধার পরিচয় দিয়ে অতি অল্প সময়েই তিনি সংবাদপত্র জগতে তার আসন পাকাপোক্ত করেন। প্রুফ রিডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি দেখেন প্রেস ফটোগ্রাফী। দৈনিক সংগ্রামের পাশাপাশি দৈনিক আজাদ-এ কাজ করেন ফটো সাংবাদিক রূপে। ১৯৭২ সালের শুরুতে মান্নান সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় যোগ দেন। স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী মালিক প্রকাশক মহীউদ্দীন আহমদের সাহসী পৃষ্ঠপোষকতায় ষাটের দশকের প্রথমার্ধে 'সোনার বাংলা'-কে আউয়ুব-মুনায়েমের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক করেছিল।

সত্তরের দশকেও একই নীতির ধারবাহিকতা মান্নানের কলমে শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। সোনার বাংলায় মান্নান কাজ শুরু করেন বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে। এর পর বার্তা সম্পাদক ও পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি লেখালেখি করতেন বঙ্গদর্পণ ও দৈনিক পূর্বাভাস পত্রিকায়। রাজনৈতিক ভাষ্য, অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিবরণী, আন্তর্জাতিক বিষয়, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, স্যাটায়ার ও চুটকীধর্মী লেখা। সব লেখাতেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রজ্ঞার ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার ছাপ পাওয়া যায় এবং পাঠকের মন জয় করে। সোনার বাংলায় প্রকাশিত মান্নানের রম্য কলাম 'গুলবাজ খাঁর হপ্তা নামা' পাঠকদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলে।

সোনার বাংলায় কাজ করার সুবাদে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সে সময় অনেক প্রাজ্ঞ-প্রবীণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পান। তাদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদের সাংস্কৃতিক আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। কবি ফররুখ আহমদের সাথে ছিল তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ। কবির মৃত্যুর পর শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত 'ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি কমিটি'র নির্বাহী সদস্য হিসেবে তিনি ফররুখ স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রকাশনার সাথে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৭ সালে স্বদেশ-সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি হন।

প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে মান্নান কখনো হার মানেনি। অদম্য মনোভাব থাকায় ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তারিখের সোনার বাংলার পুরো সংখ্যাটির সম্পূর্ণ কাজ মান্নান একাই সম্পন্ন করেন। তবে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে পাঠকের কাছে ওই সংখ্যাটি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

১৯৭৫ সালের নিষেধাজ্ঞার কারণে বহু সাংবাদিক পেশা পাল্টাতে বাধ্য হন, তবে মান্নান লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইস্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল' ও 'পাক্ষিক বাংলাদেশ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। সোনার বাংলার

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনকালেই তিনি ১৯৭৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় ইয়ং মেনস মুসলিম এসোসিয়েশন (ইয়ম্মা)? তরুণ সমাজের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের মাঝে আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয় ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত করা ছিল এ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ উঠে গেলে ১৯৭৬ সালের মার্চে দৈনিক আজাদ-এর পুন: প্রতিষ্ঠা লগ্নে মান্নান এতে যোগ দেন স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে। ফারাক্কা বাঁধের মরণ ছোবল পদ্মার বিভিন্ন দশার চিত্র আর পদ্মা তীরের জনজীবনে ফারাক্কার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া নিয়ে মান্নানের রিপোর্ট সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি করে। মাওলানা ভাসানীর ডাকে ফারাক্কা অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চ কর্মসূচি পালিত হয়। তাবলীগ ইজতেমা নিয়ে বাংলাদেশের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনটির স্রষ্টা মান্নান। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুর খবরটি দৈনিক আজাদ পরিবেশন করে প্রথম ও শেষ পাতা মিলিয়ে মোট ষোল কলামে এবং প্রায় সকল কলাম দখল করে মান্নানের প্রতিবেদন।

১৯৭৬ সালে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও জাতি গবেষণামূলক গবেষণার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাকালীন চল্লিশ সদস্যের অন্যতম ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। কেন্দ্রে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার জন্য পৃথক ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু থেকে এর একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন মান্নান। ১৯৭৭ সালের ১৭ জানুয়ারি দৈনিক সংগ্রাম পুন: প্রকাশিত হলে তাঁর ডাক পড়ে এবং ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার ও ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। মাঝে কিছুদিন তিনি 'বাংলাদেশ লেবার কেসেস' জার্নালের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার হিসেবে মান্নান সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার নীতি অনুসরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন মান্নান। ১৯৮০ সালের ২৩ মে ঢাকায় খন্দকার মোশতাক আহমাদের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় স্প্লিন্টার বিদ্ধ হন মান্নান। জরুরি চিকিৎসা গ্রহণের পর ডাক্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করে হাসপাতাল থেকে মান্নান সংগ্রাম অফিসে যান এবং একটি টেবিলে শুয়ে সে দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন। ২৪ মে'র কাগজে সে প্রতিবেদন তাঁর নামে ছাপা হয়। শীর্ষস্থানীয় বহু রাজনীতিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মান্নান যা গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে। সাংবাদিক হিসেবে মান্নান তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠাসহ পালন করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা ও তাদের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে তিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের আগস্টে মান্নান সাংবাদিকতার পেশা থেকে বিদায় নেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিকতাকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ঘটনাই তাঁর পেশা বদলের কারণ হয়। ইসলামী ব্যাংকের প্রথম শাখা উদ্বোধনের দশ দিন আগে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট তিনি এ ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা রূপে যোগ দেন। ব্যাংকের দুই উদ্যোক্তা মুহাম্মদ ইউনুছ ও এম এ রশিদ চৌধুরী এবং বন্ধুবর মাহবুবুল হক মান্নানকে তাঁর পেশা পরিবর্তনের এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

জনসংযোগ কর্মকর্তা রূপে নতুন ধারার ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের জনমানুষের কাছে পরিচিত করা এবং এ কাজে মিডিয়ার সর্বোত্তম সহযোগিতা লাভ করা ছিল মান্নানের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতার কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন। সাংবাদিক থাকাকালে তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য হিসেবে এর বিভিন্ন কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পেশা বদলের পর তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বি বা)-

www.pathagar.com

এর একজন সক্রিয় কর্মী রূপে বাংলাদেশর ব্যাংকিং ব্যবস্থার সার্বিক ইসলামী রূপান্তরের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এছাড়া এ সময় তিনি বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির নির্বাহী সদস্য হিসেবে দেশের জনসংযোগ পেশার মানোন্নয়ন এবং জনসংযোগ কর্মীদের ভূমিকা জোরদার করার কাজে তিনি সবসময় নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রাখেন।

১৯৮৫ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঢাকা বিভাগীয় দফতরের উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর উনিশটি বিষয়ে ধারাবাহিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে একটি বিষয় ছিল বাংলার মুসলিম নবজাগরণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। এ সেমিনারে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান গ্রন্থের সাথে তুলনা করেন সেমিনারের সভাপতি প্রিন্সিপাল নূরুল করীম। উৎসাহমূলক মন্তব্য মান্নানকে আগ্রহী করে তোলে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিতভাবে পড়াশুনায়। লেখালেখির বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশের প্রাচীন ও কিছু বিলুপ্ত শিল্প সম্পর্কে শিশু-কিশোর মাসিকপত্র ফুলকুঁড়ি'তে 'বাংলা আমার দেশ' শিরোনামে লেখেন। ১৯৮৬ সালে মান্নানের উদ্যোগে এং প্রেরণায় আড়াই হাজার থানার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ 'দীপন' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারেও আগ্রহী হন মান্নান।

চ্যালেঞ্জিং পেশার প্রতি আকর্ষণ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক সমর্থনের কারণে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৮৮ সালের ৮ জানুয়ারী জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব ছেড়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূলধারায় প্রবেশ করেন। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে সংক্ষিপ্ত ওরিয়েন্টেশনের পর ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি একটি নতুন শাখা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে যশোর যান। এভাবে তিনি ব্যাংকার ও ব্যবস্থাপক। দাদা আযিমউদ্দিন কৃষক প্রজার হয়ে লড়াই করেছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে, আর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শুরু থেকেই নিজেকে সাধারণ মানুষের ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি সর্বত্র ও সব মহলে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। তাঁর চেষ্টায় নিম্ন আয়ের লোকজন ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ হন। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীকে তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করেন। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং নিয়মের মধ্যে থেকেও একজন চৌকষ পেশাদার ব্যাংকার সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ পবির্তনে অবদান রাখতে পারেন, তার অনন্য দৃষ্টান্ত মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এর স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালের জন্য দুই-দু'বার ব্যাংকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপকের পুরস্কার পান। ব্যাংকের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ২০০১ সালেও পুরস্কৃত হন।

ব্যাংকিংয়ের মূলধারায় এসেও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা আর লেখালেখি অব্যাহত রাখেন মান্নান। তাঁর গবেষণার প্রথম ফসল হিসেবে ১৯৯২ সালে 'বাংলা ও বাঙগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' প্রকশিত হয়। বইটি সুধিমহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থটি। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় বিভিন্ন সময়ের তাঁর গঠিত প্রবন্ধ। এর মধ্যে আছে 'একশ' বছরের রাজনীতি' বাংলা চৌদ্দ শতক : ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলার রেনেসাঁর শতাব্দী, 'বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের রাষ্ট্রসত্তা' এবং 'আমাদের রাষ্ট্রসত্তার বিকাশধারা'। মূলত এ দু'টি বই প্রকাশিত হবার পর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিক ও ব্যাংকার পরিচয় অতিক্রম করে একজন শিকড় সন্ধানী গবেষক রূপে পরিচিত হন। 'বাংলা ও বাঙগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা বইটি এ জনপদের প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালের ইতিবৃত্ত। আরো দু'টি খন্ডে বাকি সময়কে উপস্থাপনের অঙ্গীকার নিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কাজ করছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেসকরণীর

www.pathagar.com

ধার, বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করেন। মাওলানা ভাসানীর জীবনের শেষ পাঁচ বছর শিরোনামে লিখেছেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। সাধারণ মানুষের ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেন নানা উদ্যোগ। তার পরামর্শে ডাইরি'তে প্রতি বছর বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপানো শুরু হয়।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইরানে গমন করেন এবং এ সফরের বিবরণী 'পারস্যের পথে-প্রান্তরে' শিরোনামে সাপ্তাহিক বিক্রমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে মান্নান ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিট্যান্স কার্যক্রমের মার্কেটিং-এর বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সৌদি আরব যান। তার দায়িত্বের আওতা সম্প্রসারিত হয় সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ওমানে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠানোর ব্যাপারে তিনি প্রচারণা চালান। রিয়াদের বাংলাদেশ বিজনেস কম্যুনিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা প্রসঙ্গ তাঁর বই-প্রবন্ধ-নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ধরে উপসাগরীয় দেশ-সমূহের প্রত্যন্ত এলাকায় সফরকালে মান্নানের সুযোগ হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন দেখার। প্রবাসে থাকাকালে তিনি তাঁর লেখালেখির কাজ অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর ভ্রমণের বৃত্তান্ত ডাইরিভুক্ত করেন যার কিছু বিবরণ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উদ্যোগ কিংবা সম্পাদনায় প্রবাস থেকে বেশ কয়েকটি সাহিত্য সাময়িকী ও প্রকাশিত হয় ।

উপসাগরীয় দেশসমূহে দায়িত্ব পালন শেষে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী ব্যাংকের হেড অফিস কমপ্লেক্স কর্পোরেট শাখার প্রথম ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৩ সালে তিনি ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তারপর ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০৭ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগ উইং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদান এবং অফিসের অন্যান্য কাজে তিনি সফর করেছেন বিশ্বের বহু দেশ। তিনি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিডারশিপ ইন ফিন্যান্স (ইকলিফ)-এর ফেলো। মালয়েশিয়ার উন্নয়নের রূপকার মাহাথির মোহাম্মদ-এর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন মান্নান। একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্বশীল হয়েও তিনি তাঁর লেখকসত্তার প্রতি সুবিচার করার ব্যাপারে যত্নশীল। ২০০৫-০৬ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এবং তাঁর সম্পাদনায় 'বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষপূর্তি স্মারক ২০০৬' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' নামে একটি সত্যনিষ্ঠ বই। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রকাশিত হয় 'ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা' শীর্ষক বই। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম বই 'বাংলাদেশের পুলিশ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে।

পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের পাশাপাশি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লেখা-লেখির মাধ্যমে অনেক জ্ঞানগর্ভ ও সুখপাঠ্য বই পাঠককে উপহার দিয়েছেন । তিনি যেমন ইতিহাস ও ব্যাংকিংয়ের ন্যায় সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, তেমনি রম্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। লেখালেখির পাশাপাশি সম্পাদনায়ও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে তার অনেক লেখা।

এর মধ্যে আছে ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভ্রমণ, অনুবাদ। তার প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিষয়ে রয়েছে বৈচিত্র্য। সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিষয়ে রয়েছে তার প্রবন্ধ। বড়দের জন্য লেখার পাশাপাশি ছোটদের জন্য তিনি কলম ধরেছেন।

www.pathagar.com

ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে তার বহু লেখা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে ছাপা হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নাম তার বৈচিত্র্যময় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিংবা অনুরূপ সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে কাজ করছেন। মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র 'নাট্যরূপ' দিয়ে গ্রামের কিশোর সাথিদের নিয়ে তা মঞ্চায়নের ব্যর্থ প্রয়াস মান্নানের পঞ্চম শ্রেণীর ঘটনা। কিন্তু এরপর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যেখানেই হাত দিয়েছেন সোনার মানুষ। মানুষের কল্যাণই যার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা।

লেখক : কবি, গবেষক, কলামিস্ট

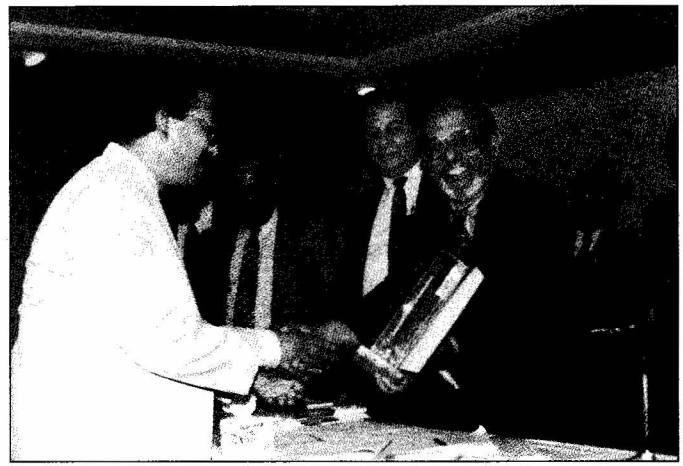

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপকের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ব্যাংকের তদানীন্তন চেয়ারম্যান কমোডর (অব:) আতাউর রহমানের কাছ থেকে

www.pathagar.com

সৃজনশীল চেতনার একজন মানুষ

আবুল আসাদ

চেতনা দুই প্রকারের। সক্রিয় চেতনা, নিষ্ক্রিয় চেতনা। নিষ্ক্রিয় চেতনার ক্ষেত্রটা হলো পাথরের মতো। এখানে বীজ ফেললে গাছ উঠেনা। বীজটাই ব্যর্থ হয়। আর সক্রিয় চেতনা হলো বীণার তারের মত। আঙুল স্পর্শ করলেই তা জবাব দেয়, বেজে উঠে। এই বেজে উঠাটাও ভ্যারিয়েবল। স্পর্শটা যেমন হবে, বীণার কণ্ঠ তেমনটাই কথা বলে উঠবে। সক্রিয় চেতনার প্রকাশ বীণার কণ্ঠের মতই টোটাল। এ চেতনায় কোন কিছু ছায়া ফেললে, তা তৎক্ষণাতই এক অপরিহার্য সাজজেক্ট হয়ে উঠে। এ সাবজেক্ট হয় জীবন্ত, সামনে এগোয়, শেষ কথাও বলে।

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সক্রিয় চেতনার মানুষ। সক্রিয় চেতনা শুধু সমসাময়িক হয় না, সমসাময়িকতার সীমা ডিঙিয়ে ভবিষ্যতকেও দেখে। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানদের সাপ্তাহিক সোনার বাংলা যেদিন বাংলাদেশের শুরুর দিনগুলোতে অন্ধকার ছাড়িয়ে আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখার একটা শৃংগ ছিল। এই অবস্থায় দাড়িয়ে প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা সফল লড়াই করেছেন। বর্তমানে দাড়িয়ে যারা দূর ভবিষ্যতকেও দেখেন, এ রকম কাজ তারাই করতে পারেন।

আমাদের মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এ ধরনেরই একজন মানুষ। সক্রিয় চেতনার এই লোকেরা তাদের চেতনার মতই অস্থির হন। হাতের কাজটুকুকেই তারা শেষ মনে করেন না, আরও কাজের জন্য চাওয়া তাদের তীব্র হয়। হাজারো নির্বাক চোখে ৭ই নভেম্বরের শ্লোগান-উল্লাস-মুখর সকালকে দেখেছে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে, কিন্তু আব্দুল মান্নান ও তাঁর মত লোকেরা সিপাহী-জনতার ট্যাংকে উঠেছিলেন ইতিহাস-বিনির্মানের কারিগরদের একজন হয়ে।

পেশাগত অবস্থানেও আব্দুল মান্নানকে এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখেছি একেবারে বটম থেকে তাঁর সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু। কিন্তু সাংবাদিকতার জন্য যে চরিত্রটা অপরিহার্য, যে দৃষ্টি ও হাতের যে কারুকাজ অত্যন্ত জরুরী, তার বলেই আব্দুল মান্নান খুব অল্প সময়ে রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন। সাংবাদিকতায় আরও সামনে এগুবার দরজা তার সামনে খোলা ছিল। কিন্তু ঐ যে বলেছি, এ ধরনের লোকেরা হাতের কাজটুকুকে শেষ মনে করেন না, আরও কাজের জন্য তাদের চাওয়া তীব্র হয়। এ চাওয়ার কারণে তারা অনিশ্চয়তাকেও আলিঙ্গন করতে পারে। আব্দুল মান্নান পেশা চেঞ্জ করেন। সাংবাদিকতা ছেড়ে হয়ে যান ব্যাংকার। সেদিন তার সামনে নতুন পেশার একটা অনিশ্চয়তা অবশ্যই ছিল। কিন্তু আজ আর নেই। তার ব্যাংকের ক্যাডারে আজ সে শীর্ষদের একজন।

সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে আব্দুল মান্নান ব্যাংকার হলেও সাহিত্যকে তিনি ছেড়ে দেননি বলেই তার নিরস ব্যাংকার জীবন সিক্ত হয়েছে সাহিত্য রসে। এই সাহিত্য-রস ইতিহাস-রচনার কঠিন পথই অবশ্য বেছে নিয়েছে। আমার জানা ভুল না হলে 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'

www.pathagar.com

গ্রন্থটিই আব্দুল মান্নানের প্রথম প্রধান সাহিত্য-কীর্তি। এ প্রসঙ্গে আমার ছোট্ট কাহিনী মনে পড়ছে। আমি আশির দশকের মাঝামাঝি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অধ্যাপক আব্দুল গফুর সম্পাদিত 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে সিপাহী বিপ্লোবোত্তর মুসলিম রাজনীতি' শিরোনামে আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল, সেই প্রবন্ধে সিপাহী বিপ্লবোত্তর সময়ের ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে একটা কালভাগ করেছিলাম। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর এক ব্যক্তিগত আলোচনায় আব্দুল মান্নান এই কালভাগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আব্দুল মান্নানের 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' বইটি যখন প্রকাশিত হলো, তখন দেখে খুশী হলাম যে আবদুল মান্নান ইসলামী রাজনীতি বা ইসলামের ইতিহাসের কালভাগকে বাংলাদেশের ইতিহাসের একেবারে আদিতে নিয়ে গেছেন এবং ইসলামের ইতিহাসের এই ধারাকেই আমাদের ইতিহাসের মূলধারা বলেছেন। গ্রন্থটি প্রথম একটি কমপ্রেহেনসিভ উদ্যোগ হিসেবে অনন্য। বাংলাদেশে ইসলামের উপর অনেকেই কাজ করেছেন। এই বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু কেউই একে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অখন্ড মূলধারার অংশ হিসেবে একে অংকন করেননি। আব্দুল মান্নান এটা করেছেন। তিনি যাত্রা শুরু করেছেন বাংলাদেশী জাতিসত্তার সেমেটিক পরিচয় থেকে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন তাই হয়ে উঠেছে তার আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের মতই। তিনি প্রাচীনযুগের উপর নজর বুলিয়ে মধ্যযুগ আত্মস্থ করে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্ত ১৭৫৭তে এসে ইতিহাসের মূল ধারা রচনার প্রায় দেড় হাজার বছর দীর্ঘ প্রথম পর্বটি শেষ করেছেন।

সক্রিয়তার নামই জীবন। তাই জীবন্ত চেতনা কখনও স্থির হবার নয়। আব্দুল মান্নানের মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারার গ্রন্থের শেষ লাইনটি পড়লেই মনে হয়, কথা শেষ হয়নি কিন্তু কথাটা যে প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাস ডিঙিয়ে বিশ শতকের শুরু থেকে শুরু হবে এটা বোঝা যায়নি। কিন্তু এটাই ঘটেছে। মূল ধারা সিরিজে আব্দুল মান্নানের দ্বিতীয় পর্ব 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'। ইতিহাসের মূল ধারা সন্ধানী আবদুল মান্নান পর্বের এই কাল সিলেকশনের ব্যাপারে ইতিহাসের আয়োজনের চাইতে সময়ের প্রয়োজনকেই মনে হয় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইতিহাসের একটা গ্রন্থিকাল এই গ্রন্থের বিষয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গই স্থায়ী পরিণতি লাভ করে দেশ বিভাগের মধ্যে। এটা উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে হট ইস্যু, বিশেষ করে উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমান দুই জাতির কাছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের নেকড়ে নবোত্থিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের দূর্বল ছাগলছানাকে বধ করার জন্যে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করে, কিভাবে আগ্রাসন ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম চলে বিশ শতকের প্রথম অর্ধেক জুড়েই এবং কিভাবে দুর্বল ছাগলছানা অবশেষে সমকক্ষ এক নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়, তারই কাহিনী লিখেছেন আব্দুল মান্নান দুই জাতি, দুই নগরীর (ঢাকা ও কলকাতা) সার্বিক সংঘাতের নিরীখে। বইটি ইতিহাসের অসংখ্য তথ্যে ঠাসা। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, ইতিহাসকার কথা বলার চেয়ে বলিয়েছেনই বেশী। এটা করে লেখক প্রয়োজনের দাবী পূরণ করেছেন অবশ্যই, কিন্তু পাঠকদের অতৃপ্ত রেছেছেন কারণ পাঠকরা ইতিহাসের সাক্ষির সাক্ষ্যকে লেখকের জবানীতে বুঝতে ও আত্মস্থ করতে চায়।

কিন্তু পাঠকদের এই পরিমান সময় দেবার সুযোগ আবদুল মান্নানের নেই। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা যার ব্যাংকে কাটে, তিনি সময় পাবেন কোথায়! এর পরও আশা, সময় যদি তিনি পান, সংগৃহীত তথ্যবলিকে নিয়ে হাতের কারুকাজ আরেকটু করেন, তাহলে পাঠক তৃপ্ত হবে, ইতিহাসেও আরও নতুন কথার সংযোজন ঘটবে।
বলেছি সক্রিয় চেতনায় স্বাভাবিক অস্থিরতা তার একটি বৈশিষ্ঠ্য। এই অস্থিরতা আর কিছু নয়, নতুন সৃষ্টির আলোড়ন। আব্দুল মান্নান পেশায় স্থির থাকেননি, সাহিত্যের বিষয়ের উপরও স্থির নয়। তাইতো দেখছি আব্দুল মান্নান ইতিহাস চর্চার মধ্যে থেকেই শিশু সাহিত্যের কল্প-পাখা-সজ্জিত হয়ে আকাশে উড়েছেন। তার 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' শিশুদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী রচনা। ব্যতিক্রমধর্মী এজন্য বলছি যে, এখানে বাচ্চাদেরকে বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি ইতিহাস ঐতিহ্য, রূপকথা, লোককথার নানা উপমা, নাম, দৃশ্য, কাহিনী সামনে এনেছেন, যা গ্রন্থটিকে একটা অনন্যতা দান করেছে।

'সোনার দেশ বাংলাদেশ' শিশু-গ্রন্থের ভাষায় আব্দুল মান্নানে শক্তিশালী গল্পের হাত দেখা গেল। গল্প-উপন্যাসের জগতে তার সরবপ্রবেশের

www.pathagar.com

একটি নীরব সংকেত একে বলাই যেতে পারে। এ ধরনের জাম্প করার বৈশিষ্ঠ্য আব্দুল মান্নানের একটি বৈশিষ্ট্য, তা তো আমি বলেছিই।

সব শেষে আমার ব্যক্তিগত একটি স্বীকৃতির কথা বলি। আমার সাইমুম সিরিজের প্রথম বইয়ের 'অপারেশন তেল আবিব' নামকরণ আব্দুল মান্নানই করেছিলেন। আমার সাইমুম সিরিজের সাথে তাকে স্মরণীয় করার জন্যই কথাটা এখানে বলা।

সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ছাপ্পান্নতম জন্মদিনে সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার-এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কবি বেলাল চৌধুরী। তার সাথে রয়েছেন ডান থেকে সৈয়দ লুৎফুল হক, মোস্তফা কামাল মজুমদার, আতা সরকার, শাহ আবদুল হালিম, এরশাদ মজুমদার, আবু জাফর, আলমগীর মহীউদ্দীন, মাহবুবুল হক ও ড. মাহবুব হাসান

www.pathagar.com

ইতিহাস গবেষণায় আবদুল মান্নানের সাফল্য

প্রফেসর ইমেরিটাস
ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী

তারেক ফজল নামে পরিচিত স্নেহাস্পদ সহকর্মী ড. তারেক এম তওফীকুর রহমান মারফত বাংলা ও বাংগালি মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা (প্রথম প্রকাশ ১৯৯১), আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪) ও বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ (প্রথম প্রকাশ ২০০৭) শিরোণামের সুন্দর বাঁধাই করা তিনটি গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে এবং এগুলোর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে 'মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : পিছনে ফিরে দেখা' শীর্ষক একত্রিশ পৃষ্ঠার টাইপ করা একটি কাব্যিক লেখা। এ সব মিলে একটি মূল্যায়নধর্মী লেখা তৈরির অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে। আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সজাগ। এতদসত্ত্বেও যখন কিছু লিখতেই হবে তখন প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, উপর্যুক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচয়িতা হলেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং টাইপ করা লেখাটি হলো তাঁর জীবন পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত খতিয়ান। একনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করে বর্তমানে পেশায় তিনি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন একজন ঊর্ধ্বতন ব্যাংক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তার সাথে জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত পরিসরে উদীয়মান ইতিহাস গবেষক। সাবধানতা অবলম্বন করে লেখার পূর্বে তাঁর জীবন পরিক্রমার কলামটি পরখ করলাম এবং বইগুলোর ওপর পাখির দেখার ন্যায় নজর বুলিয়ে নিলাম। এই দেখা থেকে আমার অনুভূতি তুলে ধরেছি।

খবর থেকে ইতিহাস এবং খবরের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংবাদ পরিবেশন করা। সাংবাদিকতার মধ্যে অনুসন্ধান করা যায় ইতিহাসের অন্যতম সূত্র। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যত ইতিহাসের সূত্র হিসেবে সাংবাদিকতা বা খবর পরিবেশনকে তেমন বিশ্বস্ততার পর্যায়ে আমলে নেন না ইতিহাসবেত্তাগণ। খবর পরিবেশন ও সাংবাদিকতায় থাকে আত্মিক আবেগ ও ভাষার লালিত্য। এদিক থেকে সাংবাদিকতা সাহিত্য চর্চার অনেকটা কাছাকাছি একটি অধুনা বিকশিত অভিজ্ঞান। অপরদিকে ইতিহাসচর্চা বস্তুনিষ্ঠতা ও নির্মোহতার দাবিদার। উপকরণের স্তূপ থেকে চুলচেলা বিচার করে সত্য অনুসন্ধান করা এবং তা অনুসন্ধিৎসুদের নিকট উপস্থাপন করা ইতিহাসচর্চার প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হয়। একসময় রাজ-রাজড়াদের প্রশস্তি ও কর্মকান্ডের মধ্যে ইতিহাসকে গন্ডিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সে ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত ধারণায় মানুষ হলো ইতিহাসের উপাদান। তাই সকল মানুষের অংশ আছে ইতিহাসের পরিসীমায়। এতে সমাজের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততার প্রতিটি বিষয় ওঠে আসে ইতিহাসচর্চার বিশাল পরিমন্ডলে। সমাজকে বিযুক্ত করে ইতিহাস বিনির্মাণ করা যায় না। অথচ ইতিহাসের জনক বলে খ্যাত গ্রিস ঐতিহাসিক হিরোডটাসকে (খ্রিস্ট-পূর্ব ৪৮০ অব্দ) ইতিহাসের সাথে সমাজকে যুক্ত করতে দেখা যায় না। তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে গ্রিকো-পারসিক যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং রাজেন্যদের নিষ্ঠুরতার দৃশ্যমান চিত্র। অপরপক্ষে যুগ ও কাল পেরিয়ে মুসলমানদের হাতে ইতিহাস চর্চা বিশিষ্টতা লাভ করে এবং জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটে তাতে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিঃ) ইতিহাসের চলমান ঘটনাপ্রবাহকে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন তা ইতিহাসকে একটি বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞানে দাঁড় করিয়েছে। দর্শন ও জীবনবোধের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও নির্মোহতা ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। কূপমন্ডুকতার বেড়াজাল ভেদ করে আলোকিত মন নিয়ে ইতিহাস লিখলে তা সমকালীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিক-নির্দেশনা হিসেবে বিশেষভূমিকা পালন করবে- এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে উৎসারিত বাস্তবতার মূলধন পুঁজি করে জনাব আবদুল মান্নান আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার অন্বেষার

www.pathagar.com

সাথে সাথে মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার ওপর তথ্যভিত্তিক, অথচ বিশ্লেষণমুখী- আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ও 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ে।

বাংলা এমন একটি ভূখন্ড যা প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছে তার পলিপড়া উর্বর মাটিতে। ফলশ্রুতিতে নানামুখী সংস্কৃতি ও সভ্যতার বালিয়াড়ি জমেছে এদেশে বসবাসরত নানাবর্ণের জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এ দেশের মাটিতে জনবসতির সন্ধান মিলছে বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মালমসলাতে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সুর অনুরণিত হলেও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর যে স্বকীয়তা ছিল তা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নতুন আংগিকে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত কালপর্বকে একক সময়ক্রমের আওতায় এনে তিনি সমাজ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক ধারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। জুলুম, নির্যাতন ও মনুষ্যত্ব ধ্বংসের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কন্ঠ ও হাত সব সময় সক্রিয় ছিল বাংলার এই মাটিতে। শান্তিকামী জাতি হিসেবে মুসলমানদের আগমন এ দেশে সমাজ বিপ্লবের যে ধারা প্রবর্তন করেছিল জনমানসে তা প্রশান্তি বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং সহমর্মিতা ও জনগণের সহ-অবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। আবদুল মান্নান মুক্ত মন নিয়ে এসব বিষয়ে তাঁর এই গ্রন্থে যৌক্তিক আলোচনা পেশ করেছেন।

আবদুল মান্নান 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো মূলত ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এবং তাতে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামের চিত্র ভালভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এ দেশের মানুষ ও মাটির পরিচয়ে গড়ে ওঠা মুসলমানদের তাওহীদ ভিত্তিক জীবনবোধ ও সংস্কৃতি তাদের শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রতিকূলতা জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন শক্তি প্রয়োগে সহায়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয়া তারই ধারাবাহিকতার একটি অংশমাত্র। মুসলিম ক্ষাত্রশক্তির সাথে এ দেশের উলামা-মাশায়েখ ও মেহনতী জনগণ একই কাতারে দাঁড়িয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের শিকড় উৎপাটনে জীবন দিতে কুন্ঠাবোধ করেননি কখনও। নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশ ভূখন্ডের আপামর জনগোষ্ঠী ইসলামের অমিয় বাণীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তাদের জাতিসত্তার মূল সবক এবং তার রক্ষার জন্য বীর সৈনিক হিসেবে সদা প্রস্তুত। শত প্রলোভন, বঞ্চনা ও নিপীড়নের কঠোরতার মধ্যেও তারা শিখর হিমাদ্রীর ন্যায় অটল। তারা শির দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমামা ছাড়তে মৃত্যুপণে বলীয়ান। আবদুল মান্নানের 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থে এ কথাগুলো ওঠে এসেছে বলে আমার মনে হয়েছে। শিল্পীর কথামালায় ও বলিষ্ঠ লেখনীর অগ্রভাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে আবদুল মান্নানের সংগ্রামী চেতনার এসব অভিব্যক্তি। আকাশ সংস্কৃতির বিষময় ছোবলের বিরুদ্ধে আমাদের তরুণ প্রজন্ম লেখকের এ মূল্যবান লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমি মনে করি।

উপর্যুক্ত দু'টি গ্রন্থের উপসংহার হিসেবে যুক্ত হয়েছে জনাব আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থটি। লেখক অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে সাজিয়েছেন ইতিহাসের ধারাক্রম অনুযায়ী। পত্র-পত্রিকা, বিদগ্ধজন ও মনীষীদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে চিত্র অংকন করেছেন তা নবীন-প্রবীণদের অবশ্যই অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। লেখক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুশীলন গ্রহণের জন্য নিকট-অতীতের বিষয়াবলি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। লেখকের এই তিনটি গ্রন্থ একত্রে পাঠ করলে বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় সন্ধানের একটি চূড়ান্ত পর্যায় উপলব্ধি করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তাঁর কোন কোন মতের সাথে কেউ ভিন্নতা পোষণ করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস রচনার সার্বিক পদ্ধতি বিচারে তাঁর লেখার মধ্যে নির্মোহতার ছাপ স্পষ্ট।

পরিশেষে বলতে চাই যে, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অত্যন্ত শ্রম দিয়ে ও কষ্ট স্বীকার করে উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনা করেছেন তাঁর এই তিনটি গ্রন্থ। ভাষা সাবলীল, গতিময় ও সুখপাঠ্য। ছাপা পরিচ্ছন্ন ও বাঁধাই মনোরম। আমি এই গ্রন্থগুলোর বহুল প্রচার কামনা করি।

লেখক : প্রফেসর ইমেরিটাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

একজন অ-ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ডঃ মাহ্‌বুব উলাহ্‌

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে আমার পরিচয় বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে। বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। কম্পিউটারে ঠাসা কম্পোজে দীর্ঘ ষাট পৃষ্ঠায় তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধে অজস্র তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে জনাব মান্নান কঠোর পরিশ্রম ও গভীর অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। প্রবন্ধটিতে যে পরিমাণে তথ্যের সমাহার ঘটানো হয় সেই পরিমাণে বিশেষণ ছিলো না। তবুও প্রবন্ধটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা প্রায় নির্বাসিত হতে চলেছে। মনে হচ্ছে জাতিকে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার জন্য একটি অতি শক্তিশালী মহল তৎপর রয়েছে। আমরা ইতিহাস পাঠ করি কেন? আমরা জানি, ইতিহাস হচ্ছে অতীত সম্পর্কে অধ্যয়ন করে বর্তমানকে বোঝার চেষ্টা করা এবং ভবিষ্যতের করণীয় নির্ধারণ করা। ইতিহাস বিস্মৃত জাতি তাই বর্তমানকে বুঝতে পারে না এবং ভবিষ্যতের করণীয়ও নির্ধারণ করতে পারে না। এমন ইতিহাস বিস্মৃত জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচারে জনাব আবদুল মান্নান জাতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর ইতিহাস রচনায় বিশেষণের ঘাটতি থাকতে পারে, কিন্তু অতীতের ঘটনাবলী জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি যে সুকঠিন দায়িত্ব পালন করছেন তার জন্য অবশ্যই আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাব।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রশিক্ষিত পেশাদার ইতিহাসবিদ নন। ইতিহাসবিদ আহমদ হাসান দানী, মমতাজুর রহমান তরফদার, আবদুর রহীম ও আবদুল করীম প্রমুখ যেভাবে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে অতীত দিনের অনেক অজানা তথ্য সাগর সেঁচে মনি মাণিক্য সংগ্রহ করার মত উদ্ধার করেছেন, আবদুল মান্নান তেমনটি হয়ত করেননি। তিনি প্রধানত অন্যের আবিষ্কার করা তথ্য দিয়ে ইতিহাসের মালা গেঁথেছেন। তাঁর এই প্রয়াসকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, এরকম কাজ এখন এদেশে ক'জনই বা করছেন? বক্তৃতার আসরে টেবিলে তুবড়ি মেরে কাল্পনিক ইতিহাস বর্ণনার তোড়ে সঠিক ইতিহাস আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উত্থাপনের সঙ্গে যুগপৎ পরিবেশন করা হয় অধিকতর বিকৃত ইতিহাস। ইতিহাসের এই রাজনীতিকিকরণ ইতিহাসের জন্য চরম দুর্যোগ বয়ে এনেছে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রাজনীতির প্রয়োজনেই ইতিহাস নিয়ে প্রায় তিন দশক ধরে লেখালেখি করছেন। তাঁর এসব লেখালেখিতে সস্তা হাততালি কুড়ানোর কোনো প্রয়াস নেই। তাঁর প্রয়াসের পেছনে কোনো দুরভিসন্ধিও কাজ করে না। তথ্য পরিবেশনে তাঁর নিবিড় যত্ন ও সততা আমরা লক্ষ্য করি।

তথ্যের জন্য তিনি যথাসাধ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে উৎস ও সূত্র নির্দেশ করেন। ইতিহাস পড়ে তিনি আনন্দ পান- একথা বিশ্বাস করতে চাই। আনন্দ না পেলে অমন সাধনার কাজ করা যায় না। হয়ত তার মনের মধ্যে গভীর বেদনাবোধও কাজ করে। এই বেদনাবোধ আমাদের রাজনীতিতে ইতিহাস বিমুখতার জন্য, এই বেদনাবোধ ইতিহাস চেতনাবর্জিত প্রজন্মের লক্ষ্যহীন যাত্রা দেখে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেন, বক্ষে তার বেদনা অপার'। আমার ধারণা অপার বেদনা বুকে নিয়েই আবদুল মান্নান ইতিহাস লেখেন। যে রাজনীতির প্রয়োজনে তিনি ইতিহাস লেখেন, তাকে সঙ্কীর্ণ দলীয় গন্ডিতে আবদ্ধ করা যাবে না। এই রাজনীতি দেশপ্রেমের রাজনীতি। মা ও মাটির প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার

www.pathagar.com

রাজনীতি। ইতিহাস কখনো রাজনীতি বিমুক্ত হতে পারে না। ইংরেজরা অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা ইতিহাস রচনা করেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ইংরেজদের মিথ্যার বেসাতিকে উন্মোচিত করে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে বেগবান করেছিলেন। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে একজন ধর্মান্ধ ও পরধর্ম বিদ্বেষী রূপে চিত্রিত করে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের রাজনীতিকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের বিশেষণ আওরঙ্গজেবকে পরধর্ম বিদ্বেষের গানি থেকে মুক্ত করেছে। এভাবে আমরা অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারি। এ কারণে ইতিহাস সর্বকালে সর্বযুগে রাজনীতির ডামাডোল থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। তাই বলে ইতিহাসের মূল্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।

বাংলাদেশের ইতিহাস আজকাল এমনভাবে পরিবেশিত হয় যে, ১৯৫২ সালের পূর্বে এই জনপদের কোনো ইতিহাস ছিল না। ১৯৫২ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক – একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু তারও আগে আছে ১৯৪৭, ১৯৪০, ১৯৩৭, ১৯৩০, ১৯১১, ১৯০৬, ১৯০৫ এবং তারও আগে ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ, ১৭৫৭ তে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অস্তমান হওয়া এবং তারও আগে স্বাধীন সালতানাতের কাহিনী। এর চাইতেও পেছনে ফিরে তাকালে আমরা পাই সেন ও পাল রাজাদের যুগ। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের গঠন সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের অনেক চড়াই-উতরাই পার হওয়ার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের এই ধারায় মুক্তির মন্দির সোপানতল শত-সহস্র বীরের রক্তধারায় রঞ্জিত হয়েছে। সমাজের নিচুতলার মানুষের জেগে ওঠা এবং উপরের তলার মানুষদের হাতে এদের দমন-পীড়নের সংঘাতই আমাদের ইতিহাসকে দিয়েছে মহিমা। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর লেখা গ্রন্থ 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বাংলা ও বাংগালী- মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃত - শাহ ওয়ালিউলাহ দেহলভী ও জামালউদ্দিন আফগানী' প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদেরকে ১৯৫২'র পেছনে মনোযোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমন নয় যে ইতিহাসবিদরা এই কাজটি করেননি। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কৃতিত্ব হল স্বদেশ চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে সহজ সরল ভাষায় পাঠকপ্রিয়ভাবে জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো তুলে ধরা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বার দেখা হয় এ বছর (২০০৮) একুশের বইমেলায় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের স্টলে। প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ নানা রকমের বই প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। সেদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম মান্নান সাহেবের কৌতূহলের জগত বেশ প্রসারিত। ইতিহাস ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের বই সংগ্রহ করা ও পাঠ করা তাঁর নেশা। কোনো গবেষক যদি তাঁর নিজ এলাকার বাইরের জ্ঞানের জগত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকেন তাহলে তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি মান্নান সাহেবের যে উৎসাহ লক্ষ্য করেছি এবং সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁর যে প্রসারণশীলতা লক্ষ্য করেছি, তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। তাঁর ইতিহাস রচনায় বিশেষণাত্মকতার যে ঘাটতি আছে, আশা করা যায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করার ফলে সে ঘাটতি তিনি ভবিষ্যতে পূরণ করতে পারবেন।

মোহাম্মদ আবুদল মান্নানের একাডেমিক জীবনে ধারাবাহিকতা ছিলোনা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএস ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। মেধা তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিলো শীর্ষে। শিক্ষা জীবনে ছেদ পড়লে অনেক মেধাবী ব্যক্তির পক্ষেও শেষ পর্যন্ত ভালো ফল করা সম্ভব হয় না। কিন্ত মান্নান সাহেব এক্ষেত্রে ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। পেশাগত জীবনেও তাঁকে অনেক চড়াই-উতড়াই পার হতে হয়েছে। সংবাদপত্র জগতে তাঁর প্রবেশ একজন প্রুফ রিডার হিসেবে। নিছক সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি সম্পাদনা ও রিপোর্টিং- এ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। সাংবাদিকতায় জড়িত থাকার ফলে তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল এদেশের বিশিষ্টজনদের সংস্পর্শে আসার। এইসব ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর চিন্তার জগত প্রসারিত হয়েছিল। সাংবাদিকতায় উৎকর্ষ অর্জনের ফলেই তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৮৩ সনে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিযুক্ত হবার পর থেকে তিনি ব্যাংকিং জগতেই থেকে গেছেন। এখন তিনি এই ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মান্নান সাহেবের পেশাগত জীবনের উত্তরণ

www.pathagar.com

দেখে আমার চোখে ভেসে ওঠে ত্রিশ কিংবা চল্লিশের দশকে উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের চিত্র। কৃষকের সন্তান এই উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তরা মফস্বলের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে কোলকাতায় যেত ভাগ্যান্বেষণে। তখনকার দিনে এই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কারো পক্ষে ভালো কোনো সরকারী চাকুরী পাওয়া সম্ভব হতো না। সুযোগমত কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকায় তাঁরা একটি কাজ জুটিয়ে নিতেন। এদের অনেকেই প্রুফ রিডার হিসেবে সামান্য বেতনে কর্মজীবন শুরু করতেন। কেউ কেউ পাশাপাশি কোলকাতার কোন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনাটা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। অনেকের পক্ষেই কর্মজীবনের ব্যস্ততা কিংবা আর্থিক সমস্যার ফলে বিএ পাশ করাও সম্ভব হতো না। কিন্তু তাঁরা স্বশিক্ষিত মানুষ হয়ে উঠতেন। গুনীজনের সংস্পর্শে এসে তাঁরা হয়ে উঠতেন একেকটি আলোকিত মানুষ। এদের অনেকেই সাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। মান্নান সাহেবের জীবন পরিক্রমা ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবন সাধনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র অনেকাংশে বদলে গেলেও বদলে যায়নি এদেশের অসচ্ছল কৃষক সন্তানদের জীবনে উত্তরণ ঘটানোর সাধনা। এটাই বোধ করি বিশাল পরিবর্তনের স্রোতে অপরিবর্তনের নিয়তি।

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর বেশির ভাগই ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত। তিনি মূলতঃ বাংলার মুসলিম সমাজের অধস্তন অবস্থা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করার মধ্যে নিবিষ্ট থেকেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব হয় না আত্মপরিচয় নির্ধারণ করতে না পারলে। বাংলার মুসলমান সমাজ তার আত্মপরিচয় নির্মাণে পথ খুঁজে ফিরেছে। মান্নান সাহেব এই পথ-খোঁজা পথিকের সন্ধানী মনকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে আমি 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ– ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' গ্রন্থটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে কবি আল মাহমুদ লিখেছেন, ' সব ঐতিহাসিকেরই পক্ষপাত থাকে, মান্নানেরও তা আছে বৈকি! কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর তথ্য-সন্ধানে বিস্ময়কর প্ররিশ্রম ও জ্ঞানের পরাক্রম। এই গ্রন্থে প্রতিটি পরিচ্ছেদ যেভাবে নিষ্ঠার সাথে উত্থাপিত হয়েছে তাতে বঙ্গভঙ্গের আদি, অন্ত, অন্তর্নিহিত সত্যের অপ্রকাশিত যন্ত্রণা পাঠককে অভিভূত করে ফেলবে। ইতিহাস অভিভূত হওয়া বা বিস্ময় প্রকাশের বিষয় নয়। কঠোর সত্যের মুখোমুখি করাই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব। ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা আমাদের সামনে সার্থকভাবে উত্থাপন করেছেন।' আমি কবি আল মাহমুদের এই মন্তব্যের সঙ্গে খুব একটা ভিন্ন মত পোষণ করি না। বইটির কোনো-কোনো অধ্যায়ে লেখক এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন যার অভিঘাতে সম্বিত হারাতে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের চার নম্বর উপ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো–"কলকাতার উত্থান ও আড়াই ডজন 'এক পুরুষের বড় লোক"। এতে তিনি লিখছেন, " ভবানীচরণের বাতলানো মহাজনী পথ ধরে রাতারাতি কারা 'অধিক ধনী' হয়েছিলেন, তাদের পরিচয় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করেছেন গবেষক বিনয় ঘোষ। বিনয় ঘোষ ১৮৩৯ সালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ একটি নামের তালিকা তাঁর 'টাউন কলকাতার কড়চা' বইতে তুলে দিয়েছেন। এই 'ভদ্রলোক'রাই শহর কলকাতার 'প্রাতকালীন গাত্রোত্থানের ইতিহাসের সাথে যুক্ত।" এইসব কৃতি পুরুষদের একজন হলেন, "ঠাকুর পরিবারের 'জুনিয়র ব্রাঞ্চ' বা নবীন শাখা নামে পরিচিত এবং কোম্পানী সরকারের এজেন্ট, পরে ২৪ পরগণার কালেকটর ও নিমক এজেন্টের সেরেস্তাদার থেকে নিমক মহলের দেওয়ান ও স্বল্পকালীন 'কাস্টমস-সল্ট-ওপিয়াম' বোর্ডের দেওয়ান, কুমারখালীর রেশম কুঠির মালিক, প্রজাপীড়ক নীলকর দ্বারকানাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৭৯৪) পরিবার। 'কার ট্যাগোর এন্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা এবং নীল ও রেশম ব্যবসায়ী দ্বারকানাথের প্রভাব প্রতিপত্তির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তার সমসাময়িককালে ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তারই কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। আমার প্রশ্ন, পারিবারিক এই ঐতিহ্য ও শ্রেণী চরিত্রের কারণেই কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন? কোলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোকেরা তাদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে মনে করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় নেমেছিল। কিন্তু মান্নান সাহেবের বই পড়ে যে প্রশ্নের জবাব আমরা পাই না তা হলো, বঙ্গভঙ্গ কেমন করে কোলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোকের স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল? বাংলার ইতিহাসে ভদ্রলোক ও পূর্ববাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের কথা আমরা জানি। কিন্তু মান্নান সাহেবের বইটি পড়ে বোঝা যায় না

www.pathagar.com

কি সামাজিক প্রক্রিয়ায় ভদ্রলোকরা 'ভদ্রলোক' হয়ে দাঁড়াল? মান্নান সাহেবের তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনায় এ ধরনের বিশেষণ খুব একটা পাওয়া যায় না। ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ আনুকূল্য না পেলে বিনয় ঘোষের তালিকাভুক্ত এক পুরুষের বড়লোকরা এক পুরুষের মধ্যেই বড়লোক হতে পারতো না। কেন তাদের প্রতি এই আনুকূল্য? কেনই বা মুসলিম সমাজের প্রতি ইংরেজ শক্তির বিরাগ? এসব প্রশ্ন পাঠক সবিস্তারে জানতে চায়। পৃথিবীর যত দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে সকল দেশেই এক পুরুষের মধ্যে বড়লোক হওয়ার অঢেল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এদের উত্থান পর্ব অত্যন্ত ক্লেদাক্ত এবং কদর্যতায় ভরা। ইংরেজি ভাষায় বলা যায়, এরা হল 'Filthy Rich' । এই সব নোংরা ধনীদের বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক গঠন থাকে, যা তাদের উত্থান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলার ক্ষেত্রে এদের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের বর্ণ পরিচয়টি। বর্ণভেদমূলক সমাজে উচ্চ বর্ণভুক্তরা নিম্ন বর্ণভুক্তদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার যৌক্তিকতা তৈরি করা হয় শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে। এটা বড় ভয়ানক অবস্থা। বাংলার মুসলিম চাষীসমাজ এই দুঃসহ পেষণের শিকার হয়েছিল। মোদ্দাকথায়, মান্নান সাহেবের গ্রন্থে তাঁর পরিবেশিত ও সংগৃহীত বিপুল তথ্যরাশির সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির এই প্রসঙ্গগুলো যুক্ত হলে গ্রন্থটি কালোত্তীর্ণ হত। বিনয় ঘোষের মত তিনি মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ ঘাটাঘাটি করেন নি। তাঁর পক্ষে সেটা হয়ত সম্ভবও ছিলো না। এভাবে মৌলিক সূত্রগুলো যাচাই-বাছাই করতে না পারা কোন রকম ব্যর্থতাও নয়। তবে অন্যের উদ্ধার করা তথ্যের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশেষণের সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি মৌলিক অবদান রাখতে পারতেন। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বুঝাতে চেয়েছি কি করে তাঁর কাজটি একটি সেমিন্যাল ওয়ার্ক হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও তাঁর লেখা থেকে খন্ডিত চিত্র পাই মাত্র। মুসলিম সম্প্রদায় কেন বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে সাড়া দিলো না সেই সম্পর্কে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু অন্ত-র্ভেদী বিশেষণ হাজির করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসব বক্তব্য মান্নান সাহেবের মূল থিসিসকে শক্তিশালী করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরোধিতার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে গ্রন্থের ২০৭ পৃষ্ঠায় মান্নান সাহেব উলেখ করেছেন, "১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দুরা এক জনসভা করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধী ভূমিকার কথা অনেকেই বলে থাকেন। সম্ভবত গড়ের মাঠের এই সভায় সভাপতিত্ব করার কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে এই ধারণাটি প্রচার পেয়েছে। মান্নান সাহেব তাঁর পরিবেশিত প্রায় সকল তথ্যের উৎস নির্দেশ করেছেন। যেহেতু অভিযোগটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, তখন এর তথ্যসূত্র নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। শুধু এই অসম্পূর্ণতাটি না থাকলে মান্নান সাহেবের গ্রন্থটি বাংলাদেশের স্বরূপ-অন্বেষী পাঠকদের জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ারে পরিণত হতে পারত। গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন, "পাল, সেন, তুর্কী, পাঠান, মোঘল শাসনামলে সকল উত্থান-পতনের রাজনৈতিক বিবর্তনে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ-উচ্চ বর্ণ হিন্দু এই সম্মিলিত শক্তিই শাসন-যন্ত্রের ছত্র-ছায়ায় সমাজে একটানা প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ইংরেজ শাসনেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।" বিশাল এক ঐতিহাসিক যুগ-পরম্পরা সম্পর্কে মান্নান সাহেবের এই উক্তিটি মোটা দাগে সঠিক। কিন্তু 'চিরায়ত ঐতিহ্যের বিব্রতকর অনুশীলন' সম্পর্কে এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। পাল ও সেন যুগে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্যের একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে। কিন্তু তুর্কী, পাঠান ও মোঘল শাসনামলেও এদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকার বিষয়টি পাঠকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। বাংলায় মুসলিম শাসনামলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ লাভের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক বিবেচনায় অথবা তাদের উদার মানসিকতায়। মান্নান সাহেবের মূল আলোচনায় ইংরেজ শাসন কায়েমের পরবর্তী সময়কে ঘিরে। এর পূর্বেকার ঘটনা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। তা সত্ত্বেও সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কোনো তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে হলে তা বিশেষণ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে করা শ্রেয়। সবশেষে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রশংসা করতে হবে এর তথ্য সমৃদ্ধতার জন্য। আমি আশা করি মান্নান সাহেব ভবিষ্যতে তাঁর বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত গ্রন্থটির একটি বড় সংস্করণ করবেন, যেটি হবে আরো তথ্যবহুল এবং বিশেষণ-ঋদ্ধ। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান দীর্ঘায়ু হোন এবং আরো অনেক মূলবান কাজ করুন–এই কামনাই করব।

প্রফেসর, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

একজন ভালো মানুষের প্রতিকৃতি

ডা. তারেক শামসুর রেহমান

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমার চেনার কথা নয়। কোনদিন দেখা হয়েছে কি-না, কিংবা কখনও মতবিনিময় হয়েছে কি-না, তা ঠিক এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূলত একজন ব্যাংকার। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। কিন্তু তাঁর লেখালেখি তাঁর এই পরিচয়কে ছাড়িয়ে গেছে। আমার বিবেচনায় তিনি ব্যাংকারের চাইতেও অনেক বেশি গবেষক ও গ্রন্থকার। অনেক দেরীতে হলেও তাঁর লেখনির সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল অনুজপ্রতিম তারেক ফজল। আমি তাঁর লেখা সব পড়তে পারিনি। তবে তাঁর তিনটি গ্রন্থে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, হ্যাঁ কাজটি অন্তত আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা রাজনীতি চর্চা করি, রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করি, পড়াই আমাদের এই কাজটি করা উচিত ছিল। আমরা যা করিনি, সে কাজটি করেছেন জনাব আবদুল মান্নান। তিনি হয়ে উঠেছেন পরিপূর্ণ একজন গবেষকরূপে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। শুধু জানাতে চাই, আমরা যারা শিকড় সন্ধান করি, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

জনাব মান্নান রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু তিনি হেঁটেছেন ইতিহাসের পথে। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনেছেন বাঙালীদের মুক্তি সংগ্রামের সঠিক চিত্রটি। 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগামের মূলধারা' গ্রন্থের পাতায় পাতায় রয়েছে সেই অনুসন্ধান। একজন গবেষক যে কাজটি করেন, সে কাজটিই করেছেন জনাব মান্নান। 'আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ'- প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ও প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সহকারে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন গঙ্গা-বিধৌত এ পলিময় ভূখন্ডের অধিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি একটি নতুন দিক। বাঙালী মুসলমানদের ইতিহাস খুঁজতে তাঁর এই গবেষণা আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

জনাব মান্নান বারবার খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাঁর অতীত, যেমনটি আনোয়ত্র হ্যালী (রুট) খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর আরো দু'টি গ্রন্থ 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' ও 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'- এ ধারাবাহিকতারই ফলশ্রুতি। 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা' গ্রন্থে তিনি থেমে গেছেন পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত এসে। আর আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারায় তিনি এগিয়ে গেছেন আরো একটু আগে স্বাধীনতা- পরবর্তী বাংলাদেশ পর্যন্ত। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত। এই গ্রন্থের শেষের দিকে (পৃঃ ১৯২) তিনি বলার চেষ্টা করেছেন, কেন শেখ মুজিবকে বাকশাল গঠন করতে হয়েছিল। এখানে তিনি ইংগিত দিয়েছেন তৎকালীন মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের যোগ-সাজশের। বিষয়টি অনেকের কাছেই নতুন। এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবীই এটি স্বীকার করতে চান না যে বাকশাল গঠনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ভূমিকা ছিল। সিপিবি ও ন্যাপ (মোঃ) এ ক্ষেত্রে পালন করেছিল একটি বড় ভূমিকা। আমার নিজের গবেষণাও এটি। পশ্চিমা ইউরোপে আশির দশকে আমি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করি। আমি সোভিয়েত তান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি কেন বাংলাদেশে এক দলীয় শাসনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ ছিল। গবেষণার কাজে আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়নেও যেতে হয়েছিল। জনাব মান্নান কিছু তথ্য সংযোজন করেছেন বাকশাল প্রশ্নে। তিনি গভীরে যাননি। সেটি তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। আমরা যারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি নিয়ে কাজ করেছি আমরা সোভিয়েত নীতির বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি কেন একজন বুর্জোয়া ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ একজন নেতাকে (শেখ মুজিব) দিয়ে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সাবেক সোভিয়েত নেতারা (পাঠক এ ব্যাপারে আমার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'সোভিয়েতকে-বাংলাদেশ' পড়ে দেখতে পারেন)।

www.pathagar.com

জনাব মান্নানের অনুসন্ধিৎসু মনে তাঁকে প্রায়শই নিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। তিনি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস। চরম সাহিত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সাহসিকতায়। তাঁর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' এমন একটি গ্রন্থ যার প্রায় প্রতিটি পাতায় তিনি সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন, যা এই প্রজন্মের তরুণ সমাজকে সত্যবাদী হতে সাহায্য করবে। সেই ইতিহাসকে আমরা অনেকে জানি, কিন্তু জানাতে সাহস পাই না এক ধরনের ইমেজ সংকট- এর ভয়ে। জনাব মান্নান সাহস করে বলেছেন সেই সত্য কথা। সেটি তাঁর নিজের কথা নয়। বরং ঐতিহাসিকদের লেখা ও তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পাঠকদের নিয়ে গেছেন সত্যের কাছে। তিনি যখন লেখেন, 'কলকাতার মৌচাকে ঢিল এবং কয়েকটি স্বার্থের 'বঙ্গে মাতরম' স্বদেশবাদের নামে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, কোম্পানীর তাবেদার রূপে 'নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' উনিশ শতকের এশিয়াটিক সোসাইটি; সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ, কিংবা 'ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ; কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিপৰ যখন কলকাতা; সাতচল্লিশে বঙ্গভঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের ভিত্তি, তখন তিনি বারবার আমাদের সেই সত্যের কাছে নিয়ে যান। তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন : 'স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপ বাংলদেশের প্রতিষ্ঠা এই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের যুগ-যুগব্যাপী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শতকরা ৯৭ ভাগ মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা পরিচালিত বাংলাদেশের এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাঞ্জাবের স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে। নিজেদের মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিরবদ্ধে নয়। এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। এই স্বাতন্ত্রবোধই আমাদের পৃথক করেছে কোলকাতার 'বাঙালী' বাবুদের কাছ থেকে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই আমাদের টিকিয়ে রাখবে আরো হাজার বছর।

জনাব মান্নান একজন ব্যাংকার হয়েও হয়ে উঠেছেন একজন পরিপূর্ণ গবেষক, যিনি ইতিহাস ঘাঁটতে পছন্দ করেন। আর ইতিহাস ঘেঁটেই সত্য ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরা, এ প্রজন্মের তরবণরা তাঁর কাছে ঋণী থাকবো। তিনি আমাদের আরো ভাল ভাল বই উপহার দেবেন, এই প্রত্যাশা রইল।

লেখক : প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
কর্মী ও গবেষক

জুবাইদা গুলশান আরা

আমাদের এই বিশাল পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই মানুষ মাত্রই সমাজ অন্তর্গত জীবনকে গ্রহণ করে বাঁচে, নিজেকে তার অংশীদার ও যোগ্য করে গড়ে তোলে এবং সাফল্যের জন্যে ব্যক্তি হিসেবে শুরু করলেও তার ভূমিকা হয়ে ওঠে সার্বজনীন। তারা অবিরাম কাজ করে যায়, আবার এর মধ্যে কিছু মানুষ আছেন, যাদের দ্বারা দেশ-জাতি এবং সমাজ উপকৃত হয়। মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া তাদের জন্য একটি কমিটমেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজের বহু বিস্তৃত বিশাল পটভূমি হয়ে ওঠে তাদের কর্মভূমি। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তেমনই একজন মানুষ। লেখালেখির মানুষ হিসেবে তাঁর কিছু লেখা গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। বইগুলো হচ্ছে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা,' 'বাংলা ও বঙালী : 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'। বিষয়গুলো আমাদের পরিচিত হলেও আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গ্রন্থ তিনটিতে। পড়তে গিয়ে আমার ভাবনার সঙ্গে যুক্ত একটি বিশাল ক্ষেত্র আমার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়লো।

প্রচুর গবেষণা এবং পর্যবেৰণের ফলশ্রুতিতে তথ্যপুষ্ট এ গ্রন্থগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। অতঃপর গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে জানার ইচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাথমিকভাবে জানতে পারি, এই মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। জানতে পারি, তিনি মূলত একজন সাংবাদিক। তাঁর চিন্তার বিস্তৃতি আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। তাঁর লেখা বেশ ক'টি গ্রন্থ হাতে আসে আমার, যার মধ্যে পরিচয় পাই একজন গবেষক, একজন সামাজিক বিশ্লেষকের। একজন মানুষের বিকাশমান চিত্তের প্রসার অবশ্যই তার কর্মধারা, যৌবনকাল এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের পলিমাটিতে গড়ে ওঠে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের মানুষ। তাঁর জন্ম হয় ভাষা আন্দোলনের বছর। তেজস্বী পিতামহ মৌলবী আজিমুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ মালেক ও পুত্রবধূ জোবায়দা খাতুনের সন্তান মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

মান্নানের শৈশব ছিল সদ্য দেশ বিভাগ; স্বাধীনতার উত্থান-পতনমুখর রাজনৈতিক আলোড়নে পূর্ণ। গ্রামীণ পরিবেশে তার লেখা-পড়া প্রাইমারী পর্বে শুরু হলেও নাগরিক প্রভাবও ছিলো বৈচিত্র্যময়। দাদার হাত ধরে মসজিদে যাওয়া, উঠানে আযান দিয়ে নামাজ পড়া। শবে বরাত, শবে কদরে সোনাঘটির স্রোতে ডুব-সাঁতার কেটে মসজিদে গিয়ে রাত জাগা,... কিংবা দাদার ইতেকাফ উপলক্ষে রোযার মাসে মসজিদে ইফতারী বা সাহ্‌রী নিয়ে যাওয়া ছাড়াও নানা অভিজ্ঞতায় ভরা ছিলো তার ছেলে বেলার জীবন। চাঁদনী রাতে বাড়ির উঠোনে পুঁথি পড়ার আসর, চাচার বাড়িতে কলের গান শোনা আরও নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিলো তার শৈশব। বই পড়ার প্রতি তখনই তার আগ্রহ জন্মায়। ছেলে বেলায় বাবার কাছ থেকে পাওয়া পয়সা দিয়ে সার্কাস না দেখে তিনি 'সোহরাব রোস্তমের' নাটক কেনেন। গাজী কালু চম্পাবতী, ছহি বড় জঙ্গনামা, বিষাদ সিন্ধু, আরব্য উপন্যাস এবং আরও প্রচুর বই পড়ার সুযোগ ঘটে তার। আধুনিক এ্যাডভেঞ্চারের বইও পড়ার সুযোগ ঘটে। প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময়ে দুপতারা করো নেশন হাই স্কুলে কবি জসীম উদদীনের সঙ্গে, কবি গোলাম মোস্তফার পুত্র শিল্পী মোস্তফা আজিজের সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে।

শিশুকালে বাজবী প্রাইমারী স্কুলে পাঠকালীন ইসমাইল পণ্ডিতের মত অত্যন্ত স্নেহময় শিক্ষকদের সান্নিধ্যে তিনি ছিলেন ধন্য। ওই কাছাকাছি সময়ে সাংবাদিক শফিকুল কবীরের সঙ্গে তার সাৰাত এবং সৌহার্দ্র্য

www.pathagar.com

ঘটে। সেই ছিল তার সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নের সূচনা। স্কুলের পাঠ শেষে এসএসসি পাস করে ঢাকায় পড়তে আসেন মান্নান। শহরতলির মান্ডা গ্রামে লজিং থাকা শুরু হয়। শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময়ে শফিউল আলম প্রধান, রাশেদ খান মেনন, ছাত্র ইউনিয়ন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে এবং ছাত্র কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। মাসিক পৃথিবী পত্রিকার সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিবের সান্নিধ্যে এসে সাংবাদিকতার জগতে আগ্রহী ও যুক্ত হন ১৯৭০ সালে। এর আগে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়ে তিনি এইচএসসি পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফটো সাংবাদিক হাসান আব্দুল কাইয়ুমের কাছে তিনি প্রেস ফটোগ্রাফী শেখেন। পরে 'আজাদ' পত্রিকায় যোগ দেন। এভাবে তিনি সাংবাদপত্র জগতের সঙ্গে দ্রুত জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকা ছিলো দেশের একটি বলিষ্ঠ পত্রিকা। ১৯৭২ সালে মান্নান আজাদ থেকে সোনার বাংলায় যোগ দেন। প্রথমে বিভাগীয় দায়িত্বে, পরে বার্তা এবং তারও পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, নির্মল সেন, মোবায়েদুর রহমান প্রমুখ বিখ্যাত সাংবাদিক সোনার বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাহাত্তুর থেকে পঁচাত্তুর সময়কালে 'সোনার বাংলা' পত্রিকা সেই সময়ে মাওলানা ভাসানির 'হক কথা' পত্রিকার পরেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলো। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদ এ সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন কালা-কানুন রদের দাবি এবং নিউজ প্রিন্টের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল। ১৯৭৪ সালে সোনার বাংলায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কারণে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে এস বি অফিসে ডেকে নেয়া হয় এবং দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এই সময়ে তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসেন তারা হলেন-আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম এবং বহু রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। কবি ফররখ আহমদের মৃত্যুর পর তিনি তার শেষ কৃত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সত্তর দশকের দিনগুলো ছিলো সংবাদপত্র জগতের জন্য ঘটনাবহুল এবং সঙ্কটময়। উত্থান-পতনময়। এর ধাক্কা পোহাতে হয় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই। তারপর ১৯৭৬ সালে সংবাদপত্র জগতে লাগে পরিবর্তন ও গতিময়তার হাওয়া। ঐ বছরেই মান্নান পুনরায় নবপ্রতিষ্ঠিত আজাদ পত্রিকায় যোগ দেন। ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মরুকরণ প্রক্রিয়া ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। ঐ সময়ে পর পর কয়েকদিন আজাদে প্রকাশিত হয় বিস্তৃত ফারাক্কা বিষয়ক প্রতিবেদন যা সারাদেশে তোলপাড় তুলে দেয়। ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কথা-বার্তা ওঠে। মাওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক লং মার্চও ঐ সময়ে পালিত হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট কবি নজরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেন, তারপর ১৭ই নভেম্বর মাওলানা ভাসানীও ইন্তেকাল করেন। ১৯৭৭ সালে মান্নান আবার সংগ্রামে যোগ দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর দ্রুত ধাবমান সময়ে ঘটে যায় অনেক বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এই সাংবাদিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে আগমন ঘটে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের পরে সেই সঙ্কটকালীন সময়ে কর্নেল জিয়া ও জেনারেল ওসমানীর মূল্যবান সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রকাশ করেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

১৯৮০ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সে সময় প্রখ্যাত সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূন, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ, বোরহান আহমেদ, মোহাম্মদ হোসেন, গিয়াস কামাল চৌধুরী, নির্মল সেন ও আরও অনেকেই সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবনের সফল সাংবাদিকতার মাঝখানে একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে আবদুল মান্নান সাহেব তার পেশা পরিবর্তন করেন। ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান কমোডর আতাউর রহমান তিউনিসিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন। সেখানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকা তৈরীর দায়িত্ব পড়ে ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল এম. ফরীদউদদীন আহমাদ ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ওপর। ফরীদউদদীন সাহেব মান্নানকে বলেন, উপরি কাঠামো থেকে ব্যাংকিং-এর মূল ধারায় যাচ্ছেন না কেন?

www.pathagar.com

ফরীদউদদীন সাহেবের এই অনুপ্রেরণা তার জীবন কাঠামোকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেয়। কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিক নিবিষ্ট হন ব্যাংকিং-এর ন্যায় চ্যালেঞ্জিং পেশায়। ১৯৮৩ সালে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। তার এ আকস্মিক পেশা পরিবর্তনে বিএফইউজের সভাপতি আহমেদ হুমায়ূন খুব দুঃখ পান। তবে যে গুরুত্বের সাথে তিনি সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক ততটাই গুরুত্ব নিয়ে তার জীবনের পেশাগত পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ যথাযথভাবেই মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। ক্রমশ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যান। ঢাকা, যশোর এবং ঢাকার বিভিন্ন শাখায় কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সার্বিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। কাজের প্রয়োজনে বহু দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয় তাঁর। এই সময়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'হুন্ডি'র পরিবর্তে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করেন। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা।

এবারে কিছু ভিন্ন কথা। শৈশব থেকেই সাহিত্য এবং গবেষণার প্রতি একটি আগ্রহ-পূর্ণ ক্ষেত্র ছিলো তাঁর মনের মধ্যে। এরও একটি অন্তর্গত বিষয় রয়েছে। ১৯৮৫ সালে "বাংলার মুসলিম নবজাগরণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা" শীর্ষক এক সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে তার পদার্পণ। তবে তারও আগে ১৯৮০ সালে তার লেখা একটি গ্রন্থের কথা উলেক্ষখ করা প্রয়োজন। তার নাম হল, "বাংলাদেশের পুলিশ।" খোশ রোজ বিতাবমহল থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পুলিশ একাডেমীর পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে লেখালেখির প্রতি আকর্ষণ ও গবেষণার কাজে নিবিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাসের বিশাল জগতে প্রবেশ করেন। এই দেশ ও জাতির প্রতি রয়েছে তার গভীর কমিটমেন্ট। ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যেসব গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তার প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে মানবমুখিতা, স্বাজাত্যবোধ, ইতিহাস-মনস্কতা।

তার কর্মজীবনে যশোরে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হন। দক্ষিণ বাংলার জনজীবন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মকান্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন। দরিদ্র পথশিশুদের কাজ করে ঐ শিশুদের নির্মল ভালোবাসা অর্জন করতে সৰম হয়েছিলেন। বহু বিস্তৃত জনগোষ্ঠির ইতিহাস অন্বেষণে ব্যাপৃত থেকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলার বহু অজানা কাহিনী ও প্রাচীন ইতিহাস তথ্যাবলী অন্বেষণে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি আল মাহমুদ তার এ কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমার কাছে আমাদের জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠক ও পুনরাবিষ্কারক হিসেবে বেশ কিছুকাল যাবত প্রতিভাত হচ্ছেন, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল অনুসন্ধিৎসা। একই সাথে সত্যের সততাপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। শুধু লেখার ব্যাপারে নয়, পেশাগত ক্ষেত্রে তিনি উলেক্ষখযোগ্যভাবে সফল।

ঢাকায় এসে মৌচাক শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি দুইবার ব্যাংকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা লাভ করেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাস বিষয়ে যে ধরনের লেখালেখি করেন, তার প্রথম ফসল "বাংলা ও বাঙ্গালী".... (১৯৯২)। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার নিবিড় অনুশীলন এ গ্রন্থের পর্বে পর্বে লৰ্য করা যায়।

এর পাশাপাশি লেখেন "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা।" বিজ্ঞজনের কাছে তার কয়েকটি গ্রন্থ পর পর সমাদৃত হয়। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও আত্মপ্রকাশকে অভিনন্দিত করেন সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ। পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় তার গবেষণামূলক এ গ্রন্থ। এই অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যগত আত্মপরিচয় ও ক্রমবিকাশের শুরু পাল যুগ থেকে তুলে ধরেছেন তিনি। একজন ইতিহাসবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েছে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস। সৌদী আরবসহ বহু দেশে তাঁর কাজ ও দায়িত্ব পালনের সুযোগে তিনি বাংলাদেশী অভিবাসীদের নিয়ে "সরেজমিন সমীক্ষা" শিরোণামে একটি বই লেখেন। বাংলাদেশ সিঙ্গল কান্ট্রি ট্রেড ফেয়ার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে দায়িত্ব পালন করেন। উপসাগরীয় দেশগুলোর দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকাল অতিবাহিত করে ২০০৬ সালে ব্যাংকের ডেপুটি একজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। সব শেষে ২০০৭ সালের নভেম্বরে ইসলামী ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উইং-প্রধান ও পরে বিনিয়োগ ইউং-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কর্মস্পৃহা অদম্য। এর মাঝখানে তিনি লেখালেখি, গবেষণায় নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখে আসছেন। ২০০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষপূর্তি স্মারক ২০০৬ নামে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের কঠিনতম এক অধ্যায় সম্পর্কে এই বিশাল গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব মান্নান সাহেবই পালন করেন। ২০০৭ সালে "বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন তিনি। বাংলা বিভাগ, নতুন প্রদেশ গঠন, বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে আসে নতুন জীবনের জাগরণ। মুসলিম কৃষক প্রজাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পশ্চাৎপদতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ ই অক্টোবরের ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন। ভাই গিরিশচন্দ্রের মতো সুধীজন, তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা আম্বেদকর প্রমুখ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন দান করেন। এসব বিষয়ে বাস্তব ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-পাঠককে সত্য ইতিহাস উপলব্ধি করতে সুযোগ দেয়। এই উলেক্ষখযোগ্য গ্রন্থগুলো পাঠ করে অনুভব করি যে, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একটি গুরবত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া বাংলার দুই মুসলিম পথিকৃত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামাল উদ্দীন আফগানীর জীবনী গ্রন্থ এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর দু'টি মূল্যবান গ্রন্থও উলেক্ষখ করার মতো।

মোহাম্মদ মান্নানের লেখা একটি অন্য সুন্দর শিশুতোষ গ্রন্থ "সোনার দেশ বাংলাদেশ"। এ গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য, নৌশিল্প, বাণিজ্য, উৎপন্ন দ্রব্য, নীল চাষের কঠোর অতীত ঘটনাবলী, মসলিনের ঐশ্বর্যসম্পন্ন প্রাচীন কাহিনী আকর্ষণীয়ভাবে শিশু-কিশোরদের সামনে মেলে ধরেছেন। যেন রূপকথার এক স্বপ্নলোকের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে তার জীবনের প্রত্যুষ থেকে আজ অবধি যেভাবে অগ্রসর হতে দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে তিনি একজন কর্মী, একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসক, একজন সাহিত্যিক ও সৃজনশীল চেতনার মানুষ। মানব জীবন ও বিশ্বজীবন দুইয়ের ছায়া পড়েছে তার ওপরে, বাস্তবতাবোধ, স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধ সব মিলিয়ে তিনি একজন স্বপ্ন তাড়িত মানুষ। তার স্বপ্ন তাকে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, তারপর ফিরিয়ে এনেছে স্বদেশের মাটিতে। তার মধ্যে কাজ করেছে কর্মের স্পৃহা, দেশপ্রেম ও প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ববোধ।

এসব মিলিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে পথ ধরে সোনাখালি নদীর তীরে সত্যভান্দী গ্রামের শ্যামল ছায়াচ্ছন্ন মাটি থেকে এক কিশোরের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সে পথ তাকে নিয়ে যাবে বৃহত্তর বিশ্বের কাছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তার সফলতাকে প্রসারিত, বিস্তৃততর হওয়ার সুযোগ দেবেন- এ-ই প্রার্থনা জানাই।

লেখক : বিশিষ্ট কথাশিল্পী, গবেষক, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের প্রধান ইতিহাস বিশ্লেষক

শাহ আবদুল হান্নান

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি তার অল্প বয়স থেকেই চিনি। যদিও আমি গভীরভাবে তার সাথে মিশেছি তা দাবি করতে পারব না। কিন্তু তাকে আমি তার কাজ, তার সাহিত্য দ্বারা জানি। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে, বাংলাদেশের জাতিসত্তা নিয়ে, বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস নিয়ে তার সুন্দর কাজ রয়েছে।

এসব কাজসহ বিভিন্ন আন্দোলন, যেমন বঙ্গভঙ্গ এ রকম বিষয়ের উপর তার পড়াশুনা অসাধারণ ধরনের। সে-ই বোধ হয় বর্তমান বাংলাদেশে এইসব বিষয়ে সবচেয়ে জানাশুনা ব্যক্তি। তার লেখাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি মনে করি, ইতিহাসের জন্য আবদুল মান্নানের অবদান স্বীকৃত। ইতিহাস ছাড়াও ব্যাংকিংয়ের উপর তার অভিজ্ঞতা ভালো। সৌদি আরবে যখন তার পোস্টিং ছিল সেখানে ইসলামী ব্যাংকের প্রসারে সে অনেক কাজ করেছে। যদিও ইসলামী ব্যাংকই কাজ শুরু করেছে কিন্তু বাংলদেশের যে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফ্লো বা ধারা সৃষ্টি করার জন্য তার অবদান আছে।

আবদুল মান্নান ব্যাংকিংয়ের উপর একটা বই লিখেছে। বইটির নাম 'ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা'। আমি যতটুকু জানি, সেই বইটা বেশ ভালো হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের উপর যে ক'টি বই আছে বা লেখা হয়েছে তার মধ্যে এই বইটিকে আমি অন্যতম ভালো বই বলব।

আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ইতিহাস বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত। বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত আগে নানারকম ছিল। এক সময় আসাম-এর সীমান্ত ছিল। এক সময় উড়িষ্যা-বিহারসহ ছিল। আবার এক সময় শুধু বেঙ্গল একটা হলো। তারপর ইস্টবেঙ্গল হলো, যেটা পরবর্তীতে বাংলাদেশ হলো।

যা-ই হোক, বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসত্তার আলোচনায় বলতে চাচ্ছি যে, এর একটা তাৎপূর্ণ দিকে হলো এখানে যে দু'টি সমাজ রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। তার একটা হলো মুসলিম সমাজ আর একটা হলো হিন্দু সমাজ।

এরপর ছোট-খাটো অন্যান্য সমাজ তো আছে। একথা ঠিক যে, এখানকার মুসলিম সোসাইটি তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান আর সেটা হলো ইসলাম। ইসলাম মানে তৌহিদ, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইসলামের নীতিবোধের প্রতি নিষ্ঠা। ইসলামের ইতিহাসের হিরোরা তাদের হিরো হয়েছে। তারা এখানে এসেছে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির যা কিছু ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী নয় তা তারা গ্রহণ করেছে। আর যা কিছু তারা ইসলামবিরোধী, শরীয়তবিরোধী বলে মনে করেছে সেসব কিছু তারা সাধারণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সেখানে দেব-দেবির পূজা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একইভাবে কোন ধরনের পৌত্তলিক আচরণ বা শিরক সংক্রান্ত বিষয় তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

তারা বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল। এক অর্থে সবাই বিদেশ থেকে এসেছে। বাংলাদেশেও তো অরিজিনাল জনগণ বলে কিছু ছিল না। হয় তারা নর্থ থেকে এসেছে বা সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এসেছে কিংবা ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে এসেছে বা বার্মা থেকে এসেছে। কিভাবে এসেছে তা অবশ্য আমি ঠিক ভালো করে জানি না। তা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হয়ত ভালো করে জানে। এই আসার এক অর্থে সবাই বিদেশী। কেউ পুরাতন বিদেশী, কেউ নতুন বিদেশী। এটা

www.pathagar.com

অনেকটা আমেরিকার ওল্ড ইমিগ্রান্ট ও নিউ ইমিগ্রান্টের মতো পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই না।

এ দেশের মুসলমানদের যে কোয়ালিটি তা মূলত আল্লাহর নিকট, কোরআনের নিকট, তৌহিদের নিকট এবং একই সাথে সুন্নাহর উপরে। সুতরাং এটা মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশ ও গঠনের ৰেত্রে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে স্থানীয় কালচারের যেটাই গ্রহণযোগ্য ছিল তা। সেটা খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক যা-ই হোক না কেন। কালচারের ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ম হচ্ছে 'উরফ'-কে বা স্থানীয় কালচারকে মেনে নিতে পারো যতৰণ পর্যন্ত তা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এখানকার মুসলমানদের জাতিসত্তা এভাবে গড়ে উঠেছে।

আবার নন-মুসলিমদের যে জাতিসত্তা রয়েছে, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, তাদের জাতিসত্তা কিছু মৌলিক দিক থেকে ভিন্ন। তারাও আগত, তারা সার্বিকভাবে আমাদের আগে এখানে এসেছে, তাদের মধ্যেও একটা বিশ্বাস আছে, সে বিশ্বাস অনেকটা আলাদা। একদিকে স্রষ্টাতে বিশ্বাস, পরমেশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভগবানে বিশ্বাস আছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অবতারবাদ রয়েছে এবং নানা ধরনের দেব-দেবী রয়েছে। তাদের দেব-দেবী, অবতাররাও বিশেষ ক্ষমতা রাখে। আবার তারা বিশ্বাস করে 'গড' নিজে অবতীর্ণ হন অবতার রূপে। যেমন কৃষ্ণকে তারা অবতার বলে। এ রকম আরো অবতার তাদের রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এই অবতারদেরও ৰমতা বা শক্তি রয়েছে যা ইসলাম থেকে একেবারেই ভিন্ন। এরই রূপক হিসেবে তারা মূর্তি ব্যবহার করে থাকে।

হিন্দু সমাজের হিরো অবতার, দেব-দেবী, অন্যদিকে নবী-রাসূল, সাহাবী, পরবর্তীকালের মুজতাহিদ আলেমগণ, তাদের খলিফাগণ মুসলমানদের হিরো হয়েছেন। কাজেই আমাদের জাতিসত্তা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিসত্তা যে ভিন্ন তা অস্বীকার করা যাবে না। এটা এই উপমহাদেশের একটা চরিত্র যে ইসলাম এবং অন্যরা মৌলিকভাবে এতই পৃথক যে, সহজেই ধরা পড়ে। একটু লৰ্য করলেই দেখা যাবে যে-কোন শহরেই মুসলিম এলাকা আলাদা এবং হিন্দু এলাকা আলাদা। যে কোন গ্রামে মুসলিম এলাকা আলাদা এবং হিন্দু এলাকা আলাদা। এটা কেন হলো? এটা হলো এই জন্য যে, এটা না হলে তাদের চলাচল কষ্টকর হলো। তারা এত ভিন্ন ছিল, তাদের জন্য এটাই সহজ ছিল যে, তারা আলাদা বাস করলে তা তাদের জন্য সহজ হবে। এটা ছিল এক প্রকার সহ-অবস্থানের একটা ভালো উপায়। এটা কোনো খারাপ ছিল না। এটা ভালো ছিল। কেননা, দু'য়ের সংমিশ্রণটা অসম্ভব ছিল না। বাস্তব ছিল না।

এই অবস্থায় আমাদের স্বীকার করতে হবে, তাদের মধ্যে আলাদা একটা জাতিসত্তা রয়েছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এই দুই জাতিসত্তার মধ্যে অনেক উপাদানের মিল আছে। তার মধ্যে একটা হলো স্থানীয় কালচারের কিছু অংশ তারাও গ্রহণ করেছে, মুসলমানরাও গ্রহণ করেছে সেই দিক। তারপর আস্তে আস্তে নতুন একটা জাতি হয়েছে বাংলাদেশ। নতুন একটা দেশ হয়েছে বাংলাদেশ। এই সীমান্তের প্রতি যদি আমাদের আনুগত্য থাকে যে, আমরা তা রৰা করব তা হলে এটাও ঐক্যের ভিত্তি।

আমাদের জাতির মধ্যে নতুন কিছু হিরো হয়েছে। যারা বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করে জীবন দিয়েছে, তারা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার হিরো হয়েছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আমাদের ব্রজেন দাশ বিরাট সাঁতারু ছিলেন। তিনি তো সবার হিরো। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে এখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, আমাদের ঐক্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতিসত্তা কোনো বাধা নয়। জিনিসটা অনেকটা এ রকম যে আমেরিকাতে ক্যাথেলিক রয়েছে, প্রোটেস্টান্ট রয়েছে। তারা একে-অপরকে দেখতে পারে না। কিন্তু তারা আমেরিকান। সেখানে ইউরোপ, স্প্যানিশ, ইংলিশ থেকে যাওয়ার সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ করে। আর বাকি যারা গেছে তারা ১০ ভাগ। তা সত্ত্বেও আমেরিকান ভিত্তিতে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি আমাদের দেশজ ভিত্তিতে একটা ঐক্য আছে।

কাজেই আমি মনে করি, আমাদের মাল্টিকালচারিজম আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের ভিন্নতা রক্ষা করতে চায়। ইউরোপ আমাদের নসিহত করে এটাকে রক্ষা করার জন্য। তারা মাল্টিকালচারিজম রক্ষার সুযোগ দেয়ার থিওরিতে বলে থাকে। এটা আমরা জানলাম। কিন্তু ইউরোপীয়রা আবার এটা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে মানতে পারে না। যেমন, যখন হিজাবের কথা আসে তখন তারা এটা ভুলে যায়। এটা তাদের ভোলা উচিত নয়।

www.pathagar.com

তা হলে মাল্টিকালচারিজমের ভিত্তিতে যদি আমরা চিন্তা করি সে ৰেত্রে একই দেশের ভিতরে বিভিন্ন কালচারের লোক থাকতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকতে পারে। মদীনার সনদে আমরা দেখছি, রাসূল (সাঃ) যখন ইহুদী মুসলমান উভয় জাতিকে আলাদা আলাদা উম্মত বলছেন, আবার দু'টো মিলিয়ে একটা উম্মত বলছেন, এই সব শব্দ মদীনার সনদে আছে। আবার ইসলাম যে 'লাকুম দ্বীনুকুম' বলছে তার মধ্যেও তো বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি আছে। 'দ্বীন' শব্দটির গভীরে গেলে দেখব মূল জিনিসটিকে দ্বীন বলা হয়। অর্থাৎ তোমাদের মূল জিনিস তোমাদের কাছে, আমাদের মূল জিনিস আমাদের কাছে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উলেৰখ করতে চাই। ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে, ঘটনা সাধারণত বিতর্কের বিষয় নয়। কিন্তু কেন ঘটনা ঘটল, সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে। যেমন, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল এতে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু কেন হলো? তা নিয়ে নানা ব্যাখ্যা হতে পারে, ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশেৰষণ-এটা ভিন্ন বিষয়।

ইতিহাস এক জিনিস আর এর ব্যাখ্যা-বিশেৰষণ আরেক জিনিস। সেখানে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কেউ বলতে পারে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র; কেউ বলতে পারে এটা হিন্দু জাতির, হিন্দু নেতৃত্বের একটা মুসলিমবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব।

এৰেত্রে আমি বলব, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে অন্যদের মতবিরোধ হতে পারে। হয়ত বা এটা নির্ভর করে জিনিসটা কে দেখছে তার উপর। আমি নিজেও হয়ত কোন কোন ৰেত্রে মতবিরোধ করি, যদিও এই মুহূর্তে তা বলতে পারব না। কিন্তু আমি আশা করব, আবদুল মান্নান ভবিষ্যতে যখন তার বইগুলো রিভাইস করবে তখন সে যতটুকু সম্ভব আরো নিরপেৰ নজরে করবে। একথা বোধ হয় আমি তাক বলেছিও। যদি তিনটা যুক্তি সম্ভাব্য হয় তা হলে সেই তিনটাই বলা দরকার। তারপর বলবে কোন্‌টা তার মতে বেশি যুক্তিযুক্ত। ইতিহাসকে সেভাবেই আমাদের দেখতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানকে দেখতে হলে এখানে জাতীয়তাবাদী চেতনা থাকতে পারে। তারা বলতে পারে না, এখানে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা থাকতে পারে। তারা বলতে পারে হিন্দুদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আরেকটা হতে পারে যে কি ঘটনা ঘটল তা আমরা বললাম। তারপর বিভিন্ন মত উপস্থাপন করে বললাম যে আমার মতে এই মতটিই বেশি যুক্তিপূর্ণ। অথবা এই মতটাই প্রবল বলে মনে হয়। এ রকম যদি লেখক হয় তা হলে তার মতামত টিকে থাকে। কিন্তু আমি যদি খুব একপেশে হয়ে যাই, এই পাশে অথবা ওই পাশে আর তা যদি সত্যভিত্তিক না হয় তা হলে ইতিহাস নিরপেৰতা হারাবে। তাই আমাদের এককভাবে একপেশে হওয়া উচিৎ নয়। তবে কোন জায়গায় বা ৰেত্রে এ রকম হতে পারে। যেমন- ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন। এখানে এই দিক ওই দিক না, এখানে একটাই দিক 'সঠিক'। আমেরিকা সঠিক নয়। প্যালেস্টাইনে জিউইস কমিউনিটি সঠিক নয়। তারা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জোর করে ইসরাইল করেছে। আবদুল মান্নান থেকে সরে গিয়ে এখানে আমি একটা মৌলিক সত্য কথা বলে ফেললাম।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের জাতিসত্তার এই আলোচ্য মুসলিম ধারাকেই প্রধান বলেছেন। এটা সংখ্যার দিক থেকে প্রধান। আমার মনে হয় তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। আমি তাকে ইতিহাসের ব্যাপারে আরো একাডেমিক হতে বলব। বিষয়টি ঠিক মতো বলবে। ব্যাখ্যা-বিশেৰষণ আমার জাতির পৰে গেল কি গেল না-এটা বড় হবে না। ব্যাখ্যা-বিশেৰষণ সত্য হতে হবে। আমি সব সময় মনে করি, আমাদের 'লা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল'- হককে বাতিল দ্বারা ঢেকে দিও না-এটা মেনে চলতে হবে। আমি এটাকেই ইসলাম মনে করি। ইসলাম বিরোধিতা নয়। ইসলাম কখনোই এই শিৰা দেয় না যে, আমাকে সত্যবিরোধী মুসলিমপ্রীতি গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

www.pathagar.com

অনুজ প্রতিম আবদুল মান্নান

আবু জাফর

কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে জনাব আবদুল মান্নানকে অনুজ প্রতিম হিসেবে দাবি করলাম। ষাট দশকের শেষে অথবা সত্তর দশকের একেবারে শুরব থেকে তাঁর সাথে পরিচয়, মাধ্যম ছিল আমার বন্ধু জনাব মাহবুবুল হক। পাতলা, ফর্সা একটা টগবগে যুবক। বয়স আর কত হবে। হয়তো কুড়ি পেরোয়নি। আচরণে ভদ্র, রবচি মার্জিত, পোশাক-পরিচ্ছদে আকর্ষণীয়। এক কথায় বলা যায় একটা স্মার্ট ছেলে। তখন আমাকে সম্বোধন করত জাফর ভাই বলে। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে- প্রায় চলিৱশ বছর। অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় কত পরিবর্তন হয়েছে। মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে। আবদুল মান্নানের মুখ থেকে জাফর ভাই ডাকটার পরিবর্তন হয়নি। সে কারণে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে অনুজপ্রতিম বললাম।

সাংবাদিক হিসেবে জনাব মান্নানের কর্মজীবন শুরব। তাকে দেখলে মনে হতো একজন উৎসাহী সংবাদকর্মী। আদর্শের প্রতি উৎসাহীকৃত না হলে কারো পৰে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব হয় না। নিয়োজিত কাজের প্রতি একাগ্রচিত্ত না হলে সফলতা পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব জ্ঞানের কথা। অগ্রজদের কাছে শুনেছি, পুস্তকে পড়েছি। বাস্তবে অনেক প্রমাণ পেয়েছি, অনেকের জীবনে প্রত্যৰ করেছি। মান্নানের জীবনে আমি তেমন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অনেক কিছু লৰ্য করেছি। স্টাফ রিপোর্টার থেকে সে চীফ রিপোর্টার হয়েছে। তাঁর অনেক প্রবন্ধ পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ যৌক্তিক চিন্তার খোরাক যোগায়। তাঁর প্রবন্ধ ও গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন কিছুটা স্বতন্ত্র। ওইসব বিষয় নিয়ে চর্চা করা এখন অনেকের কাছে প্রগতির বিরোধী। তথাকথিত ওই প্রগতিবিরোধী বিষয়গুলো মান্নানের গবেষণার প্রিয় ৰেত্র। আর ওই ৰেত্র হলো ইসলাম ও মুসলমান। আমাদের দেশের মুসলমানদের জীবন প্রবাহ ইসলামের আদর্শ অনুপ্রাণিত।

এ আদর্শিক মূল্যবোধ তাদের জীবনকে এমন এক ধারায় প্রবাহিত করেছে যা অন্য ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে পৃথক। এ কথাটা অনেকে মানতে চান না। তারা আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টা বড় করে দেখতে চান। আমাদের এ ভূখন্ডে প্রাচীনকাল থেকে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কত ভিন্নধর্মী ও ভিনদেশি লোক ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছে, সে ঐতিহাসিক সত্যকে তারা উপেৰা করতে চান। এম. মুজিবের ইন্ডিয়ান মুসলিমস্ এবং খন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল' গ্রন্থ অনেকের খন্ডিত জ্ঞানকে প্রসারিত করেছে, অনেকের করেনি। আমাদের পূর্বসূরীরা এসব বিষয় নিয়ে একাধিক কালজয়ী কাজ করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের কৃতিত্ব, তাদের জীবনবোধ ও ঐতিহ্যকে উপেৰা করার এবং অনেক ৰেত্রে হেয়প্রতিপন্ন করার প্রয়াস এখনও কমেনি। এ প্রয়াস অনেককে আহত করে।

এ আহত বোধ থেকে সৃষ্ট মান্নানের প্রতিবাদী লেখনী অনেককে উদ্দীপ্ত করে, আমাকেও করে।

প্রয়োজন, প্রসিদ্ধ বা ভাগ্য যা-ই বলি না কেন, সাংবাদিক মান্নান এখন ব্যাংকার হয়েছে। পেশাগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তার গবেষণাধর্মী প্রতিবাদী লেখনী হারিয়ে যাক, এটা আমি চাই না। সাংবাদিক, ব্যাংকার, গবেষক জনাব আদুল মান্নানের এ তিনটি পরিচয়ের মধ্যে আমি শেষোক্তটিকেই বেশী সম্মান করি, প্রশংসা করি। আমি জনাব মান্নানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কমনা করি, আন্তরিকভাবে।

লেখক : গবেষক, অনুবাদক, সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও ইতিহাসচেতনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১৯৮৭ সালে অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা" নামে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[২] এই দুটি গ্রন্থই কোনো অসাধারণ গবেষণাসমৃদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ নয়; কিন্তু দুটি বই-এরই একটি দৃষ্টিভঙ্গিগত সাযুজ্য আছে ঃ দুটি বই-ই বাঙালি মুসলমানের স্বাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে অবলোকন এবং প্রখ্যাত বাংলার ইতিহাসগ্রন্থসমূহের একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদ। ১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গের সূচনাতেই মন্তব্য করেছিলেন, 'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন-লন্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমনি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপের পরে শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; ইতিমধ্যে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়-রমেশচন্দ্র মজুমদার-যদুনাথ সরকার[৪] নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বাঙ্গালি-রচিত বাংলা ও বাঙালির অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা তাদের অনেকগুলিকে সাধ করে ইতিহাস বলি-এবং সে হয়তো সাধ পুরানো মাত্র; কেননা তাতে আমাদের প্রত্যাশিত নিরপেক্ষতা পাই না, আমাদের নিজস্ব ধারাবাহিকতারও পরিচয় পাই না। ঐ গ্রন্থালোচনায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলি মনে পড়ছে: 'ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্ত্তিমত্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" এবং "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই প্রয়োগ করতে চাই ঃ 'অহংকার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী, এখানেও তাই'।

কিন্তু এই অহঙ্কার নিষ্কারণে নয়। "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" বইটি মূলত ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ অবধি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস; এবং "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" গ্রন্থ আদিকাল থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। দুই হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের উত্তরখন্ড "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" আর পূর্বখন্ড "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা"। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা ও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখলেন না বলে; আমরা আশা করে থাকবো, ঐ দুই হাজার বছরের অনুপুঙ্খ পূর্ণতার ইতিহাস কোনো একদিন কারো কলমে রচিত হবে। গ্রন্থদ্বয়ের লেখক বা সম্পাদকের হাতে হলে খুশি হবো আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস-বিভাগ বা ইতিহাসকেন্দ্রী সংস্থা-সংগঠনগুলোর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই এ রকম কর্মের প্রত্যাশা করে আসছি আমরা। টুকরো-টুকরোভাবে হচ্ছেও। কিন্তু ষোলো খন্ডে যেমন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে মরহুম হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদকতায়, তেমনি এ বিষয়ে কোনো উচ্চাশী প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত বলে মনে হয় আমার–যা হয়তো একদল বিশেষজ্ঞের হাতে পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি খন্ডে প্রণীত হবে। হয়তো তিন বা চার খন্ডে তার একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আমাদের স্বকীয় শিকড়সন্ধানের ভিত্তি হিসেবে আমার এই স্বপ্ন আশা করি দুরাকাঙ্ক্ষা বলে বিবেচিত হবে না। স্বাধীনতার দুই দশক পরে বরং এই প্রত্যাশা সকলের স্বাভাবিক বলেই মনে হওয়া উচিত। "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা" এবং "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" তারই প্রাথমিক প্রত্যয়ী প্রত্যয়।

www.pathagar.com

"বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" গ্রন্থের এগারোটি অধ্যায়ের প্রথমটি 'নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি'। পরবর্তী অধ্যায়গুলো একটি ধারাবাহী ইতিহাস। আর্য আগমনের পটভূমি থেকে পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত ইতিহাস লেখক বর্ণনা করেছেন–কিন্তু রাজশাসনের সূত্র ধরে 'জনগণের আধিপত্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াই'-এর প্রসঙ্গই তিনি সবসময় নজর রেখেছেন। ফলত এদেশের মানুষ প্রথম থেকেই স্বাধীনতাকামী। ভারতবর্ষের অনেকখানি দখল করে ফেললেও 'আর্যদের পূর্বমুখী এ অভিযান বাংলাদেশে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ শাসন (পালশাসন ঃ চারশো বছর), হিন্দু শাসন (সেন-বর্মণ শাসন), মুসলিম শাসন (১২০৩-১৭৫৭ ঃ তুর্কী আমল, স্বাধীন মুসলিম বাংলা, মুঘল আমল)। লেখক লক্ষ্য করেছেন, 'পাল আমলে এদেশের জনগণের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে স্বস্তি এবং অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি ফিরে আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা এ যুগেও অব্যাহত ছিলো। এ ষড়যন্ত্র চলেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শিক সমন্বয়ের নামে। এ চতুর কৌশল অনেকাংশে সফল হয়েছিলো। বিশেষত পাল রাজত্বের অবক্ষয় যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ষড়যন্ত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাল রাজত্বের পতনের জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের আদর্শই অনেকাংশে দায়ী ছিলো।' (পৃ. ৬৭) পরবর্তী সেন-বর্মণ শাসনামলে বৌদ্ধ প্রভাব মুছে ফেলা হয়, বাংলা ভাষা দেশান্তরিত হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির অবস্থা হয় শোচনীয় এবং তারপরই মুক্তির প্রতীকরূপে এলেন বখতিয়ার খিলজী। লেখক যথার্থই দেখিয়েছেন, ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে এসে বখতিয়ার খিলজী অকস্মাৎ বাংলা দখল করলেন, তা নয়- "বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম প্রচারকগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।" (পৃ-২৬) একজন ইতিহাসবিদ লিখছেন, 'ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের বহু পূর্বেই (সম্ভবত: অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে) বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, আরব ভৌগলিক ও বণিকদের লেখনী এবং বাংলাদেশে প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোককাহিনীর ভিত্তিতে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। মুসলমানদের সঙ্গে এই প্রাথমিক সম্পর্ক প্রধানত: বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে হিসেবে আরবদেশীয় মুসলমানেরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং এই বাণিজ্যের সূত্র ধরেই যে আরব নৌ-তরী বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আসা-যাওয়া করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন হতে পারে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে, কিছু কিছু আরব বসতি স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলে এই অঞ্চলে আরব প্রভাবের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ আরো প্রসার লাভ করে। মধ্য-এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য মুসলমান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে এসেছিলেন–কেউবা ভাগ্যান্বেষণে, কেউবা ধর্মপ্রচার করতে, কেউবা বাণিজ্য করার জন্য।'৫ বাংলাদেশের পরবর্তী দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো বছরের মুসলিম শাসন সম্পর্কে ডক্টর এম. এ. রহীমের উক্তি পুনরুদ্ধৃত করে সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত জানাতে হয় : 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলা যায় যে, মুসলমান রাজত্বকাল ছিলো বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ।'৬

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন, 'বাংলায় প্রথম পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকগণ কোনও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি। তাঁদের কার্যক্রমেই পরবর্তীকালে এখানে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে। ... এদেশের জনগণ ইসলাম প্রচারকদেরকে পেয়েছিলো তাদের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায়।' (পৃ. ১২৮) কেবল ধর্মপ্রচারকরূপে নয়–এদের ভূমিকা ছিলো সর্বতোমুখী। লেখক সংগতভাবেই এদের আখ্যায়িত করেছেন 'মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক' হিসেবে। স্বাধীন সুলতানী আমলের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের নাম চিরস্মরণীয় এজন্যে যে, তাঁর সময়েই প্রথমবারের মতো 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' শব্দ দুটি প্রযুক্ত হয় এই অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের বোঝাতে। বাংলার এই স্বাধীন নৃপতিদের ভূমিকা বিরাট। এঁরা শুধু ইসলামকেই এদেশে স্থায়িত্ব দেননি, 'এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলে, বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে লুটিয়া পড়িত।'৭ ইসলামের এই প্রবল প্রতাপের সময় আবির্ভূত হন চৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩) ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠাতা। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত যে কী পরিমাণ ইসলাম প্রভাবিত, তা দেখিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি লিখেছেন, 'নামে রুচি ও জীবে দয়া–ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের মূলমন্ত্র। গৌড়ীয়

www.pathagar.com

বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুটি ও জীবে দয়া' মুসলিম সুফী সাধকদের "জিকর" ও "খিদমত" নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। ... গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের "প্রেম" সুফীদের "ইফাক", "রাধাকৃষ্ণ" সুফীদের "সাকী" ও "বুৎ" কিংবা "সামআ" ও "পরওয়ানা"; "ঐশ্বর্য" সুফীদের "কিরামত" ছাড়া আর কিছুই নহে।'৮ এই স্বাধীন মুসলিম বাংলার সময়কালেই প্রাচীনতম বাঙালি-মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাব।

আলোচ্য লেখকের একটি মূল কৃতিত্ব এদেশের সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ উলামাদের ভূমিকা তুলে ধরায়। ইতিহাসে উপেক্ষিত একজন আলেমের ভূমিকা তো অবিস্মরণ মহিমা-খচিত। বাংলার সাড়ে-পাঁচশো বছরের (১২০৩-১৭৫৭) মুসলিম শাসনের মাঝখানে মাত্র চার বছরকাল (১৪১৫-১৮) বর্ণ-হিন্দুর শাসন চলেছে–দুর্বল সাইফুদ্দীন হামজা শাহ ও শিহাবুদ্দীন বায়েজীদ শাহের পরে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান। সে সময় 'সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম নূর কুতব-উল-আলম-এর অক্লান্ত চেষ্টাতেই মুসলিম শাসন পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে উপেক্ষিত নূর-কুতব-উল-আলম-এর অসাধারণ প্রয়াসের কথা আমাদের মনে হয় আরেকবার যখন দুর্বল নবাব আলীবর্দী খান ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার পর আমরা কোনো নতুন নূর কুতুব-উল-আলম-এর দেখা পেলাম না–দেশ চলে গেলো ইংরেজের হাতে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সাড়ে-পাঁচশো বছর মোটামুটিভাবে এভাবে বিভাজন করা যায় ঃ তুর্কী আমল (১২০১-১৩৫০), স্বাধীন মুসলিম বাংলা (১৩৫০-১৫৭৫) এবং মুঘল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭)। কালানুক্রম রক্ষা করেও আলোচ্য লেখক এভাবে বিভাজন করেননি। তিনি সামগ্রিকভাবে মুসলিম অবদানের মূল্যায়ন করেছেন–নিছক রাজনৈতিকভাবে নয়। এর ফলেই ইতিহাসের সত্যকে তিনি যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। উলামা ও মুজাহিদদের ভূমিকা আর কোনো বাংলার ইতিহাস প্রণেতা এতো উজ্জ্বল সত্যনিষ্ঠভাবে দেখাননি। মুসলিম অবদানের মুল্যায়নের সারাৎসার তিনি ধরে দিয়েছেন এভাবে (আমি কয়েকটি মূল পয়েন্টই উদ্ধৃত করছি) ঃ

১. শাসকদের তরবারী এদেশে ইসলাম প্রচারে কোন মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। প্রচারকদের কারামত বা অলৌকিক মাহাত্ম্যও এদেশে ইসলামের সাফল্যের কারণ ছিলো না। ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, সাম্য, মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মানবিক মর্যাদার পথে ইসলামের উদাত্ত আহ্বানই এদেশের মানুষের ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো।

২. মুসলিম রাজ্য-বিস্তার, মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধান এবং জনগণের ঈমান ও অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম প্রচারক আলেম ও মুজাহিদদের ভূমিকা ছিলো অন্য সকলের ভূমিকার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

৩. এদেশে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকারের ধারণা ইসলাম প্রচারকদেরই অবদান।

৪. প্রচারকগণ প্রধানত গ্রাম এলাকায়, জনগণের মুখের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন।

এই ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে ঃ বদান্যতা ও উদারতা অনেক সময় দুর্বলতারই ছদ্মবেশ। মনে হয়েছে ঃ বদান্যতা ও উদারতার বিপরীতার্থক শব্দ সংকীর্ণতা নয়–আত্মপ্রত্যয়। মুসলিম শাসনের পতনের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে তার কিছু দুর্বলতাও চিহ্নিত করেছেন–সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক দুর্বলতা। তিনি লিখেছেন, 'সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে সমৃদ্ধ ভাষারূপে পরিগণিত আরবিতে তখন তাফসীর, হাদীস, উসুল, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্থরাজি মওজুদ ছিলো। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের একান্ত উপযোগী এ বিশাল জ্ঞানভান্ডার জনগণের সামনে তুলে ধরার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। ফলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও তাদের তৈরী বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করলো, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মৃত্যু অবধারিত ছিলো।' (পৃ. ২১২) দু'টি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে আমাদের মনে ঃ (১) পাল রাজাদের তো পতন ঘটার অন্যতম কারণ তাদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়-মুসলমান নৃপতিদেরও কি এ কার্যকারণ সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি নয়? (২) যে তালিকা দিয়েছেন লেখক তা কি আজো বাংলা ভাষায় আনুপূর্ব অনুদিত হয়েছে?–যাই হোক, এখানে আমি মুসলিম নৃপতিদের

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শতাব্দীতে সম্পন্ন প্রধান রচনাবলীর একটি বীথিবদ্ধ তালিকা পেশ করতে চাই পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবনের জন্যে ঃ

চতুর্দশ শতাব্দী
১. য়্যুসুফ-জলিখা ঃ শাহ মুহম্মদ সগীর

পঞ্চদশ শতাব্দী
১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ু চন্ডীদাস
২. রামায়ণ ঃ কৃত্তিবাস ওঝা
৩. শ্রী কৃষ্ণ বিজয় ঃ মালাধর বসু
৪. মনসামঙ্গল ঃ বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস
৫. পদাবলী ঃ বিদ্যাপতি ঠাকুর

ষোড়শ শতাব্দী
১. মহাভারত ঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
২. চৈতন্য ভাগবত ঃ বৃন্দাবন দাস
৩. চৈতন্য মঙ্গল ঃ লোচন দাস
৪. পদাবলী ঃ মুরারি গুপ্ত, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস
৫. চন্ডীমঙ্গল ঃ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
৬. গোরক্ষ বিজয় ঃ শেখ ফয়জুলাহ, শ্যামাদাস সেন
৭. লায়লী-মজনু ঃ দৌলত উজীর বাহরাম খান
৮. মনোহর-মধুমালতী ঃ মুহাম্মদ কবীর
৯. নবীবংশ ঃ সৈয়দ সুলতান

সপ্তদশ শতাব্দী
১. চৈতন্যচরিতামৃত ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ
২. মহাভারত ঃ কাশীরাম দাস
৩. রামায়ণ ঃ অদ্ভুতাচার্য
৪. মনসামঙ্গল ঃ বংশীদাস, কেতকদাস ক্ষমানন্দ
৫. ধর্মমঙ্গল ঃ রূপরাম, রামদাস আদক
৬. শিবমঙ্গল ঃ রতিদেব
৭. সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী ঃ দৌলত কাজী
৮. পদ্মাবতী ঃ সৈয়দ আলাওল
৯. ইউসুফ-জলিখা কারবালা ঃ আবদুল হাকিম

অষ্টাদশ শতাব্দী
১. ধর্মমঙ্গল ঃ ঘনরাম
২. শিবায়ন ঃ রামেশ্বর চক্রবর্তী
৩. অন্নদা মঙ্গল ঃ ভারতচন্দ্র
৪. কালিকামঙ্গল ও শাক্ত পদাবলী ঃ রামপ্রসাদ সেন
৫. মহারাষ্ট্রপুরাণ ঃ গঙ্গারাম

এই পাঁচশো বছর ধরে মুসলমান কবিরা দেবমহিমার জায়গায় রোমান্স কাব্যের মাধ্যমে মানব মহিমা প্রচার করেন; কিন্তু সংখ্যায় আর প্রতাপে তা আর কতোটুকু।

দু-একটি জায়গায় এই লেখকের সঙ্গে সামান্য মতপার্থক্য আছে আমার। ১৪৭ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, "ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা নওমুসলিমদের জীবন থেকে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ উপাদান মূর্তি প্রতিমা তথা মূর্তি পূজার বড় শির্ক দূর হয়েছিলো। কিন্তু তাদের অবচেতন মন থেকে শির্কের শিকড়গুলি সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলার জন্য যে যত্ন প্রয়োজন, তা এখানে সম্ভব হয়নি।" কিন্তু স্থানিকতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষেও ইসলাম খানিকটা স্থানিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, যেমন নিয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। ইসলামের ভিতরে চিন্তা বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু কিছু মতান্তর বা শাখা-উপশাখা আছে, মূল ইসলাম ধর্ম তাতে কিন্তু বিপন্ন হয়নি, এতোটুকু। দু'একটি মুদ্রণ ত্রুটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে ঃ ২১৬ পৃষ্ঠায় 'বিমলবিহারী মজুমদার' লেখা আছে, হবে 'বিমান বিহারী মজুমদার', ২৪২ পৃষ্ঠায় 'কাস্ট' লেখা আছে, হবে 'কাস্ট'। এরকম ভুল আরো আছে। 'বিদ্বান' কথাটি সবসময় ভুল বানানে আছে। ইতিহাসগ্রন্থে নির্ভুলতা জরুরী। গ্রন্থপঞ্জি ও নির্দেশিকা থাকলে বইটির ব্যবহার যোগ্যতা বেড়ে যেতো বহুগুণে।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ-সংযত-সরল ঃ ইতিহাসগ্রন্থের উপযোগী। তাঁর প্রতিটি উক্তি তথ্য ও যুক্তি সমর্থিত। সমগ্র গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত। লেখকের পথ ও গন্তব্য অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বক্তব্য কোথাও আবছা-ঝাপসা নয়। আমার মতো সাধারণ পাঠকও এই বই থেকে একটি সাফ ধারণা

www.pathagar.com

করতে পেরেছে। অনেক ইতিহাসগ্রন্থ লেখক পাঠ করেছেন; কিন্তু অতীতের ধারাবাহিকতাকে তিনি দেখেছেন নিজের চোখে, সজ্জিত করেছেন নিজের মতো করে। নতুন তথ্যের উপস্থাপনার চেয়ে নতুন বিশেষণের উপস্থাপনাই এই বই-এর প্রধান গুণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী-মুসলমান যখন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলো, তখনই তার ইতিহাস সন্ধিৎসা শুরু হয়ে যায়। মীর মশাররফ হোসেন থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত আমাদের সৃষ্টিশীল লেখকেরা, মওলানা আকরম খাঁ থেকে হাবিবুলাহ বাহার পর্যন্ত আমাদের চিন্তাবান লেখকেরা--যাঁদের হাতে বাঙালী মুসলমানের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ ঘটেছে, তাঁরা সকলেই ইতিহাস-সচেতন। মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং প্রায় প্রত্যেক লেখকই কম-বেশী ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতার কথা বলেছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর "মোছলেন বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" তো এ বিষয়ে প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থের প্রবেশকে লেখক জানিয়েছেন, 'ইতিহাস চর্চার সরল অর্থ হচ্ছে অতীত সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান।' খুব ঠিক। কিন্তু অন্য সব বিদ্যাচর্চার মতো ইতিহাস চর্চাও অর্থহীন যদি না তা বর্তমানকে সম্মুখগতির সন্ধান দিতে না পারে, সমকাল যদি শব্দহীন ইতিহাস বিদ্যুতে আলোকিত হয়ে না ওঠে, একালে যদি অতীতকাল থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম না হই। লেখক মুসলিম শাসনের পতনের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথম পয়েন্টেই সঙ্গতভাবে জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রগঠনের পাশাপাশি জাতিগঠনের কাজে সম্যক সচেতনতার অভাবে এবং সাংস্কৃতিক অসচেতনতার কারণে' মধ্যযুগের সাড়ে-পাঁচশো বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটেছিলো। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও এই চেতনা জরুরী বলে মনে হয়েছে আমার। আমি তো মনে করি, এখানেই লেখকের সার্থকতা–ইতিহাসকে এই বর্তমানে যুক্ত করে দেওয়ায়।

একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে আমার। কবিতাটি বাংলা ভাষায় নয়-জার্মান ভাষায় রচিত। ইতিহাস বিষয়ে অসাধারণ এই কবিতাটি লিখেছিলেন জার্মান কবি নাট্যাকার বেরটোল্ট ব্রেখট। কবিতাটির নাম 'জনৈক শ্রমিক ইতিহাস পড়ছে' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

কারা বানিয়েছিল থিব্‌স-এর সাতটা তোরণ?
বইগুলি তো শুধু রাজাদের নামে ছয়লাপ!
রাজারাই কি বিরাট পাথরের চাঁই
পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল?
আর ব্যাবিলন, কতবার যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে;
কারা শহরটাকে প্রত্যেকবার আবার নতুন করে বানিয়েছিল?
সোনায় ঝকমক করা লিমা শহরের কোথায় কি রকম বাড়িঘরগুলিতে
তারা বাস করতো, যারা ঐ শহরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ধোপদুরস্ত করেছে?
চীনের প্রাচীরের শেষ ইটটি যেদিন গাঁথা হলো
সেই সন্ধ্যায় রাজমিস্ত্রীরা কোথায় তাদের আস্তানা খুঁজতে গিয়েছিল?
সার্বভৌম রোমে তো বিজয় তোরণের ছড়াছড়ি
কারা তাদের বানিয়েছিল? কাদের ওপর সিজারেরা মাতব্বরি করতো?
বাইজেনটিয়ামকে নিয়ে কত গান, কত প্রশস্তি,
সেখানকার বাড়িঘরগুলি সবই কি প্রাসাদবাড়ি ছিল?
আর, এমনকি উপকথার অ্যাটল্যান্টিস-এ
যে-রাত্রে সমুদ্র তার সংহারমূর্তি ধরেছিল
ডুবন্ত মানুষগুলি তখনও ষাঁড়ের মতো চিৎকার ক'রে
তাদের ক্রীতদাসদের ডাকছিল। কিন্তু কেন ডাকছিল?

যুবক আলেকজান্ডার ভারত জয় করেছিল।
সে একাই?
সিজার গ-ল-দের যুদ্ধে হারিয়েছে।
তার সেনাবাহিনীতে কি একজন রাঁধুনীও ছিল না?
স্পেনের যুদ্ধ জাহাজগুলি একটার পর একটা জলে ডুবে যাবার পর
যখন আর তাদের কোন চিহ্নই রইলো না,
রাজা ফিলিপ তখন খুব কান্নাকাটি করেছিল।
সে কি একাই কেঁদেছিল?
সাত বছরের যুদ্ধ ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছে।
ঐ যুদ্ধে আর যারা জিতেছিল, তারাই বা কিরকম মানুষ?
প্রতিটি পৃষ্ঠা একটি করে জয়ের কাহিনী,

www.pathagar.com

কাদের বিনিময়ে ঐসব বিজয় উৎসব?
প্রত্যেক দশ বছরে একজন করে মহাপুরুষ
কীর্তনীয়দের পাওনা মিটিয়েছে কারা?

অনেক-কিছু জানার।
অনেকগুলি প্রশ্ন।

হ্যাঁ, আমাদের 'অনেক-কিছু জানার' আছে। 'অনেকগুলি প্রশ্ন' জেগেছে। এই কৌতুহল ও জিজ্ঞাসার জবাব চাই। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর অসাধারণ "বাঙালির ইতিহাস ঃ আদি পর্ব" মহাগ্রন্থে রাজরাজড়ার ইতিহাস নয়-সাধারণ মানুষের ইতিহাসই রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেই অসাধারণ গ্রন্থেও সাধারণ বাঙালী-মুসলমানদের ইতিবৃত্ত কি তেমনভাবে পেয়েছি আমরা? আমাদের সচেতন বর্তমান লেখক প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। বারংবার লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রাজরাজড়া নয়, কারা ছিলেন এদেশের ইমেজ গড়ার করিগর। এই ইমেজ গড়ার কারিগরদের কথা প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত। বাঙালী যে মুক্তিপিপাসু চিরকাল, বাঙালী-মুসলমানই তা বারবার প্রমাণ করেছে। কিন্তু যথার্থ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস-রচয়িতার অভাবে আমরা তা সবসময় জানতে পারিনি। বর্তমান গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কিছু কিছু জানিয়েছেন, কোন-কোন প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন। বাংলা ও বাঙালির মূলধারা বিষয়ে আমরা ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছি। আমরা খানিকটা অবাক হয়েই দেখছি, আমরা অতীতের ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়েই বিকশিত হয়েছি-কোন আকস্মিক উদগম নই। আমাদের আছে দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য– কোন হীনমন্য জাতি হওয়ার কারণ নেই আমাদের। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বইটি তাই শুধু ইতিহাসগ্রন্থ নয়–ইতিহাস চেতনারও গ্রন্থ।

---

১. 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত। ডিসেম্বর ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২. 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। ফাল্গুন ১৩৯৭ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা।

৩. প্রথম প্রকাশ ঃ 'বঙ্গদর্শন ঃ ১২৮১'। বাঙ্গালার ইতিহাস নামে 'বঙ্কিম রচনাবলী'র দ্বিতীয় খন্ডে সংকলিত। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৪. যদুনাথ সরকারের নাম উলেখ না করে একজন ঐতিহাসিক তার সম্পাদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ THE HISTORY OF BENGAL VOLL. II Published by the University of Dacca in 1948 of course deals with the period of Muslim rule in Bengal; But it was written from and together different point of view. Moreover, it totally ignores, the socio-cultural aspects of the history of the Muslims (Preface, History of the Muslims of Bengal, Vol-1 A: Muhammad Mohar Ali, 1985, Imam Muhammad Ibn Saud Islami University, Riyadh).

৫. 'বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয়' ঃ শাহানারা হোসেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (প্রথম খন্ড) ৯৮৭ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" (প্রথম খন্ড) ঃ ডক্টর এম এ রহীম

৭. "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" ঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭। পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা।

৮. "প্রাগুক্ত"।

৯. 'বের্টোল্ট ব্রেখট ঃ কবিতা সংগ্রহ' ঃ সুব্রত রুদ্র-সম্পাদিত, ১৯৮৯। নাথ পাবলিশিং কলকাতা। ব্রেখটের 'জনৈক শ্রমিক ইতিহাস পড়ছে' কবিতাটির অনুবাদক ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপধ্যায়।

লেখক ঃ কবি, কথাশিল্পী ও সাহিত্য সমালোচক

www.pathagar.com

একজন আবদুল মান্নানের কথা

জয়নুল আবেদীন আজাদ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নামের অনেক মানুষই বসবাস করেন আমাদের এই প্রিয় জনপদে। তবে একজন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-কে আমি বেশ ভাল করেই জানি। অন্যদের কথা তেমন বলতে পারবো না। এই আবদুল মান্নান প্রিয় এই স্বদেশকে "খামার বাংলা" বলতে ভালবাসেন, কিন্তু টাওয়ার বাংলার প্রতি তার নেই কোন বিদ্বেষ। তবে ইতিহাসের সত্য বলতে গিয়ে যা বলার তা বলতে তিনি আবার অকুণ্ঠচিত্ত। কিন্তু আবদুল মান্নানের তো ইতিহাসবিদ হওয়ার কথা ছিল না। বাকপটু, খাদ্যপটু, খবর খাদক আবদুল মান্নান তো সাংবাদিক হিসেবে বেশ ভালই করছিলেন, সাংবাদিক হিসেবে তার সাথে আমার যে দীর্ঘসময়ের পরিচয় তাতে কখনো মনে হয়নি যে, তিনি এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাবেন। তবে দীর্ঘ দিনের বন্ধু হিসেবে তার কিছু প্রবণতার সাথে আমি বেশ ভালভাবেই পরিচিত ছিলাম। ঘন্টার পর ঘন্টার উষ্ণ আলোচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি ইতিহাসের বিষয়েও তার উৎসাহ লক্ষ্য করেছি। মান্নান যখন ইতিহাসের কথা বলতেন তখন তার চোখে-মুখে যে উদ্ভাস লক্ষ্য করতাম, তাকে আবেগ নামে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। এই সব স্মৃতির আলোয় বিবেচনা করলে মান্নানের ইতিহাসমনস্কতাকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

মান্নান আসলে অনেক কিছুই হতে পারতেন, ভোজনবিলাসী মান্নান একজন শ্রেষ্ঠ আড্ডাবাজ হতে পারতেন, শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হতে পারতেন, শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার তো হতেই চলেছেন, তবে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ হতে ওকে আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। গবেষণার কষ্টসাধ্য এ পলে বন্ধুর সাফল্য কামনা করি, দোয়াও করি। কারণ বন্ধুর ইতিহাস সাধনার পথটা বেশ বন্ধুর।

আবদুল মান্নানের সাথে আজ-কাল খুব একটা দেখা হয় না, ফোনে কথা হয় কখনো কখনো। তবে বছরে দু-একবার দেখা হয়ে যায় বনভোজনে কিংবা কখনো সাংস্কৃতিক সম্মিলনে। এসব আনন্দঘন পরিবেশে লঘুচালের কিছু কথাবার্তার সাথে হাসিঠাট্টা যেমন হয়, তেমনি গুরুগম্ভীর বিষয়ও চলে আসে চকিতে। তবে খাবার টেবিলে দ্বৈতকণ্ঠেই উচ্চারিত হয় একটি কথা : স্টার হোটেলের সেই দিনগুলো আজ আর নেই। ঢাকার অধিবাসীরা পুরানো ঢাকার স্টার হোটেলের সাথে কম-বেশী পরিচিত। দৈনিক সংগ্রামে সাংবাদিকতা জীবনের প্রথমদিকে আমরা যখন বংশালে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতাম, তখন স্টার হোটেল আমাদের ডাকতো। ঐ হোটেলের বিরানি, কাবাব, বোরহানি ছিল বেশ সুস্বাদু। মান্নানের মধ্যপ্রদেশ তখনো স্ফীত ছিল, কিন্তু ও কিছুতেই কম খাইতে চাইতো না। সব ব্যাপারেই ওর একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ ভাব। কিছুতেই ঠকতেই চাইতো না, জেতাই যেন ওর নেশা। আমি তখন প্রায় তালপাতার সেপাই, বলতাম, মুটু একটু কম খেলে হয় না। কে শোনে কার কথা। মান্নান হাসফাস করে হলেও বেশী খেতে চাইতো, তারপর কোল্ড ড্রিংসের সাথে চলতো চুটিয়ে আড্ডা। সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে উপলব্ধি করি, স্মৃতি সততই সুখের। সেই মান্নান এখন আর আগের মত ভোজন রসিক নয়, শরীর অনুমোদন করছে না, ডাক্তারও নয়। আমিও আর সেই তালপাতার সিপাইটি নেই, আমার মধ্যপ্রদেশও মান্নানের কাছাকাছি। আসলে ষাটের ঘরে এসে আমরা এখন প্রবীণ হতে চলেছি। মান্নানের মত আমার মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। ক'দিন পরেই নাতি-পুতিসহ আমাদের সংসার আরও সমৃদ্ধ হবে। শুধু কি নাতি-পুতিতেই আমরা সমৃদ্ধ হবো, পঠন-পাঠন, অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞানেও কি আমরা সমৃদ্ধ হবো না? জীবনের এই পর্যায়ে এসে আবদুল মান্নান যদি খামার বাংলার নির্যাসে সমৃদ্ধ হয়ে একজন আবুল মনসুর আহমদ কিংবা উজ্জ্বল একজন ইতিহাসবিদ হয়ে ওঠে তা হলে তো ভালই হয়। আসলে বন্ধুমহল যত সমৃদ্ধ হয় ততই সুবিধা। ফোন করেই অনেক কিছু জেনে নেয়া যায়। সহস্র মিনিটের পরিশ্রমকে একমিনিটেই সংক্ষিপ্ত করা যায়।

www.pathagar.com

আমার জন্ম চাঁদপুরে, আর আবদুল মান্নানের নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার। ওর জন্মকাল ১৯৫২-এর ৩০ জুন। তবে জন্ম হোক যথাতথা জীবনদৃষ্টিতে মিল হলেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। '৭০-এর দশক থেকে মান্নানের সাথে আমার বন্ধুত্ব। এখন ২০০৮। এ দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় আমি উপলব্ধি করতে পারি সাংবাদিকতায় ও ব্যাংকিংয়ের জগৎ মাড়িয়ে অবশেষে ইতিহাসের জগতেই শেষ আশ্রয় হবে মান্নানের। ইতোমধ্যেই মান্নানের 'বাংলা ও বাঙালী : মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'; 'এই আমার বাংলাদেশ'সহ অন্যান্য গ্রন্থ সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যৌবনে যে সত্য মান্নান আবেগময় ভাষায় যুক্তিসিদ্ধ করতে চাইতেন, সে সত্যই আজ তিনি গবেষণার কষ্টিপাথরে আমাদের বোধগম্য করতে চাইছেন। মান্নানের এই পরিণত প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই । আর একটি কারণেও এই বন্ধুর প্রতি আমি এখন তুষ্ট-তা হলো মধ্যপ্রদেশের বদলে জ্ঞানের প্রদেশ সমৃদ্ধ করতেই তিনি এখন সচেষ্ট। আমি আবদুল মান্নানের এবং তার পরিবারের আরও সুখ ও সমৃদ্ধি কমনা করছি মহান প্রভুর দরাবারে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, শিশু সাহিত্যিক, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

ব্যাংকার গ্রন্থকার লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

খন্দকার মনিরুল আলম

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ দিনের। এটি বেশী ছিল যখন তিনি সাংবাদিকতায় ছিলেন। তিনি কাজ করতেন দৈনিক সংগ্রামে আর আমি বাংলাদেশ টাইমস-এ। মান্নান সাহেব ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী এবং নেতা ছিলেন। আমার বিচরণ ক্ষেত্র ছিল জাতীয় প্রেসক্লাবে। আমাদের মধ্যে সখ্যতা বেশী ছিল এ কারণে যে আমরা দু'জনে সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং জাতীয় প্রেসক্লাবে একই ফোরামভুক্ত অর্থাৎ একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম। আমাদের রাজনৈতিক দলও ছিল অভিন্ন। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা হিসেবে মান্নান সাহেব সংবাদপত্র শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের রুটি-রুজির সংগ্রামে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সে সময়ে সাংবাদিক ইউনিয়ন দুই ভাগে ভাগ হয়নি। ইউনিয়নের দাপট ছিল। সরকারি-বেসরকারী এবং মালিক পক্ষ সাংবাদিক ইউনিয়নকে সমীহ করতো, গুরুত্ব দিত। ইউনিয়নের নেতৃত্বও ছিল আপোষহীন।

যা হোক, এ সময়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনাব মান্নান যোগ দেন ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে। তাঁর এ পেশা পরিবর্তনে একটু অবাক হয়েছিলাম বৈ কি। তবে আশ্চর্য হইনি। সাংবাদিকতা পেশা থেকে অনেকে জনসংযোগ পেশায় যোগ দিয়েছেন, তাদের অনেকে সফলও হয়েছেন। সাংবাদিকতা এবং জনসংযোগ-এ দুটো মোটামুটি কাছের পেশা। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক মরহুম খায়রুল কবীর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও হয়েছিলেন।

ইসলামী ব্যাংকে যোগ দেয়ার পরে মান্নান সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ অনেকটা কমে যায়। এর পর তিনি জনসংযোগ বিভাগ ছেড়ে সাধারণ ব্যাংকিং-এ যোগ দেন। তাই তার সাথে যোগাযোগটা আনুষ্ঠানিকতানির্ভর হয়ে পড়ে। তবে জানতে পারি যে তিনি নতুন কর্মপরিধিতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন। তার ক্রমপদোন্নতি সেটারই প্রমাণ।

জনাব মান্নান ছিলেন সাংবাদিক, এখন ব্যাংকিং জগতে সফল ব্যাংকার। আমার ধারণা, ব্যাংকিং একটি টেকনিক্যাল বিষয় এবং এ পেশায় আসতে হলে ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। তবে ব্যতিক্রম দেখলাম মরহুম খায়রুল কবীর এবং আবদুল মান্নানের ক্ষেত্রে। দু'জনেই নতুন পেশায় অকল্পনীয় উন্নতি করেছেন।

কিছুদিন আগে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের ড. আবদুল ওয়াহিদ মান্নান সাহেবের লেখা "বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" নামের বইটি আমাকে দিয়েছেন পড়তে। ওয়াহিদ সাহেব মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা বই আমাকে দেন। তবে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' বইটি আমি শুধু পড়িনি বলা যেতে পারে গোগ্রাসে গিলেছি। আমি জানতাম না, জনাব মান্নান পুস্তক রচনা করেছেন কয়েকটি। সেগুলো অবশ্য আমার পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে এ বইটি পড়ে আমার সীমিত জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' বইটি পড়ে আমার এ উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে বর্তমানের বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কতো কম জানি। মান্নান সাহেব যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার তালিকা বিশাল। ৭৬ টি। এ বইগুলো তার পড়তে হয়েছে। আমার

www.pathagar.com

কাছে অবাক লাগে, দেশের একটা শীর্ষ ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় পদে থেকে শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি কিভাবে সময় বের করেছেন। নিজের দর্শনের প্রতি গভীর কমিটমেন্ট না থাকলে ওটা সম্ভব হয় না।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি নিছক একটি গ্রন্থ নয়। ইতিহাস যারা পড়েন তাদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয়/পাঠ্যগ্রন্থ। যারা রাজনীতি করেন তাদেরও এ বইটি পড়তে হবে। এ কারণে যে তাদের জানতে হবে এবং বুঝতে হবে কেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ চেয়েছিলেন। বছরের পর বছর তাদের যে শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল, বিদেশী ব্রিটিশ এবং দেশী উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কাছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি গঠনের দাবি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে। কিছু কিছু দালাল এবং জ্ঞানপাপী অনেক কিছু অস্বীকার করেন। বিশ্বাস করেন অখন্ডতায়। তারা কারা, তা আমাদের অজানা নয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার পেশায় আরো উন্নতি করবেন। একটা সময়ে তিনি একজন প্রাক্তন ব্যাংকার হিসেবে পরিগণিত হবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আবদুল মান্নান অমর হয়ে থাকবেন একজন সত্যাশ্রয়ী ইতিহাস গবেষক আর গ্রন্থকার হিসেবে।

লেখক : সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব ও প্রিন্সিপাল ইনফারমেশন অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রতি ঈদের সকালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দুই অনুজের ঈদের জামাতে হাজির হওয়ার পর প্রথম কাজ বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করা। ছবিতে বামে মেজো ভাই আবুল হাসনাত ও ডানে ছোট ভাই আবদুল হালিম

www.pathagar.com

বিস্মৃত ইতিহাসের বালুকাবেলায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

খন্দকার হাসনাত করিম

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের সময়ের একজন কৃতি ইতিহাস-গবেষক। তাঁর জীবনটা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। কর্ম-জীবনের শুরুটা সাংবাদিকতায়। মধ্য সময়টা ইতিহাস, বিশেষ করে উপমহাদেশের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ইতিহাস গবেষণায় মৌলিক কিছু অভিসন্দর্ভে ডুবে থাকা এবং যে সময়ে তাঁর লেখক জীবনের পূর্ণতার প্রতীক্ষা- ঠিক সেই সময় খন্ড জুড়ে ব্যাংকার হিসাবে নিজেকে নতুন করে খাপ খাওয়ানো। এমন বৈচিত্র্য বিরল নয় তো কী?

নিবেদিত-প্রাণ নিরপেক্ষ ইতিহাস বিশ্লেষক এবং গবেষক হিসাবে স্বীকৃতি ও সম্মান পাবার বেশ কিছু মৌলিক গুণ মান্নানের আছে। একজন ইতিহাসবেত্তা অবশ্যই তার ভাষার একজন সফল গদ্যকার। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গদ্যরীতি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। ইতিহাসের মত একটা কঠিন ও সীমিত পাঠ্য বিষয়কে সুখপাঠ্যে পরিণত করতে সাহায্য করেছে তাঁর সহজ-সুন্দর-সাবলীল এবং অযথা অহংকার-মুক্ত বাংলা গদ্যশৈলী। এর একটা বড় কারণ হয়ে থাকবে তাঁর প্রথম কর্ম জীবনের সাংবাদিকতা পেশা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর ইতিহাস-আগ্রহের প্রধান বিচরণক্ষেত্র এই উপমহাদেশ। ক্ষেত্র নির্বাচনেই তিনি পরিচয় দিয়েছেন বাস্তবতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং সাহসিকতার। কেননা এ কথা অনস্বীকার্য, পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে ইতিহাস ভাল আচরণ খুব কম করলেও- আর তেমন কোথাও এমনটা ঘটতে দেখা যায়নি যে, ইতিহাস নিয়ে সমাজপতি এবং উপনিবেশিক রাজশক্তি এমন একটা সন্ধি করেছে, যার কুফলে অতিসম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার ধারাগুলোকেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে, অসম্পূর্ণ রেখে এবং বিদ্বেষে ভরে ইতিহাসের মতো একটা সত্যাশ্রয়ী বিষয়কে করে তোলা হয়েছে বিতর্কিত এবং কলঙ্কিত। আবদুল মান্নানকে তাই দু'টো কাজ একত্রে করতে হয়েছে।

এক. ঘটনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা-
দুই. ঘটনার বিকৃত উপস্থাপনের উপনিবেশিক বিকৃতির ধারাগুলোকে খণ্ডন করা। দান্তেকে যেমন বৈরিতা ডিঙ্গিয়ে এবং মিথ্যার পাহাড় সরিয়ে লিখতে হয়েছিলো Devine Comedia কিংবা সুয়েটোনিয়াসের The Twelve Ceasars, মান্নানকেও তেমনি অতি কষ্টে তাঁর নিরপেক্ষতার রেখাকে স্পষ্ট করতে হয়েছে ওই দুই জঞ্জাল সরানোর ক্ষেত্রে।

আমাদের উপমহাদেশে ঘটলো কী আর ঘটনার বর্ণনা দাতারা লিখলেন কী? উপমহাদেশকে যারা আলোকিত করলেন, এদেশের বর্ণ-অহংকারী বাবু ঐতিহাসিক ও বৃটিশ প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) একটা বড় অংশের মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে সেই আলোক প্রজ্জ্বলনকারীদেরকে বিদেশী লুটেরা হিসাবে চিত্রিত করা হ'ল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, বিশ্বের শুধুমাত্র এই অংশেই ইতিহাসের অপব্যাখ্যায় এবং অপলিখন দ্বারা 'সাম্প্রদায়িকতা'-কে তৈরী করা হয়েছে। এই ধারাটির জন্ম বৃটিশভারতে এবং এর প্রভাব দ্বারা উপমহাদেশ আজও পর্যন্ত রক্তরঞ্জিত হচ্ছে। তুর্কীদের মতো ভারতের মহান ও অসাম্প্রদায়িক মুসলিম শাসন সহস্রাব্দির নবজাগরণের যে আলো জ্বেলেছিলো, বাবু ঐতিহাসিক এবং বৃটিশ প্রাচ্যবিদদের যোগসাজশে সেই আলোকেই চিত্রিত করা হয়েছে অমানিশা হিসাবে।

একথা সত্য যে, ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মানসিক ও শ্রেণীগত তারতম্য থাকতেই পারে। তা' না হলে নেপোলীয়ন বা ফরাসী বিপ্লবের এত রকমের ব্যাখ্যা হলো কেন? কিন্তু দেখুন, কেমব্রিজের Modern

www.pathagar.com

History-তে ওয়াটারলু যুদ্ধের ওলন্দাজ, জার্মান, ইংরেজ এবং ফরাসী বর্ণনা-ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। পলাশী যুদ্ধের বর্ণনা-ব্যাখ্যায় কিংবা পানিপথের যুদ্ধগুলোর প্রেক্ষাপট চিত্রণের সাম্প্রদায়িক তারতম্য ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাগল করে দেয়। ইতিহাস পড়ে এমন বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন খোদ ভারতীয় পণ্ডিতেরাই- প্রাচ্যবিদদের ইতিহাস-বিকৃতির এ ধরনের কূপমণ্ডুকতার কথা অনেকে অকপটে স্বীকারও করে গেছেন।

নিরলস শ্রম দিয়ে সত্যের খনি আহরণ

উপমহাদেশের, বিশেষ করে সুবাহ্ বাঙ্গালার মধ্যযুগ, মুসলিম শাসন, বৃটিশ জবর দখল, স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭), মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭), স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের বহু অজানা অধ্যায়, বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কার্যকরণ, স্বাধীন আবাসভূমির দাবী, দেশবিভাগ- এ সবই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সত্যানুসন্ধানের বিশাল এক একটা ক্যানভাস। স্বদেশ ও সংস্কৃতির শিকড়সন্ধানী গবেষণাকর্মে তাঁর চিন্তার পক্ষবিস্তারের পিছনে অনিবার্য তাগিদটাই হলো দেশাত্মবোধ এবং মূলে ফেরার ব্যাকুলতা। 'বাংলা ও বাঙ্গালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' নামের ইতিহাসখণ্ডটি মান্নানকে নানা কারণে অমর করে রাখবে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিমণ্ডলে মান্নানের 'মূলধারা' একটি নতুন ভাবনার পৃষ্ঠা উন্মোচন করে। আলোড়ন জাগে ইতিহাস-গবেষণার বিদ্যা জগতে। মান্নানের পরের কাজটি ছিলো আরও আলোড়ন সৃষ্টিকারী। ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন মানুষের কাছে চিরদিন আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে সমাদর পাবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নানা অলি-গলি, বিস্মৃত অধ্যায়, বিভ্রান্তি-আবৃত, বড় বড় ঘটনাগুলো উঠে আসে এই বিশাল খন্ডটিতে। এর আগে ১৯৯৩-তে প্রকাশিত হয় মান্নানের আর এক মৌলিক খণ্ড 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা।' অন্যান্য প্রকাশনার কথা উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ, মান্নান বলতে যে সাধককে মনে পড়ে, তাঁর পূর্ণতার জন্য উপরোল্লিখিত তিনটি বড় কাজই যথেষ্ট। কতটা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম ও সাধনা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, বিনিদ্র রজনী ও ক্লান্ত দিবসের শ্রম জড় করলে এত কাজ একটা জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও করা যায়, ভেবেও আশ্চর্য হতে হয়।

ইতিহাস মান্নানের পেশা নয়- নেশা। পেশা তাঁকে দিয়েছে পার্থিব জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু সেটা যে আসলেই কতটা অপূর্ণ, তা' বোঝা যায় মান্নানের ইতিহাস খণ্ডগুলোর বিশ্বস্ত গ্রন্থনা দেখে। আমরা মান্নানের মতো সাধকদের তাঁদের মূল কর্মক্ষেত্র, সাধন-জগতে পাইনি, এই বঞ্চনা আমাদের জাতীয় ট্র্যাজেডীর সমকক্ষ। মান্নানের উচিত ছিলো ইতিহাস- ঐতিহ্য নিয়েই থাকা। এতে জাতির সংসার উপকৃত হ'ত বেশি।

ইতিহাসবেত্তা মান্নানের সীমাবদ্ধতা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের একজন খুব কাছের ও প্রিয় মানুষ হিসাবে সমালোচনার যে অধিকার আমি ভোগ করি, তার উপর নির্ভর করে ইতিহাস গবেষক মান্নানের সীমবদ্ধতার রেখা উন্মোচন করা তাঁর বিশাল কর্মের প্রশংসার সমান দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। মান্নান কেন যে বিশ্বাসযোগ্যতার সার্বক্ষণিক সংশয়ে ভোগেন, তা আমি বুঝতে পারি না। তবে এ সংশয়াপন্নতার স্বাক্ষর তাঁর অধ্যায়ে অধ্যায়ে। তিনি তাঁর উপলব্ধিটি লিপিবদ্ধ করতে যতটা না আগ্রহী তাঁর চেয়ে বেশি আগ্রহ তাঁর উল্লিখিত বিষয় বা বর্ণনাপ্রবাহকে প্রামাণ্য করে তোলার কষ্টকর প্রয়াসে। এটাকে আমার কাছে নিরর্থক মনে না হলেও অতিরঞ্জিত উদ্যোগ বলে মনে হয়। এটার অবশ্য বড় একটা কারণ হ'ল এই যে, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে বাবু ঐতিহাসিক ও বৃটিশ প্রাচ্যবিদরা এত বেশী মিথ্যাকে সত্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন যে প্রতি পদে-পদে মান্নানের মনে এ তাগিদ দোলা দেয় যে উপস্থাপিত ধারাভাষ্যটির সমর্থন সম্পদ বা প্রামাণ্য সম্পদ খুব বেশি জরুরী। প্রমাণের তাগিদটা বেশি আসে সুবিচারের সংশয় থেকে। কিন্তু মান্নান ইতিহাসের স্তূপ খুঁজে, খুঁড়ে মন্থন করে সত্যের লিপিকার হিসাবে কেন এ সংশয়ে ভুগবেন? যদি শত শত বিভ্রান্ত পাঠকের মধ্যে একজনও থাকে যে সত্যের তিক্ততাসহই সত্যকে বরণ করে নিতে সর্বদা তৈরি, সেই পাঠক বা পাঠকেরাই তো মান্নানের Audience Constituency - মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি দ্বারা বিপথ পরিক্রমণকারীকে সত্যানুরাগী করে তোলার দায়িত্ব একা ঐতিহাসিকের নয়। এ দায়িত্ব গোটা সমাজের। আমরা এমন লিপিকারের প্রতীক্ষায় রইবো, বিভ্রান্তির জটাজাল ছিন্ন করতে গিয়ে ভাষ্যকারের মূল কাজ থেকে যে দূরে থাকবে না। শতে শত বছরের যে মানস জঞ্জাল আমাদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে রেখেছে তা' থেকে বের হতে হলে আমাদের সবাইকেই হতে হবে মান্নানের মতো আন্তরিক এবং উদ্যমী। একা মান্নানকে যদি আমরা ইতিহাস বিকৃতির জঞ্জাল সাফ করার পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দায় চাপিয়ে দিয়ে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে বসে থাকার অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েই চলি, তা হলে ওই জঞ্জালই

www.pathagar.com

হবে আমাদের সমাজ নামক ভাগারের একমাত্র সম্পদ। মিথ্যাচার দিয়ে 'নবজাগরণ' রচনা করা যায় না। একটি যুদ্ধ বা একটি মহাবিদ্রোহই একটি নৃ-গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ বিকাশের আনুপূর্বিক গতিধারাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। আমাদের জাতীয় বিকাশ এবং স্বাধীনতামনস্কতার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ; অনেক ঘটনাবহুল। বাবু ইতিহাসবিদ ও প্রাচ্যবিদ চক্রের রেখে যাওয়া 'ইতিহাস' নামের অপূর্ণ ধারাভাষ্যকে আমরা কেন ধ্রুব বা ঐশী বুলি হিসেবে গ্রহণ করবো? সিরিয়ানরা কি ফরাসী ইতিহাসবিদদের লিখে যাওয়া সিরিয়ানামাকে গ্রহণ করবে, না-কি অপেক্ষায় থাকবে মুক্ত মনের নিরপেক্ষ সিরীয় ইতিহাসবিদদের রচিত ইতিহাসের ? বেলজীয়রা তো আজও মনে করে না, তাদের পূর্ব পুরুষেরা কঙ্গোতে যা করেছে তা বর্বরোচিত ?

ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করা যায় না ?

আবদুল মান্নান, আগেই বলেছি, তাঁর স্বভাসুলভ গদ্যরীতি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন ইতিহাসের মতো এত নিরস, বিবশ একটি পাঠ্যধারা। তবে সময় ও সংগ্রামের লিপিকার হিসাবে আরও পাঠক সফল হয়ে উঠতে হলে ইতিহাসের লিপিভাষ্যকে প্রামাণ্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত করার সংশয়াপন্নতাকে আমাদের জয় করতেই হবে। ফরাসী লেখক জুটি (Doninique Lappierre এবং Larry Collins) বর্তমান বিশ্বপাঠকের হাতে লাখ লাখ কপি তুলে দিয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন (Freedom At Midnight) মধ্যপ্রাচ্য সংকটের স্বরূপ (O' Jerusalem) এবং আফ্রিকা শৃঙ্গের সংকটা (The Fifth Horseman)-এর মতো ইতিহাস-নির্ভর পেপারব্যাক। আমার মনে হয় আবদুল মান্নান বা তাঁর মতো যাঁরা ইতিহাসের গদ্যকার তাঁরা তাঁদের পাঠক-বিকাশকে গাণিতিক প্রবৃদ্ধি থেকে জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধিতে নিয়ে যেতে পারেন, যদি কি-না ইতিহাসকে আরও সুখপাঠ্য ও পাঠক আগ্রহের সাথে অনুকূল করে তুলতে পারেন। 'Nepoleon-For and Against' ইতিহাস খণ্ডটির (Gely-এর লেখা) পাঠক সাফল্য আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে। ইতিহাসবিদ Lord Action বহু বহু জনপ্রিয় উপন্যাস রচনাকারীর ঈর্ষা হয়ে আছে। ইতিহাসবেত্তাতদের শক্তি কতখানি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো খোদ বৃটেন। বৃটেনের উদার নৈতিকতার যুগ সূচনাই তো' ফীশারের মত জনপ্রিয় ইতিহাসবেত্তাদের হাতে। লক সামাজিক চুক্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার প্রেরণাকে যত সামাজিক বিপ্লবের রূপই দিন না কেন, সেই শক্তিশালী সমাজ দর্শনকে জনগণের কাছে নিয়ে যান এ্যাডাম স্মিথ ও বেন্থমের মতো গবেষকেরা- যারা ইতিহাস লিখতে লিখতে কেবল ইতিহাসই গড়েননি, জন্ম দিয়েছেন যুগধর্মী সমাজ দর্শনেরও। ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুপম সাহিত্য শক্তির কাছে ম্লান হয়ে গেছে সন-ক্রমিক ইতিহাস লিপির পাণ্ডুর, পানসে, রক্তশূন্যপ্রবণ ক্রনিক্‌ল্ কিংবা আবেগতাড়িত যুদ্ধজয়ের বীরত্ব গাঁথার সংহার-সাহিত্য।

শিকড় যার প্রেরণা

একটি নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ যার বিরাট অহংকার এবং যে গৌরব আজও অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে বিস্মৃতির বিবরে, তার জন্য আবদুল মন্নানের মত সত্যানুসন্ধানী সাধকের খুব বেশি প্রয়োজন। মুসলিম শাসন যুগেই পৃথিবীতে ঘটেছিলো প্রথম রেনেসাঁ। অথচ মধ্যযুগের সেই সম্পদ ঢাকা পড়ে যায় বিস্মৃতির বালুকারাশিতে। ইউরোপীয়রা সেই বালু ঢাকা ইতিহাস সম্পদ থেকেই গড়েছে রেনেসাঁর সেই অনুকরণকৃত ভাস্কর্যটি। অথচ সেই ভাববিপ্লবই পেয়েছে সমাজ বিপ্লবের রূপ স্রেফ ইতিহাসনির্ভর লেখার শক্তিমান লেখকদের বদৌলতে। আমরা আরও অনেক আবদুল মান্নানকে চাই। আমাদের ভুলে যাওয়া এবং ভুলিয়ে রাখা ইতিহাস জানতে হলে এবং জীবন ও মনকে নতুন শক্তি ও মানস প্রেরণা দ্বারা সাজাতে হলে আমাদের চাই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মতো আরও অনেক নিরলস, নিরপেক্ষ এবং সত্যানুসন্ধানী ইতিহাস গবেষকের।

লেখক : বিশিষ্ট কলামিস্ট, নাট্যকার, সহ-সভাপতি ডিইউজে

www.pathagar.com

মূলধারার ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

মাসুদ মজুমদার

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন ইতিহাস গবেষকের প্রতিকৃতি। তাঁকে প্রথম জানি তরুণ সংগঠক হিসেবে। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পরিচিতিটা কম বর্ণাঢ্য নয়। চরিত্রগতভাবে তিনি গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতার লোক। সুদর্শন এবং সুভাষী হিসেবে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি একজন বন্ধুবৎসল এবং বিশ্বাসের বাগডোরে বাঁধা মানুষ। এখন তিনি সফল ব্যাংকার। একজন সফল ব্যাংকারের পরিচিতি আড়াল করে তিনি হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের নন্দিত মানুষ। গবেষক হিসেবে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ়। মূলধারার গবেষক হিসেবে তাঁকে উপস্থাপনের দায় থেকেই গৌর চন্দ্রিকায় ইতিহাস বিষয়ক ক'টি কথা বলা সঙ্গত। অন্যান্য লেখায় তাঁর ব্যক্তি জীবন, কর্মজীবন, অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ নিবন্ধে তাঁকে তুলে ধরার চেষ্টার চেয়েও ইতিহাসের কথাই বেশি থাকছে। উপসংহারে একটু খানি নির্মোহ ভঙ্গিতে তাঁকে সম্পৃক্ত করে দেয়াটাই আসল কথা। সে আসল কথাটি বলার কারণ ইতিহাসের মূলধারায় তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য- এ কথাটি ভিন্ন অবয়বে প্রমাণ করে দেয়ার দায়বোধ। সঙ্গত কারণেই এ নিবন্ধে ইতিহাসই মুখ্য বিষয়। বিষয়বস্তু ও নায়কের রূপময়তার আলোকেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে বুঝতে হবে।

ইতিহাস কতটা সুখপাঠ্য-সেটা অবশ্য তর্কের বিষয়। কিন্তু ইতিহাস ছাড়া আমাদের চলে না। চলবে না। অতীতের ওপর বর্তমান দাঁড়ায়। বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্য কতটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও বড় কথা, 'কাল' চক্রের মতো। আজ যা বর্তমান আগামীকাল তা-ই ইতিহাস। ইতিহাস মানে অতীতের নির্যাস। বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী মুহূর্তের ভাবনাটাই ভবিষ্যৎ। তাই তিনকালের সাযুজ্য ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন। ইতিহাস ছাড়া জাতির অস্তিত্বই শুধু বিপন্ন হয় না, শেকড়বিহীন গাছের মতো অকল্পনীয়। লতাগুল্মের মধ্যে পরগাছার শেকড় থাকে না। এ কারণেই পরগাছার নিজস্ব ঔষধি গুণ থাকতে পারে। গাছ হিসেবে মূল্যায়িত হয় না। মানবজাতির ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মানুষের ধারণাতীত। মানুষ যা স্মৃতি-শ্রুতি দিয়েও নির্দিষ্ট করে আয়ত্ত করতে পারে না, সেটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলে একটি অনির্দিষ্ট ধারণা পেতে চেষ্টা করে। নতুন অবয়বে ওল্ড ও নিউ টেস্টাম্যান্ট না থাকলে মানুষ অতীত সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যেত। কুরআন অতীতের আসমানী কিতাবগুলোর সাক্ষ্য দিয়ে সর্বশেষ সংস্করণ হিসেবে নাজিল না হলে মানুষের ইতিহাস গবেষণাকে সত্যের নিকটবর্তী করা মোটেও সম্ভব ছিল না। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে ধারণা জরুরি। প্রত্নতত্ত্বের খনন প্রক্রিয়ায় কিংবা ফসিল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইতিহাস গবেষণা অনুমাননির্ভর।

তাই ইতিহাস চর্চার যতটুকু উপায়-উপকরণ তার জন্য বিবর্তনবাদ কোনো উপসংহার টানতে পারেনি। কার্ল মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করে না। আসমানী কিতাব হাতিয়ে মানুষ যতটুকু ইতিহাস খুঁজে পেয়েছে, তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে মাত্র।

যারা বিশ্বাসী তারা ইতিহাসে সমৃদ্ধ দুটো কারণে, তারা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তার অস্তিত্ব যে একটি পরম্পরার ফসল, সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। এটি বিশ্বাসীর কৃতিত্ব নয়, বিশ্বাসেরই বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই মানুষ জড়বাদী ব্যাখ্যা করুক, আর অহিবাদী ব্যাখ্যাই করুক, তাকে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতেই হবে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে এ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে।

মানবজাতির একটি অখণ্ড ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের আবার নানা অধ্যায় আছে। বংশ লতিকার মতো সে অধ্যায় আবার অর্গানোগ্রামের মতো বহু কেন্দ্রিকতা থেকে এক কেন্দ্রে, এক কেন্দ্রিকতা থেকে বহু কেন্দ্রিকতায় ভাগ-বিভাজন হতে পারে। হযরত ইবরাহীম আঃ পর্যন্ত

www.pathagar.com

টানা ইতিহাসকে সব আসমানী কিতাব আধিপাপের ধারণা ছাড়া মৌলিক বিষয়গুলো প্রায় অভিন্ন অবয়বে তুলে ধরেছে। হযরত ইব্রাহীম আঃ-এর দুই পুত্রের দু'টি ধারার একটি বিকৃত ইতিহাস খাড়া করেছে ইহুদিরা। অপর আহলে কিতাবের অনুসারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সে ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করেনি, আবার হুবহু অনুসরণও করেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের তুলনায় তাদের ইতিহাস চর্চা একই সমতলে থাকে না। সেটা হয় প্রকৃত বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিকতা অথবা বিকৃত অবয়বে তুলে ধরার কারণে। অবতার বাদে সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি যুগের ভাবনা আছে। নিটোল ব্যাখ্যা নেই।

এমন একটি অবস্থা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়বাহী জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার জাতি-রাষ্ট্রের ধারণায়ও এমন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এ কারণেই জাতি-রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় ইতিহাস জুড়ে দিয়ে ভূরাজনৈতিক অবস্থানসহ জাতিসত্তার আলাদা ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতীতে অনেক জাতি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মিলে। ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তনের তথ্যও এর সাথে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ইতিহাসের আদি-অন্ত কিছুটা রহস্যঘেরা এবং মানুষের ধারণাতীত। তারপরও ইতিহাসচর্চা অবশ্যম্ভাবী। এ ভাবনাই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রেরণার উৎস।

এমন একটি অনিবার্যতার প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণাগ্রন্থ নিয়ে আমাদের এ নিবন্ধ। ইতিহাসের সাথে রাজনৈতিক সাহিত্যের সংযোগ প্রত্যক্ষ। ব্যাকরণগত বিবেচনায় 'রাজনৈতিক সাহিত্য' বলতে আলাদা কিছু বোঝায় না। তারপরও জাতির ইতিহাস বিনির্মিত হয় রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে। রাজনীতির সাথে লেপ্টে থাকে আর্থ-সামাজিক অন্যান্য দিক। যখন ইতিহাস আলোচনার বিষয়বস্তু হয়, তখন সামগ্রিকতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে যায়। তবে ইতিহাসের সামগ্রিকতা যা বিরাট ক্যানভাসে একটি বিষয়কে কিংবা কোন বিশেষ ঘটনা তুলে আনার সময় সামগ্রিকতার বিষয় প্রাধান্য পেতে পারে। সেটা কোনো কোনো ঘটনাকে এড়িয়ে যায় বা যেতে পারে, কিন্তু সেটাকে ইতিহাস বিকৃতি বলা যায় না।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'- এই শিরোনামে আমরা যখন প্রথম ইতিহাসনির্ভর কাজটি জাতীয় পর্যায়ে শুরু করি, তখন ভাবিনি এর ওপর অনেক কাজ হবে এবং পাঠকপ্রিয়তা পাবে। প্রথমে এটি ছিল একটি সেমিনার প্রবন্ধের শিরোনাম। সেটি ছিল ৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উপলক্ষে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাসকেন্দ্র একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে। প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার স্মারকে নবীন-প্রবীণ ৩৮ জন লেখকের লেখা প্রকাশ করা হয়েছিল। একটি ধারাপঞ্জি এবং নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাষণসহ এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ অক্টোবর ১৯৯৭ সালে।

স্মারক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অনেক তথ্য-উপাত্ত এবং বহু পুস্তকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। ১৬ অক্টোবর ২০০২ সালে ৯৭তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : ঢাকা কেন্দ্রিক জাতিসত্তার নবউত্থান' শীর্ষক বুকসাইজের ১৬ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছিল। একই নিবন্ধ সম্প্রতি প্রকাশিত প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থেও ঠাঁই পেয়েছে। বিসিআইসি মিলনায়তনে আমরা সেমিনারটির আয়োজন করেছিলাম।

এখন সময়ের কোলাহল থেকে ধীরে ধীরে সেগুলো নতুন প্রজন্মই তুলে আনতে উৎসাহিত হচ্ছে। এ উৎসাহের পরিধি এখন কতো ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক তার প্রমাণ হিসেবে আমি প্রতীকীভাবে মাত্র একটি গবেষণা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করবো। শিরোনাম 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক।' এ গ্রন্থটির লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৭। যাকে আমরা জাতিসত্তার মূলধারার ইতিহাস অনুসন্ধানের কারণে অনেক আগেই শেকড় সন্ধানী মূলধারার ইতিহাস গবেষক হিসেবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মধ্যে লেখক-গবেষক জাতিসত্তার ১০০ বছর তুলে এনেছেন। এটি ইতিহাস গ্রন্থ। ধরণ গবেষণাধর্মী। এ গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার পথ ধরে নিজস্ব জাতিসত্তার ধারাটি সহজভাবে উপস্থাপন করা।

বিগত এক দশকের মধ্যে কম করে দু'শতাধিক ইতিহাসনির্ভর বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সংখ্যাও কম নয়। বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্রের পক্ষ থেকেই বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের বার্ষিকী পালন করেছি। স্মারক গ্রন্থ, সেমিনার, বর্ণাঢ্য র‍্যালি নতুন প্রজন্মকে নতুন করে চকিত চমকে ইতিহাসের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করেছে। স্মারক গ্রন্থ, সেমিনার এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালিসহকারে জাতীয়ভাবে পলাশী দিবস পালিত হয়েছে। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'

www.pathagar.com

শিরোনামে বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্রের সমৃদ্ধ সর্বশেষ স্মারক গ্রন্থটি অনেকের নজর কেড়েছে।

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ এবং গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নতুন প্রজন্মের কাছে এ কারণেই পরিচিত নাম। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বইটিতে মূলধারা চিহ্নিত করার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা যেন উপচে পড়ছে। এটি সামগ্রিকভাবে ইতিহাস গ্রন্থ হলেও সময়ের বাঁক থেকে একটি বিশেষ দিক তুলে আনার আন্তরিকতা প্রবল।

বাংলার মুসলমানরা যতবার পেছনে তাকাবে ততবারই মূলধারায় ফিরে যাবার আগ্রহ বাড়বে। সেখানে ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গবেষণা কর্ম ঠাঁই পাবে 'উন্নত মমশির' হিসেবে। যতবার শেকড় সন্ধান করবে ততবার তিতু, মেহেরুল্লাহ, শরিয়ত উল্লাহরা সামনে এসে দাঁড়াবেন। স্বাধীনতার প্রতিটি বাঁকে একবার করে সিরাজুদ্দৌলা এসে সাহস জোগাবে। একটু পেছনে তাকালেই পাওয়া যাবে নবাব সলিমুল্লাহ এবং সমসাময়িক অসংখ্য জাতীয় ব্যক্তিত্বকে। অলি আল্লাহর বাংলাদেশ। শহীদ গাজীর বাংলাদেশ। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, সুফী-সাধকদের প্রভাব বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, এটি শুধু আমাদের জন্মভুমি নয়, পিতা এবং পিতামহের পবিত্র জায়নামাজ। এর ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং লোকায়ত সংস্কৃতির সাথে শুধু রক্তই মিশে নেই, আছে অসংখ্য গৌরবগাথা। এ লক্ষ্যে জ্ঞাত-অজ্ঞাত গবেষণা কর্মগুলো সে গৌরবগাঁথার সৌরভ ছাড়াবে, এটাই অনিবার্য সত্য। সেই বাঁকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হয়ে যাবেন তথ্য সূত্রের যোগানদাতাদের একজন।

লেখক : কলামিস্ট, সহকারী সম্পাদক দৈনিক নয়াদিগন্ত

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বড় মেয়ে মোহসিনা মাহমুদা ফেরদৌস নিতু লন্ডনের ম্যাকডোনালন্ডস কলেজ থেকে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের একটি আনন্দঘন মুহূর্তে বাবা ও মেয়ে

www.pathagar.com

শেকড় সন্ধানী একজন অনন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

এম. এ রশীদ চৌধুরী

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য। তবুও মানুষের কিছু সৎকর্মের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত না করলে সৎকর্মশীলদের সংখ্যা কমতেই থাকবে। এমনই একজনন সৎকর্মশীল, একনিষ্ঠ এবং শেকড় সন্ধানী লেখক জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, যার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ না করলে কর্তব্য অবহেলার দায়িত্ব এসে যায়। এ জন্যই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রয়াস।

আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্য চর্চাকারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাই বলে আমি যে কোন ধরনের লেখকদের কথা বলছি না। আমি সে সব উন্নত মানের লেখকের আদর্শগত একনিষ্ঠতার অভাবের দিকে ইঙ্গিত করছি। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ শেকড় সন্ধানী লেখক। তিনি কবি ফররুখ আহমদ-এর মতো একনিষ্ঠভাবে এতদঞ্চলের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে সমুন্নত করার প্রয়াসে তৎপর আছেন। তিনি কখনো তার এ লক্ষ্য থেকে কক্ষচ্যুত না হয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, যার দৃষ্টান্ত নেই বললেও চলে। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে বিচরণ করলেও তাঁর আসল ক্ষেত্র হলো আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধান। এমনকি কবি ফররুখ আহমদও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত বন্ধুদের সংগে এক সময় তরুণ বয়সে বামপন্থী চিন্তা-ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছলতায়ও লক্ষ্য করা যায় না।

আজ থেকে সিকি শতাব্দী পূর্বে তিনি যখন ব্যাংকিং-এর মতো একটি জটিল এবং সময়গ্রাসী পেশায় নিয়োজিত হন, তখন আমি আনন্দিত হলেও চিন্তিত হয়েছিলাম। কারণ তিনি তাঁর লেখার মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ে একটি সুবাতাস ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা একজন তরুণ লেখকের জন্য গ্লামার বিষয়। আল কোরআনের ২৬ নং সুরার নাম ঃ 'সুরাতুশ্-শুআ'রা' অর্থাৎ কবিগণ। এই কবিগণ বলতে সব ধরনের সাহিত্যসেবীকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, বিশ্ব সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের ভাষা কবিতার ছন্দেই প্রকাশিত হতো। গদ্য সাহিত্য বিগত কয়েক শতকের ব্যাপার। তাই 'সুরাতুশ-শুআ'রা'র শেষ রুকুর শেষ আয়াতগুলো শুধুমাত্র কবিদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। সকল প্রকার সাহিত্যচর্চাকারীর এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ২২১ "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব যে, শয়তানরা কার কাছে অবতরণ করে? ২২২ তারা তো অবতরণ করে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীদের কাছে। ২২৩ তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। ২২৪ আর কবিদেরকে তো বিভ্রান্ত লোকেরাই অনুসরণ করে। ২২৫ তুমি কি দেখ না যে তারা প্রত্যেকে ময়দানে উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়? ২২৬ এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। ২২৭ তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে এবং বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যারা অত্যাচার করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কেমন?"।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ বিষয়ে অবগত। তার সকল লেখার মূল সুর ঐ একই দিকে নিবিষ্ট। এমনকি তার অন্যান্য বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধে বা কথা সাহিত্যে একই আদর্শ এবং ঐতিহ্য বারবার ফিরে আসে। অর্থাৎ তিনি কখনো লক্ষ্যচ্যুত হননি। এ জন্যই তিনি অনন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ রকম একজন অনন্যসাধারণ লেখক এবং কথা সাহিত্যিক-এর উপর আলোচনা করতে গেলে আমার নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। তবুও হৃদয়ের আবেগে কিছু কথা না বললেই নয়। যেমন- কি করে তার মধ্যে এতগুলো গ্রন্থ প্রণয়নে আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একনিষ্ঠতা

www.pathagar.com

বজায় থাকল! এর কারণ অনুসন্ধানে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি এ লক্ষ্য এবং আদর্শ আশৈশব লালন করে এসেছেন। ভাটি বাংলার প্রাক্তন রাজধানী সোনারগাঁও এলাকায় জন্মগ্রহণ করেই তিনি ঐতিহ্যের নদীতে অবগাহন শুরু করেন।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় 'বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার' অফিসে 'ইসলামিক ইকোনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠায় একজন অতি তরুণ সহকর্মী হিসেবে তার সংগে আমার প্রথম পরিচয়। মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তাকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। আজ প্রায় ৪৪ বছর পর বুঝতে পারছি জহুরী জওহর চিনে। নাখালপাড়াস্থ 'মোস্তফা মনজিলে' ষাটের দশকে মরহুম আবদুর রহীমের গবেষণা কাজ দেখে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমদের সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে যায়। যদিও বাংলার মানুষ জানে যে, অদ্যাবধি তাঁর ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারেননি। ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে আবদুল মন্নান গবেষণা কাজে যে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন তা অনন্যসাধারণ! অথচ শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার হিসেবে তিনি একাধিকবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন। অর্থাৎ কর্তব্যে অবহেলা করে নিজের গবেষণা কাজ তিনি করেননি।

১৯৭২ সালের শুরুতে জনাব আবদুল মান্নান সাংবাদিকতায় যোগ দেন। পত্রিকাটি ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী মালিক-প্রকাশক মহিউদ্দীন আহমদের 'সোনার বাংলা' যা ষাটের দশকের প্রথমার্ধে আইয়ুব-মুনায়েমের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছিলো। এ পত্রিকার মাধ্যমেই আব্দুল গাফফার চৌধুরী, মোবায়েদুর রহমান, নির্মল সেনসহ বেশ ক'জন নামী-দামী সাংবাদিক আত্মপ্রকাশ করেন। যাদের সাহচর্য্যে থেকেও তরুণ আবদুল মান্নান আদর্শচ্যুত হননি।

সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেই আবদুল মান্নান লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর ঐ সময়কার লেখা 'সাপ্তাহিক বঙ্গ দর্পণ', 'দৈনিক পূর্বাভাস', 'দৈনিক সমাজ' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর 'হক কথার' পর সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিলো 'সোনার বাংলা', যে পত্রিকায় তিনি সব ধরনের লেখাই লিখতেন। এভাবেই তিনি উপ-সম্পাদকীয় এবং সম্পাদকীয় লেখার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং পত্রিকাটির কার্য-নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সুবাদে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রমুখের সংগে। এছাড়াও তিনি তাঁর সুমধুর আচরণের জন্য সমাদৃত হয়ে উঠেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, ওলি আহাদ, ড. আলীম আল রাজী, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখের সাথে। তারও আগে তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন কবি বেনজীর আহমদ, কবি ফররুখ আহমদ, কবি সৈয়দ আলী আহসানসহ অনেকের।

এরপর তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় যোগদান করে তার বিভিন্ন ফিচার লেখার মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। প্রিয়পাত্র হন 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ'র। বিজ্ঞজনেরা বলেন ঃ 'দৈনিক আজাদ' এবং 'কলকাতা মহামেডান' স্পোর্টিং ক্লাব' না থাকলে পাকিস্তান হতো কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ চিন্তাই করা যায় না। 'দৈনিক আজাদ' ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ভাষা আন্দোলনে যে বিরাট অবদান রাখে তা সর্বজন স্বীকৃত। এই পত্রিকায় মুজিবুর রহমান খাঁ'র অনুপ্রেরণায় আবদুল মান্নান আরো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করে লেখালেখি চালিয়ে যান। তার লেখার বিশেষত্বের জন্যই পত্রিকাগুলো এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন তার লেখা লুফে নিত। এভাবে তিনি ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত অনর্গল গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লিখতে থাকেন। প্রকাশনা জগতে প্রবেশ করার আগেই তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংকের তথ্য ও প্রচারণা অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু নতুন ব্যাংকিং বিষয়ে আগ্রহের কারণে তিনি একজন সার্বিক ব্যাংকার হওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং-এ গবেষণা কাজ শুরু করেন। প্রণয়ন করেন 'ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা'র মত মৌলিক গ্রন্থও।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আগে থেকে প্রকাশিত হতে থাকায় সংগে সংগে সাড়া জাগায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. ড. এ. আর. মল্লিক তাঁর লিখিত এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেন। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান প্রমুখ তাঁর এ গ্রন্থটিকে এতদঞ্চলে 'একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ ও সতর্ক বিবরণ' হিসেবে মূল্যায়ন করেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ গ্রন্থটিকে 'জনগণের ইতিবৃত্ত' রূপে আখ্যায়িত করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ

www.pathagar.com

মুহিব উল্যাহ ছিদ্দিকী গ্রন্থটির 'ধারণার ধরন ও চিন্তা-চেতনা বিকাশের নতুনত্ব' বিষয়ে আলোকপাত করে মন্তব্য করেন ঃ 'ইতিপূর্বে এ বিষয়টিকে এভাবে কেউ দেখেছে বলে আমাদের জানা নেই'। এভাবে তিনি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বারা নিজের জন্য একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যাপারে এটিও সাম্প্রতিক একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

ইতোমধ্যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী মাজান্দারান প্রদেশের বাবুলসরে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আয়োজিত ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি ইসফাহান, তেহরান, কোম, শীরাজ এবং পারস্য সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র পারসোপলিস, নখশে রোস্তমসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেন। ১৯৯৫ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইসলামী ব্যাংকের ফরেন রেমিট্যান্স কার্যক্রমের মার্কেটিং-এর বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সৌদি আরব যান। ১৯৯৭ সালে তাঁর দায়িত্বের আওতা ইউএই, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন এবং ওমান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় এলাকায় অবস্থানকালে প্রায় প্রতিরাতে প্রবাসী রেমিট্যান্স একাউন্ট ইসলামী ব্যাংকে খোলা হয়। শ্লোগান ছিল ঃ ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠান; লুঙ্গি, গামছা, গেনজীর ব্যবহার বাড়ান এবং বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করুন। এতে বিরাট সাড়া জাগে। বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ বিজনেস কম্যুনিটি (বিবিসি)-সহ বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেন। বিবিসি'র উপদেষ্টা হিসেবে এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ সিঙ্গেল কান্ট্রি ট্রেড ফেয়ার' আয়োজনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা' শিরোণামে একটি পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট' (রামরু) ২০০১ সালে বইটি প্রকাশ করে। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি সৌদি আরবসহ বিভিন্ন এলাকায় আল কোরআনে উল্লেখিত নবী-রাসুলদের স্মৃতিসম্বলিত এলাকাসমূহ সফর করে এর উপর অনেক লেখা-লেখি করেন।

এছাড়াও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেন। মালয়েশিয়া, জাপান, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ইরান, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লীডারশীপ ইন ফিন্যান্স (ইকলিফ)-এ ২০০৫ ও ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার মালাক্কা প্রণালীর পাঙ্কর ও পুত্রাজায়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক তীরে বোস্টনে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশান্ত মহা-সাগরের তীরে সান-ফ্রান্সিসকোতে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চার স্তরবিশিষ্ট 'গ্লোবাল লীডারশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করেন। পুত্রাজায়ায় এশিয়ার মহান নেতা মাহাথির মোহাম্মদ-এর তিনি একশত পাঁচ মিনিটের একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

২০০৫, ২০০৬ সালে তিনি 'বঙ্গ ভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তার সম্পাদনায় 'বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষপূর্তি স্মারক ২০০৬' নামে একটি বিরাট এবং অনবদ্য স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'সহ বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। এ ব্যাপারে কবি আল-মাহমূদসহ অনেকে তাঁর গবেষণাধর্মী লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এ নিবন্ধে আমি তার কার্যক্রমের বর্ণনা না দিয়ে শুধুমাত্র কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করে ইতি টানতে বাধ্য হলাম। কারণ তার মত প্রতিভাবান ব্যক্তির লেখা-লেখি সম্পর্কে ভবিষ্যতে গবেষণামূলক বই-পত্র প্রকাশিত হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। অচিরেই তিনি বাংলা একাডেমীসহ বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হবেন বলে আমি আশা রাখি।

পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহ্-পাকের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর 'সুপ্রিম' ইচ্ছায় মানুষের দ্বারা কিছু ভাল কাজ করিয়ে নেন। যা সে নিজেও প্রায়ই জানে না। তাই মানুষ আত্মাম্ভরিতা এবং অহংকারে লিপ্ত হয়। আমার জানা মতে, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এদিক থেকেও অনন্য। তিনি যাতে তাঁর আশৈশব লালিত লক্ষ্য এবং আদর্শের প্রতি অবিচল থাকেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

www.pathagar.com

এই দুঃসাহসিক দায়িত্ব নেয়ার পেছনে আবদুল মান্নানের মূলধন কী ছিল- এ রকম একটা সঙ্গত প্রশ্ন আসতেই পারে। এ প্রশ্নের উত্তর সহজ; তার মূলধন ছিল নিষ্ঠা, ধৈর্য্য আর সাহস। এই তিনটি বিরল গুণ তার মাঝে দেখে আসছি বরাবর। আজও।

আবদুল মান্নান সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে সাগর সেঁচে মুক্তো আনবেন- জাতিকে উপহার দেবেন চমৎকার একটি ইতিহাস।

আমরা সেদিনের অপেক্ষায়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
একের ভেতর অনেক

সবিহ্-উল আলম

সংবাদ জগতের ব্যক্তি হিসেবে তার সাথে আমার পরিচয়। তা-ও তো হলো প্রায় আড়াই যুগ। দু'জন পরস্পরকে জানতে লাগলাম। সেই জানাজানিতে উঠে এলো আমাদের দু'জনের মিল- লেখালেখি। নৈকট্য বাড়তে লাগলো- সৌহার্দ্যের দাবিতে আমাদের দু'জনের আলাদা একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেলো- আমি অগ্রজের ভূমিকায়, আর তিনি অনুজের। তবে যোগ্যতায় কোনদিক দিয়েই অনুজ নন তিনি।

মহাবিস্ময়ে একদিন আবিষ্কার করলাম, সংবাদ জগতের আমার চেনা-জানা সেই মানুষটি ব্যাংকিং পেশায় নিয়োজিত- নিবেদিত মনে-প্রাণে। তবে ব্যস্ত সময়েও সেই অভ্যেসটি ছাড়েন নি; লেখালেখি চলতে লাগলো বিভিন্ন মাত্রায়। তার মধ্যে অন্যতম হলো ইতিহাস-নির্ভর লেখালেখি- মতপার্থক্য আর মতবিরোধের বিশাল সাগর, যেটির কোন সীমানা নেই। আর সে ইতিহাস যদি হয় দেশমাতৃকাকে নিয়ে, তা হলে তো এর বিশালতা একেবারেই পরিমাপের বাইরে। সেই সাগর পাড়ি দিতে অমিত সাহস লাগে, লাগে ধৈর্য্যও, যা আবদুল মান্নানের আছে। তেমন একটি দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছেন আবদুল মান্নান। হাত দিয়েছেন নয়, ইতোমধ্যে সেই বিশাল সাগরের উল্লেখযোগ্য অংশ পাড়িও দিয়েছেন- তার কিছু ইতিহাসরূপে বই আকারে বেরিয়েও গেছে, আরও কিছু বেরোবার পথে।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান
এক অনন্য প্রতিভা

আলমগীর মহিউদ্দিন

আমাদের সমাজে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তি আছেন যাদের নিয়ে কিছু বলা ও লেখা অবশ্যই দরকার। কেন দরকার, কি জন্য লিখতে হবে- এমন প্রশ্ন অনেক তাত্ত্বিক ও পন্ডিত সমাজ করতে পারেন। এর উত্তর দেয়া এ মুহূর্তে আমার বিষয় নয়। আমরা প্রায়শ সগর্বে উচ্চারণ করে থাকি- হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে। মুখে-মুখে আমরা হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়ে কথা বলি কিন্তু প্রকৃতঅর্থে হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক সীমিত। আমরা বাঙালি জাতিসত্তা নিয়ে কথা বললে শুরু করি '৪৭, '৫২ এবং '৭১ সাল কেন্দ্রিক। অথচ বাঙালি ভাষা-ভাষী এ অঞ্চলের মানুষ হাজার বছরের ইতিহাস লালন করে চলেছে। তাই কোন নিউক্লিয়াস সেলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাঙালি জাতির প্রকৃত উৎপত্তি ও সভ্যতার আদি বিন্যাস শনাক্ত করার জন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং যে সকল দালিলিক গ্রন্থ বাঙালি পাঠককুলে উপহার দিয়েছেন তা এক বিস্ময়কর হিরকখন্ড। যা প্রতিনিয়ত ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকণা বিকিয়ে চলেছে।

'বঙ্গ ভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বাংলা ও বাঙালি মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' এই তিনটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করলে অনুরূপ তিনটি গ্রন্থ রচনা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। গ্রন্থ তিনটির নামই বলে দিচ্ছে এগুলো শুধু ৩৬ বছরের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি বরং গ্রন্থগুলো বাঙালি জাতিসত্তার মূল শেকড়ে প্রবেশ করে প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে বৃহত্তর পাঠক পরিসরে উপস্থিত হয়েছে। এখানেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্য রূপ ফুটে উঠেছে। একজন ইতিহাস গবেষক শুধুমাত্র নিকট-অতীত নিয়েই মেতে রইবেন, এমন আশা করা ও প্রত্যাশা করা যথার্থ নয়। ইতিহাস গবেষক শুধু খুঁড়তে থাকবেন। খুঁড়তে খুঁড়তে শাবল, গাঁইতি ভেঙে ফেলবেন। তারপরও তাঁর চোখ থাকবে অতলে। আরও গভীরে কোন্ সে ইতিহাস লুকায়িত তা টেনে তোলাই একজন ইতিহাস গবেষকের মূল কাজ। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সঠিক পথেই গেছেন। যে দলিল উপহার দিয়েছেন তা কালের মানদন্ড ছাড়িয়ে মহাকালের আঙিনায় পৌছে যাবে-একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের চিন্তার প্রখরতা ও দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এ লেখায় না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মান্নান তিনটি গ্রন্থের যে বিষয়েই হাত দিয়েছেন, সেখানে প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাসই শুধু উদঘাটন করে ক্ষান্ত হননি, বরং মান্নান ঘটনার অন্তরালে যে সব ঘটনা, অনুঘটনা, প্রতিঘটনা লুকায়িত আছে তা সাবলিল ভাষা বুননে পরিষ্কার করেছেন। এখানেই মান্নানের মাহাত্ম্য, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রসঙ্গে আমি এ পর্যায়ে শেষ অংশে পৌছে গেছি। বিস্ময় ও অবাক লাগে, একজন স্বনামধন্য ব্যাংকার কিভাবে ইতিহাসের মত কঠিন ও বন্ধুর পথে সাবলিল-ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন? তাঁর রচনা ও গবেষণা পাঠে কখনো মনেই হয় না, আমি কোনো ব্যস্ততম ব্যাংকারের লেখা পাঠ করছি। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত। আমরা এই মহৎ মানুষটির হাত ধরে আরো অনেক অজানা ইতিহাসের স্বাদ গ্রহণ করতে চাই। ইতিহাসের সেই সব গলি-ঘুপচি যেখানকার অন্ধকারময় দিকগুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন অনেক গবেষক, যা পাঠে নতুন প্রজন্ম অনেকেই বিভ্রান্ত ও ভুল তথ্যের

www.pathagar.com

ইন্দ্রজালে আটকে গেছেন। শুরু হয়েছে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের ফলে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিতে আমরা যেখানটায় অবস্থান করছি তা সভ্যতার সংকট না বিকৃত ইতিহাসের বিষফল বলা যাবে তা সমাজ বিশ্লেষকরাই ভালো বলতে পারবেন। যদি প্রকৃত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির খবরা-খবর সঠিক মাত্রায় প্রকাশিত না হয় তা হলে জাতি হিসেবে আমরা একদিন কানা, খোঁড়া, লেংড়া জাতিতে পরিণত হব। প্রাচীন ইতিহাস পাঠে এমন তথ্যই পাওয়া যায়। প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে জাতির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সত্য ইতিহাস গবেষকের। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সেই ঘরানার সফল ব্যক্তিত্ব বলেই আমি মনে করি। আমি তার সত্য, সুন্দর ও নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

জাতীয় অধ্যাপক আলী আহসানের সাথে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

ঐতিহ্য চেতনার নির্মাতা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

শাহজাহান মহিউদ্দিন

শেকড় সন্ধানী ইতিহাস গবেষক শ্রদ্ধেয় জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান- এর এ যাবতকালের গবেষণা কাজের স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছে সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার নামের একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। তাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য-এই গুণী মানুষটির তিন দশকের গবেষণাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। প্রায় নিরবে-নিভৃতে প্রচার অন্তরালে প্রজন্মের প্রত্যন্ত প্রয়োজনে গবেষণার যে ভিত তৈরি করে চলেছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-তাকে আলোকিত করবে এই আয়োজন।

আমাদের দেশে সত্যিকার গুণী মানুষের কদর নেই; এই অভিযোগ পুরোনো। প্রচার মাধ্যমের চোখে সাধারণত খুঁজে ফেরে স্বার্থের ইঙ্গিত। সুযোগ সন্ধানী মহলে প্রতাপ ও প্রভাব প্রায়শই ঢাকা পড়ে অকৃত্রিম প্রতিভা। সম্মাননা আর উপঢৌকনের চলমান ধারা আমাদেরকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় ফেরদৌসির ভিখ্যাত কফিন যাত্রার কথা।

গজনীর সুলতানের নির্দেশে সমগ্র যৌবনকাল ধরে মহাকাব্য 'শাহনামা' নির্মাণ করে প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মানী থেকে বঞ্চিত হন মহাকবি ফেরদৌসী। অনেক পরে সুলতান মাহমুদ গজনীর নির্দেশে স্বীকৃতি ও সম্মানীর জৌলুশ ভরা উপঢৌকনের বহর যখন প্রবেশ করে ফেরদৌসীর ধুসর গ্রামে অপ্রাপ্তি ও অবজ্ঞার সাদা কাফন জড়ানো ফেরদৌসীকে তখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গোরস্তানের উদ্দেশ্যে।

কীর্তিমান মানুষদের কালোত্তীর্ণ কীর্তির সত্যিকার ও যথাযোগ্য প্রতিদান দেয়ার সাধ্য আজো আমাদের আছে কি ? নেই। সে জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা উন্নত ও নিখুঁত ব্যবস্থা রেখেছেন অনন্ত পরপারে। কিন্তু আমরা তাঁর অবদানের সাক্ষ্য দিতে পারি যা গুণী মানুষটিকে আপন সৃষ্টিশীলতার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী করবে, নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হবেন তিনি, গতিমান হবে তার কলম।
এক্ষেত্রে সেন্টার যার বাংলাদেশ কালচার এগিয়ে এসেছে অতীত-বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে গ্লানিমুক্ত করতে। একটি সত্যিকার নির্ভেজাল সাধনার কথা মানুষকে জানাতে। আয়োজকদের আমার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'র মাধ্যমে এই গুণী মানুষটির সাথে আমার পরিচয়; অনেকটা কাকতালীয়ভাবে। রিয়াদে আমার এক বন্ধুর সংগ্রহ থেকে নিয়ে বইটি আমি কয়েকবার পড়ি। বইটি পড়ার পর আমার বার বার মনে হচ্ছিল ঠিক এ রকম একটি বই ইতিহাসবিমুখ আমার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ বইটি ইতিহাসের বিশাল দিগন্ত ও আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়কে একনজরে আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছিল। তখনও আমি কল্পনাও করতে পারিনি এই অসাধারণ বইটির স্বয়ং রচয়িতাকে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের মাঝে রিয়াদে।

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই হলো। ইসলামী ব্যাংকের মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিনিধির দায়িত্ব নিয়ে তিনি রিয়াদে আসলেন এবং আলোকিত করলেন আমাদের প্রায় নিস্প্রাণ পরিবেশকে। আমি সুযোগ পেলাম তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার, তার কমিটমেন্টকে জানার। অল্প ক'দিনের মধ্যেই তিনি আপন করে নিলেন রিয়াদ কমিউনিটির সংস্কৃতিবান অগ্রসর চিন্তার অনেক মানুষকে। লিটল ম্যাগাজিন, আলোচনা সভা, সেমিনারসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে জেগে উঠল মরুবেষ্টিত এই শহরের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গন।

www.pathagar.com

আমার মতো অনেকেই ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম "বাংলা ও বাঙালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা"র সাথে। পরিচিতি হলাম তার অসংকীর্ণ চিন্তাধারা ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথেও।

তিনি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে শুরু করে ছিলেন সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর। বৃহস্পতিবার রাত একটায় শুরু হতো সেই আসর। রাত ১২টা অবধি আপন কর্মস্থলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনেকেই ছুটে যেতেন সেই আসরে। আমি এখনো ভেবে স্তম্ভিত হই, কীভাবে তিনি কিছু আনকোরা মানুষকে সাহিত্য ও চিন্তাশীলতার অপ্রতিরোধ্য অনুরাগে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমি প্রায় ৪ বছর তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তার মন ও মানসকে কাছ থেকে যতটুকু দেখেছি তাতে আমার দৃষ্টিতে তার সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম হল তার কমিটমেন্ট। চিন্তা ও গবেষণার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে। ঐতিহ্য বিচ্যুত, ইতিহাস বিস্মৃত, হতাশা বেষ্টিত এই জাতির সোনালী অতীতকে সামনে এনে প্রজন্মের ঘুম ভাঙ্গানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। আমাদের জাতির বেড়ে উঠার সংগ্রামী সোপানগুলোকে নিরাবেগ, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বাছ-বিচর করে নতুন প্রজন্মের হাতে ইতিহাসের গৌরব মশাল তুলে দেয়ার দায়িত্ব জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মতো সাহসী কমিটেড মানুষেরাই কেবল নিতে পারেন।

অত্যন্ত বড় মাপের উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয় বিশ্লেষণের চারিত্র্য আমি তাঁর মাঝে দেখেছি। অতীতে অথবা সমকালে ইতিহাস চর্চার গতানুগতিক ধারা-গুলি আবর্তিত হয়েছে মূলত রাজরাজড়া অথবা শাসকশ্রেণীর জীবনাচারকে কেন্দ্র করে। কিন্তু জনাব মান্নান "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" কিংবা "বঙ্গ ভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" এ বিষয়-জনপদের শোষিত-বঞ্চিত মাটি ও মানুষের সংগ্রাম কাহিনীকেই ইতিহাসের চত্বরে জড়ো করার চেষ্টা করেছেন।

গতানুগতিক ইতিহাসের অন্তরালে থাকা, শাসক-বান্ধব ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি উপেক্ষিত জনপদ-জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামকেই তিনি আগ্রহ ভরে ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর ইতিহাস গবেষণার মূল প্রচ্ছদে। আমার দৃষ্টিতে এটিই জনাব মান্নানের ইতিহাস-ঐতিহ্য গবেষণার মূল ব্যতিক্রম।

তিনি ক্রমাগত লিখে চলেছেন সংগ্রামের অনবদ্য গাঁথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর এই ব্যতিক্রমী সাধনা আমাদের বর্তমান-ভবিষ্যত প্রজন্মকে "মনস্তাত্ত্বিক দুঃখবোধ"-এর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে ঐতিহ্যের অম্লান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবেই।

www.pathagar.com

বাঙালীর ইতিহাস চেতনার সংকট মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাধনা

জামালউদ্দিন বারী

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে যারা বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে 'নহিলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না' বলে মন্তব্য করেছিলেন, তারা ও তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির লোকেরা বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন বটে, তা এই ভাটি বাংলার মানুষের প্রকৃত ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগেই ১৯৭১ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে মরহুম সাহিত্যিক আহমদ ছফা প্রমথ চৌধুরীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, 'বাঙ্গালী গড়ে উঠেনি, ঢালাই হয়েছে'। এই ঢালাই হওয়া বাঙ্গালীরা রাজশক্তি বা ঔপনিবেশিক শাসকদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত অংশ। রাজশক্তির আনুকূল্যপ্রাপ্ত বাঙ্গালীরা নিজ সম্প্রদায়ের শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে লাবণ্য সঞ্চার করতে সক্ষম হলেও তাঁরা এই অনগ্রসর ও কৃষিভিত্তিক বাঙ্গালী সমাজের মানসচেতনা, স্বপ্ন ও বাস্তবতার চিত্র আঁকতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি ঔপনিবেশিক শাসকদের ভেদ বুদ্ধির শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়া ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীরা জনগোষ্ঠির অগ্রযাত্রার পথকে রুদ্ধ করার মাধ্যমে কায়েমি স্বার্থবাদিতার প্রতি ছিল তাদের পূর্ণ মনোযোগ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরের অর্ধ শতাব্দীকালে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের বৈষম্য ও বঞ্চনার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বিশাল অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করার জন্যই বৃটিশরা ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করার ফলে এই বাংলার পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর সমাজে যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল তাতে বাধ সাধল কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ও কায়েমী স্বার্থবাদি শ্রেণী। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি গত এক শতাব্দীর মধ্যে আমাদের ইতিহাসে সঠিক আলোক প্রক্ষেপণ ঘটেনি। আমাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আগ্রাসন পরিচালনার পাশাপাশি আমাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস চেতনার মূল্যবান গ্রন্থিগুলো অন্ধকার রাখতেই যেন একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন এ দেশেরই এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের উত্তরাধিকারের ধারাক্রমকে জনগণের চেতনার মধ্যে শক্ত ভিত্তি নির্মাণের জন্য আমাদের আত্মঅন্বেষণ ও শেকড় সন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি অনেক দেরিতে হলেও এখন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে। এ জন্য আমাদেরকে আরো অনেক বেশী কাজ করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সাহিত্য, কৃষ্টি ও মননশীলতায় ইতিহাসের সেই রসদ মেলে ধরার কাজটি যতটা ব্যপ্ত হতে পারতো তা' হয়নি বলেই তার গতি ও বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। বিশেষত আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিভূমি নির্মাণে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, তা ঐতিহাসিক ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের দায়িত্ব আমাদের সরকার, শিক্ষাব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশপ্রেম ও ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে কেউ কেউ ইতিহাসের উপর কিছু মূল্যবান কাজ-কর্ম করেছেন। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহাসিকপরম্পরা সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একটি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ আলো প্রক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিকাশ, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভ করা অনেক সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। মোহাম্মদ আবদুল

www.pathagar.com

মান্নান ইতিহাসের সাধারণ পাঠক, শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে সেই কঠিন কাজটিকে মাত্র তিন শতাধিক পৃষ্ঠার বইয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

একটি নিউক্লিয়াস জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আটান্ন হাজার বর্গমাইলের এই স্বাধীন ভূ-খন্ডের মানুষ একটি অভূতপূর্ব ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমাদের আজকের এই সংকটের কারণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে অনেকে অনেকভাবে বর্ণনা করলেও আসলে এটি আমাদের জনগণের রাজনৈতিক বোধ ও সংহতির সংকট। হাজার বছরের ঘটনাপরম্পরা ডিঙ্গিয়ে এই ভূ-খন্ডটির একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়ার ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের সেই একক রাজনৈতিক বোধ ও রাষ্ট্রীয় সংহতির মূলসূত্র নিহিত রয়েছে। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চা একটি ১৯৭১ কেন্দ্রিক চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার পটভূমি হিসেবে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপন করা হলেও এই ভূ-খন্ডের অনেক গর্বিত ইতিহাস এবং অনেক বঞ্চনার ঘটনাকেই পাশ কাটিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছেন বিশেষ রাজনীতি ও গোষ্ঠিপ্রীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে ভারতে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষি জনগণের সাথে অভিন্ন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে ওরা আমাদের চৈতন্যকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে চায়। উনিশ' একাত্তরে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা আমাদের জাতিসত্তার জন্য শ্রেষ্ঠতম অর্জন তাতে দ্বিমত করার কোন অবকাশ নেই। বিশ্বের প্রায় ২৮ কোটি বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে ১৫ কোটি মানুষের এটি একমাত্র স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। ঔপনিবেশিক আমলের সুবিধাভোগী অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ যখন তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারাতে বসেছে, বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্বে যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে চলেছে ঠিক তখনি আমাদের মধ্যে একটি অপ্রাসঙ্গিক বিভেদের দেয়াল তুলে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষি রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চলছে। ১৯৪৭-এর আগে যেমন ভারত ও পাকিস্তানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধেও তেমনি একটি অতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার পর একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান অথবা স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে অতীতের সকল ভেদাভেদ ভুলে একযোগে কাজ করার পরিবেশ তৈরীর প্রতি জোর দিয়েছিলেন। সীমিত সম্পদ এবং দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে তাঁদের সেই ভূমিকাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার সুযেগ নেই।

যে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রথম থেকেই বাংলার অপরাপর অংশ থেকে পূর্বাংশকে আলাদা করে দেখার ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তারই অনিবার্য পরিণতিতে ১৯০৫ সালে কলকাতার নিগড় থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক অগ্রযাত্রার স্বাভাবিক সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। তখন যারা বঙ্গমায়ের অঙ্গহানির বেদনায় কম্বিরাশ্রু বর্ষণ করে অবহেলিত পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখার জন্য বঙ্গভঙ্গ রদ করতে তুমূল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং ১৯১১ সালে বৃটিশ সম্রাজ্ঞীকে দিয়ে কথিত বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়েছিল, তারাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভাগ করতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে বাংলাকে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে ভারত ভাগ করা হলে বৃহৎ বাংলায় মুসলমানরাই হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অঙ্গিভূত করার পর থেকেই তা' পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে ভারতের ভ্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। তবে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমাদের জন্য অবিশ্যম্ভাবি করে তুলতে পাকিস্তানী শাসক ও রাজনীতিকদের অবিমৃশ্যকারিতাও কম দায়ী নয়। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভেদ-বিভাজন সৃষ্টি করার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়ণের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চলছে তা জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে যে মুসলিম বাংলার সূচনা হয়েছিল আমরা তারই

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার বহন করছি। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়েছিল, তাতে পূর্ব বাংলাই সবচে' বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯০৫ সালে ঢাকায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে সে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল তা' কি এখনো অব্যাহত আছে ? আজকের বাংলাদেশে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিকৃত ইতিহাস চর্চা এবং আমাদের সকল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে খন্ডিতভাবে ১৯৭১-এর প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড় করানোর মধ্য দিয়ে জাতির মধ্যে যে বিভাজনরেখা তৈরী করা হচ্ছে তা' আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তিভূমিকে নাড়া দিচ্ছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা না হলে এই বাংলাদেশ আরো অনেক আগেই শক্ত ভিত্তি লাভ করতো, শেকড় সন্ধানী বাংলাদেশীদের কাছে এই সত্য ধামাচাপা দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে এসব ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে হাজির করার কাজটি আমাদের লেখক ও গবেষকরা ঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আমরা আজ আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতি জাতিতে পরিণত হয়েছি। অনেক দেরীতে হলেও লেখক গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করার মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর লেখা 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঢাকা-কলাকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' গ্রন্থটি এ সময়ে আমাদের স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় চেতনার স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। গ্রন্থের নাম 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' হলেও মূলত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা, তার প্রেক্ষাপট, কলকাতা নগরীর গড়ে ওঠাসহ সিপাহী বিপ্লবের পর বাঙ্গালী মুসলমানের জাগরণ, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট পর্যন্ত বিস্তৃত। শত বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না'। বৃটিশদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত বাঙ্গালীরা শত বছর পূর্বে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও অনেক দুর্বল, অনেক প্রতিকূল বাংলাদেশের জন্য যে ইতিহাসের বারি সিঞ্চন করা প্রয়োজন, বইটিতে সে উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি এবং তার আঞ্চলিক দোসরদের ভূ-রাজনীতি, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে একটি বিভীষিকাময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তখন আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণকে আরো শক্ত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আমাদের প্রত্যাশা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বইটিতে উপস্থাপিত ম্যাসেজ দেশের কোটি মানুষের চেতনায় সম্পৃক্ত করার কাজটি করতে হবে আমাদের সকলকেই। আমি লেখক, গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সুস্থ ও কর্মময় সুদীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।

লেখক : কবি, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, সহকারী সম্পাদক- দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রজ্ঞা ও প্রার্থনায় ঋদ্ধপুরুষ

জাকির আবু জাফর

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তিনি ইতিহাসকে বাজিয়ে দেখেন। ইতিহাস বিবেচনা করেন এবং ইতিহাসকে বিশ্লেষণের আয়নায় স্বচ্ছ ও স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলেন। জীবনকে ইতিহাস দর্পণে দেখার কাংখা হয়তো তাকে ইতিহাস চর্চার দুর্লংঘ পথে টেনে এনেছে। এই পথ দুর্গম। কখনো কখনো দুঃসহও বটে।

পৃথিবীর সমস্ত কাহিনী ঘুমিয়ে আছে ইতিহাসের বুকে। এ ঘুমন্ত কাহিনীকে সাহসের চেতনায় জাগিয়ে তোলা সত্যিই কঠিন কাজ। শ্রম সাধনা ও সাধ্য এর সবটুকু পুঁজি দিতে হয় এই কর্মযজ্ঞের উন্নতির জন্য। সেই সাথে বিবেকের কঠিন নিরিখ রাখতে হয় সদা জাগ্রত। যারা জানেন ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্বাচন কতটা কষ্টসাধ্য বিষয়, তারা খানিকটা বিস্মিত হবেন বৈ কি। হ্যাঁ, ইতিহাস রপ্ত করা বিস্ময়কে সহজ করে তোলার মতই। তবুও মানুষ যেহেতু ইতিহাসের স্রষ্টা, সেহেতু মানুষই ইতিহাস লালন করে। মানুষই ধারণ করে। এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাসকে কালপ্রবাহ জাগিয়ে তোলে। যারা ইতিহাসের এই সত্যপ্রবাহ চলমান করেন, তাদেরই একজন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

একথা ভাবতে খুব আনন্দ লাগে এবং একই সাথে অবাক হই যে মান্নান ভাই ইতিহাস চর্চা করেন ইতিহাসকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ইতিহাসকে সত্যের ওপর দাঁড় করানোর মতো দুঃসাহস সবাই দেখাতে পারেন না। মান্নান ভাই সেই সাহস সঞ্চয় করেছেন বলে আনন্দ লাগে। কিন্তু এ দুরূহ কর্মটি তিনি অবলীলায় করেন বলে অবাক হই। এছাড়া তিনি তো শুধু গবেষণার আত্মজা নন। তার কর্মক্ষেত্র ব্যাংকিং পাড়া। ব্যাংকের নিরস বাতাসে শ্বাস নিয়ে কী করে তিনি ইতিহাস গবেষণার মতো কঠিন কাজের অক্সিজেন সংগ্রহ করেন-এটাই আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয়। অথচ তিনি তার কর্মক্ষেত্রেও একজন সফল মানুষ। একজন প্রশংসিত ও অভিনন্দিত উর্ধ্বতন ব্যাংকার হিসেবে সবার কাছে গ্রহণীয়। তবে ? তবে কথা একটাই, পৃথিবীতে যারা নতুন ইতিহাস গড়েন তাদের আয়োজনও নতুন করে করতে হয়। তারা সময়কে ব্যবহার করতে জানেন। অন্যরা সময়ের পেছনে দৌড়ান। আর সময় এইসব কীর্তিমানদের অনুসরণ করে। সময়কে হাতের তালুতে বেঁধে মহাকাল রচনা করেন, এখানেই সাধারণের সাথে গুণীজনদের ব্যবধান। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সময়কে নিজের করে তুলেছেন। সময় এসে তার কাছে ধরা দিয়েছে। তার অসাধ্য সাধন করার কাজে সময় যেনো নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

মানুষের জীবন মানেই সময়। সময়ই জীবন। যারা সময়ের অনুপুংখ ব্যবহার করেন তারা নিজেকেই ক্রমাগত আবিষ্কার করার কৌশল পেয়ে যান। তখন অসাধ্য কিংবা অসম্ভব শব্দটি ধীরে ধীরে তাদের অভিধান থেকে বাদ পড়ে যায়। কেবলই সাফল্যের সাধনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠার মতো সাহস তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সেই বিরলদের একজন। সাহস যার সাথী হয়ে উঠেছে। তিনি সাহসকে নিজের আস্তিনে বসত গড়ে দিয়েছেন। তাকে ছেড়ে আর সাহস যেতেই চায় না। ফলে জীবনে ক্রমাগত সাফল্য এসে তার অর্জনকে ভারী করে তুলছে। এবং তিনি আরো সাহসী হয়ে উঠছেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যারা সফল হয়েছেন তাদের সাফল্যের পেছনে গূঢ় রহস্য রয়েছে অবশ্যই। সেই গূঢ় রহস্যের নাম ক্রমাগত সাধনা। নিরবচ্ছিন্ন সাধনা সাধনা, এবং সাধনা। এই সাধনাই মানুষের সাধ্যকে সহজ করে তোলে। সাধনার সাথে অবশ্যই সততার যোগ থাকতে হয়। সততার নিরিখ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। যে সাধনার সঙ্গী হয় সততা তার বিজয় ঠেকিয়ে দেয়ার সাধ্য বোধ করি থাকে না কারো। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাধনায় সেই কঠিন সততা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। তিনি সততাকে সাধনার সংগী করে তুলেছেন। ফলে এক সাফল্যের পর আরেক সাফল্য এসে তার কাছে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে । কিংবা একটি সাফল্যের পর আরেকটি সাফল্যকে তিনিই টেনে নিয়েছেন আপন আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে।

মানুষ সাধারণত অতীতকে ধরেই বেঁচে থাকে। অতীত নিয়েই মানুষের অহংকার। অতীতই স্মৃতির আয়না ঘর হয়ে জ্বলে। কিন্তু বর্তমান? হ্যাঁ, বর্তমানে দাঁড়িয়েই মানুষ অতীতকে ডেকে আনে। তা হলে বর্তমান মানুষের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই সাথে বর্তমান পেরিয়েই যেতে হয় ভবিষ্যত নামক অধরা স্বপ্নের কাছে, যদিও যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলছি ঠিক তখনই তা অতিতে তলিয়ে যায়। তবে বর্তমানকে আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃত পক্ষে সময়ের স্থিরতা যেহেতু নেই, সে কারণে আমরা কোন কালকেই স্থায়ী বলে হাজির করতে পারি না। যেহেতু কাল অস্থির অথবা নিরন্তর বহমান, সেহেতু এর গুরুত্ব আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব মেনে নিয়েই বলি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অস্থির সময়কে খানিকটা তার করে স্থিরতায় জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার অতীতকে ঋদ্ধতায় সমৃদ্ধ করেছেন। আর বর্তমানকে করেছেন প্রাচুর্যময়। ফলে তার ভবিষ্যৎ সুন্দরের অহংকার বেজে উঠবে-এটা তো খুব সহজে অনুমান করা চলে।

যখন মানুষ মানবিক গুণাবলীর খানিকটা পূর্ণতা পায় বা একে আমরা বলি মানবিক গুণাবলী অর্জনে সমর্থ হয়, তখন তিনি প্রকৃতির উদারতা ও স্বচ্ছলতার ভাগীদার হয়ে যান। প্রকৃতির বিরাটত্ব মানুষের ভেতর জেগে ওঠে। নানা দিক থেকে প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দ বেড়ে উঠে মানুষের ভেতর। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে ভাবলে আমার কাছে সেই প্রকৃতির উদারতার কথা মনে বেজে উঠে। মনে হয়, তিনি সাবলীল সৌন্দর্যে প্রাণিত এক কর্মীপুরুষ। সদা জাগ্রত চোখ। নতুন কোনো দিগন্ত উন্মোচনের আকাংখায় সচল। নতুন কোনো রহস্যের সীমা ভাঙার কৌতূহলে উদ্দীপ্ত। কেবলই এগিয়ে চলা, কেবলই নতুন আঙিনার স্বপ্ন তাকে যেন থামতে বারন করছে। তিনি চলছেন এগিয়ে। এক-প্রান্তর থেকে আরেক-প্রান্তরে। এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায়। এ যেনো থেমে না যাওয়ার গল্প।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বোধ চেতনা ও প্রেরণার ভেতর নিজস্বতা আমাকে আকৃষ্ট করে। তিনি নিজের আলোয় পথ চলতে দ্বিধাহীন। নিজের বিশ্বাসকে উচ্চকিত করতেও অকুণ্ঠ।

যেহেতু তিনি ইতিহাসের সত্যকে সত্যের নিরিখে গ্রহণ করেন। বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব যৌক্তিকতা অবলম্বন করেন। একে আমরা বলি প্রজ্ঞা। মানুষের জীবনে প্রজ্ঞা এক বিরাট সম্পদ, প্রজ্ঞাবান মানুষই কেবল নতুন নতুন সম্ভাবনা জাগিয়ে দিতে পারেন। এই দুর্লভ গুণ প্রজ্ঞার অধিকারী আমাদের প্রিয় মান্নান ভাই। সব মানুষ একরকম হয়। কিন্তু তারাই ব্যতিক্রম, যারা প্রজ্ঞার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ব্যতিক্রমী একজন সফল মানুষ। তিনি তার চিন্তাকে নিজস্ব যুক্তিতে দৃঢ়তা দিতে সক্ষম। তার এই সক্ষমতাই তাকে আলাদা করে তুলেছে অন্যদের থেকে।

সমাজ নিয়ে, সমাজের স্থিতি-স্থবিরতা ও উন্নয়ন নিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের নিজস্ব ভাবনা আছে। সমাজের শেকড় তিনি তুলে আনেন ইতিহাসের ভেতর থেকে। সংস্কৃতি নিয়ে রয়েছে তার ঐশ্বর্যময় ভাবনা। সংস্কৃতির মৌলিক অনুষঙ্গ তার কাছে সুস্পষ্ট। তিনি সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেন বিশ্বাসের গভীর থেকে। ঐতিহ্যকে লালন করার সুদৃঢ় মানস তাকে জাতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বিষয়েও তার আলোকিত চিন্তার ফসল আমরা অনুভব করি। একইভাবে আন্তর্জাতিক বিরাটত্বেও তার ভাবনা উপস্থিত। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা এবং জয়-পরাজয়ের নানান কাহিনীকে মান্নান ভাই নিজস্ব বিবেচনায় হাজির করেন। এবং অতীতের এসব ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিয়ে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার সাহসে তিনি ঋদ্ধ।

সাহিত্যের আনন্দ আছে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মানসে। সাহিত্য আনন্দ মানুষকে সীমা ভাঙ্গার সাহস যোগায়। খন্ডিত জীবনকে অখন্ড ঔদার্যে সমৃদ্ধ করে খুলে দেয় নিবিড় আনন্দের গোপন জানালা। সাহিত্য মন কখনো হতাশায় ক্লান্ত হয় না। জ্বরা-জীর্ণতায় কলুষিত হয় না। সংকীর্ণতার চোরাবালিতে ডোবে না। মূলত সাহিত্য মানুষের

www.pathagar.com

জীবন রহস্যের গোপন তত্ত্ব খুলে দেয়। মান্নান ভাই সাহিত্যের সেই তত্ত্বের একজন সমঝদার এবং লালনকারীদেরই একজন।

সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষমতাও মান্নান ভাইকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। কোনো ঘটনার পূর্বাপর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অনুপুঙ্খ অনুধাবন করা খুব সহজ কোনো বিষয় নয়। এমন কঠিন বিষয়কে সহজ করে নেয়ার ক্ষেত্রে মান্নান ভাই পারঙ্গম হয়েছেন। এটাও কম আনন্দের নয়।

আবেগ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। কিন্তু শুধু আবেগ কাজের সাফল্যের ধারাবাহিকতা যোজন করতে পারে না। তা হলে ? হ্যাঁ, তা হলে দরকার আবেগ ও সাধনার যোগাশ্রয়। সেই সাথে দৃষ্টির বৈভব। মূলত দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে তোলে। জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস এক বড় বিষয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আবেগের সাথে সাধনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

সেই সাথে জীবনকে দেখার দৃষ্টিকে করেছেন একান্ত নিজের। যারা জানে জীবনকে কিভাবে সাজাতে হয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাদেরই একজন। তিনি তিলে তিলে অনুভব করেন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ। জীবন একটিই। এক জীবনে কতটা রহস্যের দেয়াল ভেদ করা যায় তার নীরিক্ষা তিনি প্রতিনিয়ত চালিয়েছেন। অনবরত চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনো জীবনকে জীবনের মতো করে গড়ে তোলার এ প্রয়াস তাকে অনন্যতা দিয়েছে। তিনি প্রার্থনাকে প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আমরা যারা একই সময়ে পৃথিবীকে আস্বাদন করছি আমরা জানি, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার খবর। এখানে কেউ কারো সাফল্যের আকাশ নির্মাণ করে দেয় না। কেউ কারো ব্যর্থতার গ্লানিও বহন করে না। একাকীই নির্মাণ করতে হয় নিজের পৃথিবী। জীবনের পথ বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ। প্রতিটি মুহূর্ত এখানে নতুন হয়ে বাজে। এক পৃথিবীতে বসত করেও প্রতিটি মানুষ আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা। যে যার মতো গড়ে তোলে তার নিজস্ব জগৎ। নিজের পৃথিবী নিজেকে সাজিয়ে নেবার এক দুর্মর বাসনা থাকে কারো কারো। সে বাসনা থেকে বেড়ে ওঠে আপন জগৎ। একান্ত আপন জগৎ নির্মাণের কৌশলও নিজেকে আবিষ্কার করতে হয়। মান্নান ভাই সেই কৌশলী শিল্পীদেরই একজন। কাজই মানুষের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। কাজই মানুষকে পরখ করার মাধ্যম। যারা কাজ রেখে গলাবাজি ঘৃণ্যতা রপ্ত করেন, মান্নান ভাই তাদের বিরুদ্ধে বরাবরই শাণিত বক্তব্য হাজির করেছেন। কাজের প্রতি নিষ্ঠ, দায়িত্বশীলতা এবং বিশ্বস্ততা তাকে এগিয়ে দিয়েছে তার সাফল্যের আজকের এই কেন্দ্রে। মান্নান ভাইকে যতদূর দেখি, তিনি একজন প্রশান্ত আত্মার মানুষ। তার চেহারায় তৃপ্তির সৌন্দর্য উদ্ভাসিত। সাংস্কৃতিক চেতনার উজ্জ্বলতা আছে। রুচির বহিঃপ্রকাশ আছে চলনে-বলনে। সবকিছু মিলে একজন আধুনিক মানুষ সরল আছেন মান্নান ভাইয়ের গভীরে। মান্নান ভাইয়ের স্নেহসিক্ত হতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাগ্যবান। আমার সাহিত্য সাধনা বিশেষ করে কবিতার প্রতি মান্নান ভাইয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আন্তরিক প্রশংসা আমাকে দারুণ উজ্জীবিত করে। আমি জানি, গুণসম্পন্ন মানুষই গুণের সমর্থন যোগায়। মান্নান ভাই সেই বিরল গুণীজনদের অন্যতম যিনি ভালোকে ভালো বলতে সামান্য দ্বিধাও করেন না। সুন্দরকে গ্রহণ করতে ন্যূনতম কার্পণ্যও নেই। এই আনন্দ আমি নানাভাবে প্রকাশ করি। এখনো করছি। লিখেই করছি।

বাংলাদেশকে যারা আত্মার সাথে মিলিয়ে ভালোবাসার মালা পরাতে সদা তৎপর মান্নান ভাইকে আমি তাদের মধ্যে বেশ উজ্জ্বল রূপে দেখতে পাই। তিনি তার মাতৃভূমির প্রশান্তি পরিবেশের লক্ষ্যে আজীবন লড়াই করে চলেছেন। তার জাতির প্রতিও রয়েছে তার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যম করার সংগ্রামীদের একজন তিনি। তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বাসা বেঁধেছে। আমি বরাবরই তার সাফল্যের পক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে তৃপ্ত হই। গর্ববোধ করি, মান্নান ভাই- আমাদেরই ভাই।

লেখক : কবি, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সম্পাদক-দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

ভাই আবদুল মান্নানের সংবর্ধনায় কতিপয় নিবেদন

মোঃ জহিরুল ইসলাম এফসিএ

ভাই আবদুল মান্নান-এর সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থে কিছু লিখতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এখন মনে পড়ছে না, কোথায় তার সাথে প্রথম দেখা হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে সংগ্রামের সাংবাদিক হিসাবে তার সংগে প্রথম মতবিনিময়। সে পাঠক থেকে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তরিকতার উত্থান। তার সাংবাদিকতা পেশার বড় আর একটি দান হচ্ছে এ পেশা তাকে সমাজতন্ত্রবাদী ইতিহাসবিদ বানিয়েছে। লেখক হিসাবে তার যে প্রতিভার স্ফূরণ আমরা লক্ষ্য করি, আমার মনে হয় তার সুদীর্ঘ সাংবাদিক জীবন তিলে তিলে তাকে তৈরী করেছে লেখক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে।

একজন সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি অসামান্য দায়িত্ব বোধ তাকে নিঃসন্দেহে অনন্যতা দান করেছে। স্বদেশের মানুষের দুঃখ-বেদনা ও হাসি-কান্নার চাল-চিত্র তিনি কোন ঔপন্যাসিকের মত উপস্থাপন করেননি। বরং তাদের দুঃখ-দৈন্যের শিকড় অন্বেষণ এবং সোনালী অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, সোনালী আগামীর স্বপ্ন দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। শিশুতোষ রচনা 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' বইটির প্রসংগ এসে যায়। এই বইটিতে তিনি শিশুদেরকে বাংলাদেশের বিশেষ করে মুসলমানদের সোনালী অতীতের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের সোনালী ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কবি ফররুখের সংগে দেখা হলেই বলতেন, তোমাদের একতাও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন খেয়াল দাও ওদের প্রতি সকলে। ওরা যেন নষ্ট না হয়। কবি ফররুখের মত লেখকের সামাজিক দায়িত্ব পালনে তিনি অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেছিলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসোবে। যেহেতু তিনি ছিলেন সাংবাদিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে তার সফল হওয়ারই কথা। কিন্তু পরবর্তীতে জেনারেল ব্যাংকিং-এ এসেও তিনি তার প্রশাসনিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন এবং অসাধারণ কর্মতৎপরতায় দেশের একটা প্রথম শ্রেণীর ব্যাংকে তিনি প্রায় সর্বোচ্চ পদে সমাসীন। বস্তুত ৈটিডদডটফ ঈটভপধভথ-তার সাফল্য সত্যই অবাক হওয়ার মত। সম্ভবত তার বিনয়, সদালাপচারিতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সেবামূলক মনোভাব ও আচরণ ব্যাংকের মত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তাকে সাফল্যের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু লেখক হিসাবে এখানেও তার সাফল্য সত্যিই ঈর্ষণীয়।

তার ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নামক রচনাটি এর উত্তম স্বাক্ষর। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাংগঠনিক কমমন্ত্র এবং কর্ম বর্ণনার পাশাপাশি তিনি ব্যাংকিং-এর পশ্চাত ইতিহাস, সূদ, যাকাত প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় গবেষণার আকারে উপস্থাপন করেছেন। এ জন্য বহটি ৈটিডদধডটফ ব্যাংকার ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকর্মী এবং সাধারণ পাঠক সবার কাছে গ্রহণীয় হয়েছে বলে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস।

আবদুল মান্নান ভাই-এর লেখক জীবন শুরু হয়েছিল একটি খ্যাতিমান বই ভন ডেরহাম-এর ৈটিধযন্ত্র টভঢ গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। সন্দেহ নেই, এ গ্রন্থটির অনুবাদের ফলে তিনি ইসলামের আলোকে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি রপ্ত করেছেন এবং তার রচনাবলীতে স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

সমাজ-ইতিহাস চর্চায় তার পদ্ধতি অনেকটা ইবনে খালদুনের মত। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে রাজরাজড়ার কাহিনী হিসাবে না দেখে তাকে উপস্থাপন করেছেন দেশ ও জনগণের সামাজিক রূপান্তরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ভাই আবদুল মান্নানের ইতিহাস চর্চা আসলে সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস হিসাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'বাংলা ও বাঙালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' প্রভৃতি গবেষণাকর্ম আসলে তার রচনাবলীর এ অনন্য ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকে তাঁর সম্মাননায় আমি মনে করি দেশের একজন যোগ্য সন্তানকে যোগ্য সম্মাননা দেয়া হচ্ছে এবং এ কার্যাবলীর সংগে জড়িত সকলে এমন ভাল কাজ করছেন- সন্দেহ নেই।

আমি আশা করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ পাক ভাই আবদুল মান্নানকে দীর্ঘজীবন দান করুন এবং এ দীর্ঘ জীবনের তাঁর শাণিত ও পরিক্ষিত রচনার দ্বারা দেশের জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে বেঁচে থাকা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা নতুন নতুন দিগন্তও উন্মোচিত করুন।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, সহ-সভাপতি, বিআইআইটিএ

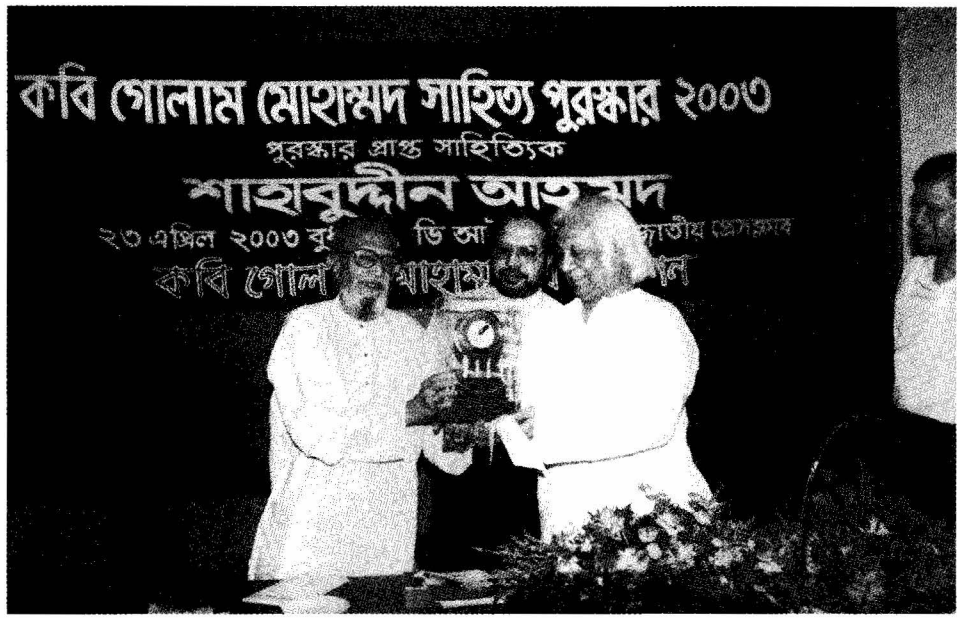

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদকে কবি গোলাম মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন
সাহিত্য পুরস্কার ২০০৩ তুলে দিচ্ছেন কবি আল মাহমুদ। মাঝে ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

কু পেশায় যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ঘর্মাক্ত, কর্মচঞ্চল মুখচ্ছবি ভেসে উঠে তার সাথে ইতিহাস সন্ধানী স্থির চিত্ত অসীম ধৈর্য্যশীল পাঠক ও লেখক আবদুল মান্নানের চারিত্রিক সাযুজ্য সত্যিই বিস্ময়কর। সেই ছবিটি যখন বাংলাদেশের ব্যস্ততম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নির্বাহীর সাথে কল্পনা করা হয় তখন তা খুবই বেমানানই হওয়ার কথা। কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ তিন চরিত্রকেই তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বে ধারণ করেছেন। এই অসাধ্য সাধনের জন্যই তিনি হয়তো এত অসাধারণ জনপ্রিয়। আমি তাঁর অতি ক্ষুদ্রতম একজন শিষ্য মাত্র।

'বাংলা ও বাঙ্গালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'-এই বইটির মাধ্যমে প্রথম আমার পরোক্ষ পরিচয় ঘটে লেখক মান্নান ভাইয়ের সাথে। ১৯৯২ সাল, তখন আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিরাজুল হক স্যার ক্লাসে একটি এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন- শিরোণাম ছিল "উপমহাদেশের আন্দোলন সংগ্রামে মুসলিম নেতৃত্ব"। সবচাইতে প্রবীণ ও সিনিয়র প্রফেসর হওয়ার কারণে স্যারকে সবাই খুব সম্মান করতো, আবার বেশ ভয়ও পেতো। তিনি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ব্যক্তিগত সংস্পর্শ পেয়েছিলেন এবং তাঁর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন বলে তাঁকে আমরা 'কায়েদে আযম' বলেই অভিহিত করতাম।

স্যারের, সেই এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করতে গিয়েই "বাংলা ও বাঙ্গালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা"- আমার পড়া এবং আমাদের ইতিহাসকে এত প্রাণবন্তভাবে অনুভব করা। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিহাসের প্রতি একটা স্বভাবগত অনীহা অনেকের মতো আমারো ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দিগদর্শন আমার মধ্যে এক অন্যরকম অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। সেই থেকে ইতিহাসের পাঠ আর পথের সন্ধান পেলে অন্তরাত্মায় যে নিবিড় অনুভবের দোলা লাগে তা স্পষ্ট টের পাই। তাই মান্নান ভাই আক্ষরিক ও বাস্তব অর্থেই আমার গুরু।

সম্ভবত ২০০১ সালে মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। মনে পড়ে, শ্রদ্ধেয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের এক সভায় শ্বেত শুভ্র একজনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন- আমাদের ইতিহাসের ওস্তাদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ভাই। কিছুটা অর্বাচীনের মত আমি শব্দ করে প্রশ্ন করেছিলাম- ইনিই সেই আবদুল মান্নান? আমার সারল্য দেখে সেদিন

শেকড় খোঁজার সংগ্রাম

মজিবুর রহমান মন্‌জু

বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লীর নাম বাজবী। সে গাঁয়েরই ছায়া ঘেরা বাগান বাড়ীর সবুজ আচ্ছাদন ধুসর মাটি ঢেকে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসার বন্ধন দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি একজনকে, তিনি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। আধুনিকতার স্পর্শে ঢাকা যখন নতুন আঙ্গিকে জাগতে শুরু করেছে তখনই তরুণ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঢাকায় পা রখেন।

শীতলক্ষ্যার ঢেউ খেলে যাওয়া জলরাশির মত মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জীবনও ছন্দ আর তরঙ্গের তালে তালে এগিয়ে গেছে। শৈশব-কৈশোরের নিটোল সারল্য ছিল তাঁর অহংকার। মানুষের অবয়ব সূত্রে পাওয়া আদর্শ আর রাজনৈতিক সচেতনতার বীজ তাঁকে এক অনিবার্য সংগ্রামী মানুষের অবয়ব এনে দিয়েছে। সাংবাদিকতার লড়া

www.pathagar.com

কেউ কেউ মুচকি হেসেও ছিলেন। মান্নান ভাইয়ের কাছে আমার লাজুক অভিব্যক্তি হয় তো পছন্দ হয়েছিল। তিনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন- আমি মতিঝিলে বসি, আসবেন। আমাদের স্বপ্নের পতাকা আপনাদেরকেই বহন করতে হবে। সেই থেকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা ছুতায় কতবার যে মান্নান ভাইয়ের সংস্পর্শে গিয়েছি তার হিসেব নেই।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' পড়তে গিয়ে আমি বারবার আপ্লুত হয়েছি। একদিন মান্নান ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- আপনি এত পড়া ও লেখার সময় পান কোত্থেকে ? তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন- "দায়িত্ব থেকে"। "বাংলার মুসলিম নবজাগরণ" এবং "মুসলিম রাজনীতিতে নবচেতনা" নামে স্বল্প কথায় তিনি যে ম্যাসেজ তাঁর জাতিসত্তার বিকাশধারায় দিয়েছেন আমি মনে করি আজকের বাংলাদেশ এই তাত্ত্বিক চেতনার উপর পথ চলতে পারলেই সফল এবং সুসংহত হবে।

মান্নান ভাই এখনো আমাদের সামনে দীপ্যমান। আমি, আমরা, এই দেশ ও মানবমন্ডলী তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক প্রাপ্তির মুখাপেক্ষী। নিষ্ঠুর বাস্তবতা এড়িয়ে তিনি আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।
কালের এ অধ্যায়ে তাঁর স্মৃতিচারণ কি মানানসই ? বেমানান হলেও কিছু স্মৃতির ব্যঞ্জনা পরিবেশনের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যদি আবার কখনো সময় বা সুযোগ না পাই- এ শংকা তো আছেই।

বছর ২/৩ আগের কথা। ঢাকা মহানগর যুব কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় বড় আকারের সীরাতুন্নবী (সাঃ) যুব র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শহীদ ফারুকী ভাইসহ মান্নান ভাইয়ের অফিসে গিয়েছিলাম কিছু পরামর্শ এবং সহযোগিতার জন্য। তিনি ব্যাংকের বড় দু'জন ক্লায়েন্টের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সে অবস্থাতেই তিনি আমাদের বসালেন এবং দু'জন বড় ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তাঁর ব্যস্ততা দেখে আমি খুব সংকোচ বোধ করছিলাম। কাজের মধ্যেই আমাদের অনেক কথা হলো। নানা আলোচনার সূত্র ধরে আমি ছাত্র জীবনের একটি স্মৃতিময় ঘটনা তুলে ধরলাম। কি আশ্চর্য ! ঘটনার বর্ণনা শেষ হতেই মান্নান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত। এত বড় একজন মানুষ! অথচ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী পথের যে কন্টকময় চিত্র তার প্রতি এখনো কত দরদ, নিখাদ-নির্মল অনুভূতি! আমরা যখন ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাদের হাতে একটি প্যাকেট তুলে দিলেন। সে প্যাকেটে এত পরিমাণ অর্থ ছিল যা আমাদের প্রত্যাশার চাইতে অনেক অনেক বেশী। মান্নান ভাইকে সেদিন আবার নতুন করে চেনা হল।

মান্নান ভাইকে নিয়ে একটি মজার অভিজ্ঞতা হল। যখনই তাঁর কাছে কোন প্রয়োজনে যাই- তিনি প্রথমেই বলবেন আমার একদম সময় নেই, বড়জোর দুই মিনিট বরাদ্দ আপনার জন্য। কিন্তু কথা শুরু করলে কখন যে ঘন্টা পার হয়ে যায় তিনি নিজেও টের পান না। আর আমরা যারা তাঁর জ্ঞানের স্পর্শে আলোকিত হবার সুযোগ পাই, তাদের ইচ্ছে হয় ঘড়ির কাঁটাটা যদি একটু কম ঘুরতো কতই না ভালো হত।

২০০৬ সালে 'বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন' উপলক্ষে ঢাকায় যে ঐতিহাসিক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় সে র‍্যালীর পুরো পরিকল্পনা ও সাজ-সজ্জা'র দায়িত্ব মান্নান ভাই আমার উপর অর্পণ করেন, যা আমার জন্য কষ্টকর হলেও খুব আনন্দের একটি ব্যাপার ছিল। এরপর জাতীয় নাগরিক ফোরামেও তিনি আমাকে সম্পৃক্ত করেন। মান্নান ভাইয়ের মত একজন বরেণ্য ব্যক্তির স্নেহছায়া ও নির্ভরতা আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম (আই. আই. ইউ. সি')-তে বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে আমাকে একটি কোর্স পড়াতে হয়। মূলত এ কোর্সের একাডেমিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে মান্নান ভাইয়ের "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা" বই-এর উপর ভিত্তি করেই।

"বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" নামে ২০০৭ সালে মান্নান ভাইয়ের যে অসাধারণ বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধে বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ- মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে "আমাদের জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠক ও পুনরাবিষ্কারক" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, কবি আল মাহমুদ-এর এই মূল্যায়ন একদিন জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হবে। মান্নান ভাই আমাদের মাঝে ইতিহাসের যে অমূল্য আত্মোপলব্ধি উপস্থাপন করেছেন তা থেকেই আগামী প্রজন্ম নতুন পথের মানচিত্র তৈরী করবে।

www.pathagar.com

বাবা আদম শহীদ-এর দাওয়াতী চরিত্র এবং বখতিয়ার খিলজীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সমন্বিত করে বাংলায় ইসলাম বিস্তারের যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিক ইংগিত মান্নান ভাই বিশ্লেষণ করেছেন তার জন্য ইতিহাস অনুসন্ধানী মানুষগুলো সারাজীবন তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।

সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, ব্যাংকার ও সমাজ সংগঠক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর জীবনের যে চিত্র আমাদের সামনে আছে তার দ্যুতি সবাইকে স্পর্শ করেছে। প্রমাণ হয়েছে, নিষ্ঠা ও সাধনা থাকলে পর্বতের চূড়াকেও পেছনে ফেলা যায়।

মান্নান ভাই তাঁর "এই আমার বাংলাদেশ" বইতে লিখেছেন- 'যে জাতি তার অতীত জানে না, সে জাতি শক্ত শেকড়ের উপর দাঁড়াতে পারে না'। নিজ জীবনেও মান্নান ভাই এ কথার সাক্ষ্য রেখেছেন প্রতি পদে পদে। তিনি ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সোনার বাংলা, দৈনিক আজাদ বা সংগ্রামকে। বিস্মৃতির বাক্সে ছুঁড়ে ফেলেননি সে সব কন্টকময় দিনের বেদনাবিধুর খস্ খসে পৃষ্ঠাগুলো। তাই হয় তো তাঁর অস্তিত্বের শেকড় আজ এত দৃঢ় ও মজবুত।

শেকড় অনুসন্ধানের সংগ্রামে মান্নান ভাই যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পনের কোটি মানুষের হৃদয়ে একদিন তা ডাল-পালা মেলবেই। এটা আমার স্বপ্ন নয়, বিশ্বাস, দৃঢ়বিশ্বাস।

লেখক : সাবেক ছাত্রনেতা, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

ভাই আবদুল মান্নানের সংবর্ধনায় কতিপয় নিবেদন

মোঃ জহিরুল ইসলাম এফসিএ

ভাই আবদুল মান্নান-এর সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থে কিছু লিখতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এখন মনে পড়ছে না, কোথায় তার সাথে প্রথম দেখা হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে সংগ্রামের সাংবাদিক হিসাবে তার সংগে প্রথম মতবিনিময়। সে পাঠক থেকে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তরিকতার উত্থান। তার সাংবাদিকতা পেশার বড় আর একটি দান হচ্ছে এ পেশা তাকে সমাজতন্ত্রবাদী ইতিহাসবিদ বানিয়েছে। লেখক হিসাবে তার যে প্রতিভার স্ফূরণ আমরা লক্ষ্য করি, আমার মনে হয় তার সুদীর্ঘ সাংবাদিক জীবন তিলে তিলে তাকে তৈরী করেছে লেখক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে।

একজন সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি অসামান্য দায়িত্ব বোধ তাকে নিঃসন্দেহে অনন্যতা দান করেছে। স্বদেশের মানুষের দুঃখ-বেদনা ও হাসি-কান্নার চাল-চিত্র তিনি কোন ঔপন্যাসিকের মত উপস্থাপন করেননি। বরং তাদের দুঃখ-দৈন্যের শিকড় অন্বেষণ এবং সোনালী অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, সোনালী আগামীর স্বপ্ন দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। শিশুতোষ রচনা 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' বইটির প্রসংগ এসে যায়। এই বইটিতে তিনি শিশুদেরকে বাংলাদেশের বিশেষ করে মুসলমানদের সোনালী অতীতের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের সোনালী ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কবি ফররুখের সংগে দেখা হলেই বলতেন, তোমাদের একতাও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন খেয়াল দাও ওদের প্রতি সকলে। ওরা যেন নষ্ট না হয়। কবি ফররুখের মত লেখকের সামাজিক দায়িত্ব পালনে তিনি অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেছিলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসোবে। যেহেতু তিনি ছিলেন সাংবাদিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে তার সফল হওয়ারই কথা। কিন্তু পরবর্তীতে জেনারেল ব্যাংকিং-এ এসেও তিনি তার প্রশাসনিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন এবং অসাধারণ কর্মতৎপরতায় দেশের একটা প্রথম শ্রেণীর ব্যাংকে তিনি প্রায় সর্বোচ্চ পদে সমাসীন। বস্তুত টিডদডটফ ঈটভপধভথ-তার সাফল্য সত্যই অবাক হওয়ার মত। সম্ভবত তার বিনয়, সদালাপচারিতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সেবামূলক মনোভাব ও আচরণ ব্যাংকের মত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তাকে সাফল্যের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু লেখক হিসাবে এখানেও তার সাফল্য সত্যিই ঈর্ষণীয়।

তার ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নামক রচনাটি এর উত্তম স্বাক্ষর। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাংগঠনিক কমমন্ত্র এবং কর্ম বর্ণনার পাশাপাশি তিনি ব্যাংকিং-এর পশ্চাত ইতিহাস, সূদ, যাকাত প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় গবেষণার আকারে উপস্থাপন করেছেন। এ জন্য বইটি টিডদধডটফ ব্যাংকার ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকর্মী এবং সাধারণ পাঠক সবার কাছে গ্রহণীয় হয়েছে বলে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস।

আবদুল মান্নান ভাই-এর লেখক জীবন শুরু হয়েছিল একটি খ্যাতিমান বই ভন ডেরহাম-এর টিধযফন্ত্র টডঢ গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। সন্দেহ নেই, এ গ্রন্থটির অনুবাদের ফলে তিনি ইসলামের আলোকে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি রপ্ত করেছেন এবং তার রচনাবলীতে স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

সমাজ-ইতিহাস চর্চায় তার পদ্ধতি অনেকটা ইবনে খালদুনের মত। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে রাজরাজড়ার কাহিনী হিসাবে না দেখে তাকে উপস্থাপন করেছেন দেশ ও জনগণের সামাজিক রূপান্তরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ভাই আবদুল মান্নানের ইতিহাস চর্চা আসলে সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস হিসাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'বাংলা ও বাঙালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' প্রভৃতি গবেষণাকর্ম আসলে তার রচনাবলীর এ অনন্য ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকে তাঁর সম্মাননায় আমি মনে করি দেশের একজন যোগ্য সন্তানকে যোগ্য সম্মাননা দেয়া হচ্ছে এবং এ কার্যাবলীর সংগে জড়িত সকলে এমন ভাল কাজ করছেন- সন্দেহ নেই।

আমি আশা করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ পাক ভাই আবদুল মান্নানকে দীর্ঘজীবন দান করুন এবং এ দীর্ঘ জীবনের তাঁর শাণিত ও পরিক্ষিত রচনার দ্বারা দেশের জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে বেঁচে থাকা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা নতুন নতুন দিগন্তও উন্মোচিত করুন।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, সহ-সভাপতি, বিআইআইটিএ

www.pathagar.com

ইতিহাসের বাতিওয়ালা মান্নান ভাই

তৌফিক জহুর

মানুষের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন মেনে নেয়া হয় যে, মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট। মানুষে-মানুষে সাম্য কোন প্রাকৃতিক, দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত নয়। আমার বিশ্বাস, এটা আধ্যাত্মিক প্রযোজনা। সাম্যনির্ভরশীল মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বসমূহের সমঝোতার ওপর। মানুষের মূল্য বায়োলজি, মনস্তত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞান দিয়ে আবিষ্কৃত হতে পারে না। কারণ, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। মানুষই রচনা করে ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রসায়ন, নৃ-তত্ত্ব। মানুষ একটি সাধারণ উৎস থেকে সৃষ্ট, তাই তার হাত দিয়ে ঘটনা, অনুঘটনা, প্রতিঘটনা ইতিহাসের শামিয়ানার মধ্যে জড়ো হতে থাকে, তখন মানুষ তার স্ব-পরিচয়ে হয়ে যায় ইতিহাস গবেষক অথবা ইতিহাস-মনস্ক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কালের চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া, জীবনের পঙ্কিলতায় নিমজ্জমান অধ্যায়, রাজ-রাজড়াদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা, শ্রেণীগত দলবদ্ধতা, চেতনাগত শিক্ষার প্রয়োগ, যে কোন মতবাদের চূড়ান্তরূপ-পরবর্তী পরিস্থিতি, শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, ইচ্ছা স্বাধীনতার বীজ প্রবিষ্ট ইত্যাদি বিষয়-আশয়ের ঠাসবুনন স্থান পায় 'ইতিহাস' নামক ডেকচির ভেতর। ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রয়োগে মানব সাম্যের প্রকৃত ভিত্তিটি হারিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি ইতিহাস গবেষকের সত্যানুসন্ধানী নির্মাণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত সূর্যের আলোর মত পথ আলোকিত করে সামনে এগুতে মানুষের আত্মাকে আলোড়িত করে। আর এ কাজ যার হাত দিয়ে হয় তিনিই প্রকৃত ইতিহাসবিদ।

ইতিহাসবিদ গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রসঙ্গে লিখতে গিয়েই উপরের ছোট্ট ভূমিকা। আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিকাশকে সঠিক তরিকায় জানতে চাইলে শেকড় সন্ধানী ইতিহাস গবেষকদের দুয়ারে কড়া নাড়তেই হবে। সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো, অষ্টম শতক থেকে আজ পর্যন্ত এতদঞ্চলে যে ক'জন ইতিহাস গবেষক ধারাবাহিকভাবে শিকড়ের তালাশ করেছেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাদেরই একজন। মুশকিল হলো, অনেকেই এ লেখার মাঝে অতিরিক্ত 'ঘি' আছে বলে প্রপাগান্ডা চালাতে পারেন। তাদেরকে সবিনয়ে বলতে চাই, এ লেখার ধৈর্যশীল পাঠক শেষ বেলাতে উপলব্ধি করবেন, কোথাও 'ঘি' নেই, যা আছে তা সত্য সন্ধানের পথে এক বিপ্লবীর ব্যাপক গবেষণার লাস্ট জাজমেন্ট।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গবেষণা কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'। শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টি প্রসঙ্গে জ্ঞানতাপস মনীষী সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ "আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিকাশকে আলোচনা করতে গেলে পাল আমলের বিস্তৃত পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সেনরা যে অসৌজন্যের জন্ম দিয়েছিল তারও সুস্পষ্ট পরিচিতি উপস্থিত করা প্রয়োজন। অবশেষে মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে নতুন মানবিক রূপ পরিগ্রহ করল তারও বিস্তৃত সমীকরণ প্রয়োজন। এ নিয়ে অল্পস্বল্প লিখিত হলেও বিস্তৃতভাবে এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেন নি। সম্প্রতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তার 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে পথিকৃত বলা যেতে পারে। তার বর্তমান গ্রন্থটির নাম 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে নতুন করে উদঘাটন করেছে। আমরা বিশেষ

www.pathagar.com

একটি ভূ-খন্ডের অধিবাসী এবং সেই ভূ-খন্ডের অতীত এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে যে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তার গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে এবং তা পাল আমল থেকে ক্রমশ গড়ে উঠেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকের কারণে বহিরাগত সেনদের সংস্কৃতিকে বিরাট এবং মহার্ঘ্য করে দেখানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের আত্মবোধ-বিমুখ কিছুসংখ্যক লোক হিন্দুদের বিবেচনাটি মেনে নিয়েছে। এহেন অবস্থা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে পথে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য তাকে আমি সাধুবাদ দেই।"(মুখবন্ধ ঃ আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা)

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ বলছেন, "ইতিহাস অভিভূত হওয়া বা বিস্ময় প্রকাশের বিষয় নয়। কঠোর সত্যের মুখোমুখি করাই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব। ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা আমাদের সামনে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময় এ বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছি। কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এ বইটি অধ্যয়ন করে বুঝতে পারলাম যে আমি নিজে কত কম জানি। আবদুল মান্নান এ বোধ আমার মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে, ইতিহাসের মূল সত্য অনেক সময় অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরও আয়ত্তের বাইরে থাকে। আমি জ্ঞানী নই, কবি মাত্র। আমার ঐতিহ্য সম্বন্ধে এ বই আমাকে দারুণভাবে আকুল করতে পেরেছে। এখানেই বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রকৃত সার্থকতা।"

আমি দু'জন (একজন পন্ডিত, অন্যজন শ্রেষ্ঠ কবি) উত্তম ব্যক্তির 'মুখবন্ধ' থেকে সামান্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করলাম ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের চিন্তা-জ্ঞানের প্রখরতা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা বোঝানোর জন্য।

ইতিহাস আমাদের প্রতিনিয়ত শিক্ষা দিয়ে চলেছে প্রতিভারও সীমাবদ্ধতা থাকে। কারণ, প্রতিবেগ তো বটেই, অদৃষ্ট বহু ঘটনাও ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জ্ঞানীদের মতোই জ্ঞানমার্গ বিপজ্জনক। জ্ঞানমার্গের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে প্রখর ধীমানকেও ভাবতে হয়। কিন্তু যিনি ইতিহাস নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। ভুল হওয়া চলবে না। আদিমাতা ইভের মত নিষিদ্ধ ফল বক্ষণের দরুন স্বর্গচ্যুত হওয়া যাবে না ইতিহাসবিদের। তার ট্রেন লাইনচ্যুত হলে সকল পড়ুয়া যাত্রীরই জানা পরিধি হবে ক্ষত-বিক্ষত, যন্ত্রণাময় ও সর্বনাশী।

এক্ষেত্রে শ্রদ্ধান্বিত কন্ঠে আমরা বলতে পারি, সভ্যতার পন্ডিতর্ব চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোর ভুল ব্যাখ্যায় মনোজগতকে দিকভ্রান্ত করে চলেছেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাসের নান্দনিক ও সৌন্দর্যময় দরজা আগলে রেখেছেন। ইতিহাসের হর্ম্যখানকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করেছেন। অনিবার্য শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন ইতিহাসের প্রাচুর্যময় অধ্যায়গুলো। ইতিহাসের নান্দনিক বেদীতে মান্নান আশ্রয় নিয়েছেন এবং আত্মসচেতন হবার শক্তি অর্জন করেছেন বিশ্বজনীনতায় লীন হয়ে।

আমার এ কথার সত্যতা পাওয়া যায় মান্নানের 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থে। মান্নান 'প্রসঙ্গ কথা' লিখতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন এভাবে ঃ "ইতিহাস হচ্ছে পেরিয়ে যাওয়া বর্তমানের দলিল। এই দলিল অবশ্যই নিরপেক্ষতা ও সততার দাবী রাখে। এই দাবী অপেক্ষাকৃত বেশী মেটাতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। আমি বিশেষজ্ঞ নই, একনিষ্ঠ একজন পাঠক। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহে আমি ইতিহাস পড়েছি। পরস্পরবিরোধী তথ্য ও মন্তব্যের কারণে আমার এ কৌতূহল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাজীবী ঐতিহাসিকদের অবচেতন ত্রুটি ও পন্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস বিকৃতি এই অনুসন্ধিৎসাকে আরো তীব্র করেছে। বলা যায়, এই ক্ষোভ থেকেই লেখার সূচনা।"

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থটি নিরাবেগ ও নির্মোহ হয়েই প্রকাশিত হয়েছে। একই বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ বাংলাদেশ থেকে রচিত হয়েছে বিভিন্ন ইতিহাস গবেষকের হাত বেয়ে। কিন্তু মুশকিল হল, মান্নান যা রচনা করেছেন তা অন্যান্য পন্ডিত মহল থেকে আলাদা। এখানেই অভূতপূর্ব এবং সক্রিয় মনোযোগের দাবি রাখে মান্নানের ইতিহাস গবেষণা। বলা যেতে পারে ধর্ম নিয়ে, প্রাচ্য নিয়ে, পাশ্চাত্য নিয়ে, ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিদ্বৎসমাজের অনেকেই সত্য উচ্চারণে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা শঠতার আশ্রয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। কিন্তু এই সব বিষয় নিয়ে ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ সব কিছুকে ছাপিয়ে মহাসত্যের পথেই

www.pathagar.com

রচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই খানে ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ তার প্রণীত গ্রন্থ 'Islam Between East and West' স্নায়ু যুদ্ধে তীব্রতারকালে লিখিত হলেও আজও সমানভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। কারণ তার গ্রন্থে সত্য আছে। আছে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার সকল সরঞ্জাম। তেমনি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' নামক ইতিহাসমনস্ক গ্রন্থটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্পর্কের যে কার্যকরী স্রোতধারা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও অসংখ্য তথ্য সংযোজন করে অনিবার্য সত্যের আয়নায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। এখানেই মান্নানের মননশীলতা ও সামাজিক দায়বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইতিহাস চর্চার সরল অর্থ হচ্ছে অতীত সম্পর্কে নিখাদ গবেষণা ও অনুসন্ধান। ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-মনস্ক বিষয়ে আমাদের এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ ইতিহাসের গাল-গল্প শুরু করেন ৫২'র ভাষা আন্দোলন কিংবা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকে। অথচ আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের চৈতন্য, আমাদের চিন্তা-জ্ঞান কমপক্ষে ১৯০৫ সাল থেকে টেনে আনা দরকার। উনিশ শতকে আমরা ঢাকাকে কিভাবে পেয়েছিলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনে কারা সক্রিয় বাধা দিয়েছিল, তাদের শনাক্ত করতে না পারলে সর্বোপরি ঐ সকল জ্ঞানপাপীর হীনমন্যতা আমাদের অগ্রযাত্রাকে কিভাবে রহিত করার অপচেষ্টা করেছিল তা জানা জরুরী বৈ কি। একজন মুসলমান ও বাংলাদেশী হিসেবে স্বনির্ভর হয়ে পথ চলতে চাইলে আমাদের জাতিসত্তার আদি কাহিনীর যথার্থ রূপ অবশ্যই জানতে হবে। আর জানার জন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 'ইতিহাসের বাতিওয়ালা' হয়ে যে সত্য তথ্যের ঝাঁপি খুলে দিয়েছেন বাংলা ভাষা-ভাষী সকল গোষ্ঠীর জন্য তা আমাদের জন্য খাছ নেয়ামত। ইতিহাসের এমন সরস ও সত্যবাক দীর্ঘদিন এদেশে কোনো ইতিহাসবিদ উচ্চারণ করেন নি। মান্নান আমাদের জন্য যে দুয়ার খুলেছেন, সেখানে এমন কিছু তথ্য আছে যা শরীরে বিদ্যুৎ স্পর্শের ন্যায় শিহরণ জাগায়। প্রতিবেশী দাদাবাবুদের মাথা বিক্রি করা কোন কোন নামধারী মুসলমান লেখক এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসানুদাস কিংবা আজ্ঞাবহ না হয়ে মান্নান হেঁটেছেন নিজের বনেদী পথে। সার্বিক সোজা ইতিহাসের পথে চলতে গিয়ে তিনি অনায়াসে গড্ডালিকা স্রোতে ভাসতে পারতেন, সলনার মানুষে গা তলিয়ে দিয়ে উড়তে পারতেন নীলিমায়, খ্যাতির জোয়ার বয়ে আনতে পারতেন, তগমা নিতে পারতেন, দু'স্থাপনে অন্যেরা যা করেছেন, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই ফর্মুলায় চলতে পারতেন। এসব কোনো কিছুই না করে তত্ত্ব ও তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ করে তিনি নির্মাণ করলেন এমন এক ইতিহাসের নয়া প্রাসাদ যা কাল পেরিয়ে মহাকালের আঙিনায় বুক টান করে দন্ডায়মান। যার ক্ষয় নাই, লয় নাই।

প্রাক-মুসলিম যুগের নিখুঁত ভারতীয় ইতিহাস অদ্যাবধি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয়নি। জানা যায়, প্রাচীনকালের আর্য-পুরাণ রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে ভরপুর। আমাদের আত্মপরিচয় আবিষ্কারে ও জাতিসত্তা নির্ণয়সহ আমাদের প্রকৃত গন্তব্য নিখাদভাবে মান্নান তালাশ করেছেন। শুধু কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তাঁর গবেষণা। তিনি প্রাক-মুসলিম যুগের মানবীয় কার্যাবলী ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি হাজির করেছেন প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বাংলায় মুসলিম শাসনের সময়কালের চিত্র তিনি রাজনৈতিকভাবেই মূল্যায়ন করেননি, বরং অতীতের ধারাবাহিকতাকে তিনি সজ্জিত করেছেন রাজ-রাজড়ার কাহিনী দিয়েই নয় বরং পাঠককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, কারা ছিলেন এদেশের ইমেজ গড়ার স্থপতি। আলেম, উলামা ও মুজাহিদদের ভূমিকা নিয়ে আর কোন ইতিহাস গবেষক এমন সত্যঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সামনে হাজির হননি। বাংলা, বাঙালি মুসলমান সমাজের যে দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধময় ইতিহাস আছে এবং আমরা যে আকস্মিক বসন্তের কোকিলের মত কুহু কুহু তানে ভেসে আসা কোন জাতি নই তা মান্নানের ইতিহাস গবেষণায় প্রকাশ পেয়ে গেছে। স্বজাতির স্বরূপ উন্মোচনে মান্নান যে কারিশমা ও চিন্তার নতুন প্যাটার্ন আমাদের সামনে হাজির করেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসের আধুনিক গতি-প্রকৃতিকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। যাঁরা এতকাল ইতিহাসের করিডোরে ঘোরাফেরা করেই মনে করতেন সমগ্র জাতিসত্তার ইতিহাস তাদের নখদর্পণে তাদের কাছে মান্নানের শেকড় সন্ধানী ইতিহাস গ্রন্থগুলো বিস্ময়করই মনে হবে। আমাদের আত্মপরিচয়, জাতিসত্তার মূল অধ্যায় ও সমৃদ্ধময় ঐতিহ্য জানতে হলে ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দুয়ারে কড়া নাড়তেই হবে। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী ইতিহাস গবেষক, যিনি আমাদেরকে দিলেন সত্যাশ্রয়ী নতুন তথ্য-প্রমাণ ও নিখাদ যুক্তি। আমরা এখন চিনতে পারছি আমাদের বনেদী রক্ত। অবচেতন মন খুঁজে পেয়েছে ইতিহাসের বাতিওয়ালাকে। জিতে রহো হাজার সাল।

লেখক : কবি, সাংবদিক, সম্পাদক, উদ্যান

www.pathagar.com

যোগ্য সাংবাদিক যোগ্য ব্যাংকার

আমানুল্লাহ্ কবীর

বয়স যতো বাড়ে মানুষ ততো স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়। এ স্মৃতি কখনো একান্ত ব্যক্তিগত, ব্যস্ত জীবনের প্রকাশ্য কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। সব স্মৃতি বলা যায় না, আবার অনেক স্মৃতি আছে যেগুলো বলে খুব অনুভব করা যায়। এসব বলা না-বলা স্মৃতি রেকর্ডবন্দি করার মতো যন্ত্র যদি কোনদিন আবিষ্কৃত হয়, তা হলে দেখা যাবে প্রতিটি মানুষ নিজেই এক একটি জীবন্ত মহাকাব্য। এমনি কোটি কোটি বছরের মহাকাব্য স্তূপীকৃত হয়ে আছে পৃথিবীর বুকে। এর খন্ডিত অংশ নানাভাবে প্রকাশিত হয় কালের যাত্রায়।

সে যা হোক, নিজের কথায় আসি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আমিও স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এসব স্মৃতি কখনো খন্ডিতভাবে, কখনো নাটকের সিরিয়ালের মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠে। আমার দীর্ঘ পেশাগত জীবনে এমনি অনেক স্মৃতি আছে যেগুলো বাদ দিলে জীবনের একটা অংশকেই বাদ দিতে হয়। তাদের সবাইকে নিয়েই যদি কোনদিন লিখতে পারি তবে তা হবে আমার জন্য মহাআনন্দ। সেই মহাআনন্দের দিন কখনো আসবে কি-না জানি না, তবে কিছু খন্ডিত স্মৃতি প্রকাশ করে যদি একটু সুখ পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কী?

আমার পেশাগত জীবনের একটা বড়ো সময় কেটেছে সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন করে। তখন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও অঙ্গ সংগঠন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নসহ (ডিইউজে) দেশের সকল ইউনিয়ন ছিল ঐক্যবদ্ধ। সে সময় আর কোন ট্রেড ইউনিয়ন সম্ভবত এমন সংগঠিত আর ঐক্যবদ্ধ ছিলো না। সাংবাদিক ইউনিয়নকে এর বৈশিষ্ট্যের জন্যই বলা হতো 'ই ´রটঢণ্র ষর্ধদ ট ঢধতততণরণভডণ'। কারণ সাংবাদিকরা কেবল রুটি-রোজগারের জন্যই লড়াই করতো না, লড়াই করেছে পেশার উৎকর্ষের জন্য; পেশাগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য। তখন যারা সাংবাদিকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অনেকেই বেঁচে আছেন, অনেকেই নেই, আবার অনেকেই শয্যাশায়ী। তাদের মধ্যে নির্মল সেন, আনোয়ার জাহিদ (দু'জনই বর্তমানে শয্যাশায়ী), আহমদ হুমায়ুন (মরহুম), গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, হাবিবুর রহমান মিলন, সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আব্দুল কাহহার, শুভ রহমান প্রমুখ ট্রেড ইউনিয়নে ছিলেন আমাদের অগ্রজ। তাদের পরের জেনারেশনই ছিলাম আমরা। আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে একই সঙ্গে পেশা ও ইউনিয়নে যারা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন তাদের একজন মান্নান ভাই। সাংবাদিকতা পেশায় সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'স্যার'- এর পরিবর্তে 'ভাই' কালচারটা খুব জনপ্রিয়। আবদুল মান্নান সাহেব বয়সে হয়ত আমার কিছুটা ছোট। পেশাগত কাজে আমরা এতো ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে পরস্পরকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করতাম। এখনো তা-ই করি। সাংবাদিকতা পেশাটা নানা কারণেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ- পেশাগত দায়িত্ব পালনের বেলায় যেমনি, তেমনি চাকরিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও। সে সময় অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় বেতন-ভাতা ছিলো অনিয়মিত, তুলনামূলকভাবে কমও। যে কারণে অনেকেই সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দিয়েছেন। মান্নান ভাইও তাদেরই একজন। তবে, তাঁর বিশাল ভিন্ন বলেই আমি মনে করি, সামনে ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি নিজ জেলা ছেড়ে ব্যাংকিং পেশায় যেতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে ব্যাংকার হয়েছেন। এটাও ছিল তাঁর বিশাল

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের জন্যে আত্মত্যাগ। কিন্তু সাংবাদিকতা পেশায় যে তিনি খারাপ অবস্থায় ছিলেন, তা নয়। তিনি দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার ছিলেন এবং দু-দু'বার বিএফইউজের যুগ্ম মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগে ডিইউজে ও বিএফইউজের বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল পেশায় ও ইউনিয়নে তাঁর আন্তরিকতা ও যোগ্যতার কারণে।

পেশা পরিবর্তনের পর ব্যাংকিং-এও তাঁর আন্তরিকতা ও যোগ্যতার ঘাটতি হয়নি। দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে কারণে তর তর করে ওঠে গিয়েছেন উপর তলায়। এখন তিনি ইসলামী ব্যাংকের মত দেশের অন্যতম বিশাল ব্যাংকের ডিএমডি। আমার একজন সহকর্মী একটা ভিন্ন পেশায় গিয়েও এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এটা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য বিরাট আনন্দের বিষয়। আমি তাঁর আরো উন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক : কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, সাবেক সভাপতি বিএফইউজে,
সাবেক সম্পাদক আমার দেশ

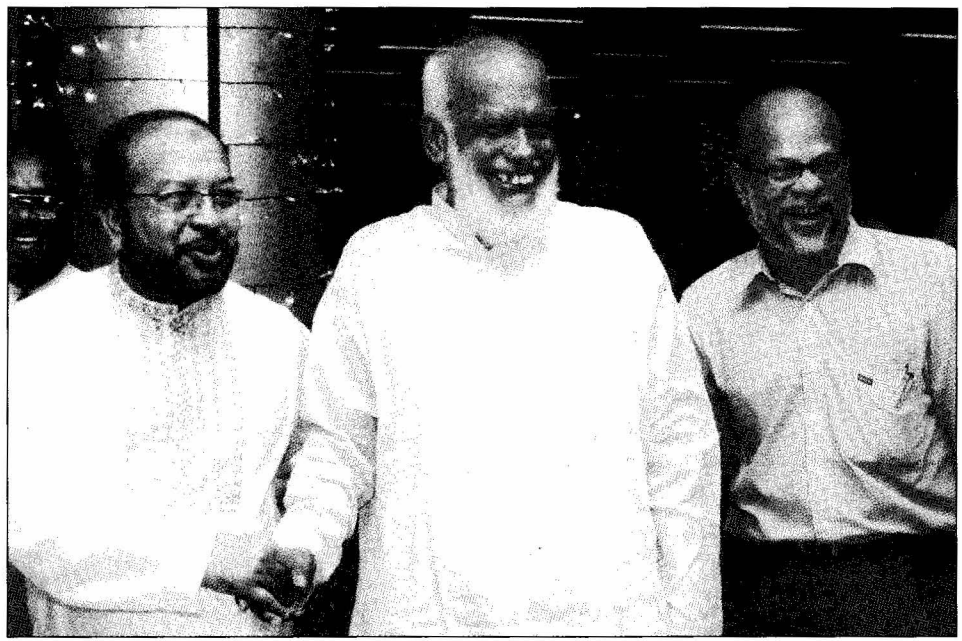

ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাথে বিশেষ মুহূর্তে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পাশে বিশিষ্ট সাংবাদিক খন্দকার হাসনাত করিম

www.pathagar.com

আমাদের মান্নান ভাই

ড. মাহবুব হাসান

গন্ডির বাইরে সহজে আমি যাই না- যাওয়ার অভ্যাসও নেই। এ জন্যে আমার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক বন্ধুর সঙ্গেই আজ আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এমন কি যোগাযোগই হয় না। এখন জীবন যাপন হয়ে পড়েছে নিছক প্রয়োজনের জন্যে যোগাযোগ। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি দ্বিতীয়বার চিনি বছর কয়েক আগে ইসলামী ব্যাংকের এক দাওয়াতে। অত্যন্ত ঘরোয়া সেই দাওয়াতে ৪/৫ জনকে দুপুরে ভাত-মাছ-ডাল খাওয়ানোর ইচ্ছা করেছিলেন তিনি। আমাকে ফোনে দাওয়াত দিয়েছিলেন বন্ধু আতা সরকার আর তাগিদ দিয়েছিলেন ড. আবদুল ওয়াহিদ। এ দু'জনই আমার প্রিয়দের তালিকায় আছেন। সেই দাওয়াতে গিয়ে মান্নান ভাইকে নতুন করে চিনলাম। তিনি যে ইসলামী ব্যাংকে ঢুকেছেন এবং আজ প্রায় শীর্ষপদে আসীন সে খবর আমি জানি না বা রাখি না। তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যাংকার হয়েছেন-এটাও ছিলো আমার অজানা। ভেবেছি, তিনি বিদেশে চলে গেছেন কিংবা ভিন্ন ট্র্যাকে আছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

তিনি সাংবাদিক ছিলেন- এমনটা বলা বোধ হয় ঠিক না। তিনি ওই পেশার এমন এক কারিগর কর্মী যার মধ্যে খেলা করতো ইনোভেটিভিটি। সত্তরের দশকে তবলিগ জামাত তখনও তুরাগ তীরে ব্যাপক বিস্তারে জমে উঠেনি এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তাদের দাওয়াতও পৌঁছায়নি- সেই প্রাথমিক বিস্তার পর্বে মান্নান ভাই দৈনিক আজাদে এক রিপোর্ট করেন। কোনো সংবাদপত্রে ইসলামী জলসার খবরা-খবর হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে, এটা পত্রিকার কর্তাদের চিন্তার মধ্যে তেমনভাবে ছিলো না। মান্নান ভাই এ কাজটি করেছিলেন তাঁর তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সুলতান আহমদের সঙ্গে পরামর্শ করে। সঙ্গে ফটোগ্রাফার হিসেবে গিয়েছিলেন জালালউদ্দিন হায়দার। তিনি টঙ্গীর তাবলিগিদের হাতে নাজেহালও হয়েছিলেন। পরে জালাল হায়দার আমার কলিগ হয়েছিলেন 'দৈনিক দেশ'-এ।

মান্নান ভাইয়ের সাংবাদিকতায় আমার বয়স সদ্য কৈশোর পেরোনো নব্য যুবকের। আমার সঙ্গে তার মিল আছে কিছুটা। আমি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে ঢাকা কলেজের দক্ষিণ ছাত্রাবাসে উঠে আসি। পড়ালেখার পাশাপাশি আমাকে রোজগারের ধান্দা করতে হয়। আয় করো আর পড়াশোনা করো- এই সংগ্রামে আমি জড়িয়ে পড়ি। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি 'রণাঙ্গন' নামের একটি সাইক্লোস্টাইল পত্রিকায় রিপোর্টারের কাজ করেছি। প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জনমত'-এ। সেই অভিজ্ঞতায় বেছে নিয়েছিলাম সংবাদপত্রের কাজ।

স্বাধীনতার সুযোগে সম্পাদক ওয়ালি আশরাফ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশ করতে আসেন। দেওয়ান শামসুল আরেফিন বাদল ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক। সেখানে আমি পোস্ট লিখি নিয়মিত। সেটা বাহাত্তুরের ঘটনা। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাংবাদিকতার পুঞ্জিতে এ রকমই তথ্য আমি পেলাম। তিনি যতটা না টাকার জন্য আমার মতো, তারও চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত আগ্রহ আর জাতির সেবাই ছিলো তার লক্ষ্য।

প্রথম তাকে আমি চিনি ১৯৮০ সালে ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসেবে। তিনি বিএফইউজেতে সেবার সহকারী মহাসচিব পদে জয়ী হয়েছিলেন। আমি তখন দৈনিক দেশ-এ সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। সে সময় আমাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন বোরহান আহমেদ, তিনিও সে বছর সহকারী সম্পাদক হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন। সেবারের নির্বাচনে আমার কোনো ভূমিকা ছিলো না- প্রতিনিধিও নির্বাচিত হইনি। তবে সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার একটা সহজ যাতায়াত ছিলো নেতাদের কাছে। আর কবি হিসেবে যে সুনাম সেই গুণে ভর করে আমার যাতায়াত ছিলো প্রায় অবাধ। এর মাত্র তিন বছর পর মান্নান ভাই রিপোর্টার জীবনের ইতি টেনে চলে যান ব্যাংকিং জীবনের পাবলিক রিলেশন্সে।

www.pathagar.com

অটুট রইল তার পেশার বন্ধুদের সাথে অকৃত্রিম যোগাযোগ। আমি যেহেতু ব্যাড-ইন্টার গোছের কোনো প্রতিভাধর নই, এ জন্য তাঁর কাছে যেতে হয়নি আমাকে। নিজের লেখালেখি আর সাহিত্য পাড়া-প্রতিবেশি ইত্যাদিই আমার ধ্যান-জ্ঞান। সেখানে আমার সঙ্গে মান্নান ভাইয়ের মিল-অমিল দু-ই আছে। আমি ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে তা নবীন-করণে বিশ্বাসী এবং আমি বিশ্বাসী মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করি নিজেকে। মান্নান ভাইও বিশ্বাসী মানুষ। কিন্তু তিনি গোঁড়া নন। তিনি ধর্ম-দর্শন আর ঐতিহ্যের প্রতি দায়িত্বশীল মানুষ। তিনি কর্তব্যকে পরিণত করেন বাস্তবায়নে। আজকে তাঁর যে উত্থান-উন্নতি এর পেছনে রয়েছে তাঁর সৃষ্টিশীলতা। তাঁর মন ও মানসিকতা মানবিকবোধের উজ্জীবনে সব সময়ই ক্রিয়াশীল। ব্যাংকিং পেশার মতো বাণিজ্যিক কর্মে নিয়োজিত থেকে, সাফল্য অর্জন করে তিনি যে আপন সত্তার চাহিদার কথা একবারের জন্যও ভোলেননি, তার নমুনা দেখা যায় তাঁর বইয়ের সংখ্যার উল্লেখ করে। তাঁর চিন্তাশীলতার পরিসর কতটা বিস্তৃত তা বইয়ের বিষয় লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাংবাদিকতা, প্রবন্ধ, ইসলাম, ব্যাংকিং, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, বাংলাদেশে ইসলাম, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, ভ্রমণ, ইসলামী অর্থনীতি, রম্য রচনা ইত্যাদি ছাড়াও সম্পাদনাসহ আরও বই-পুস্তিকার তালিকা আমি জেনেছি। কি করে মেধাভিত্তিক শ্রম ব্যাংকিংয়ের সময় ব্যয় করার পর এমন সব কাজ করা সম্ভব! মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের পক্ষেই তা সম্ভব। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই শিক্ষার্থী জানেন, মাতৃভাষার বাইরে ইংরেজী, আরবী ও উর্দু ভাষাও। সাহিত্য সাধনার জন্যই তিনি ওই সব ভাষা শিখেছেন পরম আগ্রহ নিয়ে। ওই সব ভাষার কাম দার্শনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনার রসাস্বাদনের পাশাপাশি বাঙালিদের তা পড়ার জন্যেও তিনি শুরু করেন অনুবাদের মতো দুরূহ কাজ। অনেক নির্ঘুম রাত তাঁর কেটে গেছে অনুবাদকর্মে, পড়াশোনায়। সত্যিকার সাধনা এ রকমই। সাংবাদিকতার পেশা- তা যদি হয় রিপোর্টারের জীবন- তা হলে সেখান থেকে সময় বের করে এনে সাহিত্য সাধনা অনেক কঠিন কাজ। তাই যারা পারেন তাদের তপস্বী বলা উচিত। মান্নান ভাই সেই গোত্রের সাধক। তাঁর লেখা দু'চারটি বইয়ের নাম লিখি যাতে বোঝা যাবে, তাঁর মানস-মনন-মেধা আর কর্মযোগী চেতনা। বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, সোনার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের পুলিশ, ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ইসলামে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, পারস্যের পথে-প্রান্তরে, শোয়েব নবীর দেশে, ফরায়েজী আন্দোলন, শরীয়তউল্লাহ ও দুদুমিয়া, ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলার কুড়ি শতকের রেনেসাঁ ইত্যাদি। এই বইগুলোর অধিকাংশ থেকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মানস মোটামুটি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তিনি যে আমাদের মানবিক পৃথিবীর এক সৃষ্টিশীল সন্তান- তাতে কোন ভুল নেই।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, সহযোগী সম্পাদক- দৈনিক যুগান্তর ও সহ-সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)

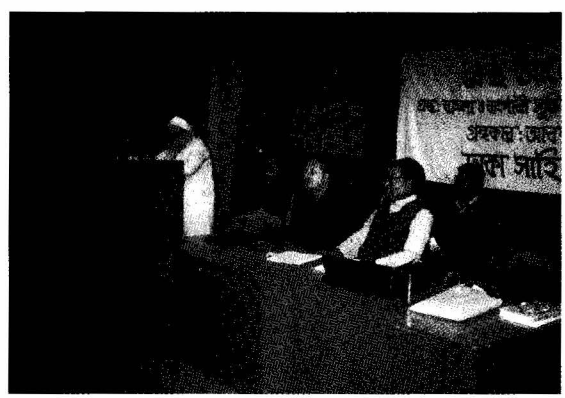

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর প্রকাশনা বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা বই-এর উৎসবের আলোচনা করছেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফ। বাংলাদেশ টাইমস সম্পাদক মাহবুব আনামের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ
পাঠ-পরবর্তী চিন্তা

মেজর জেনারেল (অব:) এম. এ. হালিম

ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আসলে একটি কঠিনতম বিষয়। কারণ ইতিহাস গবেষককে প্রতিনিয়ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের যে সড়ক নির্মাণ করেন তা যদি প্রকৃত নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত না হয় তা হলে বিপদ আছে। পরবর্তী প্রজন্ম সেই নির্মিত সড়ক বেয়ে সামনে এগুতে চাইলে প্রতি কদমে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবে। কারণ, ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের উপাদানে যে কোন পণ্যের প্রস্তুতকৃত উপাদান আসলে অমঙ্গলের বার্তাবহ। সম্প্রতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি হাতে পেলাম। বাংলা ও বাঙালি জাতির জাতীয় ইতিহাসের নানা বাঁক, আদিপর্ব, বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের ইন্দ্রজালকে টপকিয়ে সত্যের সততাপূর্ণ বিবরণ এ সময়ে খুবই দুরূহ ব্যাপার। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এই কঠিন ও দুরূহ কাজটি অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'বঙ্গভঙ্গ'- আমাদের জাতিসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়। এই অধ্যায় নিয়ে সঠিক মাত্রায় কাজ করা এবং পক্ষপাতহীন বিচার-বিশ্লেষণ করে মূল টেক্সট সামনে আনা সত্যিই কঠিন। কারণ, অখন্ড ভারতের ভূগোলের ইতিহাস প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, ইংরেজ আমলে ১৯০৫ সালের আগেই বাংলার রাজনৈতিক সীমানা তিন তিনবার বদল হয়েছিল। তখন বিষয়টি নিছক প্রশাসনিক পরিবর্তন বলে মেনে নেয়া হয়। এরপর ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। এটি ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে ইংরেজ শাসনামলে চতুর্থবারের সীমানা পরিবর্তন। কলকাতা কেন্দ্রিক প্রচন্ড শোরগোলের কারণে ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ বাতিল হয়। কিন্তু হিমালয়ান উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর ফলে যে বিরাট ফাটল ও ভাঙন সৃষ্টি হয় তা আর জোড়া লাগেনি। তার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়েও সে সময় অত্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি হয়েছিল। বাংলাদেশের গত একশ' বছরের ইতিহাসে চারটি ঘটনা সবচে' আলোড়ন সৃষ্টিকারী, যুগপ্রবর্তক ও গভীর প্রভাব বিস্তারক হিসেবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে :

১. ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন।
২. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।
৩. ১৯৭৪ সালে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জন।
৪. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ।

বাইশটি পর্বে বিভক্ত হয়ে ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে দুরূহ কাজটি তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন, এ জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা-কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতির যে ইতিহাস তিনি হাজির করেছেন তা এদেশেই শুধু নয়, ইতিহাস মনস্ক বিশ্বগ্রামের নাগরিকবৃন্দের জন্য ফেলে আসা পথের হদিস মেলাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থে ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 'প্রাচ্যের রহস্য নগরী' ঢাকা কেন্দ্রিক ইতিহাসের যে দিকগুলো আমাদের সামনে হাজির করেছেন তা সত্যাশ্রিত। তিনি শুধু তত্ত্ব ও তথ্যই হাজির করেননি, পাশাপাশি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যা

www.pathagar.com

পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলা যাবে না। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁকে কখনোই আগ্রাসী কিংবা মতলবি গবেষক কিংবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছেন-এমনও ভাবা ঠিক হবে না। এখানেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার চিন্তাজ্ঞানকে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। নিজের ঐতিহ্য ও বনেদী রক্ত তাঁকে সঠিক পথেই পরিচালিত করেছে। আমি তাঁকে বলতে চাই, হারিয়ে যাওয়ার নাম বিশালতা নয়, কিংবা নয় কোন সার্থকতা। আপনি আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আরো কাজ করুন। আপনার মাধ্যমে জাতি জানুক তাদের অতীতের সেই স্বপ্নিল অধ্যায়।

লেখক : সাবেক ডিজি, ডিজি এফ আই।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সৌদি আরব যাবার প্রাক্কালে তার নিকট বন্ধুরা তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানান। ছবিতে তার সাথে বাঁ থেকে সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, মাহবুবুল হক এবং ডান থেকে কাজী মোহাম্মদ মোর্তুজা আলী ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে আবদুল মান্নান সাহেব

নুরুজ্জামান খাঁন

আমি লেখক নই, নই কোন কবি-সাহিত্যিকও। পৃথিবীতে যারা জ্বলে, জ্বলে পৃথিবীর দিগন্তে রাঙ্গিয়ে দেয় নতুন সূর্যালোকিত সুপ্রভাত, এমনি এক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে দু'কলম লিখার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রায় পনের কোটি লোকের বসবাস আমাদের এই দেশে। সত্যিকারের সাদা দিলের মানুষ হাতে গোণা ক'জনই বা হতে পারেন ? সংখ্যাধিক্য না হলেও ভালো মানুষের দেখা আজও পাওয়া যায়।

আমি আমার এ নাতিদীর্ঘ জীবনেও এমনি এক সত্যিকারের মানুষ পেয়েছি। যিনি তাঁর সততা, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ ইত্যাদি নানান সৎগুণের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে আমার মনের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। তিনি আর কেউ নন আমাদের নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার অন্তর্গত দড়িসত্যবান্দী গ্রামের কৃতি সন্তান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ সম্মানিত ডি. এম. ডি জনাব আবদুল মান্নান। আমার দেখা মতে তিনি প্রচন্ড ধার্মিক, জ্ঞান পিপাসু, লেখক, দক্ষ ব্যাংকার তো বটেই নতুবা দেশের অন্যতম প্রধান একটি বেসরকারী ব্যাংকের ডি. এম. ডি'র মত গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করতে পারতেন না। কর্মস্থলে তিনি যেমন একজন সৎ, যোগ্য ব্যাংকার, ব্যক্তি জীবনেও তিনি একজন ধার্মিক, লেখক, সমাজ সেবক, সর্বোপরি সৎপরামর্শ- দাতাও বটে। শুধু আমার স্বীকারোক্তিই নয়, সমগ্র আড়াই হাজার উপজেলাতে বাস্তবিক অর্থেই তাঁর মত উচ্চ পদে কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই।

তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সভা, সেমিনার, টিভি টক-শো প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করে অকাতরে তাঁর জ্ঞানভান্ডার উন্মোচন করে তা দান করেন সকলের তরে। চুম্বকের আবেশের মত তাঁর উপদেশ, দাওয়াত গ্রহণ করে অনেক বিপথগামী মানুষ লাভ করেছেন সঠিক পথের সন্ধান। জনাব আবদুল মান্নান যেন- "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"-এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেননা তাঁর সৎ পরামর্শক্রমেই আমি ঠিকাদারী ব্যবসায়ী থেকে আজ একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। আমার শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ২৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পুরো কৃতিত্বও আমি দেব জনাব আবদুল মান্নান সাহেবকে। কেননা তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি উপলব্ধি করতে পারলাম, ঠিকাদারী ব্যবসার অর্জিত অর্থে আমার নিজ পিরবার সন্তান-সন্ততি হয়তো হেসে-খেলে দিনাতিপাত করতে পারবে। কিন্তু দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা কতটা কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

তাঁর এ মোহিত মন্ত্রণাতে যেন আমি মন্ত্রণামুগ্ধ হয়ে পড়লাম। শিল্পপতি আমাকে হতেই হবে যেখানে কর্ম সংস্থান হবে অনেক অনেক লোকের। আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর উপদেশে এন জেড টেক্সটাই লিঃ নামে টেক্সটাইল শিল্পকারখানার মাধ্যমে শিল্প জগতে আমার অনুপ্রবেশ। ব্যক্তিজীবনে আমি তাঁকে দেখিনি কখনো কারো প্রতি রূঢ় আচরণ করতে।

প্রচুর জ্ঞান পিপাসু তিনি। তাই মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করতে মোটেও কুন্ঠিত নন। তাই তো তিনি পরিচালনা করছেন একটি অবৈতনিক কোচিং সেন্টার, যেখানে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে তাঁর নিজ গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী। দরিদ্র অনেক

www.pathagar.com

মেধাবী ছাত্রদের তিনি আর্থিক সাহায্যও করেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই দৃষ্টান্তমূলক, অনুকরণীয়।

এ রকম সাদা দিলের যোগ্য মানুষরা যেমনি বদলে দিয়েছে আমার মনকে, তেমনি এ সারির মানুষের সংখ্যাধিক্য বদলে দিতে পারে আমাদের সামাজিক চিত্র, বদলে দিতে পারে পুরো দেশটাকে। আমি নুরুজ্জামান খাঁন তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি যেন তাঁকে অনুকরণ করে, স্বনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে সারা জীবন আবদুল মান্নান সাহেবের আদর্শে মানব সেবা করতে পারি।

কেননা, জীবে দয়া করে যেজন সেজন সেবিছে ঈশ্বর। পবিত্র হাদীসেও বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক বলেছেন, "সেই ব্যক্তি আমার কাছে প্রিয় যে আমার বান্দার/সৃষ্টির নিকট প্রিয়"।

আমার মনের প্রিয় মানুষের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে জনাব আবদুল মান্নান সাহেবের নাম।

লেখক ও ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

পূর্বের পেশার সাথে সম্পর্কহীন নতুন পেশায় মাঝপথে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার হলেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর ক্ষেত্রে তা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চলমান ঘটনাবলীর প্রাত্যহিক রূপকার সাংবাদিক মান্নান ইসলামী ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব জনমনে প্রথিত করার প্রত্যয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদান করলেও সহসাই এর প্রায়োগিক দিক তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাই বর্তমানে একজন পেশাদার ইসলামী ব্যাংকার। অন্যদিকে উঠতি বয়সে তাঁর মধ্যে দেশ-জাতি ও সমাজ চেতনার যে বীজ অংকুরিত হয় এবং সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বিকাশমান ছিল তার চর্চা তিনি নিষ্ঠার সাথে অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে মান্নানের রচিত ইতিহাসভিত্তিক বই 'বাংলা ও বাঙ্গালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বঙ্গ ভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে 'যখন যে ঘটনা যেভাবে ঘটেছে' তিনি তা অবিকল তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর বইগুলো পড়লে মনে হয় 'ইতিহাস কথা কয়'। মান্নানের রচিত বইগুলো সমাজসেবী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়েও ইতোমধ্যে তাঁর একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। মান্নানের ইতিহাস চেতনায় লেখা এ বইয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশ ও ব্যবহারিক দিকগুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশ-জাতি ও সামাজের সঠিক চিত্র তুলে ধরার বাসনা এবং জীবন পরিক্রমার মধ্যগগনে এসে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবস্থা মিশন হিসেবে বেছে নেয়াই এ দুটো বিষয়ে মান্নানকে পারদর্শী করে তুলেছে।

সদাহাস্য ও অনুপম ব্যবহারের এ লোকটি তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় এবং ইসলামী অর্তনীতি ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন নিঃসন্দেহে।

ইতিহাসবিদ, গবেষক, শেকড়সন্ধানী ও মননশীল লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (১৯৫২-)-এর লেখালেখির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। লেখালেখির মূল ক্ষেত্র বাংলাদেশের ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াও গবেষণা পদ্ধতিসহ অন্যান্য জটিল কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর সাবলীল পদচারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও বৈচিত্র্য প্রয়াসী কর্মবীর মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের অনুসন্ধিৎসু মন এক জায়গায় থেমে থাকেনি। আহরণ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যসহ নানা দেশের অভিজ্ঞতা। লিখেছেন আকর্ষণীয় ঢংয়ে ভ্রমণ কাহিনী। আপাতত থেমেছেন ব্যাংকিংয়ের জটিল কিন্তু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্বেষায়। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও এসেছে আরাধ্য সাফল্য। ব্যাংকিং জগতের সার্বক্ষণিকতাও তাঁকে লেখালেখি থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তাঁর কলম রয়েছে গতিশীল। সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর বিচিত্রধর্মী মৌলিক রচনা। বাড়ছে গ্রন্থ সংখ্যা। আমি লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও আরও বর্ণাঢ্য ভবিষ্যৎ একান্তভাবে কামনা করছি।

লেখক : বিশিষ্ট শিল্পপতি, দুইবার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সফলতাই যাঁর প্রাপ্য

আতিক হেলাল

হাঁটি হাঁটি পা-পা ক'রে মামা বাড়ির দোতলায় উঠতে গিয়ে একদিন সিঁড়ি থেকে প'ড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন দুরন্ত শিশু আবদুল মান্নান। কপালের ওপর সেই আঘাতের বড় একটা চিহ্ন আজও সেই ঘটনার স্মারক হয়ে রয়েছে। কিন্তু, হোঁচট খাওয়া মানেই পতন নয়, সেই শিশুকাল থেকে এই আত্মোপলব্ধিকে লালন করেছেন তিনি। সেদিন তিনি সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন বটে, দুরন্ত শৈশবের কাজই তো চলতে গিয়ে প'ড়ে যাওয়া; কিন্তু প'ড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন কি-না, সেটাই দেখার বিষয়। হ্যাঁ, সেদিন তিনি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। সেদিনের সেই প'ড়ে যাওয়ার স্মারকটিই আজ উঠে আসার (সফলতার) স্মারকরূপে জ্বলজ্বল করছে তাঁর সুপ্রসন্ন কপালে।

১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' োগানে পূর্ববাংলা যখন উত্তাল, সেই সময়ে সোনার গাঁও- রূপগঞ্জের সোনামাখা রূপে সম্ভাবনার এক দীপ্ত আলোকচ্ছটা হয়ে মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও যোবায়দা বেগমের কোলজুড়ে এসেছিলেন আজকের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। ভাষা-সংগ্রামের সেই সংক্ষুব্ধ পরিবেশই যেন তাঁকে জন্ম থেকে যুগিয়েছে জীবন সংগ্রামে দৃঢ়পদে অগ্রগামী হবার প্রণোদনা।

কামরাঙ্গিরচর প্রাইমারি স্কুলে তখন ক্লাস হতো গাছের নিচে। শ্লেট-পেন্সিলও নয়, তাঁকে অ আ ক খ লেখা শিখতে হয়েছে কলা পতা-তাল পাতায় বাঁশের কঞ্চির 'কলম' দিয়ে। এই আবদুল মান্নান তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে একদিন বাবার দেয়া পঁচাত্তর পয়সা নিয়ে গোলাকান্দাইলের মেলায় গিয়েছিলেন; তবে তিনি সার্কাস দেখেননি; যদিও কলকাতার কমলা সার্কাস ছিলো তখন মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের 'বস্তু'। কিন্তু সেই তীব্র আকর্ষণে কমলা সার্কাস সেদিন শিশু আবদুল মান্নানকে কাছে টানতে পারেনি; সেদিন হৈ হৈ রৈ রৈ- মেলার মধ্যেও তাঁকে কাছে টেনেছিলো বই। তিনি তাঁর হাতে থাকা পচাঁত্তর পয়সা থেকে বাষট্টি পয়সা দিয়ে মেলা থেকে কিনেছিলেন একটি বই ('সোহরাব-রুস্তম' নাটক)। সেই তখন থেকেই 'গাজী কালু চম্পাবতি', 'সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল', 'ছহি বড় জঙ্গনামা', 'বিষাদ সিন্ধু' আর 'আরব্য রজনীর' সাথে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে।

শৈশবেই সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে নিজের দৈনন্দিন জীবনধারার সাথে একটি সুসংহত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রচনার অদম্য স্পৃহা তাঁর ভেতরে কাজ করেছে। তাঁদের বাড়ির উঠানে তখন মাসুমাবাদের মৌলবী মুবারক কাজী সুরেলা কন্ঠে ওয়াজ করতেন। কখনো সেই উঠানে চাঁদনী রাতে বসতো পুঁথি পাঠ বা গল্পের আসর। চৌদ্দ উজির আর বায়ান্ন ছাপ্পা'র কিচ্ছা শুনতে শুনতে আবদুল মান্নান তখনই পাড়ি দিতেন বানেছাপরীর দেশে, কোহকাফের জঙ্গলে। মীর মশাররফ হোসেনের' বিষাদ সিন্ধু'র নাট্যরূপ দিয়ে গ্রামের কিশোর সাথীদের নিয়ে তা মঞ্চায়নের 'ব্যর্থ' প্রয়াস পান তিনি সেই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই। সেই সময়েই তিনি কবি জসীমউদ্‌দীনকে প্রথম দেখেছিলেন দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাইস্কুলে। জসীম উদ্‌দীনের মতো একজন কবির প্রতি তাঁর অপার এক মুগ্ধতা তৈরী হয় তখন থেকেই।

ছেলেবেলায় একবার তাঁর এলাকায় আসেন তৎকালীন প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত। বিস্ময়ের ব্যাপার, শতশত লোকের মধ্য থেকে কিশোর আবদুল মান্নানকে কাছে ডেকে মন্ত্রী আদর ক'রে 'আপনি' সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'আপনাকে এম এ পাস করতে হবে।' খুশিতে তাঁর চোখে পানি এসেছিলো সেদিন। সেই আবদুল মান্নান এম এ পাস তো করেছেনই, আরও অনেক কিছু 'পাস' করে 'বড়' হয়েছেন তিনি; যা হয়তো সেদিনের সেই জাঁদরেল শিল্পমন্ত্রীর কাছেও ছিলো প্রত্যাশার অধিক।

www.pathagar.com

এস এস সি পরীক্ষা দিয়ে আবদুল মান্নান ঢাকায় আসেন ১৯৬৭ সালের পহেলা মে। শুরু হয় লজিং-জীবন। তখন থেকেই তিনি পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী একাডেমী লাইব্রেরির সাথে পরিচিত হন এবং লাভ করেন এক বিশাল রত্নখনির সন্ধান। বাহরাম-বনহুরের গন্ডি পেরিয়ে মৌলিক বইয়ের এক সীমাহীন জগতের সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর এবং এই বই ভান্ডারের মাধ্যমেই নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ ও শাণিত করার এক নিরন্তর অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। যার ফলে, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, সামাজিক উন্নয়ন কর্ম, সাংবাদিকতা, রাজনীতিসহ পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এক স্বতন্ত্র প্রজ্ঞার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ঢাকায় শেখ বুরহানুদ্দীন কলেজে ভর্তি হবার কিছুদিন পরই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের যৌথ সমর্থনে কলেজের সাহিত্য সম্পাদক হন আবদুল মান্নান। তখন থেকে অর্থাৎ তরুণ বয়সেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ লাভ করে। এরপর ঐ কলেজেই আবদুল হাকিম-মিজান-প্রধান-তাহের-এনায়েত-মোশতাক-শামসুল হুদা-মান্নান মিলে গড়ে তোলেন 'সামাজ সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন। আবদুল মান্নান ছিলেন সেই সংগঠনের প্রচার সম্পাদক।

'সাহিত্য' এবং 'প্রচার'- এই দু'টি কর্মকান্ডের সাথে সাংবাদিকতা যেন না মিলে পারে না এবং এই সহজাত প্রবণতা থেকেই সাংবাদিকতা শুরু করেন তরুণ আবদুল মান্নান। শুরুটা ছিলো দৈনিক সাংগ্রামের প্রুফ রীডার হিসাবে [২ জানুয়ারী ১৯৭০] তখন সংগ্রাম-এর রীডার ইনচার্জ ছিলেন কাজী শহীদুল হক। তিনি তার নবীন সহকর্মীদেরকে তালিম দিতে গিয়ে বারবার বলতেন, প্রুফ রীডিং ভালোভাবে শিখতেই দশ-পনেরো বছর সময় দরকার।' পরপর কয়েকদিন একই কথা শুনে আবদুল মান্নান জবাব দিয়েছিলেন, 'এতো লম্বা একটা টেবিলের কিনারে বসে দশ-বারো বছর প্রুফ রীডিং শেখা আমার ধৈর্যে কুলাবে না। দশ বছরের মধ্যে আমি এ রকম একটা পত্রিকার সম্পাদক হতে চাই।'
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর সেই কথা রেখেছিলেন। তাঁর সেই 'চাওয়া'-টাকে তিনি 'পাওয়া'য় পরিণত করে ঠিকই দেখিয়েছেন।

১৯৭২ সালের শুরুতে তিনি সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য় যোগ দেন বিভাগীয় সম্পাদক হিসাবে। সেখান থেকে এক পর্যায়ে তিনি পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সেই কাজী শহীদুল হক তখন 'বাংলার বাণী'র রীডার ইনচার্জ আর সংগ্রামের প্রথম বার্তা সম্পাদক মীর নূরুল ইসলাম বার্ত-সম্পাদক। আবদুল মান্নান তাদের সাথে দেখা করতে একদিন বাংলার বাণী-অফিসে যান। কাজী সাহেব দৌড়ে এসে দরজার কাছে আবদুল মান্নানকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার শুরু করেন : 'হামারা এডিটর সাব আ-গিয়া।' তিনি সবাইকে সত্তরের জানুয়ারির গল্প বলে স্বীকার করলেন, 'মান্নান তাঁর কথা রেখেছে।'

১৯৭৫-এর ১৬ জুনের ঘটনার (এক দলীয় বাকশাল কায়েম) পর অনেক সাংবাদিক কর্মচ্যুৎ-পেশাচ্যুত হতে বাধ্য হন। আবদুল মান্নানও এই দুঃখজনক পরিণতি থেকে রেহাই পাননি। তবে তিনি এখন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইস্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল' ও পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখেন। কেননা, সাংবাদিকতাকে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ঘটনা তাঁর পেশা বদলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী ব্যাংকের প্রথম শাখা উদ্বোধনের দশ দিন আগে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট তিনি এই ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিলেন। তবে জনসংযোগের সাথে সাংবাদিকতার সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন তখনও হয়েছিলো, এমনটি বলা যায় না। কিন্তু ব্যাংকের বৃহত্তর প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও প্রণোদনায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে জনসংযোগ থেকে ব্যাংকিং-এর মূলধারায় সম্পৃক্ত হয়ে (১৯৮৬ সালে) ক্রমাগত উচ্চতর দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে হয়।

সেই গোলাকান্দাইলের মেলা থেকে সার্কাস না দেখে বাঁচানো পঁচাত্তর পয়সা থেকে বাষট্টি পয়সা দিয়ে জীবনের প্রথম বই কিনেছিলেন যে শিশু আবদুল মান্নান, সেই আবদুল মান্নান এখন প্রায় অর্ধশত বইয়ের লেখক/সম্পাদক/অনুবাদক। পত্রিকার প্রুফ রীডারের চাকরি দিয়ে শুরু করে সেই আবদুল মান্নানই আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ও সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম নির্বাহী ও নীতি নির্ধারক ব্যক্তিত্ব। এটা কিভাবে সম্ভব? তাঁর জীবন থেকে সেটাই আমাদের দেখার এবং শেখার রয়েছে।

এবার কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে শেষ করবো। সম্ভবত সেন্টার

www.pathagar.com

ফর ন্যাশনাল কালচার (D~D) অথবা ‡F~ বাংলাদেশের কোনো একটি অনুষ্ঠানে তাঁর আতিথেয়তা উপভোগ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, জাতীয় অধ্যাপক মরহুম প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের উপভোগ্য বাগ্মিতা যেমনি আজও আমার কানে এবং মনে গেঁথে রয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর সেদিনের পরিবেশিত উপাদেয় খাদ্যরাজির সুস্বাদ আজবধি আমার জিভে লেপ্টে রয়েছে। সত্যিই একের ভেতরে তিনি বহুগুণের একজন।

লেখক : কবি, ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক

জঙ্গল বাড়ী প্রাসাদের জরাজীর্ণ প্রবেশমুখে ঈশা খাঁর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধস্তন পুরুষের সাথে আশরাফুল ইসলামসহ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও তার ছোট মেয়ে মোহসিনা মাহদিয়া ফেরদৌস

www.pathagar.com

ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রতিভার প্রাথমিক মূল্যায়ন

ড. আবদুল ওয়াহিদ

বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী আমাদের শেকড় সন্ধানী ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। হার ফন মাওলা আবদুল মান্নান। একই সঙ্গে অনেক রূপের অধিকারী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এমন আবদুল মান্নান কিন্তু একই সাথে অনেক জন্ম নেন না। নিলীমায় ওড়ার স্বপ্ন আর ক'জনেরই আছে ? নিজকে, নিজের পরিবেশ-প্রতিবেশকে সাজানো-গোছানো হাতে গোণা আর সব বনী আদমের ন্যায় আবদুল মান্নানের বডিটিও নিশ্চয়ই সাড়ে তিন হাত। কিন্তু গাণিতিক বিশ্লেষণে ক্যালকুলেটরের বাটনে টিপতে থাকলে আমরা তাঁকে পাই নাটকের মঞ্চে, খেলধূলায়, ছাত্র রাজনীতিতে, কিশোর বয়সেই সমাজ কল্যাণ আর সমাজ সংস্কারের প্রথম সারিতে থাকা মায়ের সুবোধ ছেলে, ভাই-বোনের, আত্মীয়-স্বজনের ভালো ছেলেটি রূপে, মক্তব, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির ছাত্র রূপে। কোন কিছু সৃষ্টি করার নেশায় তিনি ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন 'চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর'। তাই তো তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেন, শিল্প হচ্ছে জীবনের জন্য, শিল্পের জন্য শিল্প- তা আমার নয়। গতিই জীবন- এ তত্ত্ববাক্য জীবনের ব্যারোমিটার হিসেবে গ্রহণ করে বেড়ে উঠতে থাকেন আর পাঁচজনের মতোই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম কিন্তু তিনিও নেননি। জীবনের বন্ধুর পথকে তিনি অতিক্রম করছেন কোদাল-খন্তা-হাতুড়ি-বাটাল চালিয়ে। এভারেস্ট বিজয় আর মহাকাশ বিজয়ের ইতিহাস যেভাবে আমাদের ভাবিয়ে তোলে- মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রায় ছয় দশকের ইতিহাসও আমাদের থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে বাধ্য করে। অনুপ্রেরণা যোগায়, কিছু একটা করতেও উদ্বুদ্ধ করে নিশ্চয়ই।

আজকের তিলোত্তমা রাজধানী ঢাকার উপকন্ঠের বাসিন্দা আবদুল মান্নানও ছুটে আসেন ঢাকায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন। পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। সেখানেও তিনি হাতে খড়ি থেকে শুরু করে ঈর্ষণীয় খ্যাতি আনতে সক্ষম হন। দেন নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের কল্যাণের জিঘিসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আশির দশকে ইসলামী ব্যাংকিং আর অর্থনীতি সমাজে প্রতিষ্ঠার ডাক এলে সেই মিছিলে যোগ দেন, এ ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় খ্যাতির চূড়ায় তিনি উঠতে সক্ষম হন। কর্মক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকালে তিনি ইসলামী ব্যাংকিং আর অর্থনীতিকে বিশ্বের প্রায় ২০০ টি দেশের প্রায় ৭০০ কোটি বনী আদমের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় ক্লান্তিহীন সময় ব্যয় করেছেন সফলভাবে। 'উলু বনে মুক্তো ছড়ানো'র কথাই মনে পড়ে তাঁর কাজ-কর্মে। পুকুর-ডোবা-খাল-বিলে পানির ফোঁটাও কারো চোখে পড়ে না- কিন্তু তিনি নামলেই মাছ পাবেন- 'আলাদিনের চেরাগ' আর কি?

টাইমফ্রেমে চলা আবদুল মান্নান এতো কিছুর পরও, এতো ঘাত-প্রতিঘাতের পরও থামবার পাত্র নন। কোনকিছু ধরলে তার শেষ দেখে তবেই তিনি সফলতার মালা পরে স্বস্তির হাফ ছাড়েন- বত্রিশটি দাঁত বের করে হি হি করে হাসেন শুকরিয়ার হাসি।

স্বার্থপর আর স্বার্থান্ধ তাঁকে মনে হয় না। যা শেখেন তা অন্যদের শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি অকৃপণ। মানুষ গড়ার অকৃপণ কারিগর এ লোকটি সহকর্মীদের যোগ্য করে তোলার যুদ্ধে নিরাপোষ, যার যে যোগ্যতা, তাকে সে অনুযায়ী এসাইনমেন্ট দিয়ে বিশ্বগ্রামের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে তাঁর মিছিল চলতে থাকে অবিরামগতিতে। 'না' মনে হয় তাঁর অভিধানে নেই। তাঁর আশপাশের

www.pathagar.com

কারোর মুখ থেকে 'না' বা 'পারি না' 'পারবো কি'? কথাগুলো শুনলে তাঁর চাঁদ কপালটি কুঁচকে লাল, নয় তো কালো হয়ে যায়। আজন্ম ইচ্ছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখার এ স্বপ্ন পুরুষের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এদেশের সীমানা অটুট রেখে ত্রিশ কোটি হাতকে কর্মীর শক্ত হাতে পরিণত করা। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের দেশের রূপ-রস-ঘ্রাণ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক। গ্রহিতার হাতগুলো দাতার হাতে পরিণত হোক- এটাই তাঁর দিবস-রজনীর ভাবনা। বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, একে আরো এগিয়ে নেয়া আমাদেরই দায়িত্ব-কর্তব্য। এই ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্যে তিনি দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান, দিক-নির্দেশনা দেন, গাইড লাইন দেন, পীঠ চাপটে ধন্যবাদ জানান, আবার ক্ষেত্রভেদে ছোঁড়েন তিরস্কারের তির্যক বান।

লেখক, ইতিহাস গবেষক, অনুবাদক, কলামিস্ট, ব্যাংকার, সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে চারপাশের মানুষ আজ 'ব্যাংকার' আর 'ইতিহাস গবেষক' অভিধায়ই অভিহিত করেন। ফুল যে রংয়েরই হোক না কেন, গন্ধ বিলিয়ে যাওয়াই তার ব্রত। পাপ-তাপ-দুঃখ-বিষাদে ভরা এ দেশে কোন কিছু করা যে কতোতো দুরূহ ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভুগিদেরই জানার কথা। যাদের দু'চার কলম লেখার অভ্যাস থাকে তাদের অন্তত না জানার কথা নয়, নির্দিষ্ট-নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ করে নিশিরাতে বাসায় ফিরে গা এলিয়ে দিয়ে নাক ডেকে না ঘুমিয়ে সাদা কাগজগুলো দ্রাক্ষারিত করা কতো যে কঠিন। আরামের ঘুম হারাম করার এ মিছিলের একজন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেই আমার বিশ্বাস। ব্যক্তিজীবনের আরাম-আয়েশের তোয়াক্কা না করার কারণেই তিনি বই আকারে জাতিকে ওজনী অনেক পাথর উপহার দিতে পেরেছেন, দিচ্ছেন, দেবেন- এটাই জাতির প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রতিভার মূল্যায়ন দিন-ক্ষণের সোজা পথে করলে কিন্তু অনাগত-কালের গবেষকরা ভুল করবেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন বাঁককে, তাঁর কালকে সামনে রেখে তবেই আবদুল মান্নানকে গবেষণার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে পরাতে হবে বিজয়ের অমূল্য মালা।

নিরস যে বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেন তাকে এককথায় আমরা ইতিহাস বলেই জানি, এই ইতিহাসটা কি- এ পর্যায়ে তার উপর আলোকপাত করা সঙ্গত মনে করি।

উপদেশাত্মক গল্প, কী রূপকথার সমষ্টি, কী অন্য কিছুর ইতিহাস-বিষয়টি নিয়ে অদ্যাবধি কুট-তর্ক কম হয়নি। ইতিহাসকে অতীত ঘটনাবলীর দর্পণ বলেন কেউ। আবার কেউ বলেন, ইতিহাস হলো রাজা-বাদশাহদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাহিনী, কেউ বা বলেন, সময়ের প্রেক্ষাপট মানুষকে জানানোই হলো ইতিহাস। বলা হয়ে থাকে, এটার ইতিহাস, ওই ঘটনার ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রজাতির ইতিহাস ইত্যাদি। কথাচ্ছলে আবার বলা হয় ওই লোকের ইতিহাসটা এ ধরনের। সরল রেখা টেনেই কথাগুলো বলতে বা লিখতে দেখা যায়। ফরমাশ করা হয় অতীত কাহিনী লিখতে- উপস্থাপন করতে। কোন বিষয়ের অতীত কাহিনী জানাকেই তাই বলা হয় ইতিহাস। সাধারণ মতে, অতীত কোন কিছুর বিবৃতি মানেই ইতিহাস। তা-ই যদি হবে তা হলে তো সব কিছুর ইতিহাস, সব ধরনের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সব কিছুই কী ইতিহাস? সব ঘটনাই কী ইতিহাসের অঙ্গ?

আভিধানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইতিহাস শব্দের অর্থ : ইতি (এ প্রকার) হ (সমাচার)= ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ বা প্রাচীন কথা) অস (নিক্ষেপ করা)+ ঘঞ্ অধিকরণ বাচ্য। শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং বিশেষ্য। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষকে প্রাচিন কথা বা কাহিনীর সাথে সাথে উপদেশ দানের মাধ্যমে যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, তা-ই ইতিহাস।

মহাভারতের মতানুসারে যাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ আর পুরাবৃত্ত কথা আছে, তা-ই ইতিহাস। বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, ঋষি প্রাক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম কথাদি যাতে আছে তা-ই ইতিহাস। দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস অলৌকিক বর্ণনার আধারও।

গ্রীক শব্দ 'হিস্টোরিয়া' থেকেই ইংরেজী হিস্ট্রি শব্দটি এসেছে বলে জানা যায়। এর অর্থ হচ্ছে অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। বিস্তৃত অর্থ হচ্ছে, অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের লিপিবদ্ধ দলিল। এ অর্থে যে কোন বিষয় সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানকেই হিস্ট্রি বলা যেতে পারে। তাই 'হিস্ট্রি অব দ্য সেরাসিনস' যেভাবে হতে পারে অনুরূপ হতে পারে 'হিস্টি' অব এনিম্যালস'; 'হিস্ট্রি অব কনস্টিটিউশন'; 'হিস্ট্রি অব ফিজিক্স' ইত্যাদি। আধুনিককালের ইতিহাসের জনকের দাবীদার গ্রীক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস। তিনি সেকালের গ্রীসবাসীর পরিচিত পৃথিবীর বহুস্থান

www.pathagar.com

ভ্রমণ করে সে-সব স্থানের অতীত ও সমকালীন অসংখ্য ঘটনা সরল গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কাছে আকর্ষণীয় আর ঈর্ষণীয় ঘটনাগুলোই তিনি অনুসন্ধান করেন। নিজেই বলেছেন : সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হবে- এমন সব ঘটনাই তিনি গদ্যচ্ছলে উপস্থাপন করেছেন মাত্র। অতীত ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সব ক্ষেত্রে তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার লেখার প্রতি গ্রীকবাসী এতই আকৃষ্ট হয়, পরবর্তীকালে ঠিক তার মতো অতীতের কাহিনী যেটার মধ্যে যা-ই রচিত হতো তাকেই তারা বলতো হিস্টোরিয়া। গল্পচ্ছলে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে হেরোডোটাস আজো গেঁড়ে বসে আছেন গুরুতর আসন।

হেরোডোটাসের পরবর্তী ঐতিহাসিক হিসেবে থুকিডাইডিস সামনে আসেন। তিনি অবশ্য অত্যন্ত নিপুণতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই তাকে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি মনে করেন, অতীতের যে সব রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনার বর্ণনা তার লেখায় আছে তা মানুষকে রাজনীতি শিক্ষা দেবে। উপদেশাত্মক ইতিহাস রচনার সারিতে থুকিডাইডিসকে আদর্শস্থানীয় মনে করা হয়।

জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে লিখেছেন, ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের কেবল জানাই, যেভাবে অন্যেরা আমাদের জানিয়েছেন।
ইবনে খালদুনের মতে, ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার কাহিনী, সমাজে যে পরিবর্তন আসে তার নিখুঁত-নিখাদ কাহিনী।

এ মতের কাছাকাছি অনেক প্রবক্তাই বলেন, যে কোন যুগ বোঝার চেষ্টাই সে যুগের ইতিহাস। সমগ্র সমাজ বা জাতির ক্রমবিকাশের কথাই হলো ইতিহাসের সারমর্ম।

আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা করে একটু আগ বাড়িয়ে বলেন, ইতিহাস হচ্ছে একটি সামাজিক বিজ্ঞান। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরা। তাই ঐতিহাসিকদের কাজ হচ্ছে দুটো-

১. বাস্তব ঘটনা যুক্তি-প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করা,
২. প্রতিষ্ঠিত ঘটনা সময়ের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা।

এ পর্যায়ে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, নিখিল বিশ্বের অতীত-বর্তমান ঘটনার বর্ণনা দ্বারা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করাই হবে ইতিহাসবিদের একমাত্র ব্রত।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির দিক-নির্দেশনায় মনে করা হয় রোমান ঐতিহাসিক সালুস্ট ছিলেন নিরপেক্ষ। তার রচনা ছিলো অলংকারবহুল।

রোমীয় ঐতিহাসিক লিভির উদ্দেশ্য ছিলো অতীত থেকে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের জন্যই ইতিহাস রচনা করা।

রোমান আরেক ঐতিহাসিক ছিলেন একেবারেই নৈরাশ্যবাদী। তার মতে, মানুষের ভাগ্য চিরতমশাচ্ছন্ন। তার লেখা পড়লে মনে হয় এই বুঝি মানুষের শেষ দিন ঘনিয়ে এলো।

প্রাচীনকালের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এমন ধারণার পাশাপাশি অধুনাকালের ঐতিহাসিকদেরও ইতিহাসের ওপর বিভিন্ন মতামত দেখা যায়, ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ.টি. বাকল ইতিহাসকে মনে করেন বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে উপাদানের মধ্যকার সূত্র আবিষ্কার করেন, এ উপাদানগুলোকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করেন, তিনিও ইতিহাসে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করা আর এসব ঘটনাকে তার প্রকৃতি ও প্রকার অনুযায়ী একত্রিত করা, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা উচিত বলে মনে করেন।

ঐতিহাসিক সিলি ও বিউরিও এমন মতামতই পোষণ করেন। ভাবোচ্ছাসের পরিবর্তে ভাব-গাম্ভীর্য নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি বিজ্ঞানসমুচিত সত্যানুসন্ধানে তারা ব্যাপৃত থাকতেন বলেই মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন! ইতিহাস হলো একটি বিজ্ঞান। তার কমও নয়, বেশিও নয়। বৈজ্ঞানিকের যা-ই কাজ, একই কাজ ঐতিহাসিকেরও।

জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ভন রেঙ্কের মতে, ইতিহাস এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঠিক তা-ই যেন যথাযথ প্রতিফলিত হয়। নিতান্তই সংকীর্ণতার সাথে ইতিহাসের ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সত্যতা যাচাই-বাছাই করতে

www.pathagar.com

হবে। আর ইতিহাসের কোন উপসংহার কিন্তু টানা চলবে না। ইতিহাস হবে একটি দর্পণ, ঠিক চেহারাটিই যেন ঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়।

আবার ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়নের কাছে ইতিহাস হলো সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ। তিনি মনে করেন, ঐতিহাসিক শিল্পীর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক হবে। ইতিহাসের প্রাসাদ গড়তে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাল-মসলার উপাদান; এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক একজন বৈজ্ঞানিক। সংগ্রহের পর সৃজন-কলা, মূল কাঠামো গড়ার পর যেমন আসে কারুকর্ম; তখন ঐতিহাসিক শিল্পী যিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে অতিসাধারণ নিষ্প্রাণ বস্তুকে করে তোলেন প্রাণবন্ত।

ধারাবাহিক ডান-বাম, প্রাচ্য-প্রতীচ্য যে কোন ইতিহাসের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হবে সমাজ, দর্শন, পরিবেশ, অর্থনীতি আর রাজনীতি দ্বারা ঐতিহাসিকরা প্রভাবিত। তাই তো দেখা যায়, হেরোডোটাস পারস্যের শক্তি ও সম্পদে মুগ্ধ হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। থুকিডাইডিস গ্রীক গণরাষ্ট্রগুলোতে ভূমি-অভিজাত ও নগরের বণিক শ্রেণীর গৃহযুদ্ধের জন্যে নিন্দাবাদ করলেও গণতান্ত্রিক জনতার প্রতি ছিলেন নিতান্ত সহানুভূতিশীল। লিভি এবং টেসিটাস ছিলেন রোমান সাধারণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। গিবন প্রাচীন রোমান সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ ভক্ত আর মধ্য- যুগীয় সমাজ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। অনুরূপ দেখা যায়, গিজো, থিয়েরী, মিগনে প্রমুখ ফরাসী ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় অভিজাত ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । জার্মান ঐতিহাসিক ট্রেইয়স্কি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রতীয়মান হলো, ইতিহাসের উৎস হচ্ছে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব। আর ইতিহাস ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়মুখীন হতে পারে না, অবশ্যই ব্যক্তিগত বা পাত্রগত হতে বাধ্য বলেই বিষয় বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ জন্যে কলিংউড 'ইতিহাসের জন্য ইতিহাস' তত্ত্বের সমর্থক। তার মতে, সব ইতিহাসই হচ্ছে ধারণার ইতিহাস। ঐতিহাসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় ধারণা থেকেই।

আবার ইতালীর ঐতিহাসিক বেনেদেতো ক্রোচে ইতিহাস এবং দর্শনকে দেখেন অভিন্ন রূপে। তিনি মনে করেন, ইতিহাস সব সময়ই সমকালীন, কারণ অতীত সম্পর্কে বর্তমান মনোভাবই হচ্ছে ইতিহাস। আমেরিকার ঐতিহাসিক রবিনসন মত ব্যক্ত করে বলেন, ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টাই বৃথা। ঐতিহাসিকদের কাজ হলো, মানবজাতি সম্পর্কে অতীতের যে কোন সত্য উদঘাটন করা। অবশ্য, আকর্ষণীয় আর গুরুত্বপূর্ণের বিষয়টি তো থাকতেই হবে সামনে।

উপরের নাতিদীর্ঘ আলোচনায় দেখা গেছে এ নিয়ে মতপার্থক্যের শেষ নেই, নেই কোন কূল-কিনারা। তাই দেখা যায়, ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বেরও উদ্ভব হয়েছে। যেমন ধরা যাক- ঐশ্বরিক মতবাদ, উদ্দেশ্যবাদ, মহামানবতত্ত্ব, অঙ্গ-সংস্থানী মতবাদ, প্রতিবন্ধকতা ও সাড়া প্রদান মতবাদ, সারগ্রাহী বা সংস্কৃতি মতবাদ, রৈখিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, ভৌগোলিক মতবাদ, বৈজ্ঞানিক মতবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইত্যাদি।

আমাদের আলোচ্য ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে তা হলে আমরা কোন্ ধারার ইতিহাস গবেষকের সারিতে দেখবো ? তাঁর গবেষণালব্ধ ইতিহাসকেই বা আমরা কোন্ পাল্লায় মেপে তুল্য-মূল্য বিশ্লেষণের প্রয়াস পাবো? এ জন্যে আমাদেরকে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। আস্তিক বনী আদম মাত্রেই আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল এবং ঐশী গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমানের কোন বিকল্প নেই। আল-কুরআন আস্তিকদের ইতিহাসের অমূল্য আকর।

সেই কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানব আর জিন জাতিকে আল্লাহ একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই যে জিন জাতি তাদের কাছেও কিন্তু নবী পাঠিয়েছেন। ওশী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন বলে 'হায়াতুল হায়ওয়ান ' গ্রন্থের ২য় খন্ডে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়ে দেখিয়ে দেয়, হযরত আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.), নূহ (আ.) থেকে ইবরাহী (আ.), ইবরাহীম থেকে ঈসা (আ.), ঈসা (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত পৃথিবীতে এক বা দু'লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল একশ' চারখানা কিতাব ও ছহীফা নিয়ে এসে যুগে-যুগে, দেশে-দেশে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছিলেন অবিশ্রান্ত। ইসলামের পূর্ণতা আসে কুরআনের মাধ্যমে আর মহানবীর মাধ্যমে। এরপর আমরা ইবন ইসহাক, ইবন হিশাম, ওয়াকিদী, তাবারী, ইবন খালদূন প্রমুখ আস্তিক বনী আদমের নির্ভেজাল আর নির্লিপ্ত ইতিহাসের কাছে ছুটে যাই। এরই ধারাক্রমে পৃথিবীতে কতো শত ইতিহাস রচিত হয়েছে তার কোন হিসেব নেই।

এক সময় মুসলমানরাই পৃথিবীতে কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ভারতীয় উপমহাদেশেও প্রায় আটশ' বছর ছিলো মুসলিম শাসন। এরপর বৃটিশ বেনিয়ারা বাণিজ্যব্যাপদেশে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসলো। ইংরেজদের ঘানি টানতে হলো মুনলমানদের। রাতের অন্ধকারে আর তপ্তরৌদ্রময় দ্বিপ্রহরে কতো শতো ঘটনা ঘটেছে পর্দার অন্তরালে, তারও বা কোন দলিল থাকবে কোত্থেকে। আমাদের সুযোগ্য পূর্বসূরীরা বৈরি পরিবেশে নির্ভীকভাবে কলম ধরেছিলেন। তারপরও আমাদের প্রতিপক্ষ লালাজিরা মিথ্যাকে এমনভাবে সত্য হিসেবে খাইয়ে দেয়ার জিগির উঠাতে থাকেন, মনে হয় তা মিথ্যা নয় আসলেই সত্যি। 'উত্তরে বলিলে দক্ষিণে যাইবে', এই চানক্য নীতির কাছে মুসলমানরা তো হাবা-গোবা। এই হাবা-গোবা মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বুকটান করে এসব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মসি ধারণ করেছেন। আবার বর্ণচোরা অনেক নামধারী মুসলমান মিথ্যাকেই বাজিয়ে যাচ্ছে ডুগডুগি। সত্যানুসন্ধানের যে মিছিল মশাল হাতে নিয়ে মানজিলে মাকসুদে পৌছার শপথে ক্লান্তিহীন, সেই সৈনিকদের অধুনাকালের প্রথমসারির সৈনিক হলেন আমাদের ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি তাঁর কাল-স্থান আর পাত্রের চাহিদার তাকিদে ইতিহাসের ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ আর নিরস বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। এটা তাঁর মিশন। এ মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়াই তাঁর টার্গেট। এ টার্গেট বাস্তবায়নের জন্যেই তাঁকে আরামের ঘুমকে হারাম করতে হচ্ছে। শ্রান্তি-ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলে দেয়ার জন্যে নিঝুম রাতে বারবার বাথরুমে যেতে হচ্ছে চোখ-মুখে পানি দেয়ার জন্যে। দেশমাতৃকার প্রতি নির্দিষ্ট-নির্ধারিত দায়িত্ববোধ না থাকলে কোন বাংলাদেশীর এমনটি করার কথা নয়। আমরা আলোকিত মানুষের জিগির শুনি, সুশীল সমাজের গালভরা বুলি শুনতে শুনতে তো ইদানীং আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল ভিলেজের এদেশের মানুষগুলোর মধ্যে দেশমাতৃকার নিখাদ স্বার্থরক্ষায় ক'জন এগিয়ে আসছেন? আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তো শহরে-হাটে-মাঠে-ঘাটে অনেক রসালো কথা শোনা যায়। এসব পরজীবীর বিরুদ্ধে মসি ধারণ করা কম সাহসের কথা নয়। তাদের কথায় উঠ-বস করতে না পারলে আবার অসামাজিক হয়ে যেতে হবে- এ ভয়ে অনেকে টেবিলটকে গলা ফাটান সত্য, কিন্তু দু'কলম লেখার বেলায় ভিজা বিড়াল বনে যান। আবদুল মান্নান ভাইদের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীরাই সমালোচনা আর কারো চোখ রাঙ্গানিকে থোড়াই তোয়াক্কা করে শাদাকে শাদা আর কালোকে কালো বলার মিছিলের প্রথম সারির সৈনিক হিসেবে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন জাতির জন্যে। বেচারা হাবা-গোবা মানুষগুলোকে ইতিহাস-ঐতিহ্য আর শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অবগাহন করিয়ে অমোঘ চাবুকাঘাতে জর্জরিত করার প্রশ্নে নিরাপোষ। জানতেই হবে আমাদের সোনালী ইতিহাস-ঐতিহ্য। কি ছিলো না আমাদের? আজও আমাদের কি নেই? কিন্তু আমাদের আপামর জনতা আমাদের সোনালী অতীত সম্পর্কে বেখবর। তাদেরকে স্বশিক্ষিত করার জন্যে পরিকল্পনামাফিক কাজ করার ক্ষেত্রে মান্নান ভাইয়ের তুলনা তিনি নিজেই। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে, এ মাটিকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা, আর এর রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু আমরা দায়িত্ব সচেতন নই। আমাদেরকে দায়িত্ব সচেতন করার জন্যেই মান্নান ভাইয়ের অব্যর্থ তীর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ তীর নিক্ষেপ সে-ই করতে পারে, যার বুকের পাটা অত্যন্ত মজবুত। কেনা-বেচার প্রেক্ষাপটে গিভ এন্ড টেকটাই এখন একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্যে ওদের হ্যাঁ-এর সাথে হ্যাঁ মিলানোর কোন বিকল্প নেই। জাগতিক সব কিছুর দায়িত্ব ওরা নিয়ে লোভী মানুষগুলোকে সোজা পাঠিয়ে দিচ্ছে হাবিয়া দোযখে। নির্বোধ ওরা ভাবছে, সবই তো পেলাম। জীবনটা তো ভালোই কাটছে। ছেলে-মেয়েগুলোদের তো হিল্লী-দিল্লী-লন্ডন-আমেরিকা-কানাডায় সেটেল করতে পারলাম। এ দলের লোক মান্নান ভাই নন বিধায় ইতিহাসের ইতিহাস রচনা করে চলেছেন অকুতোভয়ে। তাঁর ইতিহাস রচনার রীতি-নীতি অভিনব। একই বিষয়ে যতো কথা-বার্তা আছে, সব একত্রিত করে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, প্রতিনিয়ত আমরা বিষ খেয়ে বিষ হজম করছি। আমাদেরকে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে এই বিষ খাওয়া থেকে এখনই বিরত থাকতে হবে। তা না হলে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র একদিন ধ্বংস হতে বাধ্য।

তিনি ব্যবস্থাপত্র লেখার ব্যাপারে অব্যর্থ। তাঁর কথাটি তিনি সোজা-সাপ্টা বলে সাবধান করেন নিতান্ত নির্ভয়ে। কঠিন সত্য কথা বলতে তাঁর বুক একটুও কাঁপে না। তাঁর হারাবার কোন ভয় নেই। পাওয়ার লোভ তাঁকে পঙ্গু করে না কখনো। দাতার হাত তাঁকে মনুষ্যত্বের উচ্চ সোপানে উঠিয়েছে। মানুষ আর মানবতার জয়গানে তিনি নিরাপোষ শিল্পী। গাদ্দার ইহুদী আর খ্রীষ্টানদের বিশ্বমানবতা থেতলে দেবার প্রতিবাদেও তিনি উচ্চকণ্ঠ। আশপাশের মানুষগুলোর জন্যে তিনি হাউ-মাউ কেঁদে উঠেন। কিছু একটা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি কাউকেই শত্রু মনে করেন না। এসব গুণের সমাহার তাঁর মধ্যে থাকায় তিনি পেয়েছেনও অনেক। বাকী থাকলো-

মরিলে হাসিবে তুমি
কাঁদিবে ভুবন।

লেখক : গবেষক, অনুবাদক, সংস্কৃতি সেবী, সম্পাদক, আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা

www.pathagar.com

'আমাদের' জাতিসত্তার বিকাশধারায় 'আমরা'

ড. মাহফুজ পারভেজ

জাতিসত্তার সফল ইংরেজি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ethnic বা ethnicity শব্দগুলোকে। ১৪ শতকে ল্যাটিন ethnicns শব্দটি আসে গ্রীক ethnikos শব্দটি থেকে এবং ইংরেজিতে সেটা ethnic হয়ে যায়। যার অর্থ "People, nation, self" অভিধানে শব্দটির আরও কিছু অর্থ পাওয়া যায় :

1. Member of an ethnic group : a member of an ethnic group within a society.
2. Sharing cultural characteristics sharing distinctive cultural traits as a group in society.
3. Ethnic minorities : A group sharing cultural characteristics : relating to a group or groups in society with distinctive cultural traits.
4. Ethnic origins : of specified origin or culture: relating to a person or to a large group of people who share a national, racial, linguistic, or religious heritage, whether or not they reside in their countries of origin.
5. Culturally traditional : belonging to or typical of the traditional culture of a social group.

সংজ্ঞাসমূহের আক্ষরিক অনুবাদ না করে সামগ্রিক ভাবার্থ নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, এথনিসি বা জাতিসত্তা হলো এক দল মানুষের বিশেষ ধরনের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, আচার-আচারণগত, পোশাক-পরিচ্ছেদ, মূল্যবোধ, দর্শন, ধর্ম, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ইত্যাদির সমন্বয়। এরা একটি দেশে বসবাস করতে পারে, আবার বহু দেশেও বসবাস করতে পারে। তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র থাকতেও পারে, কিংবা না-ও থাকতে পারে। যেমন-কুর্দিদের কোন স্বাধীন দেশ নেই। এ জন্য কুর্দি জাতিসত্তাকে নাকচ করে দেয়ার কোন ভিত্তি নেই। ভারতের কাশ্মিরি, শিখ/পাঞ্জাবি, মিজো, নাগা, মণিপুরি, অহমিয়া, গারোদের জাতিসত্তা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। স্বাধীনতা পায়নি বলে তাদের জাতিসত্তা শেষ হয়ে যায়নি। অন্যদিকে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালিরা ভারতীয় জাতীয়তা গ্রহণ করলেও বাঙ্গালি জাতিসত্তা ত্যাগ করেন নি। বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালিরা পাকিস্তানি জাতীয়তা ত্যাগ করে বাংলাদেশি জাতীয়তা ও জাতিসত্তা যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেভাবে ভারতীয় জাতীয়তা ত্যাগ করে বাঙ্গালি জাতিসত্তার পক্ষের কোন জাতীয়তা গ্রহণ করা ভারতীয় বাঙ্গালির পক্ষে সম্ভব হয় নি। এখানেই জাতিসত্তার প্রকৃত সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ফুটে ওঠে, যার মাধ্যমে 'আমাদের অন্যায়ের' প্রভেদটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। একই বিট্রিশ যুক্তরাজ্যের অধীন হয়েও ইংরেজ ও আইরিশ যেমন এক নয় : একই বাংলা ভাষায় কথা বলে বাংলাদেশের বাঙ্গালি আর পশ্চিম বঙ্গ বা আসামের বাঙ্গালি এক নয়। কিছু কিছু মিল মানেই একাত্মতা নয়। কোথায় সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় পার্থক্যটুকু রয়েছে, সেটা বুঝতে হবে। উড়িয়া ও অহমিয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কিছু মিল মানে তো এই নয় যে, বাংলা, উড়িয়া ও অহমিয়া একই ভাষা? ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, বিশ্বাস ও পরম্পরার মধ্যে ঐক্য না হলে জাতীয়তা বা জাতিসত্তাগত দিক থেকে ঐক্য হওয়া অসম্ভব। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত খুব চেষ্টা করার পরেও ১৯৪৭ সালে এসে ভারতে বাঙ্গালিরা যেমনভাবে 'আমাদের' সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে নি, তেমনিভাবে পাকিস্তানিরাও পারে নি। এটা হয়েছে জাতীয়তা বা জাতিসত্তাগত দিক থেকে ঐক্যের অভাবে। তথা ভারতের বাঙ্গালি বা পাকিস্তানিরা কেউই দূরের ছিলেন না : বাঙালিরা ছিলেন ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে কাছাকাছি কিন্তু বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দিক থেকে দূরবর্তী। পাকিস্তানিরাও ছিলেন ধর্ম ও ঐতিহ্যের দিক থেকে কাছাকাছি কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দূরবর্তী। ফলে

www.pathagar.com

'আমাদের' সঙ্গে কোন কোন দিক দিয়ে মিল থাকলেই সবাই যে 'আমাদের' অংশ হবেন, তা নয়। এখানেই 'আমাদের' সঙ্গে 'অন্যদের' পার্থক্য।

প্রসঙ্গত একটি বই-এর উল্লেখ করা যায়, যাতে জাতিসত্তাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছে। বইটির লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, যিনি ইতিহাসবিদ ও গবেষক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। বইটির নাম 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে এবং ২০০৬ সালের মার্চে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড। জাতীয় অধ্যাপক ও বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী লেখক প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বইটি সম্পর্কে লিখেছেন : '(বইটি) আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় নতুন করে উদঘাটিত করেছে। আমরা একটি বিশেষ ভূখণ্ডের অধিকারী এবং সেই ভূখণ্ডের অতীত এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে সে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তা আমল থেকে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে পাওয়া যায়।'

বইটি সম্পর্কে কলিকাতার 'সাপ্তাহিক কলম' লিখেছে : "বিশ্বের মানচিত্রে একটি জনগোষ্ঠী কিভাবে একটি অনন্য জাতিসত্তার পরিচিতি লাভ করলো, তার প্রোফাইল এই গ্রন্থ। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন, কিভাবে যুগে যুগে শোষণ, বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রান্তির পথ পেরিয়ে একটি জাতি তার সবুজ জমিনে লাল সূর্যকে অঙ্কিত করেছে। এই গবেষণা গ্রন্থটি একটি বলিষ্ঠ দিগদর্শন।" অন্যদিকে, 'নতুন সফর' পত্রিকার মতে; "মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের ক্রমধারাকে শুধু চিহ্নিতই করেনি, বরং গবেষকদের জন্য অসংখ্য উপাদান চয়ন করেছেন। আমরা যাতে সঠিক সময়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি, সে জন্য বইটির বহুল প্রচার অত্যন্ত জরুরি।"

স্বাধীনতা ও জাতিসত্তার বিষয়টি আবেগ ও অতিরঞ্জন এবং কোনরূপ আরোপের ঊর্ধ্বে এমন একটি বাস্তবতা যা ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধর্ম, মূল্যবোধ ইত্যাদির হাত ধরাধরির মধ্য দিয়ে অতীতের গভীর থেকে বর্তমানের খোলা চত্বরে এসে উপনীত হয়েছে। এই স্পর্শকাতর বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি ও আবেগের মাতামাতির সঙ্গে বাইরে (আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক) চাপিয়ে দেয়া প্রবণতা বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফলে নতুন প্রজন্মকে তথ্য-সত্যের আলোকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ভাষায় বলা যায় : "রাষ্ট্র কখনও সাগরের বুকে একটি দ্বীপের মত হঠাৎ জেগে ওঠে না। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখারও একটি পুরাতত্ত্ব থাকে, তার একটি অতীত থাকে। বর্তমান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হল পূর্বপুরুষদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। সেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত হয় বর্তমান স্বাধীনতার শিকড়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষদের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এই সংগ্রামের রয়েছে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা ও অসামান্য বহমানতা। সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব-পতাকা হাতে এই ভাটি অঞ্চলের সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই করেছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এই জনপদে বিবেচিত হয়েছে উপমহাদেশের বিশাল মানচিত্রে আর্যপূর্ণ সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল রূপ। এলাকার জনগণের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিকট-অতীতে এ লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটর বর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্যরা তাদের অধিকার বিস্তৃত করে নানা ঘোর পথে যখন এ বদ্বীপে উপনীত হল, তখন থেকে একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশের জনগণের আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াই পর্যন্ত ও জাতির সংগ্রাম ও সংক্ষোভের মূলধারা রচিত হয়েছে অভিন্ন প্রেরণার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। এ অঞ্চলের মানুষের বংশধারা বহু-বিচিত্র রক্ত প্রবাহের মিশেল ঘটেছে। সেমিটিক দ্রাবিড় রক্তের সাথে এসে মিশেছে অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলীয়, এমনকি আর্য-রক্তের ধারা। এ প্রবাহ এমনভাবে মিশে গেছে যে, নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় কাউকে এখন আর স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। চেহারার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এলাকার গরিষ্ঠ মানুষের মিল রয়েছে তাদের জীবনদৃষ্টিতে। জীবনদৃষ্টির অভিন্নতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তাদের জীবনের অভিন্ন লক্ষ্য এবং একত্রে বসবাসের ও জীবনধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বাসনা ও প্রতিজ্ঞা।

www.pathagar.com

অভিন্ন বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জন্ম হয়েছে তাদের একটি জীবনচেতনা ও আচরণরীতি। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের সংগ্রামে এই জীবনচেতনাই স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের সংগ্রামের লক্ষ্যকে এই জীবচেতনাই নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নির্মাণ করেছে তাদের ইতিহাস। এভাবে এ এলাকার মানুষের বোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত নিরন্তর সংগ্রামের ধারাকে অবলম্বন করেই তাদের একটি পরিচয় নির্মিত হয়েছে। এ পরিচয়ই তাদের জাতিসত্তার ভিত্তি।"

উপসংহারে বলা যায়, মোহাম্মদ আবদুল মন্নান 'আমাদের' জাতিসত্তার বিকাশধারায় 'আমরা' কারা, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'আমরা' যে আমরাই, 'অন্যদের' মত নই, সেটাও বুঝিয়েছেন। 'আমরা' কাদের জন্য বিকৃত হয়েছি, 'আমাদের' মত থাকতে পারি নি বা পারছি না, সেই ইতিবৃত্তকেও তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের ভেতরে নিহিত রয়েছে জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক আত্মিক দলিল : সামাজিক পরম্পরার সেতুবন্ধন, রাজনৈতিক সংগ্রামের এপিটাফ এবং অর্থনৈতিক শোষণের খোলা ইশতেহার। এই বই-এর আগে জাতিসত্তার অস্তিত্বের মৌল বিন্যাস ও জ্যামিতিটিকে এত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আর কখনও পাওয়া যায় নি। এখন লেখকের বৌদ্ধিক অভিযাত্রার সঙ্গে পাঠকের বিবেকের আত্যান্বেষী সংশ্লেষ ঘটিয়ে জাতিসত্তার অভিমুখে পৌঁছানো ও বিকাশধারাকে নির্বিঘ্ন করা সামগ্রিকভাবে 'আমাদের' দায়িত্ব। মূল বিচারে 'আমরাই' হলাম জাতিসত্তার ভ্যানগার্ড, 'আমাদের' অতীত ও ইতিহাসের সংরক্ষক এবং 'আমাদের' ভবিষ্যতের বিনির্মাতা।

ড. মাহফুজ পারভেজ : কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলামিস্ট, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

লেখক ও ব্যাংকার
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
মুঃ ফরীদউদদীন আহমাদ

পূর্বের পেশার সাথে সম্পর্কহীন নতুন পেশার মাঝপথে এসে প্রতিষ্ঠালাভ করা দুরূহ ব্যাপার হলেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর ক্ষেত্রে তা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চলমান ঘটনাবলীর প্রাত্যহিক রূপকার সাংবাদিক মান্নান ইসলামী ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব জনমনে প্রথিত করার প্রত্যয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদান করলেও সহসাই এর প্রায়োগিক দিক তাকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাই বর্তমানে একজন পেশাদার ইসলামী ব্যাংকার। অন্যদিকে উঠতি বয়সে তাঁর মধ্যে দেশ-জাতি ও সমাজ চেতনার যে বীজ অংকুরিত হয় এবং সাংবাদিকতর পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বিকাশমান ছিল তার চর্চা তিনি নিষ্ঠার সাথে অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে মান্নানের রচিত ইতিহাস ভিত্তিক বই 'বাংলা ও বাঙ্গালী মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' প্রকশিত হয়েছে। এসব বইয়ে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে 'যখন যে ঘটনা যেভাবে' তিনি তা অবিকল তুলে ধরার প্রয়াস চলিয়েছেন। তাঁর বইগুলো পড়লে মনে হয় 'ইতিহাস কথা কয়'। মান্নানের রচিত বইগুলো সমাজসেবী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রানিত করবে। 'ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বিষয়েও ইতোমধ্যে তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। মান্নানের ইতিহাস চেতনায় লেখা এ বইয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশ ও ব্যবহারিক দিকগুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশ-জাতি ও সমাজের সঠিক চিত্র তুলে ধরার বাসনা এবং জীবন পরিক্রমার মধ্যগগনে এসে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা মিশন হিসেবে বেছে নেয়াই এ দুটো বিষয়ে মান্ননকে পারদর্শী করে তুলেছে।

সদাহাস্য ও অনুপম ব্যবহারের এ লোকটি তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন নিঃসন্দেহে।

লেখক : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

www.pathagar.com

লেখক-ব্যাংকার আবদুল মান্নান
প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ

ইতিহাসবিদ, গবেষক, শেকড়সন্ধানী ও মননশীল লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (১৯৫২)-এর লেখালেখির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। লেখালেখির মূল ক্ষেত্র বাংলাদেশের ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াও গবেষণা পদ্ধতিসহ অন্যান্য জটিল কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর সাবলীল পদচারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও বৈচিত্র্যপ্রয়াসী কর্মবীর মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের অনুসন্ধিৎসু মন এক জায়গায় থেমে থাকেনি। আহরণ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যসহ নানা দেশের অভিজ্ঞতা। লিখেছেন আকর্ষণীয় ঢংয়ে ভ্রমণ কাহিনী। আপাতত থেমেছেন ব্যাংকিংয়ের জটিল কিন্তু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্বেষায়। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও এসেছে আরাধ্য সাফল্য। ব্যাংকিং জগতের সার্বক্ষনিকতাও তাঁকে লেখালেখি থেকে দূরে রাখতে পারেনি। কলম রয়েছে গতিশীল। সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর এক বিচিত্রধর্মী মৌলিক রচনা। বাড়ছে গ্রন্থ সংখ্যা। আমি লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও আরও বর্ণাঢ্য ভবিষ্যৎ একান্তভাবে কামনা করছি।

লেখক : গ্রন্থকার, কলাম লেখক, সংগঠক, চেয়ারম্যান- সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন শেকড় সন্ধানী লেখক
আখতার-উল-আলম

মনীষী সিসেরো বলে গেছেন, একটি পুস্তকের পেছনে থাকে একজন লেখক। সে লেখকের পেছনে থাকে সুদীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তেমনি একজন লেখক যিনি নিজেকে, নিজের পরিচয়কে জানতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। তাঁর মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ শুধুমাত্র ইতিহাসের চর্চা ও অনুশীলনের ফসল নয়, তারো বেশী কিছু এবং অনেক কিছু।

এতে দেখা যায় একজন লেখক অভিনিবেশ সহকারে নিজ শেকড়ের সন্ধান করছেন এবং নিজেকে দাঁড় করাতে চাইছেন গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের পটভূমিকায়।

তাঁর সেই প্রয়াস সার্থকতা পেয়েছে, যখন দেখি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর কোন বক্তব্যকে শুধু কথামালা দিয়ে সাজিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছেন না, বরং সেই সাথে তিনি নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করছেন তথ্য-উপাত্ত এবং প্রমাণ দলিলের ভিত্তিতে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কেন না সামনে রয়েছে তাঁর আরো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। নিছক সাধুবাদ দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব শেষ করতে চাই না। কেননা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের নিকট থেকে আমার প্রত্যাশা অনেক।

বলা বাহুল্য, সে প্রত্যাশা দেশ ও জাতির প্রত্যাশা থেকে আলাদা নয়। আলাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন এবং দেশ ও জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণের তওফিক দান করুন। আমীন।

আখতার-উল-আলম ঃ সাংবাদিক, সাবেক উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, সাবেক রাষ্ট্রদূত

www.pathagar.com

নিরন্তর সৃজনশীল কারিগর

মুঃ আযীযুল হক

সভ্যতাকে বিবেচনার নৈর্ব্যক্তিক ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টি মানুষের সংস্কৃতির গতিবিধিতে বিকিরণ ঘটিয়েছে। সংস্কৃতিতে গভীর মানবিক ব্যঞ্জনা অপসৃয়মান। নান্দনিকতার মনুষ্যত্ববিহীন বিকাশ আমাদের সততার মৃত্যু পরিণামকে করেছে গ্রাহ্য। আমরা উপলব্ধি করছি সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস জানতে সৎ মানবীয় ও গভীরতর দৃষ্টির প্রয়োজন। সংস্কৃতির যে জ্ঞানবৃত্তিক প্রস্থানভূমি, সেখানে আজ মৌলবদল জরুরী হয়ে পড়েছে। সভ্যতার প্রগতিকে যথাঅর্থে বিবেচনা ও তার বিকাশের স্বাভাবিক পথকে রুদ্ধ না করে তাতে জ্ঞান ও সংস্কৃতির মহত্তর সংগীতকে বাঙ্ময় ও সচল করে তুলবার জন্য আমাদের অসাধারণ ব্যাখ্যা সম্বলিত ইতিহাস গ্রন্থ বারে-বারে পাঠ করতে হবে। এমন ইতিহাস মনস্ক ব্যক্তি আমদের সমাজে এখন বড্ড প্রয়োজন। যিনি গবেষণা করবেন দেশের অখন্ড জাতীয় সত্তা নিয়ে। ইতিহাসের আড়ালের ইতিহাস তিনি তুলে আনবেন সত্যাশ্রয়ী কলমের ডগায় সততা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমলব্ধ চিন্তার স্ফূরণে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এই ভূমিকার অবতারণা করলাম।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জন্মলগ্নে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্টে যোগদান করেন। ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি একজন জাঁদরেল সাংবাদিক ছিলেন। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে দেখেছি কর্মোদ্দীপনা। আমাদের দেশে একই সঙ্গে সুপুরুষ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাসম্পন্ন ও ইসলামী ভাবাপন্ন ব্যক্তির সাক্ষাত পাওয়া মুশকিল। কিন্তু বিস্ময় সহকারে আমি দেখলাম মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মধ্যে তিনটি বিষয়ই বিদ্যমান। আমি অনুধাবন করলাম এই তরুণ জীবনে অনেক দূর যাবেন।

ফিউচারের জন্য লোক তৈরি করাই আমার কাজ। আমি তাঁকে ভবিষ্যত ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের নেতা হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তাঁকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করি। ইসলামী ব্যাংকিং সংগঠন পরিচালনা, বিভিন্ন আলোচনা ও একত্র ভ্রমণে আমি তাঁকে ক্রমশ আরো ভালোভাবে আবিষ্কার করি, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করি। বিভিন্ন সময় আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে বলি, জেনারেল ব্যাংকিং-এ আপনাকে কাজ করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক আপনার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। একদিন তিনি নিজেই এসে এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বললেন। বললেন, 'স্যার আমি এখন জেনারেল ব্যাংকিং-এ কাজ করতে রাজি।' আমি প্রসেস শুরু করলাম এবং দ্রুত তাঁকে জেনারেল ব্যাংকিং-এ জয়েন করানো হল।

যশোর ব্রাঞ্চে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে নতুন দায়িত্ব দিয়ে তাঁর ব্যাংকিং সেকটরে মূলধারার কার্যক্রম শুরু হয়। যেহেতু তাঁকে বলেছিলাম সাইড লাইনে পড়ে থাকা চলবে না, ইউ কাম টু মেইন স্ট্রীম। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান নিজেকে উপস্থাপন করলেন সর্বোচ্চ পরিশ্রম দিয়ে। যশোরে সফল ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করলেন তিনি। এরপর তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হল মৌচাকে। সেখানে আরো নতুন নতুন সফলতা উপহার দিলেন তিনি। তিনি মূলধারার ব্যাংকিং ও পাবলিক রিলেশনস সাইড সমন্বয় করে অসাধারণ সফল হলেন। তখন আমরা তাঁকে সৌদি আরবে পাঠালাম। সেখানে তিনি ইসলামী ব্যাংকিং প্রমোট করা, অনেক বিদেশী ব্যাংক ভিজিট, বহু বিদেশীর সাক্ষাত লাভ করে অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ক্রমশ বড় করেছেন।

কয়েক বছর মধ্যপ্রাচ্যে কাটিয়ে দেশে এসে হেড অফিস কমপেক্স কর্পোরেট শাখার ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পান। সে সময় তাঁর সঙ্গে কিছু

www.pathagar.com

মেধাবী অফিসার দেয়া হয় শাখা উন্নয়নের জন্য। সেখানেও আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রমঘনিষ্ঠ কর্মকান্ড পরিচালনা করে শাখাকে একটা বিশেষ মানে উন্নীত করেন। এরপর ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেন ও বর্তমানে ইনভেস্টমেন্ট উইং-এর প্রধান হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ছিলেন সফল সাংবাদিক। ব্যাংকার হয়ে তিনি সফলতার চূড়া স্পর্শ করেছেন। আমি তাঁর এই সফলতাকে অভিভাবকের মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করি। সবচে যেটা বিস্ময় জাগায় তা হলো, ব্যাংকিং ক্যারিয়ার গড়ার জন্য কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর হাতের কলম ছাড়েন নি। আমাদের জাতিসত্তা বিকাশের মূলধারায় কাজ করা খুবই বড় চিন্তার বিষয়। তিনি এই কাজটি অক্লান্তভাবে করে চলেছেন।

একটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণ হয় মূলত সাহিত্য, ইতিহাস, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ধর্ম-দর্শনের ভিত্তিতে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে (ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে) সমাজ বইয়ে পাল-সেন-বৌদ্ধদের ইতিহাস অনেক বড় করে লেখা আছে, যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। কিন্তু ১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতার যে বিস্ময়কর উত্থান ও শাসনকাল এবং এ জনপদকে মুসলিম শাসন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবে যে উন্নতি সমৃদ্ধি ও সৌকর্যের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিলো, সে আলোচনা সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। সে সময়ের কথা লেখা আছে স্বল্পপৃষ্ঠাব্যাপী।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোক মুসলমান। আমাদের সন্তানদের আদর্শগত চেতনা ও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য পাল-সেন আমল বেশী জরুরী না সুলতানী আমল ও মোগল সাম্রাজ্যের আদ্যপান্ত জানা জরুরী? ব্রিটিশদের সময়কাল আমরা পাঠ করি। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ পয়তালিশ টাকা বেতনের চাকরি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন তা ক'জন শিক্ষার্থী জানে? আধিপত্যবাদীরা চাচ্ছে এখানে মুসলিম সেন্টিমেন্ট ধ্বংস করতে পারলেই পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আর তাদের ক্রীড়নক কিছু লোক সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস গেলানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এ অবস্থার মুকাবিলায় মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের মতো গবেষকগণ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে আমাদের সামনে হাজির করছেন প্রকৃত ইতিহাস। অশুভ শক্তি যতই অসত্য তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জাগতিক চিন্তা-ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, আমরা আশান্বিত যে তা মোকাবেলার জন্য আমাদের মাঝে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আছেন। জাতির সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য তিনি পেশাগত শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছেন।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ১৯৪৭ সালের পর আমাদের এখানে একটা স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নিতে শুরু করে। সাহিত্য, দর্শন, ঐতিহ্য আবহমানকালের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও আমাদের নতুন ভৌগলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় তা আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেগে ওঠে। সাতচলিশে স্বাধীন নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নতুন ভৌগলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতায় একটি জাতি হিসাবে জন্মের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর ও অগ্রবর্তী স্তরে আমরা ক্রমশ ধাবিত হয়েছি। সমাজ মানসের এই পরিবর্তন, এই সজীব, সচেতন, স্পর্শকাতর আবেগ ঐশ্বর্যের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। সংগ্রাম ও নিরীক্ষায় বিস্তৃত এক দীর্ঘ রক্তকন্টকিত সরনী। ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো কিছু কিছু মতলবী ইতিহাসবিদ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কাউকে উৎকৃষ্ট, আবার কাউকে অপকৃষ্ট করে লিখেছেন। ফলে প্রকৃত ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে বিস্মৃত। জ্ঞানের ব্যভিচার, বুদ্ধির আলস্য, চিন্তার বিকৃত ধারা নিঃশেষ করেছে আমাদের ইতিহাস গবেষকদের মেরুদন্ড। সেখানে মহীরুহের মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছেন মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আমাদের স্বর্ণালী ইতিহাসকে সশ্রম নিরীক্ষা প্রয়াসে স্বাভাবিক গতিপথে পরিচালিত করেছেন। তিনি ইতিহাসের সেই সার্বজনীন স্তম্ভ উদ্ভাবন করেছেন যা পাঠে এ প্রজন্ম আত্মসম্বিত ও আত্মজাগৃতি অর্জন করতে পারে। ফিরে পেতে পারে স্বকীয় আত্মশক্তির অধর্ষ বিশ্বাস।

আমি কখনো কখনো মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের পরিচয় এভাবে উলেখ করি যে, তিনি আমাকে ব্যাংকিং-এর শিক্ষক হিসাবে মান্য করেন আর আমি তাকে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে বিবেচনা করি। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বই 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' পাঠ শেষে আমি তাঁকে ফোন করি। তখন তিনি সৌদি আরবে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন রত। আমি তাঁকে বলেছিলাম ঃ 'কোন ব্যাংকের এম ডি হয়ে মৃতুবরণ করার চেয়ে এমন একটি বই রেখে মৃত্যুবরণ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।' মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বোধকরি আমার এই কথা গুরুত্বসহ গ্রহণ করেন। তাঁর বইয়ের পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় আমার এই মন্তব্যের উলেখ থেকে তাই মনে হয়।

আমি দোয়া করি ব্যাংকের গুরু দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতির খেদমতে সত্য অন্বেষণে তাঁর কলম চালনা অব্যাহত থাকুক। মোহাম্মদ আবদুর মান্নান আরো এগিয়ে যান। ইতিহাস গবেষক হিসেবে তাঁর সফলতা ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান দীর্ঘায়ু হোন।

লেখক : মুঃ আযীযুল হক ঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান নির্বাহী, বর্তমানে কয়েকটি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক কনসালট্যান্ট।

১৯৯৬ সালে সৌদি আরবের রিয়াদ প্যালেস হোটেলে বাংলাদেশ বিজনেস কম্যুনিটির উদ্যোগে সিঙ্গেল কান্ট্রি ট্রেড ফেয়ার উপলক্ষে আয়োজিত 'ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

মান্নান ভাই আযোজন পথ বাকি

মোহাম্মদ মুসা

মিটিং-মিছিল, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, গুলি... সবকিছুর শেষ তাঁর দেখা চাই। তাঁর লেখা রিপোর্ট পড়লেই সময়ের কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠে ঘটে যাওয়া ঘটনার আনুপুঙ্খ বর্ণনা। আর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্বিপাকের সময় তাঁর কলম হয়ে উঠতো শিল্পীর তুলি। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তিনি নির্মাণ করতেন ভয়ঙ্কর দুর্যোগের নিখুঁত লেখচিত্র।

আলোচনা সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম কভার করার জন্য এসাইনমেন্ট দেয়া হলে অমন টগবগে, প্রাণবন্ত ও আলাপী মানুষটাই হয়ে যেতেন মগ্নমৈনাকের মত গম্ভীর, অচঞ্চল এবং নির্বাক। মৌনী নবাতিপর এর কায়দায় ডুব দিতেন অতলান্ত বিষয় সাগরের গভীরে। মার্ডার, আদম ব্যবসায়ীদের প্রতারণা, নারী ও শিশু পাচার, বড় অংকের চাঁদাবাজি, টার্মিনাল দখল, ক্রাইম বিটের এসব স্টোরি করার আগে তাঁর অন্য মেজাজ, ভিন্ন চেহারা। প্রশ্নের পর প্রশ্নের ফুলঝুরি ছুটছে। সেই সাথে রিপোর্টার্স নোট বুকে চলছে প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলোর জটডাউন। কিন্তু একজন রিপোর্টারের অভিধানে বোধ হয় বিশ্রাম বলে কোন কথা নেই। স্পট থেকে দ্রুত অফিসে ফিরে তাই মস্তিষ্কের মেমোরিতে ধারণ করা ঘটনার টুকরো টুকরো অংশগুলো দ্রুত প্যাডের বুকে কালো অক্ষরে নামিয়ে ফেলা। ফেরার পথে গোটা ঘটনা কয়েকবার আগাপাশতলা ভাবা হয়ে যায়। ডেডলাইনের কথা মাথায় রেখে অনেক আগেই ইনট্রো, ইলাস্ট্রেশন অব ইনট্রো, মেজর পয়েন্টস ও মাইনর পয়েন্টস নিয়ে স্টোরি তৈরী হয়ে যায়। সময় থাকলে সাজেস্টিভ হেডলাইনও।

সত্তর দশকের শেষ ভাগে দৈনিক আজাদ-এ নৈশপালা শুরু হত বাদ মাগরিব। টেবিলে বসেই একটি রিপোর্টের উপর চোখ আটকে গেল। যেমন ঝরঝরে গদ্য তেমনি চমৎকার শব্দচয়ন ও বাক্য বিন্যাস। হাতের লেখায় পেশাদার সাংবাদিকের ব্যস্ততা ছাপিয়ে শৈল্পিক সৌন্দর্য বারবার মুখ্য হয়ে উঠতে চায়। একটানে রিপোর্টটি আদ্যোপান্ত পড়ে 'চমৎকার' শব্দটি উচ্চারণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামনে তাকাতেই দেখি সহাস্যবদন এক তাজা প্রাণ- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

তারপর গ্রীষ্মের দীপ্র দুপুরে, শীতের হাড়কাঁপানো আঁধারে কিংবা বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণে যখনই দেখা হয়েছে পেশাদারিত্বের আলখাল্লাটা মুহূর্তের জন্য নামিয়ে রেখে সেই স্বভাবসুলভ প্রীতি সম্ভাষণ- 'কেমন আছেন?' মুখনিঃসৃত শব্দের মধ্য দিয়ে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার উত্তাপ পলকে প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

সংবাদপত্রে কিছু কিছু সোনালী নিয়ম শুরু থেকেই চলে আসছে। এসব নিয়মের যেন কোন ব্যত্যয় নেই। প্রবাদতুল্য একটি নিয়ম : নিউজ হ্যাজ দ্য হ্যাবিট অব ব্রেকিং ইন অর্ড টাইম এন্ড অর্ড প্লেসেস। গভীর রাতে সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে শরীর যখন ভেঙে পড়তে চায়, তখনই দুর্গম জায়গায় সংবাদ তৈরী হয়। রিপোর্টারকে তাই নগর সংস্করণ ছাপা শুরু হবার আগ পর্যন্ত পালাক্রমে তৈরী থাকতে হয়। ওয়ানডে ম্যাচের স্লগ ওভারে চার-ছয় হাঁকানোর কায়দায় রিপোর্টারকে কিছু শক্তি তাই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মান্নান ভাইকে দেখেছি কাঁটায় কাঁটায় সেই নিয়ম মেনে চলতে। কাজ শেষে সবাই চলে গেছেন। একজন অলিখিত সেই নিয়ম মেনে এখনও বসে কাজ করে যাচ্ছেন। কাজ কি কখনও শেষ হয়? আজকের কাজ হয়তো শেষ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 'ব্রেকিং' একটা কিছু এসে যেতেই পারে। এছাড়া আজকের পিছু পিছু ধাওয়া করে আগামীকাল। একটা সময়ে তাও 'আজ' হয়ে যায়। তারিখ রেখা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা যায় আজ ও আগামীকাল। কিন্তু চিন্তাকে কি ওরকম কোন রেখা টেনে আলাদা করা যায়?

অনুসন্ধিৎসা আর আন্তরিকতা- এ দুটোই প্রয়োজন তদন্তমূলক প্রতিবেদন রচনায়। কোন ঘটনার পেছনের নেপথ্য কাহিনী- যাকে জনসাধারণের চোখ থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখা হয়। ঘটনার গভীরে ডুবুরির মত ডুব দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করা এবং

www.pathagar.com

সাহসিকতার সাথে পরিবেশন করা চাট্টিখানি কথা নয়। সে জন্য বলা হয় 'দ্য ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার স্টার্টস অফ উইথ দ্য হানচ দ্যাট দেয়ার ইন মোর টু এ্যান ইভেন্ট দেন মিটস দ্য আই।' তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরীতে মান্নান ভাই-এর আলাদা আগ্রহ বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পোঁড়খাওয়া একজন হিসাবে জানি, এই বিশেষ কাজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আছে, রাতের পর রাত জেগে বিস্তর পড়াশুনা আছে এবং সর্বোপরি জীবনের ঝুঁকিও আছে।

বৈরী পরিবেশ একজন রিপোর্টারকে প্রভাবিত করার জন্য নানা আয়োজন সাজিয়ে রাখে। অসম্ভব রকম চাপের মুখে রিপোর্টারকে তাই 'না' বলার সৎসাহস থাকতে হয়। একস্ট্রা অর্ডিনারি কমনসেন্স, চলনে-বলনে চোখে পড়ার মত স্মার্টনেস এবং প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন করার ক্ষমতা থাকাও বাঞ্জনীয়। মান্নান ভাই যতদিন সাংবাদিকতার এরেনা'য় ছিলেন ততদিন তাঁর কাজে সেই বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করেছি। মিডিয়া থেকে সরে না গেলে দেশবাসী তাঁর সত্যসন্ধানী নির্ভীক ও বলিষ্ঠ লেখনির সেবা আরো বহুদিন পেতেন সন্দেহ নেই। সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জিং গ্ল্যামার থেকে ব্যাংকিং এর সুশৃংখল ঘেরাটোপেও তিনি সফল। এ বিশ্বসংসারে যোগ্য লোকদের নিয়ে কাড়াকাড়ির ব্যাপারটা মনে হয় চিরন্তন। অলক্ষ্যে তাঁর একটা প্রতিযোগিতাও চলে। সবাই চান যোগ্য ব্যক্তিটি তাঁর প্রতিষ্ঠানেই আসুক এবং যথারীতি প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করুক।

মান্নান ভাই সাংবাদিকতাকে বিদায় জানালেও এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশা তাঁর সতত অনুসন্ধিৎসা মন এবং সত্য অন্বেষী মনন বিনির্মাণে প্রভূত সহায়তা করেছে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল চষে বেড়িয়ে আর মাটির সোঁদাগন্ধ শরীরে মেখে গড়ে ওঠেন যে সাংবাদিক, দেশ ও জনগণ তার কাছে সবার আগে।

তাই ব্যাংকিং পেশার অর্থ-কড়ির নিরেট বৈষয়িক চৌহদ্দির মধ্যে অষ্টপ্রহর থেকেও সামান্য ফুসরত পেলেই ইতিহাসের বাতায়নে দাঁড়িয়ে জাতি হিসাবে নিজের আত্মপরিচয়কে নতুন আঙ্গিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। একজন ইতিহাসমনস্ক নাগরিক হিসাবে কলম হাতে নতুন সহস্রাব্দে হাজারো চ্যালেঞ্জের মাঝে মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশের ধারা সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালান। সত্য উদঘাটনে তা প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শ্রম দেয়ার দীর্ঘদিনের অভ্যাস তাঁকে এ কাজে এগিয়ে নেয়।

কবি আল মাহমুদ- এর ভাষায়, অনুসন্ধিৎসা ও সততার সাথে জাতির ইতিহাস পুনরাবিষ্কার সচেষ্ট থাকেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। জাতীয় ইতিহাসের নানা বাঁক, বিভ্রান্তি এবং তরঙ্গের ওপর সন্ধানী আলো ফেলার দুরূহ কাজটি গভীর সোৎসাহে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। হীরকখন্ডসদৃশ নানা তথ্য অসামান্য মুন্সীয়ানায় কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে জোশিলা বাক্যের মনোহারিত্বে যেভাবে তিনি শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসকে উপস্থাপন করেন, তা এককথায় অপূর্ব। বইয়ের যে কোন পাতায় চোখ বোলালেই মনে হয়, দীর্ঘদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বুঝি কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেছে।

আর ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো নির্মম সত্য আবার কখনো বেদনাবিধুর প্রসঙ্গের অবতারণা করে পাঠককে নতুন করে আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দেন ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। কোন হঠকারি ভাবনাতাড়িত হয়ে নয়, বরং ইতিহাসবিস্মৃতি একটি জাতির জন্য কত যে ভয়ংকর হয়ে উঠতে- পারে সেই পরিণাম সজ্ঞাত চেতনা থেকে আগামী প্রজন্মকে সতর্ক করে দেয়ার অভিপ্রায় থেকেই তাঁর এই সাহসী উচ্চারণ।

পেশাজীবনের ঊষালগ্নে সত্য অন্বেষার যে বীজ বোনা হয়েছিল তার মনোভূমিতে তা পরবর্তীকালে পল্লবিত হয়ে তাঁকে এনে দিয়েছে বিরলপ্রজ ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবিদ- এর মর্যাদা। তবে মনজিল এখনো দূরে। গন্তব্যে পৌছতে আযোজন পথ বাকি। যাত্রার তো সবে শুরু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে সুস্থ রাখুন, হায়াত দরাজ করুন এবং অসমাপ্ত আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করার তওফিক এনায়েত করুন। আমীন।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট, কথাশিল্পী ও ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার

www.pathagar.com

বঙ্গ ও বাঙ্গালী জাতিসত্তার শেকড় ও বিকাশধারা উপস্থাপনে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কৃতিত্ব : একটি মূল্যায়ন

ড. তারেক ফজল

সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বঙ্গ যথার্থই একটি ক্ষুদ্র ভূ-খন্ড । প্রাচীনত্বের বিবেচনাতেও এটি ব্যাপক তাৎপর্যের দাবিদার হয়তো নয়। কিন্তু গঠনকাল থেকে এর বেড়ে ওঠা-বিকশিত হবার ধাপে ধাপে ও বাঁকে বাঁকে এই বঙ্গ-ভূখন্ড ও এর অধিবাসীরা বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই নিজস্ব তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ সেসব ঐতিহ্যের বিষয়ে পরবর্তীকালে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যথেষ্ঠ অবগত ও সচেতন থাকতে পারেননি। বর্তমান স্বাধীন-সার্বভৌম ভূ-খন্ডের বাঙ্গালী নাগরিকেরাও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত মনোযোগী ও সচেতন নয় বলেই বিবেচনা করা হয়।

বঙ্গ ও বাঙ্গালীর গঠনকাল এবং বিকশিত হবার কয়েক হাজার বছরের এবং নির্দিষ্টভাবে বিগত এক হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ প্রচুরসংখ্যক গবেষণা কর্ম ও অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্গ ও বাঙ্গালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নৃ-তাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের দাবি রাখে। আবার অনিবার্য, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সব মাত্রাকেই এক সাথে এবং/পারস্পরিক-ভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে জানতে হয়। অন্যথায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান ও উপলব্ধি অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত থেকে যায়। বঙ্গ ও বাঙ্গালীর ইতিহাস-ঐতিহ্যের সুদীর্ঘকালীন ও সকল মাত্রার বিষয়াদি একজনমাত্র গবেষক অথবা লেখকের পক্ষে একটিমাত্র গ্রন্থে গবেষণা কর্মে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। বহুসংখ্যক গবেষক ও লেখক বঙ্গ ও বাঙ্গালীর গঠন ও বিকাশধারার বিভিন্ন আঙ্গিকের নির্দিষ্ট কোনো একটি এলাকা ও ক্ষেত্র বিষয়ে গবেষণা করেছেন অথবা বিদ্যমান উপাদানের সমন্বয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (অতঃপর মান্নান) বঙ্গ ও বাঙ্গালীর গঠন ও বিকাশধারার প্রধানত রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ মনোযোগের স্বাক্ষর রেখেছেন। বঙ্গ ও বাঙ্গালীর বিকাশধারার রাজনীতির সাথে এর সমাজ ও অর্থনীতি, এর ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং কখনো কখনো এর সাহিত্যও গভীরভাবে যুক্ত বা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। বঙ্গ বাঙ্গালীর বিকাশ-ধারার বিশাল এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকালীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রধানত রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপস্থাপনে মান্নান যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বর্তমান নিবন্ধে সে বিষয়ে একটি মাঝারি মাত্রার মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যনিষ্ঠা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান{১৯৫২-২০০২} পেশাদার সাংবাদিকতার জীবন ছেড়ে পেশাদার উর্ধ্বতন ব্যাংক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি (১৯৯০), বাংলাদেশের পুলিশ (১৯৮৩), সৌদী আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী একটি সরেজমিন সমীক্ষা (২০০১), পারস্যের পথে-প্রান্তরে (২০০১) ও এই আমার বাংলাদেশ (২০০৩) শিরোনামের বইগুলো রচনা করলে মান্নান-এর মূল মনোযোগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য বিষয়ে, এর বিকাশ ও গতিধারা বিষয়ে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ও বাঙ্গালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা (১৯৯১), আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা

www.pathagar.com

(১৯৯৪) ও বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঃ ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (২০০৭) শীর্ষক নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন থেকে। এ গ্রন্থ তিনটিতে মান্নান বঙ্গভঙ্গ নামের ভূখণ্ডের গঠন-এর মূল অধিবাসীদের একটি জনগোষ্ঠী থেকে একটি জাতিতে বিকশিত হবার ধারাবাহিকতাকে একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে উপস্থাপন করেছেন। মান্নান-এর কৃতিত্ব, ন্যায্য বিবেচনায় ও খাঁটি অর্থে এখানেই। অসংখ্য গবেষক, লেখক যেখানে বঙ্গ ভূ-খন্ড ও এর অধিবাসীদের একেকটি দিক অথবা বিচ্ছিন্ন বা আংশিক সময়ের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন, মান্নান সে সকল গবেষক ও লেখকের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনকে নিজের মাঝে ধারণ করেছেন এবং অতঃপর পাঠকদের জন্য তা ধারাবাহিকভাবে এবং মুন্সিয়ানার সাথে ৩টি গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

তিন গ্রন্থ ঃ এক ধারা

"বাংলা ও বাঙ্গালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" শীর্ষক গ্রন্থে (ঢাকা, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ : ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ২০০৪, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ঐ, ২০০৬

মান্নান ঃ

ক. মূল বঙ্গ ভূ-খন্ড চিহ্নিত করে এর অধিবাসী দ্রাবিড়দের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন,

খ. বঙ্গে আর্য আগ্রাসন, দ্রাবিড়দের আর্য প্রতিরোধ সংগ্রাম- যা আর্য বর্ণনার দেবতা ও অসুরের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত, আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি ও আর্যীকরণ এবং ব্রাহ্মণ্য শাসকদের বৌদ্ধ নিধনকর্ম ব্যাখ্যা করেছেন,

গ. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল শাসকদের উত্থান-পতনের চারশ' বছরের শাসন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন,

ঘ. আর্য-ব্রাহ্মণ্য সেন শাসনামলে বঙ্গে আমলাতান্ত্রিক তথা পদ্ধতিমাফিক-সুসংবদ্ধ উপায়ে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধ সভ্যতা ও বাংলা ভাষার দেশান্তরী সাধন ব্যাখ্যা করেছেন,

ঙ. আর্য-সেন শাসনের অবসান করে মুসলিম শাসক বখতিয়ার খিলজির উত্থান ও এর প্রেক্ষাপট রচনায় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক-সূফী-দরবেশের ভূমিকা ও অবদান তুলে ধরেছেন,

চ. বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে বঙ্গ তথা বাংলা (ক্রমশ : বৃহত্তর আকারে) জনপদে জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের অনুপ্রেরণায় গণতান্ত্রিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভাষাগত ও অর্থনৈতিক অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন,

ছ. বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক নবাব সিরাজউদ্দৌলাহসহ পূর্ববর্তী দু'শতাব্দীর মুসলিম সমাজে নানা মাত্রিক পতনের ছয়টি সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং

জ. বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ঘটনাপরম্পরা উপস্থাপন করেছেন।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' শীর্ষক গ্রন্থে (ঢাকা : আশা প্রকাশন, ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ : ঢাকা : দারুস সালাম পাবলিকেশন্স ১৯৯৮, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ঢাকা কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬

ক. মান্নান বাংলার দ্রাবিড়দের সভ্যতা সৃষ্টি, আর্য আগ্রাসন ও সভ্যতার ধ্বংসলীলা মুসলিম শাসনকাল ও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন,

খ. পলাশী-উত্তর বাংলার মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দুর্দশা অবনতি ও আর একই সময়ে শাসক ইংরেজদের নানা মাত্রিক সহযোগী বর্ণ হিন্দু ও কলকাতার অবাক উত্থান ও সমৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন,

গ. শোষিত মুসলিম ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে হাজী শরীয়তুল্লাহ তিতুমীরের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও মহাবিদ্রোহ ব্যাখ্যা করেছেন,

ঘ. বাংলার মুসলিম নবজাগরণ ও জাতিগত ঐক্যচেতনা বিশ্লেষণ করেছেন,

ঙ. হিন্দু প্রাধান্যের পশ্চিম বঙ্গ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূর্ব বঙ্গের মাঝে সৃষ্ট বৈরিতা ও নানামাত্রিক রাজনৈতিক অগ্রগতির ফল হিসেবে বৃটিশ-ভারত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হবার তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও পাকিস্তান যুগে বাংলাদেশকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ-কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে মূল বাংলা ভূ-খন্ডে একটি সুনির্দিষ্ট জাতিসত্তা বিকশিত হওয়া ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঃ ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শতবছরের

www.pathagar.com

রাজনীতি হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক' শীর্ষক গ্রন্থে (ঢাকা কথামেলা প্রকাশন, ২০০৭) মান্নান ১৯০৫ সালের কথিত বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ১-১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পর্ক ১৯০৫-পূর্ব বঙ্গ-অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা উপস্থাপন করেছেন। ৩৩৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে এরপর মান্নান–

ক. ১৯০৫ সালের কথিত চতুর্থ বঙ্গভঙ্গের বিষয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুর বিরোধিতার ছয়টি সুনির্দিষ্ট কারণ নানাস্তরের শিক্ষিত ও বর্ণহিন্দু বহুমাত্রিক বিরোধিতার ও প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন,

খ. কথিত বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বর্ণহিন্দুর সন্ত্রাসবাদী চরম ও জঘণ্য সাম্প্রদায়িক ও খুনে আন্দোলন বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন এবং ক্ষুদিরামের মতো নেহায়েত সন্ত্রাসী বোমাবাজ খুনে এক কিশোরের ফাঁসি-প্রাপ্তির সূত্রে তাকে কথিত স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক বানাবার বর্ণহিন্দু সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন,

গ. আলোচনায় তুলে আনা ও পূর্বতন দাবির ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত বর্ণহিন্দুর চরম ও ভয়ঙ্কর বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুর সাথে বঙ্গের মুসলিম স্বার্থের ঝুঁকিপূর্ণ দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় পৃথক-স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমি দাবি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা ও পাকিস্তান নামে বৃটিশ ভারতীয় মুসলিমের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করেছেন,

ঘ. ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সেই প্রচেষ্টা ভন্ডুল হবার ঘটনাপরম্পরা উপস্থাপন করেছেন ও

ঙ. পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলার ক্রমশ এগিয়ে যাবার একটি খন্ডিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

মান্নান বিপুল তথ্য-উপাত্ত-উদ্ধৃতির সূত্রে এ গ্রন্থ তিনটি প্রণয়ন করেছেন। এরকথা একটি অর্থ, ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত-উদ্ধৃতিসমূহ মান্নান তার চারপাশে পরিবেশ প্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছেন। বিভিন্ন গবেষক লেখক স্মৃতিচারণকারী বিভিন্ন সময়ে সে সব তথ্য-উপাত্ত-বক্তব্য তাদের গবেষণা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থাৎ মান্নান বিপুল তথ্য-উপাত্তের যোগানদার নন। মান্নান-এর কৃতিত্ব, অসংখ্য গ্রন্থে গবেষণাকর্মে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব তথ্য-উপাত্ত-বক্তব্য মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে সংগ্রহ করেছেন, ছাই থেকে মানিক রতন আহরণের মতো এবং মুন্সিয়ানার সাথে চমৎকারভাবে সে সব তথ্য-উপাত্ত-বক্তব্য বর্তমান ও ভবিষৎ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। মান্নান-এর কৃতিত্ব : দীর্ঘ ত্রিশ বছরের (মান্নান আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা ১৯৯৪ ভূমিকা ঃ আমাদের জাতিসত্তা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম ১৯৭৭-৭৮ সালে) মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের ফল হিসেবে একই লক্ষ্যাভিসারী তিনটি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন। পাঠক তাই বলতে পারেন : 'তিন গ্রন্থ এক ধারা'। [সংক্ষেপিত]

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও তাঁর মিশন

আসাদ বিন হাফিজ

মানুষের যোগ্যতা এবং প্রতিভা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। কোন্ মানুষটিকে দিয়ে আল্লাহ কি কাজ করিয়ে নেবেন সেটাও পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু আল্লাহ নিজেই বলেছেন : যে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহও তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। ব্যক্তির বেলায়ও তাই; যে ব্যক্তি তার ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহও তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। পরিশ্রম ও চেষ্টার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য এখানেই, আমরা আমাদের যোগ্যতার ব্যাপারে সচেতন নই, ভাগ্য বদলাবার চেষ্টাও আমাদের মধ্যে সেভাবে তীব্র ও সক্রিয় নয়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন এর মধ্যে ব্যতিক্রম। তারা নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার ব্যাপারে সচেতন এবং সেই যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাবার ব্যাপারেও তাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, উদ্যম এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা। ফলে তাঁরা সমাজের আর দশজন মানুষের সাথে থাকার পরও সাধারণ মানুষ থেকে হয়ে উঠেন অসাধারণ। সমাজকে তাঁরা শ্রীমণ্ডিত করেন, সভ্যতাকে বিকশিত করেন এবং জীবনকে করে তোলেন যথার্থ অর্থেই সফল ও সার্থক। আমার দেখা মানুষদের মধ্যে তেমনি একজন মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

দুনিয়ার সব কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে আমরা কেউ পৃথিবীতে আসিনি। কিন্তু সময়, সমাজ ও পরিবেশের চাহিদা পূরণের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কর্মতৎপর থাকি। এই তৎপরতার কতটুকু কাঙ্ক্ষিত আর কতটুকু কাঙ্ক্ষিত নয়, তা নিয়ে আমরা সচরাচর মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো, কেবল ভোগ-বিলাস আর ব্যক্তিকে নিয়ে পড়ে থাকার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াকে সুন্দর এবং মানুষের জীবনকে শান্তি ও স্বস্তিময় করার জন্য আমাদের ওপর অর্পিত হয়ে আছে গুরু দায়িত্ব। সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী সে দায়িত্ব আমরা পালন করলে তাতে কেবল আমারই কল্যাণ হবে না– বরং তাতে পৃথিবীরও অনেক কল্যাণ সাধিত হবে।

এ কথা আমাদের অনেক সময়ই মনে থাকে না। তবে সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা তা অন্তরে গেঁথে রাখেন মজবুতভাবে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তেমনি একজন সচেতন, সপ্রতিভ ও সচল মানুষ। কি কাজ তাকে করতে হবে তিনি তা জানেন এবং তিনি সে কাজটি সম্পন্ন করেন গভীর নিষ্ঠা, পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও সর্বোত্তম মেধা আর যোগ্যতা ব্যবহার করে। তাঁকে দেখলেই মনে হয়, তাঁর জীবনের টার্গেট তিনি শৈশবেই স্থির করে নিয়েছিলেন এবং বাহুল্য কাজ সযত্নে এড়িয়ে তিনি তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছেন দৃঢ় পায়ে। আর এ জন্যই তিনি একাধারে সফল সাংবাদিক, খ্যাতিমান ব্যাংকার এবং সেই সাথে একজন শেকড় সন্ধানী ইতিহাসবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। কিন্তু এর কোনটিই তার মূল পরিচয় নয়, বরং তার মূল পরিচয় তিনি আল্লাহর একজন সার্বক্ষণিক প্রতিনিধি বা খলীফা– যার মূল কাজ মানুষ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া।

কাজের ব্যাপারে একাগ্র ও নিষ্ঠাবান মানুষকে অনেক সময় স্বার্থবাদী মনে হতে পারে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ। ব্যক্তি যদি তার যোগ্যতাকে বিকশিত না করে তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ, সমাজ, জাতি। সমাজকে কিছু দিতে হলে সে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ব্যক্তিকেই। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের উচিত আল্লাহর দেয়া মেধাকে কাজে লাগিয়ে আপন যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। মানুষ যখনই নিজেকে আল্লাহর খলীফা ভাবতে শুরু করে তখনই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় এ ধরনের মমত্ববোধ ও দায়িত্বানুভূতি।

www.pathagar.com

সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করার জন্য তার মধ্যে জন্ম নেয় এক ধরনের আকুতি ও ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা তাকে কেবল নিষ্ঠাবানই করে না; করে তোলে কর্মমুখর, সজীব, সচল, প্রাণময় জাগ্রত মানুষ। ব্যক্তির অর্জন তখন হয়ে ওঠে দেশ, জাতি ও সভ্যতার পরিপুষ্টির নিয়ামক। মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রয়োজন সেবা করার উপযোগী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা। অযোগ্যতা দিয়ে নিজের যেমন কোন কল্যাণ করা যায় না, তেমনি দেশ এবং মানুষেরও কোন উপকার করা যায় না। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কর্মময় জীবন এ সত্যটি আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান খেলাফতের দায়িত্ব পালনকেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলেন। সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। ভুল তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলছে সে চক্রান্তের হাত থেকে মানুষ ও মানবতাকে রক্ষা করা তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসবে গ্রহণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে জাতির যে মহত্তম খেদমত করার প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সাংবাদিকতার পেশা ছেড়ে একই স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেন।

এখানে স্মরণ করা দরকার, যখন এ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো পর্যন্ত এ উপমহাদেশে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আলেমদের মধ্যেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন ধারনা ছিল না। ব্যাংকিং পদ্ধতি পুরোটাই সুদনির্ভর। সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে এ কথা তখন মানুষ কল্পনাও করতে পারতো না। এ ক্ষেত্রে 'ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' একটি তাত্ত্বিক দর্শন দাঁড় করায়। তার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

সবাই জানেন, অর্থনীতি মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের যে প্রক্রিয়া চালু আছে, তাতে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কেবল বেড়েই চলছিল। পুঁজিবাদ মানুষকে ভোগ করতে শেখায়, ত্যাগ করতে নয়। ফলে সেখানে মানুষের চাইতে বস্তুর মূল্য অধিক। এভাবে সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে গেলে সেখানে দেখা দেয় অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই কুফল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক দর্শন পেশ করলে রাশিয়ায় চালু হয় সমাজতান্ত্রিক অর্তনীতি। এখানে মানুষকে গণ্য করা হয় যান্ত্রিক মানুষ হিসাবে। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে সম্পদ সব রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করা হয়। ব্যক্তিক পঁজিবাদ রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রীয়ক পুঁজিবাদে। এ দুই অর্থনীতির কোথাও মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা নেই। পুঁজিবাদে মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অপরিমেয় সম্পদ আহরণ ও ভোগের সুযোগ পায় আর সমাজতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; মানুষ এখানে মূলত থাকে সম্পদহীন; সম্পদ সব হয়ে যায় রাষ্ট্রের।

এ দুই প্রান্তিক অর্থনীতির মোকাবেলায় ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করে, যেখানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমে কমে আসে। ইসলাম মানুষকে ভোগ নয়, বরং ত্যাগ করতে শেখায়। যাকাতভিত্তিক এ অর্থনীতিতে ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ অর্থনীতি চালু হলে সে দেশে না খেয়ে মরার মত গরীব থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্পদের অনাকাক্ষিত পাহাড় গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতির এ দর্শনকে ধারন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনীতির এ নতুন কনসেপ্ট যদি এদেশের সাধারণ মানুষকে বুঝানো যেতো, তাহলে পাল্টে যেতো দুর্নীতির মহোৎসব। সততা ও ন্যায়নীতির ওপর একটি জাতি দাঁড়িয়ে গেলে তাদের অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারতো না। ইসলামী ব্যাংক এ রকম একটি চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়েই তার যাত্রা শুরু করে।

জাতিকে জাগ্রত, সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা এবং ব্যাংকিং দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ দুই ক্ষেত্রের উভয়টিতেই ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেন। সৎ সাংবাদিকতা এবং মানবিক অর্থনীতির বিকাশে তাঁর এই অবদানকে ছোট না করেও বলা যায়, যে কাজটির মাধ্যমে তিনি জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করেছেন, তা হচ্ছে তাঁর ইতিহাসচর্চা। এ ক্ষেত্রে তিনি অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন।

যখন তিনি সাংবাদিক ছিলেন তখন থেকেই তিনি নিয়মিত লেখালেখির

www.pathagar.com

সাথে যুক্ত ছিলেন। কলম, পৃথিবী, অগ্রপথিক, ফুলকুঁড়িতে লিখতেন নিয়মিত। ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর তাঁর লেখা তখনই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সেমিনারের জন্য প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বাংলার মুসলিম নবজাগরণের স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেন তিনি। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে সেই থেকে শুরু হয় তাঁর রাত্রিজাগরণ। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে রচিত হয় তাঁর শতাধিক মূল্যবান গবেষণা প্রবন্ধ। ১৯৯২ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' প্রকাশিত হলে তিনি অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসাবে নতুন মূল্যায়নে ভূষিত হন বিদগ্ধ মহলে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ আর মল্লিক বইটির গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধ লেখেন। সৈয়্যদ আলি আহসান বইটিকে বাংলার ইতিহাস চর্চার 'পথিকৃত' বলে অভিহিত করেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ একে 'শুধু ইতিহাস গ্রন্থ নয়– ইতিহাস চেতনারও গ্রন্থ' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'কে 'জনগণের ইতিবৃত্ত'রূপে গণ্য করেন। ড. মোহাম্মদ মুহিব উল্যাহ সিদ্দিকী মন্তব্য করেন, 'ইতিপূর্বে এ বিষয়টিকে এভাবে কেউ দেখেছে বলে আমাদের জানা নেই।'

তাঁর প্রতিটি বই-ই প্রচুর তথ্য-উপাত্তে ভরপুর। 'বাংলার মুসলিম জাগরণের দুই পথিকৃত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দীন আফগানী' গ্রন্থে এ দুই মনিষীর সংগ্রাম ও সাধনার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ভিন্ন ধারার গ্রন্থ। 'ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা'য় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় বই। বইটি সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। কবি আল মাহমুদ বইটির মুখবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা মোটেও অতিরঞ্জিত মনে হয়নি।

এসব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি শিকড়সন্ধানী গবেষকরূপে নিজের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা তাঁর সাংবাদিক ও ব্যাংকার পরিচয়কেও ছাপিয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণের কয়েক হাজার বছরের অবিচ্ছন্ন মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাসকে তিনি যেভাবে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সামনে, তা তুলনারহিত ও অনন্য। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের আজীবন সদস্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তাতে সঙ্গতভাবেই জাতি তাঁর কাছে তাঁর অসমাপ্ত ও আরাধ্য কাজটুকুর আশু সমাপ্তি প্রত্যাশা করে। একজন সফল সাংবাদিক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকার কি করে এমন কঠিন ও দুরূহ কাজটিতে হাত দিলেন এবং তাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এলেন তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু যে কথা শুরুতেই বলেছি, আল্লাহ মানুষকেই এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যিনি প্রতি মুহূর্তে এ কথা মনে রেখে পথ চলতে পারেন তাঁর চলার পথ তিনিই সহজ করে দেন। আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাকে আল্লাহ কি যোগ্যতা দান করেছেন, সে ব্যাপারে একটি পরিষ্কার ধারণা অর্জন করা এবং তারপর সেই যোগ্যতাকে বিকশিত করার জন্য কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাহলে আল্লাহই তাঁর দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করে দেন; যেমনটি দিয়েছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আদি নিদর্শনগুলো দেখেছেন স্বচক্ষে। বাংলাদেশর প্রত্ননিদর্শনগুলোও তিনি দেখেছেন গবেষকের মন নিয়ে। সভ্যতার এ পথ চলায় নিজের ভূমিকাটুকু পালন করার চেষ্টা করেছেন সচেতন ও সতর্কতার সঙ্গে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তিনি যদি 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'র একটি সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ইতিহাস উপহার দিতে পারেন, সেটিই হবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি- যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল।

লেখক : প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিসেবী, সংগঠক

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর ইতিহাস সাধনা

মুনশী আবদুল মাননান

আমার মিতা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর সদ্য প্রকাশিত একটি ইতিহাসগ্রন্থ হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, আমি যেন ওই গ্রন্থটির একটি আলোচনা লিখি। তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি, সেই আলোচনাটি আজও লেখা হয়নি। সময়ের ওপর দোষ চাপাবো না। সত্যি কথা বলতে কি, সময়াভাব নয়, উদ্যোগের অভাবেই আমি তাঁর অনুরোধের প্রতি সুবিচার করতে পারিনি। অলসতাই এ জন্য সর্বাংশে দায়ী।

অনুরোধ নয়, দাবী করার হক তাঁর আছে। নামের মিল ছাড়াও তাঁর সঙ্গে আমার পেশার মিলও এক সময় ছিল। তিনি একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক ছিলেন। পেশা পরিবর্তন করে তিনি এখন বিশিষ্ট ব্যাংকার। আমার একমাত্র পেশা এখনও সাংবাদিকতাই। পেশাগত গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস চর্চা করে যাচ্ছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এ ক্ষেত্রেও তাঁর খ্যাতি ঈর্ষাযোগ্য। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাংকের এতবড় ও জটিল দায়িত্ব পালনের পর ইতিহাস গবেষণা ও লেখালেখির সময় পান কখন? উত্তরে বলেছিলেন, ঘরে যতটুকু সময় পাই, তার বেশির ভাগই এ কাজে ব্যয় করি। যখনই সময় পাই তখনই কিছু পড়ি বা লিখি। বুঝতে পারি, ইতিহাসচর্চা ও লেখালেখি তাঁর নেশা। শুধু নেশা বললে সব বলা হয় না। জাতিপ্রেম, দেশপ্রেম এবং জাতি ও দেশের প্রতি এক বিশেষ দায়িত্ববোধ থেকে তিনি ইতিহাসচর্চায় নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

আমাদের দেশে যারা ইতিহাসচর্চা করছেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তাঁর ইতিহাস বিবেচনা ও মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেন, তাঁর সঙ্গে আমার চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইতোপূর্বে ইতিহাস বিষয়ে আমার যে সব লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এর পরিচয় রয়েছে। তাই কেবল অনুরোধ ও দাবীর কারণেই নয় আপন গরজে স্বপ্রণোদিত হয়েই তাঁর ইতিহাস গ্রন্থগুলোর ওপর আমার আলোচনা করা উচিত।

ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি মনে করি, এখনও আমাদের জাতীয় ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে লেখা হয়নি। বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ড এবং এর অধিবাসীদের নিয়ে লেখা ইতিহাস গ্রন্থ নেহাত কম নেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে ঘটেনি। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যেসব ইতহাস লিখেছেন, তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণের প্রতিফল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালী' ঐতিহাসিকরা যে সব ইতিহাস লিখেছেন, তাদের মধ্যেও আমাদের প্রকৃত ইতিহাস ও ইতিহাসের সত্য বিধৃত হয়নি। কিংবা তা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর বাইরে ইতিহাসের যতটুকু চর্চা হয়েছে, তার মধ্যে একাংশ কেবলই পূর্বানুসৃতি এবং একাংশ অসম্পূর্ণ। একটি জাতি ও দেশের জন্য এর নিজস্ব ইতিহাসের কোনো বিকল্প নেই। ইতিহাস শুধু অতীতের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা নয়, কীর্তি-অকীর্তি, সফলতা-ব্যর্থতার বিবরণ নয়, ইতিহাস আরও অনেক কিছু। ইতিহাস বর্তমানকে গড়ে তোলার ও ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা লাভের অনুপ্রেরণার আশ্রয়স্থল। জাতীয় স্বার্থেই আমাদের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন পুনর্গঠন ও পুণর্লেখন হওয়া আবশ্যক। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক ইতিহাস, এখানে বসতি স্থাপনকারী মানুষ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে তাদের উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস, তাদের সামাজিক ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, শাসনেতিহাস, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে আজও লিখিত হয়নি। না হওয়ার কারণেই জাতি পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও কাটেনি। অথচ এই বাংলাদেশ একটি প্রাচীন ভূখণ্ড এবং এখানে মানববসতি স্থাপনের সূচনাও হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। তারপর নানা পরিবর্তন, নানা উত্থান-পতন, নানা সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই দেশ ও জাতি ভূইফোঁড় নয়। তার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এ জন্য ইতিহাসচর্চা যেমন ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার, তেমনি রচিত হওয়া দরকার বিভিন্ন দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

ইতিহাসচর্চা বলতে যা বোঝায়, তা এই উপমহাদেশে শুরু হয় মুসলিম শাসনামলে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা। এর আগে পুরান কথা ও সাহিত্য ছাড়া নির্ভরগোয্য কোনো ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া যায় না। মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে ইতিহাস রচনা করেন। তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উপমহাদেশের অতীত, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই ধারাবাহিক ইতিহাসচর্চায় ছেদ পড়ে। ব্রিটিশ আমলা ঐতিহাসিকরা উপমহাদেশের নতুন ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। তারা প্রধানত তাদের ইতিহাসই রচনা করেন, যেখানে তাদের গৌরবগাঁথাই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্যে বাদ ও বিকৃতি তাদের ইতিহাস চর্চার বড় বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশীয়দের মধ্যে যারা ইতিহাস রচনা করেন, তাদের ইতিহাসও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তারাও মূলত ব্রিটিশ আমলা ঐতিহাসিকদেরই অনুসরণ করেন। সে সব ইতিহাসও খন্ডিত, অসম্পূর্ণ। একপেশে ও মতলবী। ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে এই ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

যে-কোনো জাতির সঠিক ও অবিকৃত ইতিহাস তার চলার পথে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এমন পথ দেখানো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের নেই। ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস চর্চা যতটুকু হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং একের সঙ্গে অপরের অমিলও যথেষ্ট। ইতিহাস এমন এক বিষয়, যার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। আঙ্গিকগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণে এই পার্থক্য ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসচর্চা আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের মধ্যেই সীমিত হয়ে নেই, তা রীতিমত বিভ্রান্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, আমাদের জাতিসত্তার মূলধারা কোন্‌টি এবং কি, তা প্রশ্নাতীতভাবে এখনও নির্ণিত হয়নি কিংবা এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই কাজটি ইতিহাসবিদদেরই করার কথা। কিন্তু তারা এদিকে খুব কমই নজর দিয়েছেন। জাতি হিসাবে আমাদের একটি নিজস্ব সত্তা তো আছেই। জাতীয়তার যে স্পীরিট, তা ওই সত্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যেহেতু জাতিসত্তার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়নি। ফলে তার অন্তর্গত স্পীরিটও আমাদের বোধে ও চৈতন্যে কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি বা পারছে না। জাতীয়তা নিয়ে বিতর্কেরও তাই অবসান ঘটছে না। জাতিসত্তা চিহ্নিত হলে জাতীয়তা নিয়ে বিতর্ক থাকতো না। জাতিসত্তার সঙ্গে জাতীয় দৃষ্টিকোণের সম্পর্ক ওতপ্রোত। জাতিসত্তার মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিকোণ বাঁধা আছে। জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য জাতীয় দৃষ্টিকোণ অপরিহার্য। এর অভাবই ইতিহাস চর্চার বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টির মূল কারণ।

বিভ্রান্তি দূর ও সঠিক জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতিসত্তা নির্ণয় এবং তার বিকাশ ধারার আলোকে জাতীয় পরিচয়ের স্বরূপ উন্মোচন করা। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি এ কারণে ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ বলতে চাই যে, তিনি আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিকাশধারা নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ সংক্রান্ত তাঁর একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' শীর্ষক গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জাতিসত্তার স্বরূপ সন্ধানে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন। পাল শাসনামলের পূর্ব থেকে শুরু করে সেন ও মুসলিম শাসনামলে বিস্তৃত পটভূমিতে তিনি জাতিসত্তার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এ রকম চেষ্টা ইতোপূর্বে খুব কমই হয়েছে। এই ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'। একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তিনি এ গ্রন্থে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। সৈয়দ আলী

www.pathagar.com

আহসানের ভাষায় : 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে নতুন করে উদঘাটন করেছে। আমরা বিশেষ একটি ভূখন্ডের অধিবাসী এবং সেই ভূখন্ডের অতীত এবং আমাদের বিশ্বাসের সংস্কৃতি নির্মাণে যে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।'

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : ঢাকা-কলকাতা কেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' গ্রন্থের নাম থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। শতবর্ষের রাজনীতি ও দুই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সম্পর্কের নানা দিক ও বিভাগ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে। সে আলোচনা গতানুগতিক নয়। জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নির্মোহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থসহ তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই তিনি ব্যাপকভাবে পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ ব্যবহার করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অন্যান্যের অভিমত তুলে ধরে নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জাতিসত্তার স্বরূপ অনুধাবন এবং জাতি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে সহায়ক হবে, এ বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। এই নিভৃতচারী ইতিহাসবিদের কাছে থেকে আমরা আরও অনেক কিছু পেতে চাই এবং আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করার সক্ষমতা যে তাঁর আছে, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর সাধনা অব্যাহত রাখবেন, এ কামনা করি। পরিশেষে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট, ইতিহাস গবেষক

১৯৮৪ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ মোহাম্মদ আলীর ইসলামী ব্যাংক সফরকালে চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক লশকরের পাশে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন সফল ব্যাংকারও

ইকবাল কবীর মোহন

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন ইতিহাসবিদ, স্বনামধন্য সাবংবাদিক, লেখক ও গবেষক। একজন সুসাহিত্যিক হিসাবেও তিনি কম পরিচিত নন। তার উপর তিনি একজন স্বনামধন্য ও সফল ব্যাংকারও। পেশাগত জীবনে স্বর্ণপদক জয় করে তিনি তাঁর সফলতার স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জনাব আবদুল মান্নানের সাথে আমার সরাসরি পরিচয় ঘটে পেশার কারণে। সেটা ১৯৮৬ সালের ঘটনা। ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করে ব্যাংকের শেয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে গিয়ে প্রিয় স্যারের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। চাকুরী জীবনের শুরুতে অত্যন্ত পরিশ্রমী এ মানুষটির কাছ থেকে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি, তা আজও আমার সর্বদাই মনে পড়ে। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর ব্যবহার এবং কর্মতৎপরতা দিয়ে আমার পেশাগত জীবনে একটি স্বপ্নের সূচনা করে দিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, জনাব আবদুল মান্নান আজও একইভাবে ব্যাংকিং তৎপরতায় নিজেকে সমানভাবে নিয়োজিত রেখেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর তৎপরতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, পেশাগত জীবনের বাইরেও তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কাজে একজন অগ্রসৈনিক। এ দেশের সুস্থ ও কল্যাণকর সাহিত্যের বিকাশ, শিল্প ও সংস্কৃতির সুন্দর ধারা বিনির্মাণে তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন সিপাহসালার। শিল্প ও সাহিত্যের অনেক আন্দোলন ও সামাজিক সংগঠনের সাথে তাঁর সংযোগ এ ক্ষেত্রে তাঁকে আরো পরিচিত করে তুলছে বৈ কি।

ইতিহাসবিদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জন্ম ১৯৫২ সনের ৩০ জুন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার সত্যভান্দী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাতার নাম জোবায়দা বেগম। তাঁর দাদা মৌলভী আজিমউদ্দীন একজন জনহিতৈষী মানুষ হিসাবে পরিচিত এবং এলাকার অনেক জনহিতকর কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের মাঝে দ্বীনী জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্যে নিজ উদ্যোগে মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান পারিবারিকভাবেই ছিলেন ঐতিহ্যবাহী।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ছোটবেলা থেকেই প্রবল জ্ঞানানুসন্ধানী ছিলেন। অজানাকে জানার বাসনা তাঁর মধ্যে ছিলো প্রবল। সভ্যভান্দি গ্রামের মসজিদের মৌলভী আবদুল কুদ্দুসের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এর পর বাজবী প্রাইমারী স্কুলে আদর্শলিপি ও ধারাপাত-এর মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। মামার বাড়ির সুবাদে তিনি কামরাঙীর চর প্রাইমারী স্কুলে বা মনোহর মাদরাসায়ও আসা-যাওয়া করেন। প্রাইমারী স্কুলে পড়াকালীন সময়েই দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে কবি জসীমউদ্‌দীন-এর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এটাই তাঁর জীবনে কোন কবিকে স্বচক্ষে দর্শন। তাঁদের এলাকায় একবার প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত আসেন। যার ফলে জীবনে প্রথম একজন মন্ত্রির দর্শনও লাভ করেন তিনি। মন্ত্রীর সাথে করমর্দনের সময় তিনি বলেন, 'আপনাকে এম এ পাস করতে হবে।' এ ঘটনা ইতহাসবিদ মান্নান সাহেবের জীবনে এনে দেয় এক বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা। তিনি অতটাই অনুপ্রাণিত হন যে, এরপর থেকে তিনি কঠোর অধ্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময়

www.pathagar.com

থেকেই জ্ঞানার্জনের পথে তাঁর দ্রুত বিচরণের সূত্রপাত ঘটে। স্কুল জীবন থেকেই জনাব মান্নান লেখালেখির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি যখন হাইস্কুলের ছাত্র তখন তাঁর স্কুলে একবার কবি গোলাম মোস্তফার ছেলে শিল্পি মোস্তফা আজিজ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের তরুণ রিপোর্টার শফিকুল কবির আসেন। খুব অল্প সময়েই মান্নান সাহেবের খাতির জমে ওঠে তাদের সাথে। বিশেষ করে তরুণ সাংবাদিক শফিকুল কবির-এর সাথে কথা-বার্তা বলার পর সাংবাদিকতা ও লেখালেখির প্রতি একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

জনাব মান্নান সাহেব ১৯৬৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন এবং একই সনের মে মাসে রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। ইতিহাসপ্রীতির কারণেই ঢাকার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক বেড়ে যায়। তিনি প্রায়ই হোসাইনী দালান, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, লালবাগের কিল্লা, সদরঘাটের কামান, হাইকোর্ট এলাকা দেখতে যেতেন। তিনি থাকতেন ঢাকাস্থ মান্ডা গ্রামে। এখানে তাঁর কিছু ভালো বন্ধু জোটে। মান্নান সাহেব ছিলেন ছোটবেলা থেকেই বই পড়ুয়া। কাপাসিয়ার এনায়েতুল্লাহ নামে আর এক বই পড়ুয়ার সাথে তার পরিচয় ঘটে। এনায়েতুল্লাহ সাহেব তাঁকে পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ইউসিস লাইব্রেরী ও ইসলামী একাডেমী লাইব্রেরীর সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। তাঁর সারাদিন কেটে যেতো এসব লাইব্রেরীতে বই পড়তে পড়তে। তিনি ঢাকার শেখ বুরহানউদ্দিন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। এ কলেজের তিনি সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় মান্নান সাহেব এক টগবগে তরুণ। তিনি তখন আইয়ুববিরোধী ভূমিকায় অংশ নেন এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বর্জন করেন।

এ সময় তিনি আকস্মিকভাবে মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিবের সান্নিধ্য লাভ করেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ তিনি এখানেই লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রখ্যাত আলেম মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মাসুম, মওলান সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন, মওলানা মুস্তফা মাহমুদ আল-মাদানী, মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর মতো দেশবরেণ্য আলেমের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ অর্জন করেন। ১৯৭০ সালের ২ জানুয়ারী তিনি দৈনিক সংগ্রামে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দৈনিক সংগ্রাম ইউনিটের প্রথমে সহকারী ইউনিট চীফ ও পরে ইউনিট চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় যোগ দেন। সোনার বাংলায় তিনি প্রথমে বিভাগীয় সম্পাদকের পদটিও অলংকৃত করেন। পাশাপাশি সাপ্তাহিক বঙ্গদর্পণ, দৈনিক পূর্বাভাস ও দৈনিক সমাজেও লিখতেন। সোনার বাংলায় দায়িত্ব পালনকালে তিনি ১৯৭৩ সালে ইন্টারমিডিয়েড পাস করেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এবং প্রথম স্থান অধিকার করে এম এ পাস করেন। সোনার বাংলায় কাজ করার সুবাদে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, মোহাম্মদ মোদাব্বের, বাংলাদেশ অবজারভার-এর সাবেক সম্পাদক আবদুস সালাম, বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি, সোনার বাংলার সাবেক সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরী, প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, ড. আলিম আল রাজিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য লাভ করেন। আবুল মনসুর আহমদ-এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর স্নেহাষিশ লাভে সমর্থ হন। এর অনেক পূর্বেই কবি ফররুখ আহমদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই বছর তাঁর লেখা প্রথম বই 'বাংলাশের পুলিশ' খোশরোজ কিতাব মহল থেকে প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিকতাকে জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের এবং জাতির খেদমতের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে শরীক করেন। নিছক চাকুরী হিসেবে নয় বরং ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মহান কর্ম হিসাবে তিনি ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত হন। ১৯৯০ সালে ইসলামী ব্যাংক মৌচাক শাখায় ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালের জন্য তিনি দুইবার ব্যাংকের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানেজার হিসেবে স্বর্ণপদক, নগদ পুরস্কার ও

www.pathagar.com

সম্মাননা লাভ করেন। ডিপোজিট মোবিলাইজেশনসহ সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৯২, ১৯৯৪ ও ২০০১ সালে তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর দুই সপ্তাহব্যাপী এক প্রশিক্ষণকোর্সে যোগ দেন। তিনি ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিট্যান্স কার্যক্রমের মার্কেটিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সৌদী আরবে যান। সৌদী আরব ছাড়াও কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ইরান, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইংলেন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় যান। দীর্ঘ পাঁচ বছর উপসাগরীয় দেশসমূহে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে ২০০০ সালে ইসলামী ব্যাংকের হেড অফিস কমপ্লেক্স শাখায় সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন ও পরে ২০০৫ সালে ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ২০০৬ সালে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং উইং-এর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন এবং ব্যাংকের সার্বিক উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখেন। বর্তমানে তিনি ব্যাংকের বিনিয়োগ উইং-এর প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তবে শত ব্যস্ততার মধ্যেও জনাব মান্নান নিজের লেখক সত্তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত রেখেছেন। এখনও প্রায় প্রতিদিন তিনি সময় পেলে লেখালেখি ও পড়ার কাজে সময় ব্যয় করেন। তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, শিক্ষার ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, রাজনীতিতে মেরুকরণের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক কাজ করেছেন।

জনাব আবদুল মান্নান-এর চিন্তা, কর্ম, দর্শন, সাধনা দেশ ও জাতির আগামী দিনের কারিগরদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এবং তাঁর গবেষণা বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চা অঙ্গনে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এ আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করতে পারি নিঃসন্দেহে।

লেখক : গবেষক, শিশু সাহিত্যিক, আন্তর্জাতিক ভাষ্যকার, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা ব্যবস্থাপক, হেড অফিস কর্পোরেট শাখা

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ শাখা উদ্বোধনের দিনে এক বিশেষ মুহূর্তে বাম দিক থেকে শিল্পপতি এ কে খান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হাস্যোজ্জল মোহাম্মদ ইউনুছ ও ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক লশকর

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
একজন আলোকিত মানুষের কথা
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, গবেষক, ইতিহাসবিদ, সংগঠক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ব্যাংকার ইত্যাদি নানা পরিচয়ে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। আমাদের সমসাময়িককালে শিকড় সন্ধানী গবেষক, জতীয় ইতিহাস- ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও মুসলিম বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীরাশ্রয়ী গ্রন্থ ও কলাম রচনায় তাঁর অবস্থান অনন্য। এ ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তাও লাভ করেছেন তিনি। জ্ঞানের বিশালতা, অভিজ্ঞতার সম্ভার, সমাজ ও বিবেকবোধ, নৈতিকতা ও সৃষ্টিশীলতায় তিনি এক শ্রদ্ধেয় অবস্থান অর্জন করেছেন। বহুমুখী প্রতিভা, বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা, গবেষণা নিষ্ঠা, সার্বিক আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলির উপর তাঁর সচেতনতা এবং পান্ডিত্য তাঁকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে একজন স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

বর্তমানে দেশের প্রখ্যাত পেশাদার ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একেবারে শুরুরকাল থেকে জড়িত থেকে বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর ফেলো হিসেবে জড়িত হয়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শীর্ষ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

ইতিহাসবিদ ও গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মানস কাঠামো ও সৃজন চিন্তার মূল প্রেরণা স্বপ্নে। বর্তমান থেকে তিনি চলে যান অতিতে। উপস্থিত হন উৎস মূলে। তারপর অনুসন্ধানগুলো তুলে ধরেন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে। বর্ণিত বিষয়ের গভীরতর অনুসন্ধান এবং নতুনতর ইতিহাস আবিষ্কারের দ্যোতনায় উদ্ভাসিত বিধায় তিনি একজন শেকড় সন্ধানী গবেষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস তাঁর নিজস্ব এলাকা। তাঁর অতি প্রিয় অনুশীলন ও গবেষণার বিষয়বস্তু। তবে তাঁর জ্ঞান ইতিহাসের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ অবাধ। গভীর অন্তর্দৃষ্টিভরা অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধনের সম্ভার সৃষ্টি করেছেন তিনি জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে কোন বিষয়কে তাঁর বর্ণনার গুণে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে জানেন। তাঁর লেখার তিনটি গুণ এবং সেগুলো হচ্ছে, এক. ভাষার স্বচ্ছলতা, দুই. চিন্তার গভীরতা এবং তিন. বিষয়ের অনিবার্যতা।

যে বিষয় তিনি বেছে নেন, সেটি অনিবার্য ও নির্ভিক হয়ে ওঠে। তাঁর বিষয়বস্তুর একটি তালিকা করলে দেখা যাবে ঘুরে-ফিরে তিনি স্থিত হচ্ছেন তাঁর প্রিয় কিছু চিন্তার মধ্যে। যেমন-মানুষ, সমাজ, পরিবেশ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, সময় প্রান্তিক ও মজলুম জনগোষ্ঠি, বাংলা ও বাংগালী, মুক্তিসংগ্রাম, রেনেসাঁ, অভিবাসন, ভ্রমণবৃত্তান্ত, মুসলিম বিশ্ব, ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, রাজনীতি। এক দিকে আছে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন; স্বার্থ সময় ও

www.pathagar.com

গোষ্ঠী; উৎপাদন-শোষণ-মধ্যস্বত্বভোগ, আইন-স্বাধীনতা-সাম্য-সৌভ্রাতৃত্ব, সংস্কৃতি, জনজীবন এবং জীবনের মান-অপমান; স্বার্থপরতা ও পরাণ্যপরতা; নারীর মর্যাদা ও অধিকার, দাওয়াত-তাবলীগ-প্রচারধারা, ঐক্য-সংহতি-উম্মার শত্রু-মিত্র, সমাজ কাঠামে দুর্বলতা ও এর পরিবর্তনের অনিবার্যতা, বিপ্লব-নিয়মতান্ত্রিক, ইসলামী বিপ্লব, সুদ-পুঁজীবাদের কলুষ ও তার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই; বিশ্বায়ন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও সমাজে তা থেকে উদ্ভূত সংকট; শিষ্টাচার-শালিনতা-মূল্যবোধ; দারিদ্র্য-সম্পদের বন্টন-উন্নয়ন-এ রকম আরো অসংখ্য চিন্তা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কাছে ক'টি বিষয় যেমন প্রিয়, ক'টি তেমনি অপ্রিয়; কিছু বিষয় ব্যক্তিগত হলেও বৃহত্তর পাবলিক ডিসকোর্সের কাঠামোতে স্থাপিত। আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। যেমন-আমাদের জাতিসত্তার বিকাসধারা অথবা বাংলা ও বাংগালী। মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ব্যাখ্যায় একটা নিজস্বতা, শেকড় সন্ধানী মনোভংগী ও মৌলিক মাত্রা সব সময় দৃশ্যমান হয়। যুক্তি ও তর্কের একটি পলেসিত তিনি তাঁর লেখনীকে সাজান এবং প্রায়শই এ রকম সিদ্ধান্তে পাঠকদেরকে পৌছাতে সাহায্য করেন যে, যদি সমাজের ভিত্তি না বদলায়, সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন না করে জোড়াতালির কোন পরিবর্তন আসলে তা হবে সাময়িক অথবা এর সুফল হবে ক্ষণস্থায়ী।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখালেখির আরেকটি পরিচয় হচ্ছে এর একটি বৈশ্বিক মাত্রা। তার ক্ষেত্রে যে অর্থে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আছে জ্ঞান ও চিন্তা, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশ। জাতীয় বা দেশীয় প্রেক্ষিতের পেছনে কার্যকর ইতিহাস ও রাজনীতির অবস্থানগুলো শনাক্ত করতে গিয়ে, স্থানীয় ইতিহাসের শেকড় সন্ধান করতে গিয়ে এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও সময়ের সম্পর্কগুলো পুনঃ নির্ধারণ করতে গিয়েই বিস্তৃত ওই ভূমিটিকে তিনি চিহ্নিত করেন। যাকে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক বলে অভিহিত করা যায়। অন্য কথায় তাঁর চিন্তায় বৈশ্বিক কথাটি অবধারিতভাবে একটি বাইনারিতে স্থানীয়র সংঙ্গে যুক্ত হয়। এমন একজন মানুষ হিসেবে তিনি বিশ্বকে দেখেন যার মূল গভীরভাবে বাংলাদেশের মাটিতে প্রোথিত। এই বৈশ্বিক অবস্থানের দু'টি সুফল তাঁর লেখায় পাওয়া যায়।

এক. বিশ্বের চিন্তাগত এবং সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যগত সব মানবিক প্রকাশ ও আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযুক্ত এবং তার বিষয় ও শৈলীগত প্রকাশে একটি দীর্ঘ প্রেক্ষিতের উপস্থিতি। বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তা আন্দোলন থেকে তিনি অনেক পাঠ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেগুলোকে সব সময় স্বীয় আদর্শিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তবেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে মন্তব্য ব্যাখ্যা পেশ করেন বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছান, তা সংক্ষেপে, সার সমৃদ্ধভাবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষিত-পরিক্ষিত একটি রসে ভিজিয়ে পরিবেশন করেন।

সৃষ্টিশীল লেখনীতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বিচিত্র সহজে লক্ষণীয়। তিনি এক দিকে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অন্য দিকে অনুবাদ করেছেন। এবং দু' ক্ষেত্রে তিনি একজন লেখক হিসেবে নিজেকে পেশ করেছেন মুসলিম জাহান ও ইসলামী উম্মাহর সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তিনি অনেক লিখেছেন, ঘটনার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘটনার পশ্চাতের ঘটনা এবং সমম্যা-ষড়যন্ত্রের উৎসমূলে পৌছাতে চেষ্টা করেছেন। আর এ জন্য তিনি ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিচরণ করেছেন। উম্মাহর সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, বোধ-বিশ্বাস, আশা-আকাংঙ্খা সংকট-সম্ভাবনার দিকটি নতুন প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করেছেন। সমসাময়িক ঘটনার সূত্র ধরে তাই কখনো কখনো ছুটে গেছেন হাজার-দেড় হাজার বছর আগের জামানায়। এই যে কাল থেকে কালান্তরে ছুটে চলা অসংখ্য প্রবন্ধ আর গ্রন্থের অবয়বে তার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আল্লাহ পাক হায়াতুত তাইয়্যেবা দান করুন। তিনি বেঁচে থাকুন আরো অনেক দিন এবং আমাদের মনের চোখকে উন্মীলিত করতে থাকুন। এ-ই হচ্ছে এই লেখার শেষ প্রত্যাশা। তিনি বর্তমান সময়ে এক সাহসী কলম যোদ্ধা, একজন সফল আলোকিত মানুষ। তাঁর কাজ শেষ হবার নয়।

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ড, আইবিবিএল, কাওরান বাজার শাখা

www.pathagar.com

তিনি আমার বড় ভাই

আবুল হাসনাত

খালের নাম সোনাখালি। সোনাখালীর দুই তীর ঘেঁষে পূর্ব-পশ্চিমে বেড়ে ওঠা গ্রামের নাম সত্যভান্দী। সত্যভান্দী গ্রামটির দুই অংশ। খালের উত্তর পাড়ে দড়ি সত্যভান্দি। এ দড়ি সত্যভান্দি গ্রামটি সোনাখালির পূর্ব পশ্চিমে লম্বমান। পূর্বের অংশের শুরুতেই এখন একটি পাড়া। নাম বাগান বাড়ি। এ বাগান বাড়ির এক শান্ত, ভদ্র, নিরীহ অথচ ন্যায়ের প্রশ্নে আপোসহীন মানুষ মোহাম্মদ আবদুল মালেক। সমাজকর্মী, পরহিতব্রতী এ মানুষটি পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর সহধর্মিনী সুগৃহিনী জোবায়দা বেগম একজন সমাজ কল্যাণ ব্রতী, শিক্ষানুরাগী, প্রতিভাময়ী দয়ার্দ্র মহিলা। জীবনের এক পর্যায়ে এসে তিনি পরিচিত হন ইসলামী আন্দোলনের শত শত কর্মীর মা হিসাবে। সেই বাবা-মার নয়ন জুড়িয়ে জন্ম নেয় তিন ছেলে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আবুল হাসনাত ও আবদুল হালিম।

জন্মের পরপরই দুই মেয়ের মৃত্যু হয়। স্বভাবতইঃ মা-বাবা, দাদা, আত্মীয় স্বজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। না জানি এবার কি হয়। আলাহ পাক তাদের নিরাশ করেন নি। মা জোবায়দা বেগমের কোল জুড়ে চাঁদের আলোক প্রভা ছড়িয়ে জন্ম নিলেন আবদুল মান্নান। স্বাভাবিকভাবেই আদরের যেন শেষ নেই। আদরে আদরে স্নেহে ভালবাসায় বড় হতে থাকে আবদুল মান্নান।

আমার বড় ভাই সম্বন্ধে আমার খালা বলেন–আমাদের মান্নান ছোট বেলা থেকেই সোনার ছেলে। ছোট বেলা থেকেই সে ভদ্র, মার্জিত। সে কোন দিন কারো সঙ্গে ঝগড়া করেনা, গালি দেয়না, মারা-মারি করেনা সে সোজা স্কুলে যেত, আবার বাড়িতে চলে আসত।

ভাইয়ার স্কুল জীবনের এক বন্ধু, এখন শিক্ষক, জনাব সিরাজুল হক মোলা। তিনি বলেন–আমরা প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বন্ধু ছিলাম। তার মধ্যে আবদুল মান্নান ছিল খুবই ভাল এবং বন্ধুভাবাপন্ন। সে ছিল অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত, স্নেহপরায়ণ। সে অত্যন্ত ভাল বন্ধু। লেখা-পড়ায়ও সে ছিল খুব ভাল ছাত্র। আর দশজন থেকে সহজেই তাকে আলাদা করা যেতো।

আমার নানীর একমাত্র ছোট ভাই আম্বর আলী প্রধান। তিনি ছিলেন ছয় ফুট লম্বা এক মানুষ। চওড়া বুক। দেখতে পাঠানের মত। দশ-গ্রামের যে কোন বিচার-সালিশে তিনি হতেন মধ্যমনি। চর এলাকায় বড় ধরনের বিবাদ সৃষ্টি হলে মাঝখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালে থেমে যেতো আসন্ন ঝড়। বেঁচে যেতো জীবন ও সম্পদ। তাঁর ছিল এগার ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেরা প্রায় সবাই ছিলেন ছয় ফুটের কাছাকাছি। তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন পুলিশ ও আর্মিতে কর্মরত। তাঁদেরই বড় ভাই এস.বি অফিসে চাকুরী করতেন। সপরিবারে থাকতেন রাজার বাগ পুলিশ লাইনের ফ্যামিলী কোয়ার্টারে।

সেই মামার স্ত্রী মানে আমাদের মামী পূর্ব স্মৃতি আওরাতে গিয়ে বলেন ঃ তোমাদের বড় ভাই এসএসসি পরীক্ষার পর ঢাকা চলে আসার কয়েক মাস পর তোমার মা-বাবাও তোমাদেরকে নিয়ে ঢাকা চলে আসেন। তোমার মা-বাবা তোমাদের সাথে নিয়ে এক সময় গোপীবাগে থাকতেন। এক বড় বন্যার সময় ঢাকা শহর তলিয়ে যায়। তোমাদের বাসায় পানি ওঠে। তোমার মামা তোমাদের মা-বাবাসহ সবাইকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসেন। তখনই দেখেছি তোমার মা তোমাদের প্রতি, তোমাদের লেখা-পড়ার প্রতি কত যত্নবান ছিলেন। এত বন্যা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিন তোমার মা তোমাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতেন। বাসায় এলে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধোয়াতেন। তোয়ালে দিয়ে হাত-পা-মুখ মুছে নিজ হাতে ভাত খাওয়াতেন। তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড় পরাতেন। তোমার ভাই মান্নান কেরোলিনের সুন্দর শার্ট পরত। এই রকম শার্ট পরার জন্য তোমার মামাত ভাই কান্নাকাটি করত। তখন আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, তোর মান্নান ভাই বড় চাকরী করে তোকে সুন্দর সুন্দর শার্ট কিনে দিবে।'

বড় ভাইকে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আদর করতেন। ছোট বেলায় তিনি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্রও খুব ভাল ছিল। তাই সবাই তাঁকে স্নেহ করতেন, ভাল বাসতেন। ভাইয়ার এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার দিনে আমার নানা পাঁচগাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী কামরাঙীর চর বাজার থেকে বাজার করে সাথে পাঁচ সের দুধ নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কে যেন দৌড়ে গিয়ে ভাইয়ার পরীক্ষায় পাশের খবর দিল। সাথে সাথে তিনি আনন্দে সেই খবরদাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভুলেই গেলেন তার হাতের দুধের ভান্ডের কথা, বাজারের কথা।

আমার মায়ের আপন ভাই একজনই ছিলেন। সেই মামা তখন পি.আই.এ.তে চাকুরী করতেন করাচী অফিসে। ভাইয়ার জন্য প্রায় প্রতি মাসেই কাপড়-চোপড়সহ নানা গিফট্ পাঠাতেন। ঐ কাপড়-চোপড় পড়ে ভাইয়া ফুল-বাবু সেজে স্কুলে যেতেন ও ঘুরে বেড়াতেন। ফলে বড় ভাইয়ার পোশাক সে কালে শিক্ষক ছাত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। আমাদের এলাকায় ও স্কুলে তিনিই প্রথম কেরোলিন শার্ট গায়ে দিয়ে সকলের দৃষ্টি কেড়েছিলেন।

আমাদের নানারা কয়েক ভাই ছিলেন, কে আপন নানা কে চাচাতো নানা তা বুঝার সুযোগ পাইনি আমরা। নানাদেরকে আমরা বড় নানা, মেঝো, সেজো, ছোট নানা হিসাবে চিনতাম। নানীদের বেলায়ও তাই। এসব ঘরের মামা-খালাদের ঘরে আমাদের সমান আদর আর অধিকার ছিল। তবে সব মামা-খালা কিংবা আমার নিঃসন্তান একমাত্র চাচা মরহুম দীন মুহাম্মদের আদর একটু বেশী কেন্দ্রিভূত ছিল আমার বড় ভাইয়ার প্রতি। বড় ভাইয়া ছিলেন সে ঘরে সন্তানের মতো।

দুপতারা স্কুলে পড়া অবস্থায় তিনি ছিলেন প্রথমে ক্লাস ক্যাপটেন। পরবর্তীতে স্কুল ক্যাপটেন। দুপতারার জমিদার বাবুদের পরবর্তী বংশধরদের দাপট আমাদের এলাকায় তখনো অবশিষ্ট ছিল। স্কুলকে ঘিরেও তাদের দৌরাত্ম ছিল। তেমনি কোন একটি ঘটনার প্রতিবাদের কারণে আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক জমিদার-সন্তান পরেশ বাবু ভাইয়াকে লাইব্রেরীতে নিয়ে বেত দিয়ে খুব মারধর করেন। তবে ভাইয়ার ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন সে অন্যায়ও তখন বন্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ ভাইয়ার আন্দোলন আর মার খাওয়া ব্যর্থ হয়নি। এ ঘটনার কিছুদিন পর মা-বাবা ভাইয়াকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন সেখানে পাঁচগাও হাইস্কুলে লেখা পড়া করার জন্য। পাঁচগাও স্কুলের শিক্ষকগণ, সহপাঠিগণ, গ্রামের অনেকেই তাঁকে খুব আদর করতেন। সেখানে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে সে স্কুল থেকেই তিনি এসএসসি পাশ করেন।

আমার মা-বাবার আদর্শে গড়া ভাইয়া ছোট বেলা থেকেই ছিলেন খুবই শিক্ষানুরাগী। গ্রামের স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে সেই তখন থেকেই তিনি ছিলেন পরম আগ্রহী। অভাবের কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে ভাইয়া ঐ বাবা-মাকে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানাভাবে বুঝাতেন। অনেক বাবা-মা ভাইয়ার অনুরোধে তাদের মত পাল্টিয়ে ছেলেমেয়েকে আবার স্কুলে পাঠাতেন। ভাইয়ার পড়ার ঘরটি বেশ প্রশস্ত ছিল। পাড়ার এমনকি গ্রামের অনেক ছেলে মেয়ে এসে তার কাছ থেকে তাদের পাঠের অনেক সমাধান করিয়ে নিত।

ভাইয়া স্কুলে পড়ার সময়ই পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সমিতি গঠন করেছিলেন। তাদের জন্য তিনি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। সে সময় তিনি নিজে একজন উৎসাহী সাংস্কৃতিক ও নাট্যকর্মীও ছিলেন। দুপতারা ইউনিয়ন পরিষদ এর সামনে প্রতি বছর শীতকালে নাটক হত। তখনকার শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহে এলাকায় ভালো নাট্যদল গড়ে উঠেছিল। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ভাইয়া এক নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ঐ অভিনয়ে অনেকেই বুঝতে পারেনি বড় ভাইয়া ঐ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কলেজে পড়ার সময়ও এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি বার্ষিক ক্রিড়া

www.pathagar.com

প্রতিযোগীতার আয়োজন করতেন। পুরস্কার হিসাবে তাদের প্রদান করতেন বই-খাতা-কলম ইত্যাদি।

আমাদের গ্রামের, ইউনিয়নের, থানার স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের জন্য সব সময়ই তার খুব দরদ দেখেছি ও দেখছি। সাংবাদিক থাকা অবস্থা থেকেই বেতনের টাকা থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বই-খাতার ব্যবস্থা করতে দেখেছি। আরো পরে তার উৎসাহ ও আগ্রহে দুপতারা বাজার কেন্দ্রিক তিনটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় সমাজ উন্নয়ন পরিষদ। তিনি গ্রামবাসীর জন্য সমাজ উন্নয়নের একটি মডেল সেখানে তুলে ধরেন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার তিনি সমাজ উন্নয়ন পরিষদে ছুটে যেতেন।

আমাদের গ্রামের বাড়িটি এখন এলাকার এই ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যানেই নিয়োজিত। গ্রামের একশ সোয়া শ' ছেলে-মেয়ে এখন আমাদের বাড়িতে আমার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 'জোবায়দা বেগম ফ্রী কোচিং হোমে' লেখাপড়া করছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত বই পত্র ও টিউটর রয়েছে। এছাড়া বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'মৌলবী আবদুল মালেক গণ পাঠাগার'। ভাইয়া সব সময় আমাদের এলাকার শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণসহ সার্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দুপতারা এলাকার বাইরেও তিনি বিভিন্ন পাঠাগার, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত।

ঈদ ছাড়াও মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে তিনি স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের সমাবেশ করেন। তাদের নগদ পুরষ্কার বা উপহার দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে উৎসাহ যোগান। ছেলে-মেয়েদের গার্জীয়ানদের মধ্যে রিকশা, গরু-বাছুর বিতরণ করেন। যাতে সে আয় থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানো যায়। এসব কাজ তিনি করেন খুবই চুপিসারে। তবে লোকদের সাহায্য করার ব্যাপারে তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তিনি সাধারণত তলাবিহীন ঝুড়িতে সম্পদ ঢালতে রাযী নন। কিছু লোক আছেন তারা না খেয়ে থাকলেও তাদের অভাব বাইরে প্রকাশ করেন না। তাদের কষ্ট সবচে বেশী হয়। তারা সমাজে প্রকৃত অভাবী। তাদেরকে সাহায্য করলে তারা উঠে দাঁড়াবেন এবং দেশের দ্রুত উন্নতি হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যারা লঙ্গরখানায় থাকে তাদের মধ্যে কিছু লোক অনেক সময় অন্যদের চাইতে বেশী সাহায্য পায়। কিন্তু কিছু সম্ভ্রান্ত লোক লঙ্গর খানায় না গিয়ে নিজ ঘরে না খেয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজন থাকে অপ্রকাশিত। তাদের দিকে কেউ তাকায় না। তাদের ব্যাপারে ভাইয়ার মনোযোগ সবচে বেশী। তিনি গোপনে তাদের সম্পর্কে তথ্য নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে গোপনে তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেন। তার মতে, যত্রতত্র হাত পাততে অভ্যস্ত ভিক্ষুকদের তলাবিহীন ঝুড়িতে যতই সাহায্য ঢালা হোক তাদেরকে কাজে নামানো যাবে না।

বন্যার সময় গ্রামের মানুষদের জন্য দেখেছি তাঁর আকুল আকুতি। কখনো আমাকে সাথে নিয়ে ছুটে গেছেন তিনি গ্রামে। নৌকা নিয়ে আশ্রয়হীন মানুষগুলির অনেকের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য।

আমার বড় ভাই এর কোমল হৃদয়ের অস্থীরতা জীবনে বহুক্ষেত্রে বহুবার দেখেছি। গেলবার দেখেছি আমার অসুস্থতার সময়। ইটালীতে ব্যবসা করতে গিয়ে আমি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে হৃদরোগ আক্রান্ত হই। আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বড় ভাই খবর পেয়ে দৌড়ে ছুটে যান। এর পর আমাকে ল্যাব এইডে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেয়া হয়। এনজিওগ্রামে পাঁচটি বক ধরা পড়ে। ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দেন। আমি আর্থিক বিষয় চিন্তা করে অপারেশন করতে রাজী ছিলাম না। ভাইয়া বললেন, প্রয়োজনে আমার ফ্লাট বিক্রি করে তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। প্রয়োজনে তোকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাব।

ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির সাহেব ওপেন হার্টের নামকরা সার্জন। তিনি হার্ট ফাউন্ডেশনে অপারেশন করেন। তাই ভাইয়া আমাকে হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি করে দিলেন। দুই দিন পর অপারেশন। অপারেশনের আগের দিন আমাকে খুশী করার জন্য ভাইয়া বসুন্ধরা মার্কেট থেকে একটা সুন্দর গেঞ্জি কিনে আনলেন। আমাকে উপহার দিলেন। আমার অপারেশনের সময় রক্ত লাগবে পাঁচ ব্যাগ। ভাইয়া ইসলামী ব্যাংকের অনেক ভাইকে নিয়ে এলেন রক্ত দেয়ার জন্য।

সকালে অপারেশন। সবার সামনে থেকে আমাকে অপারেশন

www.pathagar.com

থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাই ব্যাকুল। সকলের চোখ ছল ছল করছে পানিতে। ভাইয়ার চোখে পানি। মুখ অসম্ভব মলিন। অসম্ভব টেনশন ফিল করছিলেন। তবে আমি টেনশন মুক্ত। বিশ্ব জাহানের সবার মালিক যিনি, সবকিছুর মালিক যিনি, আমার মালিকও তিনি। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় আমাকে নিয়ে যাওয়ার তাহলে ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং আমি প্রস্তুত হে রব! আমি তোমার ডাকে প্রস্তুত! কলেমা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলাম। সাত-আট ঘন্টা পরে ঘুম ভাঙল।

ভাইয়ার অফিসের সালাহউদ্দিন ভাইর কাছ থেকে পরে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ 'হাসনাত ভাই, স্যার আপনাকে খুব বেশী ভালবাসেন। আপনার অপারেশনের আগের দিন স্যার রুম বন্ধ করে কাঁদছিলেন। কথা প্রসঙ্গে স্যার বলছিলেন–তোমরা জান না, কেমন মনের আর কত ভালো আমার এই ভাইটি।'

অনেকের মুখেই শুনেছি ভাইয়ার আকুতি ও ব্যাকুলতার কথা। যাকে পেয়েছেন সবার কাছেই দোআ চেয়েছেন আমার সফল অপারেশনের জন্য। আমার রোগমুক্তির জন্য। মক্কা-মদিনায় তার অগুণতি বন্ধু আর সুহৃদ আছে। সেখানে ফোন করে বায়তুলাহ ও মসজিদে নববীতে দোআ করিয়েছেন। ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের প্রতিটি জামায়াতের পর দোআ করিয়েছেন। আমাদের গ্রামে দোআ করিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অত্যন্ত সুন্দর মনের একজন সৎ, চরিত্রবান আদর্শবান মানুষ আমার ভাইয়া। আলাহ পাক তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ, শান্তি, তৃপ্তি দান করুন। হে মহান রব! তুমি আমার ভাইয়াকে ক্ষমা কর। তাঁর প্রতি দয়া কর। তাঁর প্রতি রহম কর। তাঁকে তোমার সন্তুষ্টির উপর পরিচালিত কর। তোমার সৃষ্টির সেবা করার, তোমার রাহে জান-মাল উৎসর্গ করার তৌফিক দান কর। তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর। তার উপর তুমি রাযি থাকো। তাঁকে তোমার উপর রাযি রাখো। দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে মর্যাদার উচ্চ স্থান দান করো। হে সর্বময় ক্ষমতার মালিক! তুমি আমার মিনতি, আর্জি, দোআ কবুল কর।

লেখক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর অনুজ সহোদর

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এক সত্য সন্ধানী ইতিহাসবিদ

আমিন আল আসাদ

কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যেপার্থক্য ও সদৃশ্য আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক গবেষক উল্লেখ করেছিলেন-'কবি বলেন এ যেনো সেই....' কিন্তু বিজ্ঞানী বলেন, 'যেনো নয় এই সেই'। তথাপি উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন তা হলো মানুষের জন্যে কিছু করা। সমাজের জন্যে কিছু করা। সমাজের কল্যাণ সাধন, জাতির কল্যাণ সাধন। সমাজকে ও জাতিকে পথ নির্দেশ প্রদান।

কবিরা মানুষের জন্যে স্বপ্ন নির্মাণ করেন, জাতিকে আশার আলো দেখান। এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উদীপ্ত করেন। অপরপক্ষে একজন বিজ্ঞানী সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে মানুষের সামনে, জাতির সামনে পেশ করেন। সঠিক তথ্য এবং পরম সত্যকে বাস্তবে পরিবেশন করেন। একজন ইতহাসবিদ তথা ইতিহাসবিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বিজ্ঞানীর কাজ হলো উপাত্তসমূহের গভীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রয়োজনে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে তথা সূক্ষ্মে অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি সঠিক লক্ষ্যে পৌছা। পরম সত্যকে আবিষ্কার করা। সত্যকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করা। একজন ইতহাসবিজ্ঞানীও হাজারো কথা-কাহিনীর ভিড় থেকে সঠিক কথাটি উদ্ধার করে আনেন। সমুদ্র সিঞ্চন করে মণি-মাণিক্য তুলে আনেন। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল সরিয়ে উদ্ধার করেন হাজার বছরের আবর্জনায় ও ধূলিস্তরে চাপা পড়া আনন্দ-বেদনার কাহিনী। অনুসন্ধান করেন আলোকজ্বল অতীত।

কবিরা স্বপ্ন নির্মাণ করেন এবং স্বপ্ন দেখান জাতিকে। আর ইতিহাসবিদ সেই স্বপ্নের পাটাতনটি দেখিয়ে দেন। পরিচয় করিয়ে দেন স্বজাতির শেকড়ের সাথে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন সত্য অনুসন্ধানী ইতিহাসবিদ। যিনি জাতির সমৃদ্ধ অতীতকে পুনরুদ্ধার করে বলেছেন 'আমরা তো কখনো পিছিয়ে ছিলাম না। প্রশ্ন রেখেছেন : আমাদের কি ছিলো না ? আমাদের কি নেই? আমাদের অনেক কিছুই ছিলো। আমাদের অনেক কিছুই আছে। তবুও কেনো আমরা পিছিয়ে? আমাদের রয়েছে গর্ব করার মতো একটা সোনালী অতীত। রয়েছে স্বর্ণালী ঐতিহ্য। অবশ্য একথাও ঠিক-আমরা যে একেবারেই এগোইনি তা কিন্তু নয়। আমাদের অনেক কিছুই ছিলো

অনেক কিছুই হারিয়েছি এবং অনেক কিছুই অর্জন করেছি। আমাদের অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাটা আরেকটু এগিয়ে নেয়ার জন্য মূলত মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের এই নিরন্তর ইতিহাস চর্চা। আমাদের অনেক কিছু ছিলো বলেই তো ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, বর্মী, মারাঠা-বর্গী ও ইংরেজ জলদস্যু-ডাকাতেরা আমাদের দেশে লুণ্ঠন ও ডাকাতি করতে এসেছিলো। ধনীর বাড়িতেই তো চোর-ডাকাতেরা হানা দিয়ে থাকে। যার বাড়িতে কিছু নেই তার বাড়িতে হানা দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কি? আমাদের অনেক কিছু ছিলো বলেই তো আজো আমাদের হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য ও পত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চুরি হয়ে যায়, প্রশাসণের বিভিন্ন স্তরে ঘাপটি মেরে থাকা কতিপয় জাতীয় কুলাঙ্গার, লোভী, ঘুষখোরদের যোগসাজশে তথাকথিত প্রদর্শনীর নামে বা ইত্যাকার নানা ছলনায় দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায় আমাদের ইতিহাসের ডাটা বা তথ্য-উপাত্তের উপকরণগুলো, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের আগামী কারিগরদের নিকট আমাদের অতীতকে যুগ-যুগ ধরে পেশ করতে পারতো। ইতিহাসের এসব দস্যু-ডাকাতেরা আমাদের দেশে বারবার হানা দিয়েছিলো এদেশেরই কিছু বে-ঈমান বিশ্বাসঘাতকের সহযোগিতায়। দস্যু-ডাকাতেরা আমাদের লুণ্ঠন করলেও একটি জিনিস তারা চুরি করতে পারেনি তা হলো আমাদের ঐতিহ্যবোধ, আমাদের চেতনাবোধ। আমাদের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আমাদের চেতনাবোধকে শাণিত করে, আত্মবিশ্বাস আর সততার চাষবাসের মাধ্যমে আমাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রগুলোর মতো

www.pathagar.com

আমরাও অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বর্ণশিখর স্পর্শ করতে পারি। এ আশাবাদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের সত্য ইতিহাস চর্চার মাধ্যমেই শুনি।

ইতহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জন্ম নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজারে ১৯৫২'র ৩০ জুন। এই সোনারগাঁকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব দেখেছেন খুব কাছে থেকে। নদী এবং নৌকা এককালে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো। যা মান্নান সাহেবও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ জন্যেই বলা হয়ে থাকে : 'নদী মাতৃক বাংলাদেশ'। কেননা নদী প্রভাবিত করেছে আমাদের জীবনযাত্রাকে। আর এই নারায়ণগঞ্জ জেলাকে স্পর্শ করেছে তিনটি বৃহৎ ও নামী-দামী নদী। 'শীতলক্ষা', 'ব্রহ্মপুত্র' ও ' মেঘনা'। এদিকে ঢাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত 'বুড়িগঙ্গা'ও উপছে পড়েছে শীতলক্ষার উপর। এই নদীগুলো প্রাচীন বাংলার রাজধানী 'সোনারগাঁকে ঘিরে প্রাকৃতিকভাবেই এক প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করেছিলো। আর আমাদের সদাজাগ্রত নৌ-সেনারা তো ছিলোই। বহিঃশত্রুরা সহজে সাহস করতো না নদী সাঁতরিয়ে এসে রাজধানী বিপর্যস্ত করার।

এই নারায়ণগঞ্জ জেলায় রয়েছে অগণিত ঐতিহাসিক স্থাপনা। বীর বাঙ্গালী ঈসা খাঁর কবর এখানে, শায়খ' নুর-কুতুবুল আলম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নস্তূপও এখানেই।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি এখানে। এ জেলাতেই রয়েছে কদম রসূল। অলি-আল্লাহদের দরগাহও এখানে। এখানে রয়েছে 'সোনাকুন্ডাদুর্গ'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বঙ্গবীর ঈসা খাঁ'র বীর পত্নী সোনামনীর আমরণ সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ দুর্গ। আমাদের ঐতিহ্যের প্রধান উপাদান আমাদের ধর্মবিশ্বাস। পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও আমাদের বৈশিষ্ট্য। সবকিছুই বিকশিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ-কে কেন্দ্র করে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের জন্মস্থান 'নারায়ণগঞ্জের' ঐতিহাসিক মাটির সোঁদা গন্ধই হয়তো বা তাঁকে করেছে ঐতিহ্যবাদী এবং প্রদান করেছে তাঁকে ইতিহাস সচেতন।

সেই প্রেরণার কথা স্মরণ রেখে লেখক তাঁর শাশ্বত বিশ্বাসের পথে ছুটেছেন। ইতিহাস চর্চাকেই লেখক পথের পাথেয় করে নিয়েছেন। কেননা 'যে জাতি তার ইতিহাস জানে না তাদের মতো হতভাগ্য আর নেই। আর যে জাতি তার ইতহাস চর্চায় যুক্তি কষ্ঠিপাথরে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে না সে জাতি নিপতিত হয় গহীন অন্ধকারে। সে জন্যেই বোধ হয় আক্ষেপ করে একজন ইতহাসবিদ বলেছিলেন, 'ইতিহাসের চরম শিক্ষা হলো ইতিহাস থেকে কেউ শেখে না'।

যা হোক। 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থে যুগপরিক্রমায় জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন 'বাঙালী' একটি পৃথক জাতিসত্তা। একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্রধারায় বিকশিত হয়েছে এ জাতি। এর রক্তধারায় প্রবাহিত তৌহিদবাদের আলো। গ্রহণ-বর্জন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে এ ভূ-খন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বতন্ত্রবোধ। বাঙালিত্বের সাথে যারা পৌত্তলিকতার সম্পর্ক খোঁজেন তারা মহাভুলের মধ্যে আছেন। বাঙালী জাতিসত্তার সাথে পৌত্তলিকতার কোন সম্পর্ক নেই, এ সাথে সম্পর্ক রয়েছে তৌহিদবাদের। বহিরাগতদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়ার ফলে সাময়িক বিভ্রান্তি এলেও মৌল চেতনা থেকে জাতিকে বিচ্যুত করা যায়নি। গিলে ফেললেও হজম করা যায়নি। তাই তো নিব বর্ণ হিন্দু এবং তৌহিদবাদী বৌদ্ধদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখি চানক্যবাদী সেদিনের বিপক্ষে। যে সেনরা এদেশে জাত-পাত ভেদাভেদের সংস্কৃতি চালু করেছিলো। মানুষের মধ্যে এনেছিলো অসাম্য ও অনৈক্য।

মান্নান সাহেবের আরেকটি অসাধারণ সৃষ্টি 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি। শুধুমাত্র 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' এই ধারণার উপর স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের অবতারণা ইতোপূর্বে বাংলাভাষায় হয়েছে কি-না আমাদের জানা নেই। সংকলন বা স্মারক প্রকাশিত হয়েছে অথবা কোন গ্রন্থে বিষয়টি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে বড়জোর। অথচ এই তত্ত্বটি স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস ও এর অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ না হলে আজকের বাংলাদেশ হতোনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী 'ঢাকা' বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলাও আসাম প্রদেশ গঠন,

www.pathagar.com

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্টা এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রতিটি ঘারাবাহিক ঘটনা পাশাপাশি জড়িত। সেদিনের ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশই আমাদের বিশ্বের মানচিত্রে স্বতন্ত্র ভিত্তি দান করেছিলো।

কলকাতার বাবুরা আমাদের দেশ তথা এই ভাটি বাংলাকে বলতো খামার বাংলা। তারা সব সময়ই এ অঞ্চলের মানুষদেরকে তাদের অধিনস্থ ভাবতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতো এবং নিজেদেরকে অভিজাত-উচ্চজাত এবং জমিদার শ্রেণীর মনে করতো। চাষাভূষা সম্বোধন করে হেয় করতো। এ অঞ্চলের চাষাভূষারা প্রাদেশিক সুভিদা পাবে, তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার বিকাশের পথ সুগম হবে, সরকারী সুযোগ সুবিধা পাবে এটা তাদের সহ্য হচ্ছিলোনা। সেন-আমলের চানক্যনীতি বংশানুক্রমিকভাবে তাদের রক্তে ও জিনে প্রবহমান ছিলো। এ জন্যেই বৃটিশ সরকার কর্তৃক পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের মানসিকতা ছিলো সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বঙ্গমাতা দ্বি-খন্ডিত হচ্ছে' শোর উঠিয়ে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের। শুরু করে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা। রবীন্দ্রনাথ-যাকে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য প্রতিভা হিসেবে পূর্ববাংলায় শ্রদ্ধা করা হয়। আমরা শিকারও করি তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য প্রতিভা। পূর্ব বাংলায় রয়েছে তাঁর অগণতি ভক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো তিনি পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের অপতৎপরতায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ার পর পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের ভগ্ন হৃদয় প্রত্যক্ষ করে তৎকালিন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা করেন হিংসুটে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু সম্প্রাদায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অথচ আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তারা সে সব জানে না। তাদেরকে সেসব সত্য জানানো হচ্ছিনা।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে সুসজ্জিত করেছেন। বঙ্গভঙ্গ রদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলিম লীগের জন্ম, পাকিস্তান আন্দোলনের উত্থান, জাতীয় জীবনের এইসব ঘটনা অতিক্রম করেই জাতি হিসেবে আমরা বর্তমানে পৌছেছি।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এটি ছিলো সময়ের বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অনেকে অস্বীকার করতে চান এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বকে একটি ভুল তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। তাদের তাকিয়ে দেখা প্রয়োজন যে ভারতে আজ বিরাজমান বহুজাতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে আজ শুধু দ্বি-জাতিতত্ত্বই নয় বহুজাতিতত্ত্বও বাস্তবসম্মত। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে পূর্ববাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা যা আজকে বাংলাদেশ তা ভারতের সাথে যুক্ত থাকতো পশ্চিম বাংলার মতো। আদৌ স্বাধীন বাংলাদশে পরিণত হতো কিনা সন্দেহ ছিল। কিংবা এভাবে যদি নাও বলি যে '৪৭ না হলে '৭১ হতোনা তবুও কি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারবো? '৪৭ সালে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এর জন্যে কি পূর্ব থেকেই প্রেক্ষাপট তৈরী হয়নি? আন্দোলন কি হয়নি? শেখ মুজিবুর রহমান কি পাকিস্তান আন্দোলন করেননি? কাজেই '৪৭ আমাদের ইতিহাসের বাস্তবতা। '৫২- ও আমাদের ইতিহাসের বাস্তবতা এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধও। '৪৭, '৫২, '৬২, '৬৫, '৬৯, '৭১ কোনটাকে কি অস্বীকার করা যাবে? যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেই ইসলামী নীতি ও ইসলামী ন্যায় বিচার ও এর পরিবর্তে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলা এবং এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো জুলুম, শোষণ, রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা, হত্যা, লুণ্ঠন। চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো যুদ্ধ। যার বিপরীতে দল-মত নির্বিশেষে এখানে গড়ে উঠেছিলো প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশকেই স্বীকার করা হয় না। ঠিক তদ্রূপ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কোন ঘটনাকে অস্বীকার করলে আমরা সময়ের রেলওয়ে থেকে ছিটকে পড়বো। কাজেই সেসব ঘটনাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে গ্রন্থটিতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

সোনার দেশ বাংলাদেশ বইয়ে আমাদের নৌশিল্প, বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, কাগজ শিল্প, লাক্ষা শিল্প সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের মসলিনের ছিলো ভুবনজোড়া খ্যাতি। মসলিনের গুণগত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে বলা হতো-'এ যেনো বাতাসের সুতোয় পরীর হাতে বোনা'। আমাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প এতোটাই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তুরস্কের সুলতান পর্যন্ত আমাদের দেশ থেকে যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করতেন। এর পূর্বে তিনি জাহাজ সংগ্রহ করতেন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে। দেখা গেলো যে, আমাদে জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ থেকে অনেক উন্নত। ফলে তুর্কী সুলতানের দরবারে আমাদের জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ-এর উপর বিজয়ী হয়েছিল। আমাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো আমাদের দেশের জলসীমাকে জলদস্যুদের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকতো। আমাদের নৌবাহিনীও ছিলো বেশ শক্তিশালী। শায়েস্তা খাঁ এ নৌ-বাহিনীকে ব্যবহার করেন পর্তগীজ ও মগ জলদস্যুদের দমন করতে। শায়েস্তা খাঁর আমলে এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেতো। অভাব ছিলো না এদেশের মানুষের মধ্যে। মাঠভরা ধান আর জলভরা দীঘি, পুকুর ভরা মাছ, এসব কথা আজ রূপকথার মতো শোনালেও এসব কথা সত্য ছিলো একসময় এদেশবাসীর জীবনে।

গ্রন্থে আমাদের দেশের কয়েকটি স্থানের 'স্থান নাম'-এর নামকরণের ব্যখ্যা করা হয়েছে। যেমন- ঢাকার কাগজীটোলার নামকরণ হয়েছে এ জায়গায় কাগজ তৈরী হতো বলে। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ও এগারোসিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানে নদীপথে ঈশা খাঁ ও মানসিংহের নৌ-বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে মানসিংহের একটি কোষা জাহাজ উল্টে যায়। পরবর্তীতে নদীর ঐ স্থানে চর জেগে ওঠে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। এই কোষা উল্টে যাওয়ার ঘটনার পর থেকে এ এলাকার নাম হয় কোষাকান্দা। নারায়ণগঞ্জ জেলায় শীতলক্ষার তীরে একটি দূর্গে ঈসা খাঁর আড়াই হাজার সৈন্য বসবাস করতো বলে একসময় এ অঞ্চলের নাম আড়াইহাজার হয়েছে বলে ধারণা পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে কার্পাস চাষ হতো বলে এই কার্পাস থেকেই কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে।

বইয়ে এ ধরনের মজার আরো কাহিনী রয়েছে। এছাড়া আমাদের জাতীয় বীরদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে ও পরাধিনতার গ্লানি থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে তাদের সংগ্রামের বিবরণ রয়েছে। তিতুমিরের কথা আমরা অনেকেই জানি। পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও শাহাদাত লাভের মধ্য দিয়ে কঠিন গোলামীর জিঞ্জিরে আমরা আবদ্ধ হই। তিতুমীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে বাঁশের কিল্লা তৈরী করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। ইংরেজরা আমাদেরকে পদানত রাখবার জন্য আমাদের নৌ-বাহিনী বিলুপ্ত করে। আমাদের নৌকা ও জাহাজ শিল্পকে ধ্বংস করে। বড় নৌকা বানানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞা না মানলে জরিমানাসহ ত্রিশ ঘা বেত-এর নির্দেশ প্রদান করে। ইংরেজীর আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে তাদের গোলামে পরিণত করে । এরা আমাদের মসলিন শিল্পীদের আঙ্গুল কেটে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে মসলিন শিল্পকে ধ্বংস করে এবং এদেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে তাদের প্রযুক্তিতে তৈরী কাপড় ক্রয় করতে বাধ্য করে। আমাদের মসলিন শিল্পের মতো আজ আমাদের পাট শিল্পও পরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তা আমাদেরই দোষে। পাট শিল্পও আজ মসলিন কিংবা শায়েস্তা খান-এর আমলের টাকায় আটমণ চাল পাওয়ার মতোই ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এই পাটকে বাংলাদেশের স্বর্ণসূত্র বা সোনালী আঁশ বলা হতো। এই পাট রপ্তানী করে বাংলাদেশ দুই/তৃতীয়াংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো। মসলিন ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে আর পাট শিল্প ধ্বংস হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ আমলেই। এখানে আমাদের অসততার সাথে বিদেশী ষড়যন্ত্রও ছিলো। সে অনেক কথা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব ইতিহাসের পরতে পরতে খুঁজে ফেরেন আমাদের গৌরবের নানা স্তম্ভ। ইতিহাসের ডাটা তথা তথ্য-উপাত্তগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রচলিত ভেজালো আস্তরণ ভেদ করে বের করে আনেন সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব। ঐতিহাসিক স্থানসমূহে সরেজমিন ভ্রমণ করে তিনি স্বভাবতই প্রত্নকীর্তির ভেতর খুঁজে ফেরেন বিশ্বাসের টেরাকোটা। আমরা তাঁর কর্মকে আত্মস্থ করতে পারলেই সার্থক হবে তাঁর নিরন্তর ইতিহাসচর্চা আর অবিরাম অনুসন্ধান।

লেখক : কবি, ছড়াকার প্রাবন্ধিক

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জীবন ও কর্ম

নাসির হেলাল

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শেকড় সন্ধানী একজন ঐতিহাসিক। ড্রেজার যেমন নদীর তলপেট হাতড়িয়ে কাদা, কাঁকর তুলে নিয়ে আসে, ডুবুরী যেমন পানির অতল তলে প্রবেশ করে তার কাঙ্খিত বস্তু খুঁজে বের করে, তেমনি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানও তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নানা ক্ষেত্র থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কুড়িয়ে আনেন, খুঁজে বের করেন। অবশ্য এ গভীর মনোনিবেশের কারণ হয়ত এও হতে পারে যে তিনি একজন সফল সাংবাদিকও। নানাবিধ গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, সংগঠক, প্রবন্ধকার, ব্যাংকার সর্বোপরি ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সুধী মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহান ভাষা আন্দোলনের বছর হিসেবে খ্যাত ১৯৫২ সালের ৩০ জুন বৃহত্তর ঢাকা জেলার আড়াইহাজার থানার দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের বাগ-বাগিচায় ঘেরা একটি বাগান বাড়ীতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জন্ম। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আবদুল মালেক এবং মাতার নাম জোবায়দা বেগম। দাদা মৌলবী আজিমউদ্দিন একজন লড়াকু মানুষ ছিলেন। এলাকার গণজাগরণের নেতা, জোতদার-জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কন্ঠস্বর মৌলবী মফিজউদ্দীনের অন্যতম একজন সহচর ছিলেন আজিমউদ্দীন। যে বাড়ীতে আবদুল মান্নানের জন্ম হয় এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলবী আজীমুদ্দীনের দাদা মালেহ মুহাম্মদ।

নিচে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর বংশ তালিকার ছক দেয়া হল-

মালেহ মুহাম্মদ
শেখ মোহাম্মদ
মাঈনউদ্দীন কাজিমউদ্দীন মৌলবী আজিম উদ্দীন
মোহাম্মদ আবদুর মালেক দীন মুহাম্মদ জমিলা খাতুন
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মোহাম্মদ আবুল হাসনাত
মোহাম্মদ আবদুল হালিম

আবদুল মান্নানের হাতেখড়ি হয় বাজবী প্রাইমারী স্কুলে। আর আরবী পড়ার প্রথম সবক নেন নিজ গ্রাম দড়ি সত্যভান্দী মসজিদে চাঁদপুরের মৌলভী আবদুল কুদ্দুসের কাছে। দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াকালে 'সোহরাব রোস্তম' নাটক কিনে পড়েন। এর পর পরই পড়েন- গাজী কালু চম্পাবতী, সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, ছহি বড় জঙ্গনামা, বিষাদসিন্ধু, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি। এছাড়া আরও পড়েন- দস্যু বাহরাম, দস্যু বনহুর, দস্যু মোহন, ভাইপর সিরিজসহ অন্যান্য বই। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালে সমবয়সীদের নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন-এর বিষাদ সিন্ধুর নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া-কালেই কবি জসীম উদদীনকে দেখেন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের অন্যতম সদস্য কিংবদন্তীতুল্য মানুষ গুল বখশ ভূঁইয়াকেও তাঁর স্কুলে দেখেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করে তিনি দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন। ক্লাস ক্যাপ্টেইন আবদুল মান্নান-এর এ সময় স্কুলে আসা শিল্পী মোস্তফা আজিজ-এর সাথে পরিচয় হয়। নবম শ্রেণীতে পড়াকালে তিনি ক্লাস ক্যাপ্টেইন থেকে স্কুল ক্যাপ্টেইন হন। এ সময় তিনি দুপতারার নাট্যদলে অংশ নেন, এমন কি অংক খাতায় মাঝে-মধ্যে দু'একটা কবিতাও লিখে ফেলেন। সাথে সাথে ঢাকায় আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভের খবর শুনে নিজ নেতৃত্বে পরদিন স্কুলে মিছিল বের করেন। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তাঁকে বাবা-মা মামার বাড়ির কাছের পাঁচগাঁও হাই স্কুলে ভর্তি করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে

www.pathagar.com

এস. এস. সি. পাস করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং শহরতলীর মান্ডা গ্রামে লজিং থাকেন। লজিং বাড়ির গৃহীনি তাঁকে আপন সন্তানের মতই আদর করতেন। ঐ মান্ডা গ্রামে লজিং থাকতেন কাপাসিয়ার জনৈক এনায়েত উল্লাহ। যিনি আবদুল মান্নান-এর চোখ খুলে দেন। তিনি তাঁকে পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক একাডেমি লাইব্রেরী, ইউসিস লাইব্রেরীসহ আরও অনেক পঠাগার, গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে বাহরান বনহুর সিরিজের গন্ডি ছেড়ে অসীম জ্ঞানের জগতে ডানা মেলেন তিনি।

শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তির কিছুদিন পর ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন আবদুল মান্নান। এখানকার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শফিউল আলম প্রধান অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য বক্তৃতা লিখে দিয়েছিলেন মান্নানকে। এই প্রধানের প্রভাবেই আবদুল মান্নানের রাজনীতিতে হাতে খড়ি।

শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজের ছাত্র থাকাকালেই রাশেদ খান মেনন জেলে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নেয়া হয়। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও মাঝে মাঝে আবদুল মান্নান তাঁর দলবল নিয়ে শ্লোগান উচ্চারণ করতেন, রাশেদ খান মেননের মুক্তি চাই।

এরপর তিনি ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপের সভাপতি শামসুদ্দোহা, মেনন গ্রুপের সভাপতি মোস্তাফা জামাল হায়দার, ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি আবুদল মালেক (পরবর্তীতে শহীদ হন) প্রমুখের সাথে পরিচিত হন।

বোরহাউদ্দিন কলেজের ছাত্র থাকাকালেই তারা 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল মান্নান এ সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ছিলেন।

এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে একটি মজার ঘটনা ঘটে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতারা ভেবে-চিন্তে ঠিক করেন যে এ সংগঠনের জনহিতকর কাজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল । আর এর সহজ পথ হল টঙ্গীর তাবলীগ জামায়াতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থিত জনতাকে জানিয়ে দেয়া। যেই ভাবা সেই কাজ। তাঁরা টঙ্গীর ইজতেমায় গিয়ে হাজির হন। কিন্তু বিধি বাম। তাবলীগের মুরুব্বীরা তাঁদের কোন কথা না শুনে তাঁদের একটি তাঁবুতে নিয়ে যান এবং দুপুর পর্যন্ত তাঁদের ছয় উসুলের তালিম দেন। জোহরের আযান হলে তাঁদের ওযু করিয়ে নামায পড়ানো হয়। উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ায় তাঁদেরকে গোমরা মুখে ফিরে আসতে হয়।

১৯৬৮ সালে 'জাতীয় যুব সংঘ' নামে অন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মান্নান এর সধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ঠিক এ সময়েই তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি পরিচত হন আজকের প্রখ্যাত গবেষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক, বাংলা সাহিত্য পরিষদের বর্তমান পরিচালক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবের সাথে। এ সময় আরও যাঁদের সাথে তিনি পরিচিত হন তাঁরা হলেন দেশবরেণ্য আলেমে দীন মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম, মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা মুস্তফা মাহমদ আল-মাদানী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী প্রমুখ।

ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র থাকাকালে (১৯৭০) আবদুল মান্নান সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি ১৯৭৩ সালে এইচ এস সি, ১৯৭৬ সালে (পরীক্ষা ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত), বি. এস. এস. (অনার্স) এবং ১৯৭৭ সালে (পরীক্ষা ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত) এম, এস. এস পাস করেন।

উল্লেখ্য যে, পেশাগত দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও তিনি এম. এস. এস. পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, এই ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারীর ১৯ তারিখ তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই তাঁর মাস্টার্সের পরিক্ষা শুরু হয়।

সাংবাদিক জীবন ঃ ১৯৭০ সালের ২ জানুয়ারী তিনি আবদুল মান্নান তালিবের সহযোগিতায় দৈনিক সংগ্রামে প্রুফ রিডার হিসেবে যোগদান করেন। প্রুফ রিডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে প্রখ্যাত ফটো সাংবাদিক হাসান আবদুল কাইউমের কাছে হাতে-কলমে প্রেস ফটোগ্রাফী শিখেন। এমন কি হাসান আবদুল কাইউম পরীক্ষার জন্য দুই মাসের ছুটিতে থাকাকালীন আবদুল মান্নান দৈনিক আজাদ-এ তার পক্ষে ফটো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। (সংক্ষেপিত)

www.pathagar.com

সে দিনের তুখোড় সাংবাদিক আজকের সফল ব্যাংকার আমাদের মান্নান ভাই

কে. এম. হানীফ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় সম্ভবত ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীর দিকে। ঢাকায় এসে চট্টগ্রামের বদিউল আলম ভায়ের পরামর্শে সোনার বাংলা অফিসে যাই মাহবুব ভায়ের কাছে। একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করাই ছিল লক্ষ্য।

ঋষিকেশ দাস রোডে জাতীয় মুদ্রণ ভবনের দোতলায় তখন সাপ্তাহিক সোনার বাংলার অফিস ছিল। আমি যোগদান করার আগেই আবদুল মান্নান আকরাম ফারুকসহ আরো কয়েকবজনকে নিয়ে মাহবুব ভাই সোনার বংলা পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আবদুল মান্নান এর আগে দৈনিক সংগ্রামে কাজ করেছেন। আমিও দৈনিক সংগ্রামের ষ্টাফ করেসপন্ডেন্ট হিসেবে চট্টগ্রামে কাজ করেছি। ফলে আমাকে তিনি চিনতেন। দু'একবার সম্ভবত র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের অফিসে দেখাও হয়ে থাকবে।
সোনার বাংলায় আমারও চাকুরী হলো। বেতন সম্ভবত আসে আড়াইশ টাকা। চাকুরী হওয়ার পর গেন্ডারিয়ার জায়গীর ছেড়ে ৪৭, বাংলা বাজারে একটি মেসে উঠলাম।

সোনার বাংলায় আমি, মান্নান মাহবুব, ভাইসহ আরো কয়েকজন (সকলের নাম এখন মনে নেই) প্রাণপনে কাজ করতে লাগলাম। অচিরেই পত্রিকাটি পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠল। আট আনার পত্রিকা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে হুড়াহুড়ি এমন পর্যায়ে গেল যে, চট্টগ্রামের বিডাস চেম্বারে লাইন করে পত্রিকা কিনতে হতো অনেক বেশী দাম দিয়ে।

সোনার বাংলা থেকে এরপর আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় চলে গেলাম। মান্নানও পত্রিকার জগত ছেড়ে চলে গেলেন ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে।

জনসংযোগ ছেড়ে ব্যাকিং লাইনে প্রবেশ করে আবদুল মান্নান অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ করে আজ ইসলামী ব্যাংকের মত একটি বিশাল ব্যাংকের দ্বিতীয় ব্যক্তি। এটা আমাদের যারা একসঙ্গে কাজ করেছি তাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়।

শিকড় সন্ধানী লেখক হিসেবে ইতোমধ্যে তার অনেক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

আবদুল মান্নান ব্যাংকের অমানুসিক পরিশ্রম এবং দীর্ঘ দশ বারো ঘন্টা ডিউটি করেও লেখালেখি চালিয়ে যেতে পেরেছেন।

এটা প্রশংসাযোগ্য। খুবই পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ না হলে এমনটা সম্ভব হতো না।

হ্যাঁ, আব্দুল মান্নান ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সউদী আরবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। রিয়াদে তার পোস্টিং -এর আগে বাংলাদেশ দূতাবাসে আমার পোস্টিং হয়েছিল। ফলে রিয়াদে তাকে স্বাগত জানানো এবং ব্যাংকের কর্মকান্ডের প্রসারে দূতাবাসের সহায়তা নিশ্চিত করতে পেরে আমার ভাল লেগেছিল।

আমি আবদুল মান্নানের দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি আমাদের সকলের স্রষ্টার কাছে। আমীন।

লেখক : লেখক, কলামিস্ট, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দিগন্ত টেলিভিশন

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এক মহীরুহ'র সান্নিধ্যে

মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন

২০০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী মাস আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। ঐ তারিখে আমি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিয়ানীবাজার শাখা থেকে হেড অফিস কমপ্লেক্স কর্পোরেট শাখায় আবদুল মান্নান স্যারের পিএ হিসেবে যোগদান করি। স্যার সম্পর্কে আমার পূর্বেই সামান্য ধারণা ছিল। নিজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস থাকলেও যোগদানের পূর্বে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ইসলামী ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ নির্বাহীর পিএ আমি হতে যাচ্ছি। স্যারের চিন্তাধারা, রুচিবোধ, জ্ঞান, চাওয়া-পাওয়া অনেক ঊর্ধ্বে। আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হবে কি? এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে নানান ভয় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। প্রথমে স্যার সম্পর্কে আমার মনের মাঝে যে ভয় কাজ করছিল যোগদান করতে এসে তা মোটেই মনে হয়নি। স্যার আমার সাথে তার স্বভাবসুলভ আলাপচারিতায় কথা বললেন এবং আমাকে সহাস্যে গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে স্যারের সাথে পথচলা।

স্যারের সান্নিধ্যে এসে জীবনে অনেক উৎসাহমূলক এবং পরামর্শমূলক কথা শুনেছি, অনেক কাজের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। স্যার একদিন পিএ হিসেবে আমার দায়িত্বের একটি দিক উল্লেখ করে বললেন ঃ

'শুন সালাহউদ্দিন, তুমি আমার চোখ এবং কান। আমার পক্ষে সব সময় সব টেবিলে গিয়ে সবার খোঁজ-খবর রাখা সম্ভব নয়। শাখায় কোথায় কি হচ্ছে, সার্ভিসে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না এগুলো সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। এটি কারোর উপর তোমার খবরদারী বা নজরদারী নয়। বরং ব্যাংকের একজন কর্মী হিসেবে এটি তোমার দায়িত্ব'।

স্যার আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে সচেতন করলেও আমি সব সময় দেখেছি তিনি শাখার সব টেবিলের খোঁজ-খবর খুব ভালই জানতেন। কাস্টমার সার্ভিসের বিষয়ে স্যার অত্যন্ত সিরিয়াস। ব্যাংকে একজন কাস্টমারকে কিভাবে সার্ভিস দিতে হয় এটি আমি আসলে তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। সার্ভিসে সামান্য অবহেলা স্যার সহ্য করেন না। একটা বড় ভুল করলেও স্যার রাগ করেন না বরং ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সার্ভিসের ব্যাপারে কোন গাফলতি করলে তিনি সহ্য করতে পারেন না।

শাখার সকল কর্মকর্তাকে স্যার লেখালেখির বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। একদিন যে ছেলেরা একটি বাক্য লিখতে গেলে হাত কাঁপতো স্যারের সংস্পর্শে এসে আজ তারাই দু'কলম লিখতে পারে। এটি কম পাওয়া নয়। এই ঋণ কোনদিন শোধরাবার নয়। স্যার সব সময় বলতেন ঃ

'জীবনটা ক'দিনের। সব কিছুর বিনাশ আছে। কিন্তু একটি বই, এটি চিরদিনের। সবকিছুর ক্ষয় আছে। বইয়ের কোন ক্ষয় নেই। মৃত্যুর পরও রেখে যাওয়া বইগুলো সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে তার জীবন, দর্শন ও কর্ম মূল্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। শ্রদ্ধা ভরে মানুষ তা স্মরণ করে। এখানেই জীবনের আসল সার্থকতা।'

হেড অফিস কমপ্লেক্স শাখায় প্রতি মাসে 'মাসিক সভা' হতো। ঐ সভাগুলোতে শাখার এবং ব্যাংকের সমস্ত পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হতো। স্যার প্রত্যেক কর্মকর্তা এমনকি শাখার ম্যাসেনজার কিংবা গার্ডকে পর্যন্ত এই সভাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করতেন। তাদের সকলকে শাখার এবং ব্যাংকের টোটাল পারফরমেন্সের উপর মূল্যায়ন করার জন্য মঞ্চে ডেকে নিয়ে আসতেন। এতে দেখা যেতো, সকলের অংশগ্রহণের কারণে অনেক ভালো ভালো পরামর্শ বের হয়ে আসতো। এই সকল পরামর্শ ব্যাংকের পরবর্তী কার্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

www.pathagar.com

ব্যাংকের শত ব্যস্ততার মাঝেও স্যার লেখালেখির যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেটি আমাকে অবাক করে। একজন অসম্ভব ধৈর্যশীল এবং কমিটমেন্টসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই কেবল এটা সম্ভব। তিনি দুর্গম পথের একজন ক্লান্তিহীন যাত্রী। যতই দিন যাচ্ছে ততই ভিন্ন একজন আবদুল মান্নান স্যারকে আবিষ্কার করছি। স্যার আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে বলতেন ঃ

'আমি অফিস থেকে বাসায় গিয়ে প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখালেখি করি এবং সেটি কখনো কখনো রাত একটা-দুইটা এমনকি ফজরেরর ওয়াক্ত পর্যন্ত গড়ায়।

বিষয়টি স্যার যত সহজে বলতে পেরেছিলেন আমার কাছে সমীকরণটি এত সহজ মনে হয়নি। এক রকম অসম্ভবই মনে হয়েছে। ভাবি, আসলে আল্লাহ তায়ালা কিছু মানুষকে স্পেশাল কিছু মিশন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। হয়ত তিনি তাদেরই একজন।

স্যারের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তার অনেক লেখার টাইপের কাজ আমি করে আসছি। একবার আমার কম্পিউটার ক্রাশ করলো। কোন ড্যাটা নেই। আমার তো ভীষণ মন খারাপ। এতদিনের পরিশ্রম মুহূর্তেই মাটি হয়ে গেল। আপডেট তেমন কোন ব্যাকআপও নেই। স্যারকে ক্রাশের খবরটা দিলে স্যার হয়তো রেগে যাবেন। এ নিয়ে টেনশনের শেষ ছিল না। তারপরও স্যারকে বিষয়টি জানালাম। কোথায় স্যার আমার উপর ভীষণ রেগে যাবেন, তা না করে অত্যন্ত নরম করে আমাকে বললেন ঃ

'এটি তেমন কোন ঘটনা নয়, এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। হয়ত তোমার এ পর্যায়ে আসতে তিন-চার মাস সময় লাগবে। এছাড়া তো আর কিছুই নয়'।

ড্যাটা হারাবার যন্ত্রণা এ কথায় আমার কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। একটু শান্তিও পেলাম। নিজের অজান্তেই স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হলাম। স্যারের এই অনুপ্রেরণা আমাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে ভীষণ সাহায্য করেছিলো।

আমার বই পড়ার তেমন অভ্যাস ছিল না। স্যার একদিন আমাকে কয়েকটি বই দিয়ে বললেন ঃ

'এই বইগুলো তুমি পড় এবং এ থেকে তুমি কি শিখলে তা আমাকে কয়েক দিন পরে জানাবে'।

কয়েক দিন পর পর স্যার খোঁজ নিতেন বইয়ের কতটুকু পড়া হয়েছে। আসলে স্যারের সংস্পর্শে আসার পরই আমার বই পড়ার অভ্যাসটা আস্তে আস্তে বেড়েছে।

স্যার একজন বাস্তববাদী মানুষ। তিনি প্রায় সময় বলেন ঃ

'আজকের তুমি আর গতকালের তুমির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে'

অর্থাৎ গতকাল আমি যে অবস্থানে ছিলাম আজ যদি ঠিক একই অবস্থানেই থাকি তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনের কোন উন্নতি হলো না। জীবন সম্পর্কে এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ আমি আর কাউকে করতে দেখিনি। স্যারের এই মূল্যবান বিশ্বাসগুলো যে কোন মানুষকেই অনুপ্রাণিত করবে। আমাকেও অনুপ্রাণিত করে। অবাকও লাগে। কি করে একজন মানুষের ভেতর থেকে এই প্রেরণামূলক উক্তিগুলো সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসে! স্যারের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে অনেক ম্যাসেজ থাকে।

জীবন সম্পর্কে স্যার সব সময় উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। বিভিন্ন আলোচনায় তিনি প্রায়ই বলেন ঃ

'আমি যে পথ দিয়ে হেঁটে যাই অবশ্যই সেখানে আমার পদ-চিহ্ন রেখে যাই। আমি একটি পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছি অথচ পথের আশপাশের লোকেরা টেরই পেলো না, জানলো না, বুঝলো না তা হতেই পারে না'।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে একজন মানুষের জন্মের মূল সার্থকতা এখানেই। একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দায়িত্বহীন-অচেতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এই জীবনের কোন সার্থকতা নেই। স্যারের কোন চেষ্টা বৃথা-অযথা হতে দেখিনি।

তিনি একজন সফল ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং একজন জাত লেখক। তিনি কলম ধরলে কলম নিজেই লিখতে শুরু করে। এটি একটি আশ্চর্য

www.pathagar.com

বিষয়। তিনি কোন অগোছালো বিষয়ে লিখতে শুরু করলে তাও গোছালো হয়ে যায়। তিনি কোন কাজে হাত দিলে সাধারণ জিনিসও অসাধারণ হয়ে যায়। তার সংস্পর্শে লোহাও যেন সোনা হয়ে যায়। তার সান্নিধ্যে এসে এটিই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা।

তার অক্লান্ত চেষ্টা ও ধৈর্যের ফসল হিসেবে বাংলাদেশ এবং উপমহাদেশের জনগণের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ বাজারে বের হয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধও লিখেছেন।

স্যারের সব ক'টি বইয়ের উপর বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন গুণীজন-পাঠকগণ ভূয়সী প্রশংসা করে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও মতামত লিখেছেন। বাংলাদেশের অনেক স্বনামধন্য লেখক স্যারের বইয়ের মুখবন্ধ লিখে স্যারের প্রকাশিত বইগুলোকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ডকটর এ. আর. মল্লিক 'বাংলা ও বাংগালী মুক্তিসংগ্রমের মূলধারা' বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন। জনাব শাহ আবদুল হান্নান ও জনাব এম আযীযুল হক লিখেছেন 'ইসলামী ব্যাংক ব্যাবস্থা' নামক বইটির মুখবন্ধ ও ভূমিকা। সর্বশেষ কবি আল মাহমুদ 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

স্যার বই লিখেন তার মনের তাড়না থেকে। বই লিখে উপার্জনের জন্য নয়। বরং আমি দেখেছি প্রকাশকদের কাছ থেকে কিনে এনে তিনি বহু বই মানুষকে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। সারের লেখার গন্ডি বাংলাদেশের মানচিত্র এবং এই ভাটি অঞ্চলের মুসলমানদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য। তিনি সাহসী হাতে ইতিহাসের আঁকাবাঁকা অতীতকে মন্থন করে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনেন এবং পাঠককে সেই চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। এখানেই একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদের সার্থকতা। ব্যাংকের কাজে স্যারকে বেশ কয়েক বছর সৌদি আরবে কাটাতে হয়েছে। ঐ সময়ে তিনি সারা সৌদি আরব চষে বেড়িয়েছেন। একজন সচেতন সৌদি নাগরিক তার নিজ দেশ ও স্থান সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান রাখেন স্যার তার চাইতেও বেশী জ্ঞান রাখেন। সৌদি আরবের বেশীর ভাগ জায়গা ভ্রমণ করার সুযোগ স্যারের হয়েছে। সৌদি আরবে অবস্থানকালে তিনি বেশ ক'টি ডাইরী লিখেছেন। যেটি তার অসম্ভব ধৈর্য এবং একজন পরিশ্রমী মানুষের পরিচয় বহন করে। ঐ ডাইরীগুলোতে সৌদি আরবের জনজীবন এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। ভবিষ্যতে এই ডাইরীগুলো বই বের করার খোরাক যোগাবে।

তিনি একজন প্রতিভাবান এবং মহান ব্যক্তিত্ববান মানুষ। তিনি একজন ভাল ব্যবস্থাপক। আমি তাকে দেখেছি একজন লিডার হিসেবে। যে কোন কাজে নতুনত্ব আনা এবং সকল অবস্থায় চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করাই যেন স্যারের নিত্যদিনের কাজ। দেশী-বিদেশী অসংখ্য ভিজিটর স্যারের সাথে দেখা করতে আসেন। স্যার সকল ভিজিটরকে এটেন্ড করার চেষ্টা করেন। যারা একবার স্যারের সাথে দেখা করেছেন তাঁরা সবাই যেন তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ মানুষে পরিণত হন। এমন মানুষের সংখ্যা কত? অসংখ্য মানুষের সাথে স্যারের পরিচয়। তাঁরা সব সময় স্যারের সাথে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেছেন।

হেড অফিস কমপ্লেক্স শাখা থেকে বদলী হয়ে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার হয়। তার নেতৃত্বে ব্যাংকের আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। রেমিটেন্স-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক এ সময় বিপ্লব সৃষ্টি করে। ইন্টরন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এ প্রায় আড়াই বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৭ সালের নবেম্বর মাসে তিনি ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট উইং-এর প্রধান হিসেবে বদলী হন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান স্যারের মতো একজন মহীরূহ'র জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করা আমার মতো একজন সামান্য লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরও স্যারের খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই প্রেরণা থেকেই এখানে সামান্য কিছু লেখা সম্ভব হয়েছে। স্যারের সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত এ গ্রন্থে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি স্যারের জন্য প্রাণ থেকে দোয়া করি ঃ আল্লাহ তাকে সুস্থ-সবল রাখুন। আল্লাহ তার প্রতি এই দুনিয়ায় এবং পরকালে রাজি-সন্তুষ্ট থাকুন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে তাকে নিয়োজিত রাখুন। আমিন।

লেখক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ব্যক্তিগত সহকারী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
দূরের মানুষ কাছের মানুষ
মুকুল চৌধুরী

অন্দর মহলের কবি

একসময়কার তুখোড় সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, বর্তমানে সফল ব্যাংকার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (আমাদের মান্নান ভাই)-এর সাথে প্রথম কবে-কখন পরিচয় হয়েছিল সেটি আজ আর স্মরণে নেই। অথচ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি তাঁর অন্দর মহলের কবি। ১৯৮১-'৮২ সালের দিকে জয়প্রিয় মাসিক ঢাকা ডাইজেস্টে 'জননীর চিঠি' নামে আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হয় [যা পরে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অস্পষ্ট বন্দর'-এ (প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯১) অন্তর্ভুক্ত হয়]। কবিতাটি ছিল নস্টালজিক। গ্রামের ছেলে, গ্রামে বড় হয়েছি। হেন কান্ড আর বৃত্তি নেই- যা করিনি। তাই গ্রাম আমাকে টানে। গ্রামের কথা মনে হলে কষ্ট পাই। হু হু করে কাঁদি। সেই সাথে মায়ের কথাও। সেই নস্টালজিয়া থেকে কবিতাটি লেখা।

মান্নান ভাই'র সাথে একদিন দেখা। জানালেন, ভাবী আমার কবিতার মুগ্ধ পাঠিকা। বিশেষভাবে 'জননীর চিঠি' কবিতাটির উলেখ করে বললেন, এ কবিতাটির জন্য ভাবী আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সাথে নিজের অভিনন্দনটুকু জানাতেও কার্পণ্য করলেন না। সেই থেকে আমি মান্নান ভাইয়ের বাসার অন্দর মহলের কবি। আমার নতুন বই বেরুলে প্রথম কপিটি মান্নান ভাইকেই দেওয়ার চেষ্টা করি। জানি, বইটি বাসায় যাবে। কবিতার বই হলে মান্নান ভাইয়ের নামের সাথে মাকসুদা ভাবীর নামটিও উলেখ করতে ভুল করি না।

আমাদের ছোটবেলায় মা-চাচীদের প্রতিযোগিতা করে উপন্যাস পড়তে দেখেছি। শরৎচন্দ্র, 'বিষাদ সিন্ধু' খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন, 'আনোয়ারা' খ্যাত নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, শংকর, 'সাহেব বিবি গোলাম' খ্যাত বিমল মিত্র প্রমুখের উপন্যাস তাঁরা পালা করে পড়তেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে কখনও কবিতা পড়তে দেখিনি। দেখিনি বলেই মাকসুদা ভাবীকে আমার ব্যতিক্রমী পাঠিকা বলে মনে হয়। কবিতা – তাও আবার আধুনিক কবিতা। একজন শতভাগ গৃহিণী এর পাঠক! কবিতা-পাঠকের এ আকালের দিনে কিছুটা আশ্চর্য হতেই হয়।

উজ্জ্বল উপস্থিতি

মান্নান ভাই সাংবাদিক ছিলেন। তুখোড় সাংবাদিক। অথচ তাঁর সাংবাদিকতার শুরু সম্পাদনা সহকারী হিসেবে, ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে, দৈনিক সংগ্রামে। কিন্তু পেশার প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

দৈনিক সংগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (১৯৭২-'৭৫)। সেখান থেকে দৈনিক আজাদ (মার্চ ১৯৭৬)। আবার দৈনিক সংগ্রাম (জানুয়ারি ১৯৭৭)। না, একাজ তিনি সম্পাদনা সহকারী হিসেবে নন, চীফ রিপোর্টার ও ডিপোমেটিক করেসপন্ডেন্ট হিসেবে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ নানা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস ব্রিফিং-এ, বিভিন্ন দূতাবাসের অনুষ্ঠানে মান্নান ভাই-এর উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাতের সংবাদে [তখন বিটিভি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেল ছিল না] যখন এ সবের খবর সম্প্রচারিত হতো, তখন মান্নান ভাই টিভি পর্দায় আরও উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠতেন। সুন্দর, ফরসা, স্মার্ট মান্নান ভাইকে আরও স্মার্ট ও স্বতন্ত্র মনে হতো। উপস্থিত অন্য সব সাংবাদিককে তাঁর তুলনায় মনে হতো মলিন, অনুজ্জ্বল।

শুধু বহিরঙ্গে নন

সাংবাদিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শুধু বহিরঙ্গে নন, অন্তরঙ্গেও

www.pathagar.com

ছিলেন উজ্জ্বল ও অভিনিবিষ্ট। সম্ভবত তাঁর মনে ছিল সাংবাদিকতা জীবনের শুরুর সেই ঘটনা। সম্পাদনা সহকারী হিসেবে দৈনিক সংগ্রামে সাংবাদিকতার শুরুতে রীডার ইনচার্জ কাজী শহীদুল হককে বলা তাঁর অভিরুচি ও অভিলাষের কথা ঃ 'দশ বছরের মধ্যে এ রকম একটা পত্রিকার সম্পাদক হতে চাই।' কিন্তু তাঁর অভিপ্রেত এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। মান্নান ভাই ১৯৭২-'৭৫ সময়কালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর উত্তাল ও বিশৃঙ্খল দিনগুলোতে সাপ্তাহিক সোনার বাংলার অন্যতম কান্ডারী ছিলেন [প্রথমে বিভাগীয় সম্পাদক, পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদক]। সেই দিনগুলোতে সোনার বাংলার সাহসী ও বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা সুবিদিত। মওলানা ভাসানীর 'হক কথা'র পরেই সোনার বাংলা নামটি উচ্চারিত হতো- পাঠক এবং শাসক উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই। সেই সময়কার পাঠকদের নিশ্চয়ই রম্য-কলাম 'গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা'র কথা মনে আছে। দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে যা লন্ডনের পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকায় সিলেটী ভাষায় পুনঃ প্রকাশিত হতো। সাহসী ও তীক্ষ্ণধী 'গুলবাজ খাঁ' ছিলেন আমাদেরই মান্নান ভাই। [সুসংবাদ ঃ 'গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা' সম্প্রতি (ফেব্রুয়ারি ২০০৮) বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।] সোনার বাংলার জন্য মান্নান ভাইকে শান্তি নগরের 'হোয়াইট হাউস' খ্যাত এসবি অফিসেও যেতে হয়েছে। আর কেনই বা যাবেন না ঃ

"ভাই হগল ! আপনেরা জানেন, আমাগ প্রধানমন্ত্রী আইজ থাইক্যা তিন বছর আগে এলান করছিলেন, 'তিন বছর কিছু দিবার পারুম না।' কিন্তু উনি কিছুই দিবার পারবেন না কইলেও আমাগরে কত কিছু দিছেন! এই হিসাব করছেন কয়জনে ? প্রধানমন্ত্রী তার এই তিন বছরের শাসন আমলে আমাগ খাওন পিন্দনের সব জিনিসের দাম দশ গুণ বাড়াইয়া দিছেন। তার ফলে আমরা এই তিন বছরে অনেক বড়লোক হৈছি। ইংরেজীতে কয় লিভিং স্টেন্ডারড। আমাগ এই স্টেন্ডারড অনেক 'হাই' হৈয়া গেছে।" .....

"তিন বছরে সরকার অনেক কিছু দিছেন। তারা আমাগরে পাঁচ হাজার সাতশ' লঙ্গরখানা দিছেন। লবণের দাম ষাইট টাকা দিছেন। মরিচের দাম সোয়াশ' টাকা দিছেন। আমাগরে টিসিবি আর বিসিক চিনাইছেন। রেশনের দোকানের লম্বা লাইন চিনাইছেন। চিনাইছেন লাইসেন্স, পারমিট, ব্রীফকেস ব্যবসা। আরো চিনাইছেন মজুতদারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী। আর চোরাচালানীর জন্য দিছেন অবাধ সুযোগ।" [সোনার বাংলা ঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪]

'সোনার বাংলা'য় বসবাস করে চুয়াত্তরের 'সোনালী দিনে' খোদ 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় এই তীর্যক ভাষা প্রয়োগ ও কঠিন সত্য উচ্চারণের পর 'হোয়াইট হাউস' তো ভাল মান্নান ভাইকে যে পুরান ঢাকার 'রেড হাউসে' যেতে হয়নি, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য।

কবি ফররুখ আহমদ ও 'এক শিশি আতর'

মান্নান ভাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদের ভক্ত ও অনুরক্ত–এ কথা ফররুখ ভক্ত প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু এ তথ্যটি প্রায় অনুলেখ থেকে গেছে যে, কবি ফররুখ আহমদের সর্বশেষ লেখাটি [কবিতা ঃ '১৯৭৪'] মান্নান ভাই'র হাত ধরে সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়। আরও একটি অপ্রকাশ্য তথ্য ঃ মৃত কবির লাশ মান্নান ভাই কোলে করে কবির ইস্কাটনের বাসার তিন তলা থেকে নীচে মসজিদ প্রাঙ্গণে নামিয়েছিলেন। আর কবির জানাযার পূর্ব মুহূর্তে মদীনা থেকে কবির এক ভক্তের পাঠানো 'এক শিশি আতরের' অতি প্রাকৃত গল্প বহুবার মান্নান ভাইয়ের কাছেই শুনেছি।

কবি-ভক্ত মান্নান ভাই সোনার বাংলার কর্ণধার হিসেবেও তাঁর দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেননি। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশ করেন সোনার বাংলার বিশেষ সংখ্যা। সেখানে কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখের সাক্ষাৎকার ও লেখা প্রকাশিত হয় [যা পরে শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়]। কবির প্রতি সরকারের অবহেলায় ক্ষুব্ধ মওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতিও পুনঃ প্রকাশ করা হয়। আরও একটি অনুলেখিত তথ্য ঃ সোনার বাংলার এ সংখ্যায় কবি-তনয় আহমদ আখতারের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। আখতার তখন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। [সংক্ষেপিত]

লেখক : কবি, ছড়াকার, গবেষক, সংস্কৃতিসেবী

www.pathagar.com

সোনাখালির সোনার ছেলে : ব্যক্তি আবদুল মান্নান

মনু ইসলাম

খালের নাম সোনাখালি। 'হাফ মুন' আকৃতির এই খালের এক মাথা দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনারগাঁও-এর প্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে; আরেক মাথা পুব-উত্তরে রূপগঞ্জ-এর কাছে শীতলক্ষায়। সোনাখালির দুই পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে জনবসতি। চৈত্র-বৈশাখে এই খালে পানি থাকে হাঁটু সমান। বর্ষায় পাবিত হয় মাঠ-ঘাট-ঘর-বাড়ি।

সোনাখালির দুই তীর ঘেঁষে পুব পশ্চিমে বেড়ে ওঠা গ্রামের নাম সত্যভান্দী। এই খাল দুই তীরে বিভক্ত সত্যভান্দী গ্রামের জনজীবনকে দক্ষিণ পাড়ে বেধেছে কালীবাড়ী বাজারের সাথে; আর উত্তর পাড়ের আত্মীয়তা তিনগাও, বাজবী গ্রাম আর দুপতারা বাজারের সাথে।

দক্ষিণ পাড়ের সত্যভান্দী ছিল হিন্দু-প্রধান। সেখানে এক সময় অবস্থাপন্ন সাহাগণ প্রতাপশালী ছিলেন। কালী মন্দীর ঘিরে গড়া কালীবাড়ী বাজার ছিল তাদেরই। উত্তর পাড়ের দুপতারা বাজার জমিদারদের দেবোত্তর সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বাজারের আয় থেকেই দুপতারার ব্রাহ্মণ-চক্রবর্তী-ঠাকুর পরিবারের সংসার চলতো। তবে বাজারের প্রায় সব দোকানদার ছিলেন বাজবী-সত্যভান্দী-তিনগাও গ্রামের মুসলমান।

দুপতারার জমিদারদের বাড়ীর সামনে দিয়ে জুতা পায়ে, সাইকেলে চড়ে কিংবা ছাতা মাথায় চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। জমিদারদের হুকুমের বরখেলাফ হলে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কিংবা দুই পা সাড়ে তিন হাত ফাঁক করে শাস্তি দেয়া হতো। দুপতারার পুবে আড়াইহাজারের জমিদারবাড়ী, দক্ষিণে সোনারগাওয়ের বারদীর জমিদারবাড়ী আর পশ্চিমে রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়ী। এই জমিদারদের প্রতাপ এবং চরিত্রে ছিল অনেক মিল। সোনাখালি খাল কিংবা ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও শীতলক্ষার পাড়ের হাজার হাজার কৃষক-তাঁতীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো এই জমিদারদের দ্বারা। আর জমিদারদের নাড়ির সম্পর্ক ছিল কলকাতার সাথে।

দুপতারার জমিদার বাড়ির কাছে গীরদা গ্রামের মওলানা আবদুল গফুর ছিলেন বিখ্যাত আলেম। তার উপাধি ছিল বাহ্‌র-উল-উলুম বা জ্ঞানের সমুদ্র। তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর একজন অনুসারী ছিলেন। ঢাকার বংশাল কেন্দ্রিক জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তাকে জমিদাররা গীরদা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করলে তিনি ক'মাইল দূরে ইদবারদী গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। বাজবী গ্রামের মওলানা মফিজউদ্দীন ছিলেন ফরায়েজী নেতা শরীয়তউলাহর অনুসারী। তিনি জমিদারদের মনগড়া নিয়ম মানতে রাযি ছিলেন না। তার নেতৃত্বে এই ক' গ্রামের লোকদের মধ্যে জমিদারের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে তারই একটা বিস্ফোরণ ঘটে।

১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এ ঘটনা পূর্ব বাংলার ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে। ঢাকার নওয়াব সলীমুলাহর নেতৃত্বে বাংলার কৃষক-প্রজারা এই নতুন প্রদেশ গঠন সমর্থন করেন। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রিক জমিদার, উকিল ও সংবাদপত্র-মালিক 'বাবুশ্রেণী' এতে ক্ষেপে ওঠেন।

www.pathagar.com

কলকাতার প্রতি নাড়ির টানে দুপতারার জমিদাররাও নতুন প্রদেশ গঠনের কারণে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমান কৃষক-প্রজারা জেগে উঠলে কলকাতা কেন্দ্রিক জমিদারদের শোষণ-ত্রাসনের দিন শেষ হয়ে যাবে। এ কারণে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' নামক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী মুখরোচক 'স্বদেশী' আন্দোলনের নামে সারা দেশে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বাংলার হিন্দু যুবকদেরকে তারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী বোমা সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয়। সৃষ্টি করে এক বৈরি পরিবেশ।

আড়াইহাজার-সোনারগাও-রূপগঞ্জ-নরসিংদী এলাকায় স্থানীয় জমিদারদের প্রভাবে অনুশীলন সমিতির আন্দোলন জোরদার হয়। এ সময়ই আড়াইহাজার, সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ থানার মিলনস্থল গোলাকান্দাইলে এবং নরসিংদীর সাটিরপাড়ার কাছে চিনিশপুর কালীবাড়ীতে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দু মেলার প্রবর্তন হয়। মেলা উপলক্ষে কালী মন্দিরে পাঁঠা বলী হতো। আর ছিল অনুশীলন সমিতির নানা প্রকার 'স্বদেশী' কসরত।

পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকার কৃষক-প্রজাদের মতোই দুপতারার সাধারণ মানুষ ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের সমর্থক। মওলানা মফিজউদ্দীন বাজবী গ্রামের পুরনো মসজিদের চত্বরে একটি মক্তব কায়েম করে সেই নব জাগরণের আওয়াজকে সমর্থন করেন।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কলকাতা কেন্দ্রিক বাবুশ্রেণীর সৃষ্ট সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ তার 'কেন্দ্রীয় রাজ্যাভিষেক' উপলক্ষে দিলীর দরবার থেকে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ রদ ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার ফলে পূর্ব বাংলার কৃষক-প্রজা জনগণের বিরাট স্বপ্নের মৃত্যু হয়। পূর্ব বাংলার কৃষক-প্রজারা যখন দারুণভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ, কলকাতায় তখন বিজয় উৎসব!

দুপতারার জমিদাররাও পূর্ব বাংলা প্রদেশ রদের সেই আনন্দে যোগ দেন। তারা ব্রিটেনের রাজার কেন্দ্রিয় রাজ্যাভিষেক-এর স্মৃতি রক্ষার জন্য ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন (বা কেন্দ্রিয় রাজ্যাভিষেক) হাইস্কুল'।

জমিদারদের ইংরেজ-বন্দনার মাশুল দিতে হয় এলাকার কৃষক-প্রজা জনগণকে। স্কুল তৈরির কাজে বিনা মজুরিতে শ্রম দেয়ার জন্য সত্যভান্দী, বাজবী ও আশ-পাশের গ্রাম থেকে লোকদের ধরে নিয়ে যেতো জমিদারের ভোজপুরী লাঠিয়াল-বরকন্দাজরা। মওলানা মফিজউদ্দীন জনগণকে সাথে নিয়ে এই জুলুমের প্রতিবাদ করেন।

একদিন এ প্রতিবাদ বড় আকার পায়। জমিদারের লাঠিয়ালরা বাজবী গ্রাম থেকে লোকদের ধরে নিতে এলে মওলানা মফিজের নির্দেশে গ্রামের লোকেরা ক'জন বরকন্দাজকে আটক করে। এ ঘটনার কারণে গ্রামবাসীদের সাথে জমিদারের লড়াই বাধে।

একদিকে জমিদারের সুসজ্জিত লাঠিয়াল-বরকন্দাজ দল। অন্য দিকে বাজবী, তিনগাও ও দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের কৃষক-প্রজা জনগণ। বাজবী গ্রামের উত্তরের মাঠে একটি ছোট্ট খালের দুই পাড়ে দুই পক্ষের বাহিনী সমবেত হয়। এলাকার জনগণ লম্বা বাঁশের আগায় বেতের আঁকশি পেচিয়ে সেই অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেন। এই অভিনব অস্ত্রের সাহায্যে তারা একে একে আটজন লাঠিয়ালকে বন্দী করে খালের এপারে নিয়ে আসেন। এ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জমিদারের বাহিনী পরাজিত হয়।

এ ছিল দুপতারার কৃষক-প্রজাদের এক অবিস্মরনীয় বিজয়। জমিদারদের বিরুদ্ধে এভাবে রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা মানুষের মনে নতুন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। প্রজাদের এ সাড়া জাগানিয়া বিজয়ের গৌরব-গাঁথা দশদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এ লড়াইয়ে যারা মওলানা মফিজের পাশে ছিলেন মৌলবী আজিমউদ্দীন তাদের একজন। সোনাখালির পাড়ে দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের বাগ-বাগিচায় ঘেরা একটি বড় বাড়ীতে জন্ম হয় আজিমউদ্দীনের। বাগ-বাগিচার কারণে এ বাড়ির নাম হয় বাগান বাড়ী। এ বাড়ীর পত্তন করেন মৌলবী আজীমউদ্দীনের দাদা মালেহ মুহাম্মদ। মালেহ মুহাম্মদ-এর দুই ছেলের ঔরসে তিনজন করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মালেহ মুহাম্মদ-এর নাতি আজিমউদ্দীনের বড়

www.pathagar.com

দুই ভাই ছিলেন মাইনউদ্দীন ও কাজিমউদ্দীন।

মৌলভী আজিমউদ্দিন ছোট বেলায় মাকে হারান। তিনি বিয়ে করেন বাজবী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে। তাদের ঘরে দুই ছেলে মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও দীন মুহাম্মদ আর কন্যা জামিলা খাতুনের জন্ম হয়। এই তিন ছেলেমেয়েকে ছোট রেখে স্ত্রী মারা গেলে আজিমউদ্দীন আর বিয়ে করেননি। ছেলে-মেয়েকে কোলে পিঠে করে নিজ আদর্শে মানুষ করেন।

বাগান বাড়ির ছয় পরকশের একাংশে আজিমউদ্দীনের পরিবারে বড় ছেলে মোহাম্মদ আবদুল মালেকের বউ হয়ে আসেন জোবায়দা বেগম। বহু বছর পর আজিমউদ্দীন আবার যেন তাঁর মাকে ফিরে পান। জোবায়দা বেগমকে তিনি 'মা' ছাড়া অন্য কোন নামে কোন দিন সম্বোধন করেননি।

আজিমউদ্দীন তার নতুন 'মা'কে ঘরে তোলার পর পরই একটি বিষয়ে সতর্ক করেন ঃ এই গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিলে হিন্দুদের অনুসরনে কিছুলোক শীতলা দেবীর পূজা করে। কলেরা থেকে বাঁচার জন্য তারা ওলাবিবিকে ভ্যাট দেয়। বানভাসীর মৌসুমে সাপের কামড় থেকে বাঁচতে এদেরই কিছু লোক মনসাদেবীর নামে ঘট সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে খালের স্রোতে কলা গাছের ভেলা ভাসায়। এসব শিরক-এ অংশ নেয়া বা এ সব কাজে 'মাডত' বা চাঁদা দেয়া শক্ত গুনাহ। জোবায়দা বেগমকে এ ব্যাপারটা মান্য করতে হবে।

জোবায়দা বেগম তার বুড়ো ছেলের এ নির্দেশ কখনো অমান্য করেননি।

১৯১২ সালের জমিদার বিরোধী লড়াই-এর চলিশ বছর পর ১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শোগানে পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। সে বছরই মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও জোবায়দা বেগমের ঘরে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জন্ম হয় ৩০ জুন তারিখে। মৌলবী আজিমউদ্দীনের বাড়ীতে চার ভিটে টিনের চারটি চৌচালা ঘর। মাঝখানে প্রশস্ত উঠান। সে উঠানে এক পা দু'পা করে হাটতে শিখে শিশু আবদুল মান্নান। এরপর একদিন তরতর করে মামাবাড়ীর দোতালায় উঠতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। কপালের ওপর একটা বড় চিহ্ন এখনো আবদুল মান্নানের সে স্মৃতির স্মারক হয়ে আছে।

১৯৫৪ সাল ছিল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ও বন্যার বছর। এ নির্বাচনে দুপতারার মানুষ হক সাহেবের পক্ষে একাট্টা হয়ে নৌকায় ভোট দেন। মান্নান তার চাচা দীন মুহাম্মদের কোলে উঠে দুপতারা স্কুলের ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিল। সে বছরের বড় বন্যায় বাগান বাড়ীর উঠানে পানি উঠেছিল। বাঁশের সাঁকোতে এ-ঘর ও-ঘর যাতায়াত করতে হতো। মান্নান একদিন সাঁকো থেকে উঠানের পানিতে পড়ে ডুবতে বসেছিল।

বাজবী প্রাইমারী স্কুলে মান্নানের শেট-পেন্সিল নিয়ে বর্ণবোধ-আদর্শলিপি-ধারাপাতের হাতেখড়ি। স্কুলের মাঠে গাছের নীচে উচ্চস্বরে 'এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ' নামতা পাঠ আর দড়ি সত্যভান্দী গ্রামের মসজিদে চাঁদপুরের মৌলভী আবদুল কুদ্দুসের কাছে হেলে দুলে 'আলিফ যবর আ, বা যবর বা' পাঠ ছিল আবদুল মান্নানের মজার খেলা।

মা জোবায়দা বেগম সে সময় ঘন ঘন এক-দুই সপ্তাহের জন্য বাপের বাড়ি নাইয়র যেতেন। তখন মান্নানকে পাঠানো হতো মামাবাড়ীর সমবয়সি ছেলে-মেয়েদের সাথে কামরাঙীর চর প্রাইমারি স্কুলে। কখনো মানেহর মাদ্রাসায়। কামরাঙীর চর প্রাইমারী স্কুলে ক্লাশ হতো গাছের নীচে। সে স্কুলে শেটের পরিবর্তে কলাপাতায় কিংবা তালপাতায় বাঁশের কঞ্চির 'কলম' দিয়ে অ-আ ক-খ লেখা শিখতে হতো।

বাগান বাড়ীতে পাশের খবিরুদ্দীন চাচাদের ঘরে হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানীর গ্রামোফোন বা কলের গান বাজতো। মান্নানের ছোটবেলায় দেখা সবচে অদ্ভুত যন্ত্র ছিল এই কলের গান। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় একদিন বাজবী প্রাইমারী স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে মান্নান দেখে উঠানে কালো দু'টি বাক্সের চারপাশে অনেক লোকের ভীড়। একটি বাক্স থেকে গমগম করে আওয়াজ বেরুচ্ছে ঃ 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা।' মান্নান এই যন্ত্রের চারপাশে হয়রান হয়ে ঘোরে। কিন্তু কে কথা বলছে তাকে খুঁজে পায় না।

www.pathagar.com

বাজবী প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে মান্নান একবার বাবার দেয়া পঁচাত্তর পয়সা নিয়ে গোলাকান্দাইলের মেলায় যায়। কলকাতার কমলা সার্কাস ছিল মেলার সবচে বড় আকর্ষণ। কিন্তু সার্কাস না দেখে মান্নান বাষট্টি পয়সায় মেলা থেকে 'সোহরাব রোস্তম' নাটকের বই কিনে আনে। এটাই ছিল তার প্রথম 'আউট বই' কেনা। সেই তখনই 'গাজী-কালু-চম্পাবতী', 'সয়ফল মুলক-বদিউজ্জামাল', 'ছহি বড় জঙ্গনামা', 'বিষাদসিন্ধু' আর 'আরব্য রজনী'র সাথে পরিচয়। এ সময় থেকেই দস্যু বাহরাম, দস্যু বনহুর, দস্যু মোহন, ভাইপার সিরিজসহ বহু 'আউট বই'-এর প্রতি দারুণ টান।
বাড়ির উঠানে কখনো মাসুমাবাদের মৌলবী মুবারক কাজী সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ করতেন। কখনো সে উঠানে চাঁদনী রাতে পুঁথিপাঠ বা গল্পের আসর বসতো। চৌদ্দ উজির আর বায়ান্ন ছাপ্পার কিচ্ছা শুনতে শুনতে মান্নান সে সময় পাড়ি দিত বানেছা পরীর দেশে; কোহকাফের জঙ্গলে। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র 'নাট্যরূপ' দিয়ে গ্রামের সাথিদের নিয়ে তা মঞ্চায়নের ব্যর্থ প্রয়াস মান্নানের পঞ্চম শ্রেণীর ঘটনা।

দাদার হাত ধরে মসজিদে যাওয়া, বর্ষা-বাদলের দিনে বাড়ির উঠানে আযান দিয়ে তার ইমামতিতে নামাজ পড়া, শবে বরাত-শবে কদরে সোনাখালির স্রোতে ডুব-সাঁতার কেটে মসজিদে গিয়ে রাত জাগা, দাদার ইতেকাফ উপলক্ষে রোযার মাসে মসজিদে ইফতারী বা সেহরী নিয়ে যাওয়া, কিংবা দাদার লাঠি হয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দূর-দূরান্তেআত্মীয় স্বজনের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া--সব কিছুতেই মান্নানের ছিল সমান আগ্রহ।

গ্রামে কেউ মারা গেলে কিংবা রোযার মাসে মৃত মুরুব্বীদের রুহের মাগফেরাতের জন্য বিভিন্ন বাড়ীতে 'খতম' পড়া হতো। খতম পড়া মানে কুরআন শরীফের সম্পূর্ণ খতম দেয়া নয়। এক বা দুই পারা তেলওয়াত করে মুরুব্বীদের নামে সওয়াব বখ্‌শে দেয়া। দাদাকে নিয়মিত দাওয়াত করা হতো এসব খতম পড়ার অনুষ্ঠানে।

দাদার হাত ধরে মান্নানকেও কখনো কখনো শামিল হতে হয়েছে এমনি খতম পড়ার অনুষ্ঠানে। এ উপলক্ষে চীনা মাটির বড় বড় পেটে মুরগীর ঝাল গোশত, মুগের ঘন ডাল বা মুড়িঘন্ট আর খেজুর গুড় সহযোগে ঘন দুধের স্বাদ মান্নানের মুখে এখনো লেপ্টে আছে। খতম পড়া উপলক্ষে 'মোলাখানা' ছাড়াও কখনো কখনো রূপালী চাকতির সংযোগ ঘটতো!

প্রাইমারী স্কুলে পড়াকালেই মান্নান কবি জসিমউদ্দীনকে দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে প্রথম দেখেন। কবির বক্তৃতা বা আবৃত্তির কিছুই মনে নেই। তবে কবির প্রতি তখনকার সীমাহীন মুগ্ধতা আজো স্মৃতি হয়ে আছে।

ছোট বেলায় এক বার এলাকায় আসেন প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত। সেটাই মান্নানের প্রথম মন্ত্রী-দেখা। দুপতারা বাজারে মন্ত্রীর জন্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। রাতারাতি সাইনবোর্ড লাগিয়ে মুসলিম লীগের অফিস বানানো হয়। মন্ত্রীর আগমনে সমস্বরে শোগান দেয়া হয়। মান্নানও সবার সাথে গলা ফাটিয়ে 'জিন্দাবাদ' বলেছিলেন। শত শত লোকের মাঝ থেকে মান্নানকে কাছে ডেকে মন্ত্রী আদর করে কথা বলেন। 'আপনি' সম্বোধন করে বলেন ঃ 'আপনাকে এম এ পাশ করতে হবে'। খুশীতে মান্নানের চোখে পানি এসে যায়।

পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পর মান্নানের গলায় জটিল অপারেশন হয়। এর আগে তখনকার আমলের অনেক নামি দামি ডাক্তার মান্নানের চিকিৎসা করেন। আড়াইহাজারের আম্বর আলী ডাক্তার। গণেরগাওয়ের বিখ্যাত কবিরাজ। ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রীটের ডাক্তার নন্দী। সব শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে দেখানো হয়। ঢাকা মেডিকেলে তখন জটিল অপারেশনের বিশেষ সুবিধা ছিল না। শেষ পর্যন্ত মান্নানকে মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে নেয়া হয়। মীর্জাপুরের এক প্রভাবশালী হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন বাজবী গ্রামের ওয়ায়েজউদ্দীন সাহেবের বন্ধু। তিনি কুমুদিনী হাসপাতালে মান্নানের ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। ঝান্ডা নামের এক মার্কিন ডাক্তার মোটা আর ফর্সা আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে মান্নানের গলা পরীক্ষা করেন।

গলার অপারেশন উপলক্ষে মীর্জাপুর হাসপাতালে থাকা ছিল মান্নানের এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা। হাসপাতালের রাতের ওয়ার্ড মান্নানের কাছে ছিল গোরস্তান। হাসপাতালের বেডে গল্পের বই পড়ার ব্যাপারে বাবার দেয়া অবাধ স্বাধীনতা আর দীনু নামে এক সমবয়সী

www.pathagar.com

বন্ধুলাভ তার দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব করে। দীনু ছিল তিন মাসের পুরনো রোগী। আর পরীর মত শাদা এপ্রন পরা নার্সরা সবাই মান্নানকে খুব আদর করতেন। তার কাছ থেকে গল্পের বই নিতেন।

প্রতি রোববার বিকালে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা রনদাপ্রসাদ সাহা ভিজিটে আসতেন। সকাল থেকেই হাসপাতাল সাফ-সুতরা করার আয়োজন দেখে বুঝা যেতো সেদিন রোববার। দানবীর আর পি সাহাকে মুগ্ধ চোখে দেখত কিশোর মান্নান।

মান্নানের মীর্জাপুর রওনা হবার দিন মা জোবায়দা বেগম শয্যাগ্রহণ করেন। পঁচিশ দিন পর মান্নানের ঘরে ফেরার খবর দিতে গিয়ে মৌলবী আজিমউদ্দীন যখন বললেন, 'মা গো, ওঠ! বড় ভাই ফিরে এসেছে!'--তখনি তিনি বিছানা ছাড়েন। এই পঁচিশ দিন মোহাম্মদ আবদুল মালেক ছেলের কাছে মীর্জাপুরে থেকেছেন। সাক্ষাতকারের সময় ছাড়া বাকী সময় তিনি হাসপাতালের চারপাশে পায়চারি করতেন। মান্নানের অপারেশন যেদিন হবে তার আগের রাত জেগে তিনি হাসপাতালের চার পাশে ঘুরে ঘুরে আলাহর কাছে সন্তানকে ভিক্ষা চেয়েছেন।

বাজবী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল পন্ডিত ছিলেন মান্নানের দাদার বন্ধু ও আত্মীয়। মান্নানের কাছে তাকে মনে হতো দরবেশ। মান্নানের পড়াশুনার ব্যাপারে ইসমাইল পন্ডিতের ছিল দারুণ আগ্রহ। রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া হাইস্কুলে মান্নানের প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে সব ক'টি দিন ইসমাইল পন্ডিত মান্নানের পাশে ছিলেন। এমন শিক্ষক মান্নান সারা জীবন আর খুঁজে পাননি।

বৃত্তি পরীক্ষার শেষ দিনের স্মৃতি মান্নানের কাছে এখনো উজ্জ্বল। শিল্পপতি গুল বখশ ভূইয়া সব পরীক্ষার্থীকে মুড়াপাড়ায় তাঁর মিল দেখাতে নিয়ে যান। তার মিলটি ছিল সে এলাকায় প্রথম যন্ত্রচালিত কারখানা। মিল চালু হতে তখনো কিছু দিন দেরী ছিল। কিশোর ছাত্রদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি মিলের মেশিনপত্র দেখান।

গুল বখশ ভূইয়া ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য মানুষ। তাকে বলা হতো পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের একজন। গুল বখশ ভূইয়া এই কিশোরদের মধ্যে যেন তাঁর নিজ স্বপ্নের বীজ ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। শিল্পহীন দেশে শিল্পের আবাদ করতে হবে। মেধাবী নতুন প্রজন্মকে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নিতে হবে। পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের এনে এজন্যই তিনি তার স্বপ্নের কারখানা দেখান।
মান্নান ঘুরে ঘুরে অবাক করা সব মেশিনপত্র দেখেন। হাতে টানা তাঁতের সাথে তার পরিচয় আছে। এখন এসব মেশিন নিজেই সূতা বানাবে, কাপড় বুনবে। মান্নানের কাছে মেশিনের চাইতেও মেশিনের পেছনের মানুষটিকে সেদিন বেশী ভালো লেগেছিল; কত বড় আর কত সহজ মানুষ!

প্রাইমারী পাশ করে মান্নান দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন। তার পরিচয়ের পরিসর বড় হয়। দূর-দূরান্তের ছেলেদের মিলনমেলা দুপতারা হাই স্কুল। নতুন অনেক বন্ধু পাওয়ার আনন্দে মান্নান আত্মহারা।

ইংরেজীর প্রবীণ শিক্ষক আবদুস সামাদ খান ক্লাশে ঘোষণা করেন ঃ 'মান্নান এই ক্লাশের সবচে শান্ত-শিষ্ট সুবোধ বালক। সে এখন থেকে এ ক্লাশের ক্যাপ্টেন।' এর পর থেকে বন্ধুরা সুযোগ পেলেই মান্নানের 'শান্ত-শিষ্ট সুবোধ' লকব ধরে টানাটানি করতো।

এ সময় মান্নানের স্কুলে আসেন কবি গোলাম মোস্তফার ছেলে শিল্পী মোস্তফা আজিজ। সাথে ইত্তেফাকের তরুণ রিপোর্টার শফিকুল কবির। হল রুমে সব ছাত্রকে একত্রিত করা হলো। বাক বোর্ডে নিমিষে অনেক রকম ছবি এঁকে যেন জাদু দেখালেন মোস্তফা আজিজ।

মান্নান এগিয়ে গিয়ে খাতির জমালেন সাংবাদিক শফিকুল কবিরের সাথে। মেহমানদেরকে এগিয়ে দিতে মান্নান পাঁচরুখির সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গেলেন। পথে যেতে যেতে শফিকুল কবির মান্নানের উৎসাহকে উস্কে দিলেন। কোন সাংবাদিককে এভাবে ধরে-ছুঁয়ে দেখা মান্নানের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই সাক্ষাতকার ছিল সাংবাদিকতার প্রতি তার 'প্রথম প্রেম'।

১৯৬২ সাল। সত্যভান্দী গ্রামের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আড়াইহাজার থানা থেকে পুলিশের বড় কর্তা এলেন। মান্নান এগিয়ে

www.pathagar.com

গিয়ে তার সাথে ভাব জমান। পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, আজ হক সাহেব মারা গেছেন।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের মৃত্যুতে পর দিন দুপতারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে শোকসভা হলো। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা তফাজ্জল হোসেন আমান সাহেব এ শোক সভায় বক্তৃতা করেন।

শেরে বাংলার ঘনিষ্ট সহকর্মী আমান সাহেব ছিলেন আড়াইহাজার-বৈদ্যের বাজার-রূপগঞ্জ-নরসিংদী এলাকার বিখ্যাত ব্যক্তি। হক সাহেব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি শিশুর মতো কেঁদে তার পাকা দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলেছিলেন। সে অনুষ্ঠানে স্কুলের হেড মাস্টার পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও এসিসট্যান্ট হেড মাস্টার মৌলবী ফয়েজউদ্দীন আহমদ এবং আরো কেউ কেউ বক্তৃতা করেন। শেরে বাংলা এমন মানুষ--যার মৃত্যুতে সকলে কাঁদে। এ শোকসভার বক্তৃতা মান্নানকে আপুত করে।

আমান সাহেবকে মান্নান এর আগে নিজেদের বাড়িতে দেখেছেন। দু'একবার তার ঘোড়ায়ও চড়েছেন। নানার বাড়িতেও তাকে দেখেছেন। নানীর রান্না করা পাট শাক আমান সাহেবের খুব পছন্দ ছিল। তোফাজ্জল হোসেন এক সময় 'আমান' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমান মানে শান্তি। পত্রিকা 'আমান' থেকে তিনি 'আমান সাহেব' নামে পরিচিত হন।

১৯৬৪ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় এক শীতের সকালে মান্নান বাবার সাথে বাসে করে নারায়নগঞ্জ যান ডাক্তার সামাদ খানকে দেখাতে। সেদিনই সকালে আদমজী মিল থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে তা নারায়ণগঞ্জ শহরে ছড়িয়ে পড়ে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ট্যাক্সি ভাড়া করে অনেক কষ্টে তারা বাড়ি ফিরেন।

পর দিনই দাঙ্গাকারীরা দুপতারার দিকে হানা দেয়। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা তফাজ্জাল হোসেন আমান সাহেব, নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা রঈসউদ্দীন ও মুসলিম লীগের রেজাউর রহমানের নেতৃত্বে এলাকার জনগণ দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিশোর আবদুল মান্নানও সে প্রতিরোধ চেষ্টায় শরিক ছিলেন। তার মা জোবায়দা বেগম এ সময় জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক জন সংখ্যালঘুকে নিজেদের বাড়ীতে আশ্রয় দেন। গ্রামের আর কেউ তখন এ ধরনের ঝুঁকি নেননি।

১৯৬৪ সালের এ দাঙ্গার সময় মান্নানের ক'জন স্কুল সহপাঠি ভারতে চলে যায়। তাদের মধ্যে নির্মল সোম ও শীতল সোম, শংকর ও বাসুদেব চক্রবর্তী আর বিনয় সেন ও সুশীল চন্দ্র শীল ছিল মান্নানের ঘনিষ্ট বন্ধু। (দুপতারা ঠাকুর বাড়ীর ছেলে বাসুদেব চক্রবর্তী পশ্চিম বঙ্গে এক পাহাড় ধসে মারা গেছে। একাত্তরের পর তার বড় ভাই শংকরদেব চক্রবর্তী ও এক বোন বাংলাদেশে ফিরে আসে।)

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর মান্নান 'ক্লাশ ক্যাপ্টেন' থেকে 'স্কুল ক্যাপ্টেন' হলো। দুপতারার নাট্যদলে অংশ নেয়া, অংক খাতায় কবিতা লেখা, দূরের ও কাছের বন্ধুদের সাথে পত্র মিতালী, ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভের খবর শুনে পরদিন স্কুলের ছেলেদের সাথে মিছিল বের করা, স্কুলের যে কোন অনিয়মের প্রতিবাদ করা--এ সব তখন মান্নানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে অভিভাবকরা তাকে ভর্তি করে দেন মামাবাড়ির কাছে পাঁচগাও হাইস্কুলে।

পাঁচগাও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। আড়াইহাজার থানায় মুসলমানদের এটিই প্রথম হাইস্কুল। পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় জাগরণের হাওয়া শুরু হয়েছিল। তারই ফসল এই হাইস্কুল। ফজলে রাব্বী খন্দকার, ফিরূজ মাস্টার, আম্বর আলী প্রধান সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। শেরেবাংলা ফজলুল হক এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য লিফলেট-এর মাধ্যমে জনগণকে আবেদন জানান। সুর-সম্রাট আব্বাস উদ্দীন পাঁচগাও-এর মাঠে গান গেয়ে লোকদেরকে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁচগাও হাইস্কুলে এক ঝাঁক নতুন বন্ধু লাভের আনন্দ, মামা বাড়ীতে নানীর আপ্যায়নের আতিশয্য, অংকের শিক্ষক সুধীর বাবুর সীমাহীন প্রশ্রয়, জাঁদরেল প্রধান শিক্ষক নৃপেন দত্তের সাথে জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নিয়ে বাকযুদ্ধ, পয়ষট্টির ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ছাত্রদের নিয়ে স্কুলে সভা-মিছিল, প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে দাদার মৃত্যু, নারায়ণগঞ্জ শহরে জয় গোবিন্দ হাইস্কুল কেন্দ্রে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে গিয়ে

www.pathagar.com

পঁচিশ দিন মুক্ত বিহঙ্গের পাখনা মেলা, পরীক্ষার আগের রাতে নাটক দেখে পরীক্ষার হলে দেরীতে যাওয়া--এমনি কত তুচ্ছ ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা আবদুল মান্নানের সংক্ষিপ্ত এ স্কুল জীবনের স্মৃতির পরাগ!

মান্নানের এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৬৭ সালের ২৬ এপ্রিল। সেদিনই বিকেলে নারায়নগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরে তিনি একটি পোস্টকার্ড পেলেন। 'ঢাকায় তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পত্রপাঠ ঢাকা চলে আস।' বাজবী গ্রামের আবু তাহেরের চিঠি। ঢাকা শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলা তখন সাত রাজার ধন। ফলে সোনাখালির হরেক রকমের মাছের স্বাদ পেছনে ফেলে 'পত্রপাঠ' ঢাকায় রওনা হওয়া।

১৯৬৭ সালের পয়লা মে। মায়ের বিয়ের স্মৃতি মোড়ানো একটি চামড়ার স্যুটকেস হাতে নিয়ে ধান-পাট-সরিষা ক্ষেতের আইল বেয়ে তিন মাইল পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে মান্নান পৌঁছেন ভুলতা বাস স্টেশনে। সেখান থেকে মোমিন কোম্পানীর বাসে ছয় আনায় তারাবো। তার পর এক আনায় শীতলক্ষা-বালু নদীর গুদারা পার হয়ে ডেমরা থেকে পাঁচ আনায় আরেক বাসে টিকাটুলী। সেখানে থেকে পায়ে হেঁটে নির্মিয়মান স্টেটব্যাংক ভবনের পাশের ঝুপড়ি পার হয়ে কমলাপুর রেল স্টেশন।

আগে রেল স্টেশন ছিল পুরান ঢাকার উত্তর প্রান্তে ফুলবাড়িয়ায়। মফস্বল ঢাকার সেই পুরনো রেল স্টেশন প্রাদেশিক রাজধানীর দাবি মিটাবে কিভাবে? তাই শহর থেকে দূরে ফুলকপি-বাঁধা কপি আর মূলা-শালগমের মাঠে কমলাপুরে এশিয়ার বৃহত্তম রেল স্টেশন নির্মাণ করা হয়। আজ পয়লা মে সকালে কমলাপুর রেল স্টেশন উদ্বোধন করেছেন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান। তার সাথে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর আবদুল মুনায়েম খান। এ উপলক্ষে রেল স্টেশন সাজানো হয়েছে মনের মতো করে।

মান্নান অবাক চোখে দেখেন সব কিছু। এই রেল স্টেশনের বিপুল সাজসজ্জা আর সমস্ত আয়োজন যেন পাড়াগাও থেকে সদ্য শহরে আসা এক অবাক বালকের সংবর্ধনার জন্য। কমলাপুরের সেই সুসজ্জিত তোরণ পেরিয়ে মুগদাপাড়ার গ্রামীণ বাজারের ভিতর দিয়ে কাঁচা রাস্তা। তার পর বেশ কিছু দূর মেঠোপথ। সব শেষে হায়দার আলী হাইস্কুলের পাশে একটা কাঠের পুল পেরোলেই মান্ডা গ্রাম।

সেই গ্রামের জজমিয়াদের বাড়ীর লজিং মাস্টার আবু তাহের। আবু তাহেরের রাতের খাবারে ভাগ বসিয়ে অতিবাহিত হল ঢাকায় আবদুল মান্নানের প্রথম রাত। শুরু হলো ঢাকার জীবন।

একেবারে ছোটবেলায় মান্নান প্রথম ঢাকা আসেন নৌকায় চড়ে। মাঝির বাড়ী ছিল কুমিলা জেলার বড়ইকান্দী গ্রামে। বছরের একটা বড় সময় তার ছৈ ওয়ালা নাও বাঁধা থাকতো মান্নানদের বাড়ীর ঘাটে। চমৎকার গান গাইতেন তিনি। তার গল্প মান্নানের খুব ভালো লাগতো। তিনি ভালো রাঁধতেও পারতেন। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন অনেক কাজের কাজী। তার নাওয়ে চড়ে সোনাখালির খাল বেয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে বর্তমান কাঁচপুর ব্রীজের কাছে যাত্রামুড়ার টাইটকার খাল ছাড়িয়ে শীতলক্ষায় প্রবেশ। তার পর আরেকটি খাল বেয়ে দয়াগঞ্জ হয়ে ধোলাই খালের মধ্য দিয়ে এসে নাও ভিড়ে নারিন্দায়। নারিন্দার বাকরখানির তখনকার স্বাদ কি ভোলা যায়?

তখনকার ঢাকার দর্শনীয় স্থান ছিল হোসেনী দালান, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, লালবাগের কেলা, সদর ঘাটের কামান, নীমতলির জাদুঘর, হাইকোর্টের পাশে পুকুরের ধারে চিড়িয়াখানা। আর ছিল গুলিস্তান।

মান্নান বাবার সাথে প্রথম মহকুমা শহর নারায়নগঞ্জ সফর করেন বাড়ির ঘাট থেকে ডাক-গয়নায় চরে। ভাড়া ছিল আট আনা।

এর পরের বার মান্নান ঢাকা এসে নানার সাথে কে এম দাস লেনে শেরেবাংলার বাড়ী যান। নানার আগ্রহ ছিল নাতিকে একবার শেরে বাংলার কোলে দিয়ে দোয়া নেয়া। হক সাহেব বাসায় ছিলেন না। তাই নানার সে শখ পুরণ হয়নি। তবে সে বাড়ীর ময়ূর ও হরিণ দেখার খুশীতে আত্মহারা হয়েছিলেন মান্নান।

ঢাকার রাস্তার ধারে তখন বিদ্যুৎ বাতি চালু হয়নি। তার পরিবর্তে কাঠের ল্যাম্পপোস্টের চূড়ায় চিমনির ভিতর ল্যাম্পগুলিতে সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে পৌর সভার লোকেরা মই বেয়ে উপরে উঠতো। সেই

www.pathagar.com

আলো-আঁধারি আর পুরান ঢাকার বসুবাজার-শরৎগুপ্ত রোড-দয়াগঞ্জ এলাকায় সকালে ময়লা টানা গরুর গাড়ির স্মৃতি মান্নানের মনে এখনো দাগ কেটে আছে।

মান্নান আরেকবার নৌকায় করে ঢাকা এসে এলাকার বড় ভাই ও সমবয়সীদের সাথে চৌদ্দই আগস্ট উপলক্ষে সদর ঘাটে নৌকা বাইচ আর স্টেডিয়ামে ছেলে-মেয়েদের কুচকাওয়াজ দেখে। এসব ছিল মান্নানের শহর দেখার ছোটবেলার স্মৃতি। ঢাকার ধানমন্ডী তখনো ধানক্ষেত।

এর পর মোমিন কোম্পানী ঢাকা-নরসিংদী সড়ক নির্মাণ করে। ফলে ঢাকার সাথে এলাকার যোগাযোগ বেড়ে যায়। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় ঢাকায় এসে মান্নান প্রথম টেলিফোনে কথা বলেন। স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে প্রথম ফুল প্যান্ট আর গুলিস্তান থেকে একটা পাইলট কলম কিনেন। সে বছরই ঢাকায় ডিআইটি বিল্ডিং-এর নীচ তলায় টিভি স্টেশন উদ্বোধন হয়। তার পর ঢাকায় কত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়।

শহরতলির মান্ডা গ্রামে লজিং থাকেন বিভিন্ন মফস্বল থেকে আসা সত্তর-পঁচাত্তরটি ছেলে। মান্ডা গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই 'মাস্টার' থাকে। এটা এ গ্রামের একটা সামাজিক মর্যাদা আর ঐতিহ্যের অংশ। মান্ডা গ্রামে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পেয়ে বহু ছেলে সে সময় ঢাকায় লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে।

মান্নান যে বাড়ীতে লজিং-এ উঠেন, সাবেত ছিল তাদের পালক পুত্র। সাবেতের 'মা' মান্নানকেও সন্তানের মতো আদর করতেন। তার আদর বেশী করে মায়ের কথা মনে করিয়ে দিত। বিছানায় একা শুয়ে মা-বাবা আর ছোট দুই ভাইয়ের কথা মনে করে মান্নানের কান্না পেতো।

মান্ডা গ্রামে মান্নানের অনেক নতুন বন্ধু জোটে। তাদেরই একজন কাপাসিয়ার এনায়েতউলাহ মোলা। এনায়েতের সাথি হয়ে মান্নান পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও ইসলামিক একাডেমী লাইব্রেরীর সাথে পরিচিত হন। এ যেন সোনার খনির সন্ধান লাভ। দিন কেটে যেতো এসব লাইব্রেরীতে। ইউসিস লাইব্রেরীতেও মেম্বার হন আবদুল মান্নান। বাহরাম-বনহুর-এর গন্ডি পেরিয়ে এভাবে বইয়ের এক সীমাহীন জগতের সাথে পরিচয় ঘটে মান্নানের।

শেখ বুরহানউদ্দীন কলেজে ভর্তি হবার কিছুদিন পরই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের যৌথ সমর্থনে মান্নান সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পান। অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য মান্নানকে বক্তৃতা লিখে দিয়েছিলেন শফিউল আলম প্রধান। সে লেখা মুখস্ত করে মান্নান বক্তৃতা করেন। প্রধান ও তার দলবল করতালিতে কলেজের হলরুম মুখরিত করে তোলেন।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল জব্বার খানের ছেলে ছাত্রনেতা রাশেদ খান মেনন তখন জেলে। জেল থেকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে। শেখ বুরহানউদ্দীন কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। মান্নানরা কোন সংগঠনের সদস্য নন। তবু মাঝে মধ্যে কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠতেন ঃ 'রাশেদ খান মেননের মুক্তি চাই'। শফিউল আলম প্রধানের প্রভাবেই মান্নান সে সময় এ রাজনৈতিক শোগান উচ্চারণ করেন।

এর পর ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সভাপতি শামসুদ্দোহা, মেনন গ্রুপের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার আর ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি আবদুল মালেকের সাথে মান্নানের একে একে পরিচয়। মান্নান তাদের দেখেন এবং ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা করেন।

শেখ বুরহানউদ্দীন কলেজের অরাজনৈতিক পরিবেশে হাকিম-মিজান-প্রধান-তাহের-এনায়েত-মোশতাক-হুদা-মান্নান মিলে 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। মান্নান ছিলেন প্রচার সম্পাদক।

দ্রুত সমাজ সংস্কার করার উপায় কি? সে চিন্তায় এ তরুণদের চোখে ঘুম নেই। তারা তাদের বক্তব্য একদিনে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার উপায় বের করলেন। টঙ্গীতে তাবলীগ জামাতের মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে সারাদেশকে জানিয়ে দেয়া হবে সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী।

টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে ইজতেমার ময়দানে হাজির হবার সাথে সাথেই তাবলীগের 'মুরুব্বী'রা তাদেরকে একটি তাঁবুতে নিয়ে যান।

www.pathagar.com

এর পর সেখানে দুপুর পর্যন্ত তাদেরকে ছয় উসুলের তালিম দেয়া হয়। জোহরের আযান হলে তাদেরকে অযু করিয়ে নামাজ পড়ানো হয়। এর মধ্যে তারা একবারও নিজেদের কর্মসূচীর কথা বলার সুযোগ পেলেন না। এভাবেই তাদের সমাজ-সংস্কারের অভিযান টক-ঝাল অভিজ্ঞতার মধ্যে শেষ হয়।

আটষট্টিতে মালিবাগে 'মাওসেতুং এর চিন্তাধারার গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। মান্নান উৎসুক হয়ে সেখানে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু কেন্দ্রের ছেলেদের আচরণ ও কথা বার্তা তাকে ক্ষুব্ধ করে। তাদের হঠকারী কার্যক্রমের প্রতিবাদে সে মালিবাগ থেকে কমলাপুর পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশের দেয়ালে পোস্টারিং করেন। এ কাজে তার সাথি হয় তাহের-এনায়েত-হুদা-আলাউদ্দীন ও আর ক'জন তরুণ। এ সময় তাহের ছাড়া বাকীরা সবাই থাকত মাতৃায়। তাহের থাকত মালিবাগে। ক'দিন পরে তারা 'জাতীয় যুব সংঘ' গঠন করে। মান্নান হল সাধারণ সম্পাদক। জাতীয় যুব সংঘের পক্ষ থেকে এ সময় একটি লিফলেটও বিলি করা হয়। এ সময় তাদের কারোই কোন রকম রাজনৈতিক দীক্ষা ছিল না।

সতেরো বছরের তরুণ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ সময় আকস্মিকভাবেই মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিব-এর সান্নিধ্যে আসেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার অ আ ক খ পাঠ তার এ সময়ই শুরু হয়। একই সময় মান্নান প্রখ্যাত আলেম মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মাসুম, মওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন, মওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল-মাদানী, মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর মতো দেশ বরেণ্য আলেমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান।

উনসত্তরের উত্তাল দিনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে বই খাতা ফেলে মান্নান বারুদ আর টিয়ার শেলের আকর্ষণে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বর্জন করেন।

আবদুল মান্নান তালিব-এর সহযোগিতায় দৈনিক সংগ্রামের প্রুফ রীডার হিসেবে মান্নানের সাংবাদিকতা জীবনের শুরু হয় ১৯৭০ সালের ২ জানুয়ারী। তখন দৈনিক সংগ্রামের রীডার ইনচার্জ ছিলেন কাজী শহীদুল হক। প্রুফ রীডিং-এ তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ওস্তাদ। কাজী সাহেব সংগ্রামে তার নবীন সাথীদের তালিম দিতে গিয়ে বারবার বলছিলেন, প্রুফ রীডিং ভালোভাবে শিখতেই দশ-পনেরো বছর সময় দরকার। পর পর কয়েক দিন একই কথা শুনে মান্নান জবাব দেয়, 'এত লম্বা একটা টেবিলের কিনারে বসে দশ-বারো বছর প্রুফ রীডিং শেখা আমার ধৈর্যে কুলাবে না। দশ বছরের মধ্যে এ রকম একটা পত্রিকার সম্পাদক হতে চাই।'

কাজী সাহেব সদ্য-নবীন এক প্রুফ রীডারের কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য শুনার পর এ নিয়ে সংগ্রামের টেবিলে আর কখনো কথা বলেননি।

প্রুফ রীডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে মান্নান ফটো সাংবাদিক হাসান আবদুল কাইউমের কাছে প্রেস ফটোগ্রাফী শিখে। হাসান আবদুল কাইউম সংগ্রাম ছেড়ে 'আজাদ'-এ যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য ছুটি নেন। এ সময় মান্নান দৈনিক সংগ্রামের প্রুফ রীডারির পাশাপাশি মাস দু'য়েক দৈনিক আজাদ-এ ফটো সাংবাদিকরূপে হাসান আবদুল কাইয়ুমের পক্ষেও কাজ করে।

১৯৭২ সালের শুরুতে মান্নান সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় যোগ দেন। 'সোনার বাংলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৫ সালে বিডি মেম্বারদের ভোটে ফাতেমা জিন্নাহকে 'পরাজিত' করে আইউব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সোনার বাংলায় এ নির্বাচন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনের হেডিং দেওয়া হয় ঃ 'স্বৈরাচারের কাছে পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষ পরাজিত।' এ কারণে তখন সোনার বাংলার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়।

স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী মালিক-প্রকাশক মহীউদ্দীন আহমদের সাহসি পৃষ্ঠপোষকতাই ষাটের দশকের প্রথমার্ধে 'সোনার বাংলা'কে আইউব-মুনায়েমের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক করেছিল। সোনার বাংলার স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশে এ পত্রিকা থেকেই আবদুল গাফফার চৌধুরী, মুহাম্মদউলাহ, হাফেজ হাবিবুর রহমান, মোবায়দুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, নির্মল সেন সহ বেশ ক'জন নামি সাংবাদিকের জন্ম হয়। বাহাত্তুরের বাংলাদেশে সোনার বাংলার মালিক-প্রকাশক মহীউদ্দীন আহমদের সাহসি ও স্বাধীন নীতি এবং বন্ধু মাহবুবুল হক-এর উৎসাহ মান্নানের কলমে শক্তি ও প্রেরণা যোগায়।

সোনার বাংলায় মান্নান কাজ শুরু করেন বিভাগীয় সম্পাদকরূপে। এর পর বার্তা সম্পাদক ও পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করেন। সোনার বাংলায় কাজ করার পাশাপাশি আবদুল মান্নান এ সময় সাপ্তাহিক বঙ্গদর্পন ও দৈনিক পূর্বাভাস পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। ১৯৭৩ সালে কিছুদিন যুব লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হাবিবুল বাশার সম্পাদিত 'দৈনিক সমাজ'-এও তিনি উপ-সম্পাদকীয় লিখেছেন।

কাজী শহীদুল হক এ সময় 'বাংলার বাণী'র রীডার ইনচার্জ আর দৈনিক সংগ্রামের প্রথম বার্তা সম্পাদক মীর নূরুল ইসলাম বার্তা সম্পাদক। মান্নান তাদের সাথে দেখা করতে একদিন বাংলার বাণী অফিসে যান। কাজী সাহেব দৌড়ে এসে দরজার কাছে মান্নানকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার শুরু করেন ঃ 'হামারা এডিটর সাব আ-গিয়া!' তিনি তার বাংলার বাণীর সাথিদের কাছে সত্তুর-এর জানুয়ারীর গল্প বলেন। তিনি বলেন, 'মান্নান তার কথা রেখেছে'।

মান্নানের সাথে ১৯৭০-এ প্রুফ রীডার হিসাবে সংগ্রামে যোগদানকারীদের বেশ ক'জন পরে লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে প্রকাশিত আরব নিউজ পত্রিকায় 'সম্পাদক' পদে কাজ করেন।

বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত পর্যন্ত 'সোনার বাংলা'ই ছিল মওলানা ভাসানীর 'হক কথা'র পর দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক। সে সময় মান্নানের রাত-দিনের স্বপ্ন ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'সোনার বাংলা'। তিনি দু'হাতে সব রকম লেখা লিখতেন। রাজনৈতিক ভাষ্য, অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবিবরণী, আন্তর্জাতিক বিষয়, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, স্যাটায়ার ও চুটকীধর্মী লেখা। এক কথায় জুতা সেলাই থেকে চন্ডি পাঠ।

ব্যাপক পাঠক প্রিয়তাই ছিল তখনকার সোনার বাংলার বড় শক্তি। 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত মান্নানের রম্য কলাম 'গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা' এ সময় লন্ডন থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকায় সিলেটী আঞ্চলিক ভাষায় পুনঃ প্রকাশিত হতো।

সোনার বাংলার কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 'বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদ'-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। 'অভিমত' সম্পাদক আলী আশরাফ ও 'দেশবাংলা' সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ছিলেন যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদ এ সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন কালা কানুন রদের দাবিতে এবং নিউজ প্রিন্টের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিল।

এ সময় পত্র-পত্রিকার প্রতি সরকারী আচরণ ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। ছোট খাট কারণে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে সোনার বাংলায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কারণে মান্নানকে এস বি অফিসে ডেকে নেয়া হয়। 'হোয়াইট হাউস' নামে পরিচিত শান্তিনগরের এস বি অফিসে তাকে চার ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সোনার বাংলায় কাজ করার সুবাদে তরুণ আবদুল মান্নান সে সময় অনেক প্রাজ্ঞ-প্রবীণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। তাকে নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, মোহাম্মদ মোদাব্বের, বাংলাদেশ অবজারভার-এর সাবেক সম্পাদক আবদুস সালাম, প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ ও ভাসানী ন্যাপের সহ সভাপতি ড. আলিম আল রাজি। বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি এবং সোনার বাংলার সাবেক নির্বাহী সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরীর সাথেও এ সময়ই তার পরিচয় ঘটে। মান্নান এ সময় আবুল মনসুর আহমদের সাংস্কৃতিক আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণীত হন।

সোনার বাংলা পরিবারের প্রতি আবুল মনসুর আহমদের অসামান্য সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল। এই পরিবারের সদস্য হিসেবে মান্নানকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সোনার বাংলায় তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত ও পুন প্রকাশিত হয়েছে। মান্নান বিভিন্ন উপলক্ষে সোনার বাংলায় তার কয়েকটি সাক্ষাতকারও গ্রহণ করেন।

একবার ভাষা দিবস উপলক্ষে সাক্ষাতকার চেয়ে মান্নান তাকে ফোন করেন। আগের মতোই মনসুর চাচা তাকে তার ধানমন্ডীর বাসায় যেতে বলেন। মান্নান নির্ধারিত সময়ে বাসায় গিয়ে হাজির হন।

www.pathagar.com

সেখানে ড্রয়িং রুমে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন অপেক্ষা করছিলেন। তিনি জানালেন, চাচা অসুস্থ। তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় বসে আছেন।

মান্নান ভিতরে খবর পাঠালে আবুল মনসুর আহমদ অসুস্থ শরীর নিয়ে ধীর কদমে এসে বৈঠকখানায় হাজির হন। ব্যারিস্টার সাহেবকে বিদায় জানানোর পর তিনি মান্নানকে বললেন, 'কথা কওয়া চিকিৎসকের বারণ। তবু তোমারে মানা করতে পারলাম না। তুমি প্রশ্ন তৈয়ার করে নিজেই সব প্রশ্নের জবাব লেখ। সে জবাব আমার সাক্ষাতকার হিসাবে ছাপাইয়া দেও।'

মান্নানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। এ গুরুভার তার দুর্বল কাঁধ কিভাবে সইবে?

মান্নান সোনার বাংলা অফিসে ফিরে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলাদেশের কালচার' ও অন্য ক'টি বই নিয়ে বসলেন। এ সব বই থেকে তার কিছু কিছু বক্তব্য বেছে নিলেন। আগে জবাব বেছে নেয়ার পর সে জবাবের আলোকে পরে তিনি তার প্রশ্ন সাজালেন। এই অভূতপূর্ব 'সাক্ষাতকার' ছেপে পরের সপ্তাহে সোনার বাংলার কপি নিয়ে 'চাচা'র সাথে দেখা করতে গেলেন মান্নান। আবুল মনসুর আহমদ সাক্ষাতকারটি দেখছিলেন আর চোখ তুলে মান্নানের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তার চেহারায় খুশীর ঝিলিক। তিনি মান্নানকে পিঠে ও মাথায় আদর করে দিলেন।

আবুল মনসুর আহমদ এ উপলক্ষে মান্নানকে একটি ঘটনা বললেন ঃ শহীদুলাহ কায়সার তার 'সংশপ্তক' উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের নাম ছেপে কার্ড নিয়ে তার বাসায় হাজির হন। বিনা অনুমতিতে নাম ছাপা হয়েছে দেখে আবুল মনসুর আহমদ বলেন ঃ 'তুমি তো বাপু আমাকে অনেক কম দামে বিক্রি করেছ। আমার এজাযত ছাড়া আমাকে প্রধান অতিথি করেছ। এ ছাড়া তোমার বইয়ের 'সংশপ্তক' নামকরণের সাথেও আমি একমত না। 'সংশপ্তক' অর্থ হলো শীব। এই শিরোনাম যুক্ত বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে আমি যাব না।'

আবুল মনসুর আহমদ বললেন ঃ 'আমি সে অনুষ্ঠানে যাই নাই।'

কবি ফররুখ আহমদের সাথে মান্নানের পরিচয় ঘটে আটষট্টি-উনসত্তুরে। সোনার বাংলায় কাজ করার সময় কবির সাথে তার ইস্কাটন গার্ডেনের বাসায় নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। সোনার বাংলায় এ সময় বিভিন্ন উপলক্ষে ফররুখ আহমদের বেশ কিছু পুরনো ও নতুন কবিতা ছাপা হয়। কবি ফররুখ আহমদের জীবনের শেষ লেখা কবিতাটি কবির মৃত্যুর মাত্র দু'তিন দিন আগে সোনার বাংলায় ছাপা হয়। কবির কাছ থেকে এ লেখাটি সংগ্রহ করেন মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।

১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর মান্নান ছুটে যান তার বাসায়। সেখানে হাজির হয়েছিলেন বহু কবি-সাহিত্যিক ও ভক্তকূল। তবে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আসেননি। কবির লাশ কোথায় দাফন হবে এ নিয়ে কথা হয়। কেউ কেউ বলছিলেন ডকটর মুহাম্মদ শহীদুলাহর কবরের পাশে তার লাশ দাফনের কথা। সরকারী মহল থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া মেলেনি। ফররুখ আহমদের মৃত্যুর খবর শুনে বিপবী যুগের কবি বেনযীর আহমদ ছুটে এসে আকুলভাবে নিবেদন করলেন ঃ 'আমার ভাইকে আমার বাড়ীতে আমার কবরের জন্য রাখা জমিতে দাফন করতে চাই।'
মান্নান কবির লাশ কোলে করে তিন তলা থেকে নীচে মসজিদের প্রাঙ্গনে নামানোর দায়িত্ব পালন করেন। জানাযার পূর্ব মুহূর্তে একটি আতরের শিশি নিয়ে সেখানে হাজির হন এক আগন্তুক। মদীনা থেকে কবির এক ভক্ত তার জন্য এ আতর তার মাধ্যমে উপহার পাঠিয়েছেন। এই আতর মেখেই কবিকে শেষ শয্যায় শায়িত করা হয়। 'একটি আতরের শিশি' শিরোনামে বাংলার বাণীতে এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।

কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে সোনার বাংলায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এ বিশেষ সংখ্যার জন্য কাজী মোতাহার হোসেন, সুফিয়া কামাল, আবুল মনসুর আহমদ সহ অনেকের সাক্ষাতকার নেন মান্নান। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাক্ষাতকারের পরিবর্তে একটি লেখা দেন। 'নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ' শিরোনামে কবি শামসুর রাহমানের একটি চমৎকার লেখা ছিল এ সংখ্যায়। কবি

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের ছেলে আহমদ আখতারের প্রথম কবিতা এ সংখ্যায় ছাপা হয়। আখতার তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। সরকারের অবহেলার মধ্যে জাতীয় রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি দেন। সেটিও এ সংখ্যায় ছাপা হয়।

শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত 'ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি কমিটি'র নির্বাহী সদস্য হিসেবে মান্নান এ সময় ফররুখ স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রকাশনার সাথে সক্রিয় ছিলেন। 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ'-এর উদ্যোগেও ফররুখ স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। মান্নান শুরু থেকেই স্বদেশ-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ থেকে তিনি 'স্বদেশ'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বাকশাল কায়েম করা হয়। এরপর থেকে সাংবাদিকদের একটি অংশের মধ্যে বাকশালে যোগদানের হিড়িক শুরু হয়। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর ওপরও এ ব্যাপারে নানা কিসিমের চাপ ছিল। এ নিয়ে তোপখানার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিসে কয়েকটি বৈঠক হয়। মান্নান সহ কয়েকজন প্রতিনিধি এভাবে সাংবাদিকদের দল বেঁধে বাকশালে যোগদানের বিরোধিতা করেন। ফলে একাধিক বৈঠক করেও এ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়। এর কিছু দিন পর সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হলে বাকশালে যোগদানের সুবিধাবাদী হিড়িকও থেমে যায়।

১৯৭৫ সালের ১৬ জুন মান্নানের জীবনে একটি কালো দিন।

নিউজপ্রিন্ট সংকট ও সরকারী বিজ্ঞাপনের আকাল আর সরকারী মহলের নানা প্রকার বিরূপতার মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ সালে সোনার বাংলা চালু রাখা ছিল এক দুরুহ কাজ। সাংবাদিকদের কয়েক মাসের বেতন বকেয়া পড়েছিল। সোনার বাংলার নিয়মিত স্টাফগণ একে একে প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছিলেন। যে দু'একজন খন্ডকালীন কাজ করতেন তারাও নানা কারণে ১৯৭৫-এর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকার বাইরে ছিলেন। এ অবস্থায় ১৯৭৫ সালে ১৬ই জুন তারিখের সোনার বাংলার পুরো সংখ্যাটির সম্পূর্ণ কাজ মান্নানকে এক হাতে করতে হয়।

এ সপ্তাহের সোনার বাংলা প্রকাশ করার জন্য মান্নান একটানা তিন দিন বাসায় না গিয়ে সোনার বাংলা অফিসে রাত কাটান। সব ধরনের রিপোর্ট তৈরি, সম্পাদকীয় লেখা, ভেতরের পাতাগুলোর সম্পাদনা করা, প্রতিটি লেখার প্রুফ দেখা, পেজ মেক-আপ সবই মান্নান এক হাতে করেন। এত কষ্টের পর সোনার বাংলার যে সংখ্যাটি বেরুল, তা পাঠকের কাছে পৌঁছানো গেল না।

সোনার বাংলার ১৫ কেজি গুপ্ত লেনের অফিসে বাহাত্তর ঘন্টা একটানা কাজ করে পত্রিকা প্রকাশের সব কাজ শেষ করে ১৬ জুন বিকালে শ্রীশ দাস লেনের বাসায় ফিরার পথে দৈনিক জনপদ-এর সহকারী সম্পাদক আকরম ফারুকের সাথে মান্নানের দেখা হয়। তার কাছেই তিনি প্রথম খবর পান যে, চারটি দৈনিক পত্রিকা রেখে শেখ মুজিবের এক দলীয় সরকার দেশের বাকী সকল পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে দিয়েছেন। এ দুঃখ অন্য কাউকে বলে বুঝানো যাবে না।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মেয়াদে সোনার বাংলায় মান্নানের সাথি ছিলেন আবু তাহের, আলতাফ হোসেন, সাফি আবদুস সালাম, আলাউদ্দীন ভূইয়া, এ কে এম হানিফ, আবুল হোসেন মাহমুদ, সানাউলাহ আখুঞ্জী, আজীজুর রহমান, আবদুল কাদির ও মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। মাহবুবুল হক সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে এ পত্রিকার সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন। ১৯৭৪ সালে আজীজুর রহমানের ইনতেকাল ছিল সোনার বাংলা পরিবারের জন্য এক শোকাবহ ঘটনা।

১৯৭৫ সালের ১৬ জুনের ঘটনার পর বহু সাংবাদিকের পেশা পরিবর্তন হয়। একজন সাংবাদিক বায়তুল মুকাররমের ফুটপাতে ফলের দোকান নিয়ে বসেন। তার দোকানের সামনে একটা প্যাকার্ডে লেখা ছিল ঃ 'সাংবাদিকের ফলের দোকান'।

মান্নান এ সময় লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইস্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল' ও পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। সোনার বাংলায় দায়িত্ব পালনকালে মান্নান ১৯৭৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এখন এই অর্ধ বেকার সময়ে তিনি অনার্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। পরীক্ষার রেজাল্টের পর ক'জন ছাত্রের মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে একজন কৃতিছাত্র হিসেবে তার পরিচয় হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের নভেম্বরে তার নেতৃত্বে ইয়ং মেনস মুসলিম এসোসিয়েশন (ইয়াম্মা) গঠিত হয়। তরুণ সমাজের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের মাঝে আত্মমর্যাদা, আত্ম পরিচয় ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত করা ছিল এ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াম্মা বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও প্রাগ্রসর তরুণের মাঝে সাড়া জাগাতে এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো শাখা কায়েম করতে সক্ষম হয়। দেশের খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ এই সংগঠনের কাজকে অভিনন্দিত করেন এবং বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ৭ ডিসেম্বর মান্নান সন্তোষে মওলানা ভাসানী আহুত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার সাথে ইয়াম্মার ব্যাপারেও কথা বলেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর থেকে বাকশাল আমলের বিধি-নিষেধ উঠে গেলে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে দৈনিক আজাদের পুনপ্রতিষ্ঠা লগ্নে আবদুল মান্নান এ প্রাচীনতম দৈনিক সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে যোগ দেন। এ সময়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সকল ক্ষেত্রেই ছিল আরেকটি ক্রান্তিকাল।

এক দলীয় বাকশাল আমলের পর নতুন করে বহুদলীয় রাজনীতির পালে তখন হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। দেশে আবার 'শত ফুল ফুটতে দাও; শত দল মেলতে দাও' এমন একটা আকুতি ক্রমশ সরব হয়ে উঠছে। ব্যক্তি উদ্যোগে এবং ব্যক্তির ত্যাগ ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা দেশের সদ্য বিকাশমান শিল্প কারখানায় জাতীয়করণের নামে দলীয় কর্মীদের লুটপাটের যে ধারা শুরু হয়েছিল--তারও পরিসমাপ্তির সূচনা হয় এ সময়। সমাজের সকল স্তরে পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনি একটি সময়ে দৈনিক আজাদ-এ মান্নানের স্বল্পকালীন সাংবাদিকতার সময়টি ছিল ঘটনাবহুল।

১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের সাথে এক চুক্তির ভিত্তিতে ভারত ২১ এপ্রিল ফারাক্কা বাঁধ চালু করে। এক বছর শেষ হতে না হতেই তার প্রভাবে বাংলাদেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে স্টাফ ফটোগ্রাফার জালালউদ্দীন হায়দারকে সাথে নিয়ে মান্নান পাকশি-ইশ্বরদী-গড়াই হার্ডিঞ্জ থেকে পদ্মার উজানে বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে তুলে আনেন ফারাক্কার মরণ ছোবলে পদ্মার বিশীর্ণ দশার চিত্র আর পদ্মাতীরের জনজীবনে ফারাক্কার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। পরপর কয়েকদিন দৈনিক আজাদের প্রধান শিরোনাম হয় ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার মরুভূমিতে পরিণত হবার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত খবর। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদনে 'আজাদ'-এর আট কলামের শীর্ষ শিরোনাম ছিল ঃ 'হার্ডিঞ্জের নীচে পদ্মার ঠিক মাঝখানে পানির উচ্চতা মাত্র দুই ইঞ্চি।'

প্রতিবেদনগুলো সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি করে। এরপরই ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলাসহ কয়েকটি পত্রিকায় এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ পায়। পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আন্দোলন ও কথাবার্তা শুরু হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে ফারাক্কা অভিমুখে ঐতিহাসিক লং মার্চ কর্মসূচী পালিত হয়।

দৈনিক আজাদের রিপোর্টার হিসেবে একটি মজার স্মৃতি স্মরণ করেন মান্নান। বার্তা সম্পাদক সুলতান আহমদের সাথে পরামর্শ করে ফটোগ্রাফার জালালউদ্দীন হায়দারকে সাথে নিয়ে তিনি টঙ্গীতে তাবলীগ ইজতেমার খবর সংগ্রহ করতে যান। টঙ্গীর তাবলীগের লোকেরা তাদেরকে তাড়া করে। মান্নান খালি হাতে সহজে ভীড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে পারলেও ক্যামেরা হাতে হায়দারকে একটু বেশী ঝামেলা পোহাতে হয়। শেষ পর্যন্ত 'আজাদ'-এর শেষ পাতায় ইজতেমা মাঠের ছবিসহ একটা বড় ফিচার ছাপা হয়। বাংলাদেশের কোন সংবাদপত্রে তাবলীগ ইজতেমা নিয়ে এটিই ছিল প্রথম প্রতিবেদন।

এমন একটি নতুন বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করার 'অপরাধে' মান্নানের 'বিচার' বসে ঢাকেশ্বরী রোডে আজাদ অফিসের দোতলায় প্রধান সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁর কক্ষে। চীফ রিপোর্টার শেখ রকীবউদ্দীনের কানকথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পাদক জয়নুল আনাম খাঁ নিজেই বাদী। নির্বাহী সম্পাদক এ কে এম মহীউদ্দীন আহমদ ও বার্তা সম্পাদক সুলতান আহমদ বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত। তবে তারা সবাই

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে নীরব। ঘটনার সাথে বার্তা সম্পাদকের সম্পর্ক থাকলেও আজাদ-এর পরিবেশগত কারণে মান্নান তাকে জড়াতে চান না। বিবাদী হিসেবে বিচারের রায় মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে মান্নান এ প্রতিবেদনের জন্য ভুল মানতে কিছুতেই রাযী না।
মৃদুভাষী প্রধান সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ অল্প কথায় রায় ঘোষণা করলেন ঃ উদ্দেশ্যবিহীনভাবেও যদি কোথাও এতগুলো লোক জমা হয়--সেটার একটা 'নিউজ-ভ্যালু' আছে। তাবলীগ ইজতেমা সেদিক থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কেউ আগে এই সম্মেলনের নিউজ ভ্যালুর মূল্যায়ন করেননি। মান্নান সেই 'ভ্যালুটা' উপলব্ধী করে আজাদের পাতায় খবরটা হাজির করেছে। এ জন্য তার প্রশংসা পাওয়া উচিৎ।'

এভাবে অতি সহজে মামলা ডিসমিস হয়ে গেল।

'দৈনিক আজাদ'-এ মান্নানের সবচে স্মৃতিময় দিন ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট। বঙ্গাব্দ হিসেবে ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র। সেদিন সাপ্তাহিক অফ-ডে'তে বাসায় বসে সকাল সাড়ে দশটার দিকে মান্নান তার ছোট্ট রেডিওটার 'নব' ঘুরাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ঘোষণা তাকে থামিয়ে দিল ঃ ''আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কিছুক্ষণ আগে পি জি হাসপাতালে ইনতেকাল করেছেন।''

অফ ডে-র কথা ভুলে মান্নান সাথে সাথে পি জি-র দিকে ছুটলেন।

ইতিমধ্যে কবির লাশ পি জি মিলনায়তনে এনে রাখা হয়। ভক্ত-অনুরক্ত, লেখক-কবি-গায়ক-শিল্পী-ছাত্র-শিক্ষক সাধারণ মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে। সামরিক পোশাকে জিয়াউর রহমান এলেন। কবি নজরুলের লাশকে স্যালুট করলেন তিনি। এলেন নামিদামি আরো অনেকে। সারাদিন মানুষের স্রোত ছুটে চলছে শাহবাগের দিকে।

রমনা রেসকোর্স ময়দানে জানাজা শেষে কবিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে। কবির আকাংখা ছিল ঃ 'মসজিদের পাশে আমায় কবর দিও ভাই।' বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের আযান ধ্বনী আর বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক বিউগলের করুণ 'লাস্ট পোস্ট' এর মধ্যে সন্ধ্যায় কবিকে দাফন করা হলো।

সেখান থেকে মান্নান চলে গেলেন আজাদ অফিসে।
দৈনিক আজাদের প্রথম ও শেষ পাতা মিলিয়ে সম্পূর্ণ ষোল কলাম মোটা কালো বর্ডারে ঘিরে দিয়ে কবি নজরুলের মৃত্যুতে দৈনিক আজাদ-এর শোক জ্ঞাপন করা হলো। সেদিনের আজাদের প্রথম ও শেষ পাতার কালো বর্ডার ঘেরা প্রায় সকল কলাম দখল করলো মান্নানের প্রতিবেদন। বার্তা বিভাগে শহীদ ভাই-মুসা ভাইরা সে সব লেখার স্থানে স্থানে আতর ছিটালেন। বার্তা সম্পাদক সুলতান ভাই প্রথম পাতার মাঝখানে বক্স করে জুড়ে দিলেন নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'মসজিদের পাশে আমায় কবর দিও ভাই।'

রাত আড়াইটার দিকে বার্তা সম্পাদক সুলতান ভাইর সাথে পায়ে হেটে ঢাকেশ্বরী রোড থেকে ওয়ারি লারমিনি স্ট্রীটের বাসায় ফিরে মান্নান ছিলেন আত্মহারা। তার সাংবাদিক জীবন বুঝি আজ সার্থক হলো।

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে মান্নান আজাদ ছেড়ে দেন। এ সময় খোশরোজ কিতাব মহল ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সত্ত্বাধিকারী জনাব মহীউদ্দীন আহমদ মওলানা ভাসানীর আত্মজীবনী ছাপার একটি পরিকল্পনা করেন। এ ব্যাপারে মওলানার সাথে তিনি কথাবার্তা বলে ঠিক করেন যে, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সার্বক্ষণিকভাবে মওলানার সাথে থেকে তার কাছ থেকে ডিক্টেশন নিয়ে মওলানার আত্মজীবনীর পান্ডুলিপি তৈরি করবেন। খোশরোজ কিতাব মহল তা প্রকাশ করবে। মান্নানের জন্য এটি ছিল এক অসাধারণ এসাইনমেন্ট। কিন্তু এ কাজ শুরুর আগেই মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৭ নবেম্বর ইন্তেকাল করেন।

১৯৭৬ সালে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও জাতি গঠনমূলক গবেষণার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ছিলেন সেন্টার-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চলিশ সদস্যের অন্যতম। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বেই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণার জন্য ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো কায়েম হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের এলিফ্যান্ট রোডস্থ অফিসের একটি কক্ষে সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার সকালে ব্যুরোর সাপ্তাহিক সেমিনার হতো। আবদুল মান্নান শুরু থেকেই ব্যুরোর একজন উৎসাহী কর্মীতে পরিণত হন।

১৯৭৭ সালের ১৭ জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম পুনপ্রকাশিত হয়। আবার মান্নানের ডাক পড়ে দৈনিক সংগ্রামে। ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার ও ডিপোমেটিক করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি। মাঝখানে কিছু দিন 'বাংলাদেশ লেবার কেসেস' জার্নালের এক্সিকিউটিভ এডিটর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন মান্নান। শ্রম উপদেষ্টা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত শ্রম-সম্পর্ক বিষয়ক এ-জার্নালের সম্পাদক ছিলেন শ্রমিক নেতা ও রাজনীতিবিদ শাহ আবদুল হালিম। সাবেক লেবার ডাইরেকটর আবদুল হাই এবং শ্রমিক নেতা এ কে এম বেলায়েত হোসেনও শ্রম উপদেষ্টা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। দীনেন সেনসহ বহু বিখ্যাত শ্রমিক নেতা এবং শ্রমসম্পর্ক বিশেষজ্ঞের সাথে এ সময় তার পরিচয় হয়।

দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার নীতি অনুসরনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। একটি দলীয় কাগজে কট্টর বিরোধি মতামত অবিকৃত অখন্ড সত্যরূপে প্রকাশের নীতি সংগ্রামে এ সময় পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। এ সময় দৈনিক সংগ্রামের রিপোর্টিং ডেস্কে একদল অত্যন্ত মেধাবী ও উদ্যমি সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন মাসুদ নিজামী, সালাহউদ্দীন বাবর, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, আযম মীর, আবুল খায়ের চৌধুরী, সৈয়দ মেসবাহউদ্দীন, রফিকুল ইসলাম ফারুক প্রমুখ। স্টাফ ফটোগ্রাফারদের মধ্যে প্রথমে ছিলেন লুৎফুর রহমান বিনু, এরপর জেবুল আমীন দুলাল ও আবদুর রাজ্জাক। ক্রীড়া বিভাগে মালু ভাই ও মামুন ছিলেন; হাদি মীরও কাজ করেছেন। হাদি মীরের পুরো নাম মীর আবুল ফযল মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ হাদি।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার খাল খনন কর্মসূচীর রিপোর্ট সংগ্রহের কাজে মান্নান অংশ নেন। খাল খননসহ প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম ও জাতি গঠনমূলক কর্মসূচী এ সময় দৈনিক সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্ব পায়। ফারাক্কা সমস্যাটিকে জাতির সামনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ সময় দৈনিক সংগ্রামের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর ওপর দৈনিক সংগ্রামের প্রতিবেদনসমূহ সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

১৯৭৭ সালে দৈনিক সংগ্রামেই তাবলীগ জামাতের টঙ্গী ইজতেমা প্রথম বারের মতো 'খবর' হিসেবে ছাপা হয়। এর আগের বছর এ নিয়ে আজাদ-এ ফিচার ছেপে মান্নান বিপদে পড়েছিলেন। দৈনিক সংগ্রামে মান্নান এদিক থেকে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। টঙ্গী ইজতেমার মাঠে ১৯৭৬-এর অভিজ্ঞতা মান্নানের মনে ছিল। তিনি ১৯৭৭ সালে সেখানে যান ফটোগ্রাফার ছাড়া। তার নসীবে একটি ভালো খবরও জুটে যায়।

হঠাৎ সেখানে হাজির হন উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান। টঙ্গীর মাঠে তার জন্য অভ্যর্থনার কোন আয়োজন ছিল না। একটি জিপ থেকে নেমে তিনি আমীরের সাথে দেখা করতে চাইলে একজন মুরুব্বী তাঁকে একটি তাবু দেখিয়ে দেন। মান্নানও এগিয়ে যান জেনারেল জিয়ার সাথে সাথে।

আমীরের তাবুর দরোজায় দুটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে ধরে পাহাড়া দিচ্ছে দুই নওজোয়ান। তারা তাদের বাঁশ সোজা করলো। জেনারেল জিয়া সেখানে ঢুকলেন। সাথে মান্নান। শূন্য তাবু। একটু পরই আমীর আসলেন। জিয়াউর রহমান দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখালেন। আমীর তার এই দুই মেহমানকে কিছু খেজুর ও জমজমের পানি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। পানি পান করার সময় আমীর বললেন জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। জিয়া তাই করলেন। এর পর আমীর জিয়ার কাছে তাবলীগের ছয় উসুল ব্যাখ্যা করলেন। চলিশ দিনের চিলা সম্পর্কেও বললেন। তাবলীগের কাজে জিয়াকে সময় দিতে এবং মেহনত করতে বললেন।

মান্নান ভাবছিলেন ঃ আমীর হয়তো বলবেন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম প্রচারের এই কাজ অনেক সহজে এগিয়ে নিতে পারেন। দ্বীনের কাজে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও সরকারের প্রধান ব্যক্তিদের দায়িত্ব সম্পর্কেও আমীর

www.pathagar.com

হয়তো এই সুযোগে জেনারেল জিয়াকে নসিহত করবেন। কিন্তু আমীর তাকে চিলা দেয়ার কথা ছাড়া আর কিছু বললেন না।

ইতিমধ্যে আসরের আযান হলো। আমীর নামাজের কথা বললেন। জিয়ার সাথে মান্নানও আমীরকে অনুসরন করে জামাতে শরীক হলেন। এই ঘটনাটি পর দিন দৈনিক সংগ্রামে 'কিছু খেজুর ও জমজমের পানি' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

১৯৮০ সালের ২৩ মে ঢাকায় খন্দকার মোশতাক আহমাদের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় সাংবাদিক মুস্তাফিজসহ আটজন নিহত হন। গ্রেনেডের আঘাতে বেশ ক'জন সাংবাদিকসহ বহু লোক গুরুতর আহত হন। গ্রেনেডের স্পিন্টার বিদ্ধ আবদুল মান্নানকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। জরুরী চিকিৎসা গ্রহণের পর মান্নান শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়ে ডাক্তারদের অনুরোধ ঠেলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে সংগ্রাম অফিসে একটি টেবিলে শুয়ে সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখেন। ২৪ মের কাগজে সে প্রতিবেদন তার নামেই ছাপা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা রাজনীতিতে প্রবেশের পর দলের পক্ষ থেকে তাকে সে সময় সংবাদপত্রে সাক্ষাতকার দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়। এ কারণে অনেক পত্রিকা চেষ্টা করেও তার সাক্ষাতকার নিতে পারেনি। এ অবস্থায় মান্নান তার প্রথম একান্ত সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন। মান্নান রোজার দিনে তাকে ফোন করে বত্রিশ নম্বর রোডে তার কাছে হাজির হন এবং এক পর্যায়ে তাকে বলেন যে তাকে কোন কোন কঠিন প্রশ্ন করা হবে না। এই কথায় কাজ হয়। সাথে সাথে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর কন্যা কোন কঠিন প্রশ্নকে ডরায় না'। তিনি সাথে সাথে সাক্ষাতকার দিতে রাযী হন। পঁচিশ মিনিটের এ সাক্ষাতকারের সময় মান্নানের সাথে ছিলেন তখনকার জুনিয়র রিপোর্টার আবুল খায়ের চৌধুরী। সংগ্রামে প্রকাশিত সে সাক্ষাতকারটি এরপর আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক কাগজ 'মুক্তিবাণী'তে পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

মান্নান খোন্দকার মোশতাকের দীর্ঘ চার ঘন্টার একান্ত সাক্ষাতকার নেন এবং তা দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। সে সময় দৈনিক সংগ্রামের জন্য দেশের আরো বেশ ক'জন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন তিনি। জাতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী তখন সিলেটে অবস্থান করছিলেন। তার কাছে ডাকযোগে একটি প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ এই মুহূর্তে জাতির সামনে প্রধান সমস্যা কি? জেনারেল ওসমানী শুধু এই একটি প্রশ্নের উত্তর বড় বড় হরফে একটি মাত্র শব্দে লিখে পাঠান ঃ 'ইমান'!

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের পর দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবনে হাজির হয়ে জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে সুদৃঢ় ঐক্যের ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট সাত্তার সে কঠিন দুর্যোগ মুহূর্তে অত্যন্ত বলিষ্ঠ-ভূমিকা পালন করেন। মান্নানের সাংবাদিক জীবনের এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

এর পর জিয়ার লাশকে ঘিরে সংসদ ভবনের চারপাশে লাখো শোকার্ত মানুষের যে সমাবেশ ঘটে এবং পরদিন মানিক মিয়া এভিনিউতে জিয়ার জানাযা উপলক্ষে প্রায় দশ লাখ মানুষের বিশাল জনতা জাতীয় ঐক্যের এবং জনশক্তির যে মহড়া প্রদর্শন করেন তা সালাহউদ্দীন বাবরকে সাথে নিয়ে মান্নান দৈনিক সংগ্রামে তুলে ধরেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীতা এবং বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব প্রশ্নে ব্যারিষ্টার মওদূদ আহমদের নেতৃত্বে ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সহ একটি অংশ বিচারপতি সাত্তারের কর্তৃত্ব ক্রমশ চ্যালেঞ্জ করতে থাকেন। তারা বিচারপতি সাত্তারের মুকাবিলায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তখনও পর্যন্ত খালেদা জিয়া দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য তীব্র হয়ে উঠলে দৈনিক বাংলার মনজুর আহমদ, ইত্তেফাকের শফিকুল কবির, দৈনিক সংবাদের আশরাফ খান ও দৈনিক সংগ্রামের মোহাম্মদ আবদুল মান্নান খালেদা জিয়ার বাসায় যান। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর খালেদা জিয়া বেরিয়ে এসে তার বাসার সামনে একটি অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার প্রদান করেন। এটিই ছিল খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আসার প্রাক্কালে প্রথম সাংবাদিক সাক্ষাতকার। লুৎফর রহমান বিনু তখন দৈনিক সংবাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার। তিনি এ সাক্ষাতকারের ছবি তোলেন।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের সামনে এক ছাত্র মিছিলে গ্রেনেড হামলায় আহতদের মধ্যে দু'জন ছাত্রের পা উড়ে যায়। তাদের একজন ছিলেন এম এ-ক্লাশের ছাত্র তফাজ্জল হোসেন। অপারেশন করে তার একটি পা কেটে বাদ দেয়ার পর তাকে হাসপাতাল বেডে নেয়ার পর জ্ঞান ফিরলে মান্নান তার একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। তফাজ্জলের বক্তব্য ও ছবিসহ সে সাক্ষাতকারটি দৈনিক সংগ্রামে বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে ছাপা হয়। মান্নানের সাংবাদিক জীবনে এ সাক্ষাতকারটিও স্মরণীয় ঘটনা।

সাংবাদিক হিসেবে মান্নান তার দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠাসহ পালন করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা এবং তাদের রুটি-রুজির অধিকারের প্রশ্নে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে তিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বিএফইউজের তখনকার ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কমিটিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের চমৎকার প্রতিনিধিত্ব ছিল। আহমেদ হুমায়ুনের সভাপতিত্বে এ কমিটির সহসভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রবীণ সাংবাদিক আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন ও চট্টগ্রামের নূর সাঈদ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রিয়াজউদ্দীন আহমদ। সহকারী সম্পাদক পদে মান্নান ছাড়া ছিলেন বোরহান আহমদ ও সৈয়দ মোস্তফা জামাল। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ার জাহিদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী, নির্মল সেন, বাংলাদেশ অবজারভারের নির্বাহী সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দৈনিক বাংলার কাজী মাসুম, জামালউদ্দীন মোলা, দৈনিক সংগ্রামের সালাহউদ্দীন বাবর সহ নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে সাংবাদিকতার পেশা থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত মান্নান নিষ্ঠার সাথে তার এ দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত এসাইনমেন্ট পরিপূর্ণভাবে পালন করে সাংবাদিক ইউনিয়নের দায়িত্বের প্রতি সুবিচার করার ব্যাপারে আহমেদ হুমায়ুন ছিলেন মান্নানের কাছে চমৎকার আদর্শ।

দৈনিক সংগ্রামে চীফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও এ সময় বিভিন্ন সাময়িকী ও জার্নালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রম্য রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি ত্রৈমাসিক কলম, মাসিক পৃথিবী, ঢাকা ডাইজেস্ট, পাক্ষিক অগ্রপথিক ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

১৯৮০ সালে তার লেখা বই 'বাংলাদেশের পুলিশ' প্রকাশ করে খোশরোজ কিতাব মহল। এ বইটি বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিকতাকে তার জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ঘটনাই তার পেশা বদলের কারণ হয়। ইসলামী ব্যাংকের প্রথম শাখা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দশ দিন আগে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট তিনি এ ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তারূপে যোগদান করেন। ব্যাংকের দুই উদ্যোক্তা মুহাম্মদ ইউনুছ ও এম এ রশীদ চৌধুরী এবং বন্ধু মাহবুবুল হক মান্নানকে তার পেশা পরিবর্তনের এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

সাংবাদিকতা পেশা থেকে মান্নানের হঠাৎ বিদায়ে বিএফইউজে সভাপতি আহমেদ হুমায়ুন খুবই কষ্ট পান। মান্নানও কয়েক দিন তার মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে চলেন। প্রেসক্লাবে মান্নানকে পেয়ে তার দিকে ছুটে আসেন আহমেদ হুমায়ুন। 'মান্নান, আমি আপনাকে খুঁজছি। কত টাকার জন্য আপনি সাংবাদিকতা ছেড়েছেন? আপনার আরো টাকার দরকার সে কথা আমাকে আগে বলেন নি কেন? আপনাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি।' মান্নান আহমেদ হুমায়ুনের হাতের মধ্যে হাত লুকিয়ে চুপ করে থেকেছেন।

ইউনিয়নের নানা কার্যক্রমে আহমেদ হুমায়ুন মান্নানের কথাকে আলাদা গুরুত্ব দিতেন। তার পেশাগত মানোন্নয়নের ব্যাপারেও আহমেদ হুমায়ুনের বিশেষ আগ্রহ ও সহযোগিতা ছিল। তিনি মান্নানকে বলতেন, 'সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে বড় হতে হবে। সেই সাথে ইউনিয়নেও

www.pathagar.com

অবদান রাখতে হবে। পেশাগত দায়িত্বে ফাঁকি দিয়ে যারা ইউনিয়ন করে তারা সব কিছুতেই ফাঁকি দেয়। এই ফাঁকিবাজরা শেষ পর্যন্ত ধান্দাবাজে পরিণত হয়।'

জনসংযোগ কর্মকর্তা রূপে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে পরিচিত করা এবং এ কাজে মিডিয়ার সহযোগিতা লাভ করা ছিল মান্নানের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকের প্রাথমিক দিনগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের পরিচিতিমূলক বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার, লিফলেট তৈরির কাজে তাকে এ সময় জনসংযোগ বিভাগে একা এবং প্রায় খালি হাতে কাজ করতে হয়। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন মডেল ছিল না। এ সময় তাকে সপ্তাহে সাত দিন এবং প্রতিদিন পনের ষোল ঘন্টা কাজ করতে হয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থা এবং ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি আশাতীত সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। বিশেষভাবে দৈনিক সংবাদের মতো পত্রিকার বার্তা বিভাগে সন্তোষ গুপ্ত, মোজাম্মেল হোসেন, তোজাম্মেল আলী কিংবা চপল বাশার এবং বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও বার্তা সম্পাদক নাজিমউদ্দীন মানিকের চমৎকার সহযোগিতার কথা তিনি সর্বত্রই কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিক থাকাকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য হিসেবে এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। সে সময় প্রেস ক্লাবই ছিল তার 'সেকেন্ড হোম'। পেশা বদলের পর তিনি হলেন এসোসিয়েট সদস্য। এর পর বাস্তব কারণে তার প্রিয় প্রেস ক্লাবের সাথে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে। অন্যদিকে এ সময় তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিবা)-এর একজন সক্রিয় কর্মীরূপে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামী রূপান্তরের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির নির্বাহী সদস্য হিসেবে দেশের জনসংযোগ পেশার মানোন্নয়ন এবং জনসংযোগ কর্মীদের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করেন।

সাংবাদিকতা ছেড়ে আসলেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার পুরনো পেশার সাথে নাড়ির সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন করেন নি। সারাদিন ব্যাংকের কাজে ব্যস্ত মান্নান রাতে স্বপ্নের মধ্যে রিপোর্টারের নোট বই নিয়ে দৌড়ঝাপ করেন। এ ছাড়া পেশা পরিবর্তনের পর লেখালেখির কাজে তিনি সব সময় নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রাখেন। তার সাথি বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়িরাও তাকে লেখালেখিতে সক্রিয় থাকার ব্যাপারে সব সময় উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করেন। ১৯৮৩ সালের আগস্টে ব্যাংকে যোগদানের ক'দিন পর কি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে মগবাজার রেল ক্রসিং-এ রাজনীতিবিদ মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে তার দেখা হয়। জনাব নিজামী রেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়েই মান্নানের সাথে তার পেশা পরিবর্তনকে উপলক্ষে করে কথা বলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার হাত নিজ হাতে নিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন ঃ 'আলাহ যাকে কলমের নেয়ামত দিয়েছেন তাকে সর্বোচ্চ নেয়ামত দিয়েছেন। এ নেয়ামতের শুকরিয়া তোমাকে আদায় করতে হবে। এটাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ।'

১৯৮৫ সালের অন্য একটি ঘটনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখালেখির বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঢাকা বিভাগীয় দফতরের উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর উনিশটি বিষয়ে ধারাবাহিক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারের একটি বিষয় ছিল 'বাংলার মুসলিম নব জাগরণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'। সেমিনারের সভাপতি ছিলেন প্রিন্সিপাল নূরুল করীম ও নির্ধারিত প্রবন্ধকার ছিলেন কবি আল মাহমুদ। এই সেমিনারে মোস্তফা জামান আব্বাসী ও মান্নান ছিলেন নির্ধারিত আলোচক। ঘটনাচক্রে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে এ সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়। আল মাহমুদ হন আলোচক।

প্রিন্সিপাল নূরুল করীম সভাপতির বক্তৃতায় মান্নানের প্রবন্ধটিকে একটি মূল্যবান গ্রন্থের সাথে তুলনা করেন। তার স্নেহসিক্ত আরো কিছু উৎসাহমূলক মন্তব্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত পড়াশুনায় আগ্রহী করে তোলে। সেমিনারের উনিশটি প্রবন্ধ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ঢাকা বিভাগীয়

www.pathagar.com

পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুরের সম্পাদনায় 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের জন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার প্রবন্ধটি পরিমার্জিত করেন। অধ্যাপক আবদুল গফুর এই প্রবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে বাংলার মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে মান্নানের সাথে আলোচনা করেন এবং এ নিয়ে অনেক বড় কাজ করার জন্য তাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে সেই তখন থেকেই মান্নান রাত জাগতে শুরু করেন। এর পর থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে বেশ ক'টি লেখা দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ সংখ্যার জন্য (অধ্যাপক আবদুল গফুরের তাগিদে) লিখতে হয়।

১৯৮৬ সালে শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা ফুলকুঁড়ির সম্পাদক মাহবুবুল হক-এর তাগিদে মান্নান বাংলাদেশের প্রাচীন ও কিছু লুপ্ত শিল্প সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। এ লেখাটি 'বাংলা আমার দেশ' শিরোনামে 'ফুলকুড়ি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবার কারণে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রত্ন নিদর্শনগুলো দেখার সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের উদ্যোগ ও প্রেরণায় আড়াইহাজারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ 'দীপন' প্রকাশিত হয়। এ কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারেও আগ্রহী হন।

জনসংযোগ পেশা ছেড়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'ব্যাংকার' হবার একটা ছোট্ট পটভূমি এখানে উলেখ করা যায়। ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান কমোডর এম আতাউর রহমান তিউনিসিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করবেন। সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশের দায়িত্ব পড়লো ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল এম ফরীদউদ্দীন আহমদ ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ওপর। এই বিষয়ে কাজ করার শুরুর দিনেই জনাব ফরীদ মান্নানকে বললেন, ব্যাংকের চাকুরীতে যখন এসেই পড়েছেন, তখন উপরি কাঠামো থেকে ব্যাংকিং-এর মূলধারায় যাচ্ছেন না কেন?

মান্নান বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিলেন। সেদিনই বিকালে তিনি ব্যাংকের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট জনাব এম আযীযুল হক-এর সাথে দেখা করে ব্যাংকিং-এর মূলধারায় কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জনাব আযীযুল হক পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ 'ডু ইউ রিয়েলি মিন ইট?' মান্নান জবাব দিলেন ঃ 'ইয়েস, স্যার।'

পরদিন ৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ব্যাংকের ম্যানেজিং-কমিটির বৈঠকে তার বিষয়টি আলোচিত হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো। শুক্রবার ছুটির দিন সকালে জনাব আযীযুল হক মান্নানকে বাসায় ফোন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

এভাবেই জনাব ফরীদউদ্দীন আহমদের উৎসাহ ও প্রেরণায় এবং জনাব এম আযীযুল হকের উদ্দীপনামূলক সমর্থনের ভিত্তিতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৮৮ সালের ৯ জানুয়ারী জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব ছেড়ে ব্যাংকিং-এর মূলধারায় প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি প্রথমে ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে যোগদান করেন এবং নওয়াবপুর শাখায় চার মাসের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করেন। ওরিয়েন্টেশনে থাকার সময়ই জনাব এম আযীযুল হক তাকে কিছু দিনের জন্য ইসলামপুর শাখায় রিলিভিং ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

এভাবে সংক্ষিপ্ত ওরিয়েন্টেশনের পর ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আবদুল মান্নান একটি নতুন শাখা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে যশোরে যান। এভাবেই মান্নান হলেন ব্যাংকার। ১৯৯০ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি ইসলামী ব্যাংকের যশোর শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শুরু থেকেই নিজেকে সাধারণ মানুষের ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-মসজিদে এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও ওয়াজ মাহফিলে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

তিনি সাধারণ জনগণের ছোট ছোট সঞ্চয়কে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবাহে সঞ্চালিত করার উদ্যোগ নেন এবং ছোট ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যেও কাজ করেন। তার চেষ্টায় যশোর এলাকার বহু নিম্ন আয়ের লোক ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ হন। ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুবাদে সমাজের যে বিত্তবান মানুষদেরকে সাথে তার যোগাযোগ ও পরিচয় হয় তাদেরকে তিনি দারিদ্র দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করেন। তিনি রাস্তার টোকাইদের অবস্থার উন্নয়নে উদ্যমী তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাংকিং লেনদেনের বাইরে যশোরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। যশোর ইন্সটিটিউট, স্থানীয় জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুব উন্নয়ন অধিদফতর সহ বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় তিনি বেশ কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। মুনশী মেহেরুল্লাহ দিবস উপলক্ষে গতানুগতিক আলোচনা সভার পরিবর্তে ১৯৮৯ সালে মুন্সী সাহেবের গ্রামের বাড়ী ছাতিয়ানতলায় দিনব্যাপী একটি মেলা আয়োজনে তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তার উদ্যোগে বৃহত্তর যশোর জেলার হজ্জযাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

যশোরে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দক্ষিণ বাংলার জনজীবন, তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং তাদের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধী অর্জনের সুযোগ পান। এ সময় তিনি যশোরের বেশ ক'জন প্রবীণ ব্যক্তির মূল্যবান সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

যশোরের সর্বস্তরের জনগণের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে যশোর থেকে ঢাকা ফিরে আসার সময় তাকে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্তত চৌদ্দটি বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়। যশোরের টোকাইদের সংগঠন ছিন্নমুকুল সংঘও তাকে কিছু ফুলসহ পিতলের ফুলদানি ও একটি কলম উপহার দেয়। ছিন্নমুকুলদের এই উপহারকে মান্নান তার জীবনে পাওয়া বড় বড় পুরস্কারের সমতুল্য গণ্য করেন।

যশোর থেকে ঢাকায় এসে তিনি মৌচাক শাখার প্রথম ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌচাক শাখায় দায়িত্ব পালনকালে মান্নান ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে সর্বস্তরের জনগণকে পরিচিত করা এবং ছোট ছোট বিনিয়োগ উদ্যোক্তা উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেন। এ সময় তার উপলব্ধী আরো গভীর হয় যে, দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাংকারদের আরো অনেক বেশী ইনোভেটিভ ভূমিকা পালনের এবং তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং নিয়মের মধ্যে থেকেও একজন চৌকষ পেশাদার ব্যাংকার সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।
মৌচাক শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালের জন্য দুই-দুইবার ব্যাংকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বর্ণপদক, পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। এছাড়া ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ২০০১ সালেও তিনি ব্যাংকের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত হন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৮৫ সালে ইতিহাস বিষয়ে যে পড়াশুনা ও লেখালেখি শুরু করেন ব্যাংকিং-এর মূলধারায় এসেও তা অব্যাহত থাকে। তার গবেষণার প্রথম ফসল হিসেবে ১৯৯২ সালে 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ. আর. মলিক তার এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন। এই বইটিকে সুধিজন বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। সৈয়দ আলী আহসান মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা গ্রন্থে 'এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে ...তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা' তুলে ধরার জন্য লেখকের প্রশংসা করেন এবং এক্ষেত্রে এ বইটিকে তিনি 'পথিকৃত' বলে অভিহিত করেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'-কে অভিহিত করেন 'জনগণের ইতিবৃত্ত' রূপে। তার মতে বইটি 'শুধু ইতিহাস গ্রন্থ নয়-- ইতিহাস চেতনারও গ্রন্থ'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুহিব উল্যাহ ছিদ্দিকী এ গ্রন্থটির 'ধারণার ধরন ও চিন্তা-চেতনা বিকাশের নতুনত্ব' বিষয়ে আলোকপাত করে মন্তব্য করেন ঃ 'ইতিপূর্বে বিষয়টিকে এভাবে কেউ দেখেছে বলে আমাদের জানা

www.pathagar.com

নেই।'

এ সব মন্তব্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে উৎসাহিত এবং আরো আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।

১৯৯২-৯৩ সালে বাংলা চৌদ্দশতক জাতীয় উদযাপন কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলা নতুন শতাব্দী বরণের ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ কমিটির উদ্যোগে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে বেশ কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে তিনটি জাতীয় সেমিনারে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই তিনটি প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'এক শ বছরের রাজনীতি', 'বাংলা চৌদ্দ শতক ঃ ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার রেনেসাঁর শতাব্দী' এবং 'বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের রাষ্ট্রসত্তা'। এর আগে ১৯৯২ সালে সমাজ অধ্যয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্যাঙ্গডক মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে 'আমাদের রাষ্ট্রসত্তার বিকাশধারা' শিরোনামে আরো একটি বড় প্রবন্ধ পাঠ করেন। এসব প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হয়ে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' 'আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে নতুন করে উদ্ঘাটন করেছে' মন্তব্য করেন সৈয়দ আলী আহসান।
'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' সম্পর্কে 'বাংলাদেশ অবজারভার' মন্তব্য করেছেন ঃ "With the critical eye of a journalist ...and as a true seeker of truth and researcher...it was perhaps for Mr. Abdul Mannan to complete the unfinished task, to give us a complete picture...in the form of the present book."

বইটি সম্পর্কে 'দি নিউ নেশন' লিখেছেন ঃ "Mr. Abdul Mannan deserves cheers and congratulations on presented the nation with the book..."

বস্তুত 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ও 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হবার পর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিক ও ব্যাংকার পরিচয় অতিক্রম করে একজন শিকড়-সন্ধানী গবেষক রূপে পরিচিত হন। আর তখন থেকেই মান্নান তার লেখালেখির একটা সুনির্দিষ্ট মানচিত্র এঁকে নিতে সমর্থ হন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের কয়েক হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস উপলব্ধী করার এবং তা তুলে আনার কাজে তার কলমের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেন।

'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি মূলত এ এলাকার জনগণের প্রাচীন কাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালের ইতিবৃত্ত। আবদুল মান্নান আরো দু'টি খন্ডে বাকী সময়কে উপস্থাপনের অঙ্গীকার নিয়ে এর পর থেকে কাজ শুরু করেন। মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার পরবর্তী খন্ডের কাজের অংশ হিসেবে তিনি ফকীর মজনুশাহ, শমশের গাজী, আবু তোরাব, মিয়াজান কাজী, হাজী শরীয়তউলাহ, তিতুমীর ও দুদু মিয়া প্রমুখের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। মজনু শাহ সম্পর্কে এ সময় তাঁর একটি গবেষণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া শরীয়তউলাহ-দুদুমিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীর-এর জিহাদ আন্দোলন, সিপাহী বিপবে বাংলা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি স্বতন্ত্র পান্ডুলিপি সমাপ্ত করে এনেছেন।

মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার পরবর্তী খন্ডের কাজ করার পাশাপাশি মান্নান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেরুকরণের ধারা, বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করেন। এ সময় তিনি 'মওলানা ভাসানীর জীবনের শেষ পাঁচ বছর' শিরোনামে একটি গবেষণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধটি 'মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী' নামক বিরাট গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইউমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

জনগণের মাঝে ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার সীমিত সামর্থের মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি বহু তরুণকে ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সহযোগিতা করছেন। তার উদ্যোগ ও প্রেরণায় এ বিষয়ে বেশ কিছু সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন

www.pathagar.com

টিভি চ্যানেলে ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের পাতায় ইতিহাস বিষয়ক পৃষ্ঠা সংযোজন এবং এ বিষয়ে লেখালেখি করার জন্য তিনি সংশিষ্ট অনেককে উৎসাহিত করেন।

তার পরামর্শে 'ক্লাসিক' ডাইরীর প্রকাশকগণ ১৯৯২ সাল থেকে তাদের ডাইরীতে প্রতি বছর বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপাতে শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে ক্লাসিক ডাইরীতে 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে ক্লাসিক ডাইরী প্রকাশ করে 'আবর্তিত ভাগ্যের নগরী ঢাকা-মুরশিদাবাদ-কলকাতা' নামে আর একটি ভিন্ন মাত্রার প্রবন্ধ। ১৯৯৭ সালে ক্লাসিক 'বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি' নামে (আবদুল মান্নান সৈয়দের) একটি প্রবন্ধ এবং ২০০১ সালে 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণে মুসলিম অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ক্লাসিকের অনুসরনে পরবর্তীতে আরো অনেক প্রকাশক তাদের ডাইরীতে ইতিহাস-ঐতিহ্যমূলক প্রবন্ধ এবং তথ্যাদি প্রকাশ করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে মাজান্দারান প্রদেশের বাবুলসরে দু'সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ শেষে তিনি মাজান্দারানের বাইরে 'নকশে জাহাঁ' নামে খ্যাত প্রাচীন নগরী ইসফাহান, রাজধানী তেহরান, শিক্ষা নগরী কোম, শেখ সাদী ও হাফিজের শহর শীরাজ, পারস্য সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র পারসেপোলিস বা তাখতে জামশীদ এবং তার অদূরে 'নকশে রোস্তম' সহ বিভিন্ন এলাকা ও দর্শনীয় স্থান সফর করেন। তার এ সফরের বিবরণী 'পারস্যের পথে প্রান্তরে' শিরোনামে সাপ্তাহিক বিক্রমে অর্ধশতাধিক কিস্তিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৫ সালে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিট্যান্স কার্যক্রমের মার্কেটিং-এর বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সৌদি আরবে যান। এর পর ১৯৯৭ সালে তার দায়িত্বের আওতা সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ওমানে সম্প্রসারিত হয়। উপসাগরীয় দেশসমূহে দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে এ ছয়টি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় চারণের মতো ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন এলাকার উদ্যোগী ও নেতৃস্থানীয় প্রবাসীদেরকে সাথে নিয়ে এ ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলেন। উপসাগরীয় এলাকায় অবস্থানকালে প্রায় প্রতি রাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কোন না কোন সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। এ সময় অন্তত সত্তুর হাজার লোক সরাসরি তার হাতে ব্যাংকের হিসাব খোলেন।

এই আন্দোলনের ফলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিপুল সাড়া ও সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং হুন্ডির পরিবর্তে ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশী প্রবাসীদের অর্থ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রবাসে বাংলাদেশী পণ্য ব্যবহারকেও তিনি উৎসাহিত করেন। 'ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠান', 'বাংলাদেশী লুঙ্গী-গামছা-গেঞ্জি ব্যবহার করুন', 'বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করুন'--তার এ সব শোগান প্রবাসীদের মাঝে সাড়া জাগায়।

তিনি ছোট ছোট বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং রিয়াদের 'বাংলাদেশ বিজনেস কম্যুনিটি' (বিবিসি) সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করেন। এ সময় রিয়াদে বিবিসি'র উপদেষ্টা হিসেবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩ দিন ব্যাপী বাংলাদেশ সিঙ্গেল কান্ট্রি ট্রেড ফেয়ার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
সৌদি আরবের বাংলাদেশী অভিবাসীদের সম্পর্কে তিনি 'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট' (রামরু) বইটি ২০০১ সালে প্রকাশ করে। তিনি রামরুর-এর একজন রিসোর্স পার্সন হিসেবে নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রমে অংশ নেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা প্রসঙ্গে তার বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে তিনি বাংলাদেশী প্রবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ পেশ করেছেন। তার বেশ কিছু পরামর্শ ইতিমধ্যে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

মান্নান ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ধরে উপসাগরীয় দেশসমূহের প্রত্যন্ত এলাকায় সফর কালে বিভিন্ন

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন দেখার সুযোগ পান। এ সময় তিনি সৌদি আরবে আদ ও সামুদ জাতির নিদর্শনসমূহ, হযরত সালেহ (আ.)-এর নগরী মাদায়েন সালেহ, শোয়ায়েব (আ.)-এর নগরী মাগায়েরে শোয়ায়েব, মুসা (আ.)-এর স্মৃতি-বিজড়িত লোহিত সাগর তীরের বিভিন্ন নিদর্শন, হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী কাতুরার সন্তানদের স্মৃতি বিজড়িত মাদায়েন ও তাবুক, হযরত ইবরাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.) ও হাজেরার স্মৃতি বিজড়িত এলাকা মক্কা ও মিনার বিভিন্ন নিদর্শন, আল কুরআনের সূরা বুরুজে আসহাবুল উখদুদ নামে উলেখিত হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতদের স্মৃতি বিজড়িত এবং আবরাহার হাতীর উৎস ভূমি হিসেবে পরিচিত নাজরান এলাকা, প্রাচীন ইয়ামেনী সুদা পর্বত বেষ্টিত আবহা, খামিস মুশায়েত, তিহামা ভূমি জিজান এবং আল জউফে ইমরাউল কায়েসের শহর সাকাকা ও দুমাতুল জন্দল, তাঈ গোত্রের এলাকা হাইলে হাতেম তাঈ-এর প্রাচীন ঘরবাড়ী, তার কবর ও কূয়া, আব্বাসীয় আমলের জোবায়দার নহর প্রভৃতি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-তায়েফ-খায়বর-তাবুক, ইয়ামামা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের জন্মস্থান আল ওয়াইনা, তেলের ওপর ভাসমান আধুনিক নগরী দাম্মাম, দাহরান, আবকীক, খোবার, সিহাত, রাহিমা, রাস তানুরা, সাত হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ কাতিফ, টুইন রয়েল সিটি নামে লোহিত ও আরব সাগরের তীরবর্তী দুই পৃথক নগরী জুবেইল ও ইয়াম্বু, তেলের পাইপলাইনকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা ইরাক সীমান্তবর্তী হাফার আল বাতেন, রাফা, আরার, তুরায়েফ জর্দান সীমান্তবর্তী কুরায়েত, সিরিয়া সীমান্তবর্তী তাবারজল, রোমান্টিক শহর আল খারজ ও লায়লা আফলাজ সফর করেন।

লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে জেদ্দা থেকে রাবেগ, মাস্তুরা, ইয়ানবু, দুবা সহ বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র-মরুভূমি বেষ্টিত এলাকা আল কুরআনে উলেখিত আহক্বাফ, রুব আল খালি, দাশতে কবীর ও নফুদ মরুভূমির বিস্তীর্ণ দুর্লংঘ পথে তিনি মরুভূমির শ্বাস প্রশ্বাসের ভিতর মানুষের জীবনের স্ফূর্তি দেখে মুগ্ধ হন।

প্রবাসে থাকাকালেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার লেখালেখির কাজ অব্যাহত রাখেন এবং তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত তিনি ডাইরীভুক্ত করেন। উপসাগরীয় এলাকায় তার ব্যাপক সফরের কিছু বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'মাদায়েন সালেহ ঃ অলৌকিক এক উটের দেশে' এবং 'শোয়েব নবীর দেশে' শিরোনামে। এছাড়া 'টইটম্বুর', 'ফুলকুঁড়ি' পত্রিকায় 'সৌদি আরবের চিঠি' শিরোনামে তার ভ্রমণের কিছু বিবরণ ছোটদের জন্য ছাপা হয়েছে।

উপসাগরীয় দেশসমূহে দায়িত্বপালনকালে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগী তরুণ প্রবাসীকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করেন। তার উদ্যোগে কিংবা সম্পাদনায় প্রবাস থেকে বেশ কয়েকটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়। প্রবাসীদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেন। আগ্রহী তরুণ লেখকদের লেখালেখিকে উৎসাহিত করার জন্য সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় এবং কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনি সাহিত্য সভা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন সহ বেশ কিছু সফল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রবাসে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের ব্যাপারেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। প্রবাসে নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বড় আয়োজনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

উপসাগরীয় দেশসমূহে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরার পর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী ব্যাংকের হেড অফিস কমপেক্স কর্পোরেট শাখার প্রথম ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৩ সালে তিনি ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তারপর ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে ব্যাংকের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০৭ সালের নবেম্বরে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষ করে ব্যাংকের বিনিয়োগ উইং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদান এবং অফিসের অন্যান্য কাজে মালয়েশিয়া, জাপান, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ইরান, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ও

www.pathagar.com

চীনের বিস্তীর্ণ এলাকায় সফর করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লীডারশীপ ইন ফিন্যান্স (ইকলিফ), কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া-এর উদ্যোগে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ায় মালাক্কা প্রণালীর পাঙ্কর ও পুত্রাজায়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিকের তীরে বোস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সান ফ্রান্সিসকোতে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চার স্তর বিশিষ্ট ' গোবাল লীডারশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'-এ অংশ নেন। পুত্রাজায়ায় তিনি এশিয়ার পরিবর্তনকামী মানুষের নেতা মাহাথির মুহাম্মদ-এর সাথে একশ পাঁচ মিনিটের একটি দুর্লভ সাক্ষাতকার গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি 'ইকলিফ'-এর একজন ফেলো।

একজন শীর্ষস্থানীয় পেশাদার ব্যাংকার হিসাবে নিজ দায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকার পাশাপাশি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সব সময় তার লেখক সত্তার প্রতি সুবিচার করার ব্যাপারেও যত্নশীল রয়েছেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সকালে ও রাতে তিনি নিয়মিতভাবে লেখা-পড়া করেন এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাপারটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। ব্যাংকের বর্তমান অবস্থানে থেকে তিনি কিভাবে সময় বের করেন এ ব্যাপারটিকে তিনি 'এক অতিশয় দুর্বল বান্দার প্রতি মহান আলাহর বিশেষ করুণা' এবং তার 'পরিবারের সদস্যদের বড় রকমের ত্যাগ'-এর ফল বলে উলেখ করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এর প্রকাশিত গ্রন্থ

১. ঈদুল আযহা ও কুরবানীর শিক্ষা	১৯৭৩
২. শেখ মুজিবের পতন কেন	১৯৭৫
৩. বাংলাদেশের পুলিশ	১৯৮৩
৪. ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি	১৯৮৮
৫. বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তিসংগ্রামের মূল ধারা	১৯৯১
৬. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা	১৯৯৪
৭. সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা	২০০১
৮. এই আমার বাংলাদেশ	
৯. ইসলামী ব্যাংকিং ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২০০৫
১০. বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ	২০০৭
১১. বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃত ঃ শাহ ওয়ালীউলাহ দেহলভী ও জামালউদ্দিন আফগানী	২০০৭
১২. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	২০০৭
১৩. সোনার দেশ বাংলাদেশ	
১৪. গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা (রম্য রচনা)-প্রকাশিতব্য	২০০৮

সম্পাদনা

১. দীপন ঃ আড়াইহাজার-এর ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ	১৯৮৫
২. বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন স্মারকগ্রন্থ	২০০৬

ভ্রমণ

চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, জাপান, সৌদিআরব, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান প্রভৃতি।

১৯৯৬ সালে তিনি সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার-এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক, সংগঠক, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবী, সম্পাদক-আইন পত্রিকা

www.pathagar.com

উল্লেখিত বইটিকে বিষয়ের উপর পথিকৃত বলেছেন। আমিও তাই মনে করি। 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' বইটিও গবেষণার জন্য মূল্যবান।

আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, মান্নানের বইটি প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহের প্রতিবাদ। এটা খুবই সত্যকথা।

মান্নানের ইতিহাস বিষয়ক ৩টি গবেষণা গ্রন্থ দুটো আমাদের আসল ইতিহাস জানতে সাহায্য করেছে। ইতিহাসবিদদের যে কাজটা করা উচিত ছিল তা মান্নান করেছে। মান্নানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মান্নানের সুস্বাস্থ্য কামান করছি। মান্নান তার গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবে। যার ফলে আমরা আরও বেশি বেশি উপকৃত হবো।

লেখক ঃ কবি, ছড়াকার, কলামিস্ট, কথা সাহিত্যিক, সম্পাদক- ঘরবাড়ী

প্রচলিত ইতিহাসের প্রতিবাদ

এরশাদ মজুমদার

আবদুল মান্নানের সাথে আমার পরিচয় সাংবাদিক হিসাবে কয়েক যুগ আগে। সুন্দর চেহারার মানুষ। সুন্দর ব্যবহার। অতি সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে। তার হাসিতে যাদু আছে। মানুষকে আপন করার মহা মন্ত্র। সাংবাদিকতায় কিছুদিন থাকার পর মান্নান ব্যাংকিং পেশায় চলে যায়। তখন থেকে আর নিয়মিত দেখা হয় না। এখন মান্নান ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তাদের একজন। মহাব্যস্ত মানুষ। তার দফতরে না গেলে দেখা আর কোন উপায় নেই।

আমাকে সবচে' বেশি যা অবাক করে তা হলো মান্নানের লেখার ক্ষমতা। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পেশায় নিয়োজিত থেকেও মান্নান তার গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মান্নানের অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি গবেষণাধর্মী বইও রয়েছে। তার 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' বইটি আমাকে উপকৃত করেছে। এটি মূল্যবান কাজ ও প্রকাশনা। মান্নানের কাছ থেকে দেশবাসী এ ধরনের আরও কিছু বই আশা করতে পারে। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব মান্নানের

www.pathagar.com

মান্নান ভাই
ব্রেকহীন ট্রেন

ওয়াহিদুজ্জামান

মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৪ সালে আব্বার (কবি ফররুখ আহমদ) ইন্তেকালের পরে 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' একটি সংখ্যা বের করেছিল সেই সময়ে। তিনি আমাদের সব ভাইয়ের একটি গ্রুপ ফটো তুলে ছিলেন। সেই ফটো ছাপা হয়েছিল 'সোনার বাংলা'য়।

মান্নান ভাই কখনও সাংবাদিক, কখনও সংগঠক, কখনও কথক, কখনও ইতিহাসবিদ ইত্যাদি পরিচয়ে আমার সামনে উপস্থাপিত হয়েছেন।

তিনি আমার কাছে বিরামহীন ট্রেন। ট্রেন যেমন ছুটে চলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, মান্নান ভাইও ছুটে চলেছেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁকে। তার সাক্ষী হিসেবে আছি আমি, নাজিম আনোয়ার, ফখরুল ভাই এবং আরো অনেকে।

মান্নান ভাইকে চেনাটা মুশকিল। কত রকম লোকের সঙ্গে মেশেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। সমাজে এমন কোন স্তর নেই যেখানে তাঁর সাথে যোগাযোগ নেই। উপর তলা থেকে নীচ তলা পর্যন্ত তিনি মিশতে পারেন অতি সহজে। কালো-ধলো, উপর-নীচ সব স্তরেই তাঁর পরিচয়। আড্ডাবাজ হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই। যেই কথাকে কেউ গ্রাহ্য করছে না; অবহেলা করছে সেই কথা থেকে তিনি ইতিহাসের অমূল্য রত্ন তুলে আনছেন।

পকেটে পয়সা আছে কি-নাই কিন্তু তাঁর মেহমানদারীতে কখনও উষ্ণতা নেই। সব সময় চোখে-মুখে সজীবতা। উষ্ণতার কোন ভাব নেই। ঔদার্যের কোন অভাব নেই।

পরিশ্রমী হিসেবে তাঁর পরিচয় পাই। যখন আমরা সকলে ঘুমাই, তিনি তখন লেখা-পড়া করেন। আমরা যখন হাল ছেড়ে দেই, তিনি তখন সেই হাল ধরেন। তিনি একজন আশাবাদী মানুষ।

সাংবাদিকতা থেকে সফল ব্যাংকার হওয়া তার পক্ষেই সম্ভব যার আছে অনেক দূরদৃষ্টি। আমি মনে করি, তিনি সেই দূরদৃষ্টির অধিকারী বলেই এতদূর আসতে পেরেছেন।

একটা গান শুনেছিলাম। সেখানে লক্ষ্যে অটুট থাকার আহ্বান জানিয়েছেন গীতিকার। মান্নান ভাই সেই লক্ষ্যে অটুট আছেন বলেই এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। বাকীটুকু ইনশাল্লাহ্ পারবেন। কারণ তাঁর হাতে আছে কলম, জবানে আছে কথা বলার শক্তি, কোমরে আছে বল। বাকী আল্লাহ্ ভরসা।

লেখক : প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিসেবী, ব্যাংকার

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
আমার এককালের বন্ধু ও সাথী

মাহবুবুল হক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে আমার পরিচয় ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে। দিনাজপুরে। বন্ধুবর সানাউলাহ আখুঞ্জি ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঢাকা থেকে দিনাজপুরে বেড়াতে এসেছেন। আমার অবস্থা তখন পথশিশুর মত অথবা গৃহহীণ অসহায় এতিমের মতো। এমন এক ধরনের বিস্রস্ত অবস্থার মাঝেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ। হোটেলে মেহমানদারী করেছি। কিন্তু বাসায় নিয়ে গিয়ে মেহমানদারী করতে পারিনি। বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল সাথী বা বন্ধু হিসেবে তাঁকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে।

৬৯ সালের মাঝামাঝি সময় ঢাকায় চলে আসি। সানাউলাহ আখুঞ্জির মেহমান হই। তোপখানা রোডের ন্যাশনাল রেস্ট হাউজে থাকি। যখনই সময় পাই তখনই মুক্তবুদ্ধি সাহিত্য সংঘ'র কাজ করি। 'কলকণ্ঠ' ও 'নিবেদিত প্রাণ অনির্বাণ' নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সানাউলাহ আখুঞ্জীর অনুজপ্রতীম বন্ধু হলেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে তখন সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজের সাথে জড়িত দেখা যেত না। সম্ভবত তিনি তখন ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী ও ইয়ং পাকিস্তানে কাজ করতেন। আর আলেমদের সাথেই তাকে বেশী দেখা যেতো। আমি ঢাকায় আসার বেশ কিছুদিন পর তার সাথে দেখা হয়। খোঁজ নিলেই শুনতাম ইত্তেহাদুল ওলামা, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ এবং এসবের নেতৃবৃন্দ যেমন মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মাসুম, মাওলানা আবদুল গাফফার, মাওলানা জুলফিকার আলী কিসমতি এদের সাথেই তিনি আছেন।

আমাকে দেখে তো তিনি অবাক! বললেন, সানাউলাহ আখুঞ্জী ভাইতো আমাকে আপনার কথা বলেন নি। সেদিন আমার সাথে অনেকটা সময় দিলেন এবং এক পর্যায়ে চক বাজার জামে মসজিদে আমাকে নিয়ে গেলেন। আমরা যখন মসজিদে পৌঁছেছি বাদ আছরে, তখন সভা শুরু হয়ে গেছে। মরহুম মাওলানা আমিনুল ইসলাম তখন বক্তৃতা করছিলেন। ডায়াসে বসে আছেন দেশ-বরেণ্য সব আলেম। দেখলাম, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সবার সাথেই পরিচিত ও ঘনিষ্ট। সবাই তাঁর সাথে সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করছেন।

৬৯ এর শেষ দিকে দৈনিক সংগ্রামে যোগদান করি। প্রশিক্ষণের জন্য আমার আগে অথবা পরে তিনিও দৈনিক সংগ্রামে যোগদান করেন। সত্তুরের মার্চ পর্যন্ত আমি দৈনিক সংগ্রামে ছিলাম। সেই সুবাদে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। বুঝাই যেত, আর দশজনের মত তিনি নন। একটু আলাদা, একটু বিচক্ষণ এবং একটু কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন।

৭২ সালের জানুয়ারিতে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পুন:প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে একাই শুরু করি। পেড়ে উঠছিলাম না। হিমশিম খাচ্ছিলাম। তাঁর সাথে যোগাযোগ করি। খুব খুশি হলেন। শুরু হলো আমাদের এক সাথে কাজ করা এবং এক সাথে পথ চলা। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কারণে সোনার বাংলাতেই তিনি উচুঁ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

৭৫ এ সোনার বাংলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে দৈনিক আজাদ এবং পরবর্তিতে পুনরায় দৈনিক সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন।

www.pathagar.com

সোনার বাংলায় তাঁর যে বুদ্ধিভিত্তিক ভিত্তি রচিত হয়েছিলো পরবর্তিতে সেই বিভা তাকে ভার্টিক্যালি উপরে নিয়ে যায়। সোনার বাংলায় এসে তিনি নতুন বাঁক গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, জাতির শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে আলোড়ন তুলতে হবে। এ কাজটি করার জন্য কিছু নিবেদিত প্রাণ মানুষকে জ্ঞান-গবেষণায় নিমগ্ন হতে হবে। মনে আছে, একবার আমরা শপথ করেছিলাম বুদ্ধিবৃত্তির জগত থেকে আমরা সরে যাব না। যত কষ্টই হোক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আমরা নিয়োজিত থাকবো। সে শপথ তিনি এখনও রক্ষা করে চলেছেন।

অনেকেই জানেন, ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে আমরা ক'জনা মিলে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করেছিলাম। ঢাকায় যার শুরু মুক্তবুদ্ধি সাহিত্য সংঘ থেকে। এর সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাহ আবদুল হালিম, ডা.শামসুদ্দৌলা, মরহুম সানাউলাহ আখুঞ্জী, সাংবাদিক শেখ এনামুল হক, এহসানুল হক রঞ্জু, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, মাহবুবুল হক প্রমুখ। পরবর্তিতে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ আমলে এই নিউক্লিয়াসে উপদেশক হিসেবে সাংবাদিক আজিজুর রহমান যোগ দেন। শিক্ষাবিদ মুহম্মদ মতিউর রহমান, ব্যাংকার এম.এ.রশীদ চৌধুরী, গবেষক মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ও সহযাত্রী হিসেবে যোগ দেন হাসানুল করিম, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, কাজী মোহাম্মদ মোরতুজা আলী, মিনহাজুর রহমান, মহবুবুর রহমান, কাজী ফারুক আহমদ, আবদুল লতিফ মাসুম, আতাউর রহমান এবং এদের মধ্যে অগ্রবর্তী ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। গত চার দশকে এই নিউক্লিয়াসে বহুজন এসেছেন চলে গেছেন, কিন্তু নিউক্লিয়াসটি এখনও টিকে আছে। ১৯৯৬ সালে এই নিউক্লিয়াসই গড়ে তোলে সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার (সিএনসি)। শুধু কালচার নয়, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও সিএনসি অবদান রেখে যাচ্ছে। এখানেও রয়েছে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সম্পৃক্ততা।

সোনার বাংলার মুদ্দতসহ যতদিন মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মমতাময়ী মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন আমরা ছিলাম ভাই, বন্ধু ও সাথী। একটা সময় ছিল দিনের চব্বিশ ঘন্টাই আমরা এক সাথে কাটাতাম। তার মাকে আমি সরাসরি মা বলে ডাকতাম। কখনো খালাম্মা বা চাচি আম্মা ডাকতাম না। তাঁর কাছে আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সবার কাছে সব সময় বলতেন আমার চার ছেলে। মাহবুব, মান্নান, হাসনাত ও হালিম। বলতে দ্বিধা নেই, এই মহিয়সী মহিলার ইন্তেকালের পর সেই বিষয়টি আর সেভাবে স্থিত হয় নি। এটাই হয়তো বা বাস্তবতা। বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ১৯৮০ সালে আমার লণ্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা অনেকটা সাথী হিসেবেই সময় কাটিয়েছি। এরপর আর কখনও সাথী হওয়ার সুযোগ হয় নি। পরবর্তীতে আমাদের অবস্থান আদর্শিক বন্ধু হিসেবেই।

আমার উৎসাহে অগ্রজপ্রতিম মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ভাই ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি সৌদি আরবের নাজরানে শিক্ষকতার চাকুরী ছেড়ে আসেননি। যোগদানের ক'দিন পরই তাকে আবার নাজরান ফিরে যেতে হয়, আরো এক বছর চাকুরী পুরা করার জন্য। নানা কারণে আবদুল মান্নানও সে সময় দৈনিক সংগ্রামে সুস্থির ছিলেন না। আমি এক রকম জোর করেই তাঁকে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগে যোগদান করাই। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের যোগদানের দু'চার দিন পরই জনাব নূরুল ইসলাম এক বছরের জন্য নাজরান চলে যান।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে নতুন ধারার এ কাজকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এটাই তাঁর বড় গুণ। কোনো কাজ বুঝতে, আত্মস্থ করতে এবং সে কাজের কমাণ্ডে থাকতে তাঁর জুড়ি নেই। সেই থেকে দু'যুগেরও অধিক কাল ধরে তিনি ইসলামী ব্যাংকেই সম্মান ও মর্যাদার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যতদূর জানি আউটস্ট্যাণ্ডিং ও এ্যাকসিলেন্ট কাজের জন্য তিনি বার দুয়েক গোল্ড মেডেলও পেয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের চরিত্রের বড় দিক হলো অধ্যবসায়। নিষ্ঠার সাথে তিনি পরিশ্রম করতে পারেন। সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যাংকে যখন ঢুকেছেনই তখন ভালো ব্যাংকার হতে হবে এই ছিলো তাঁর প্রতিজ্ঞা। সেই প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকের সমুদয় কর্মকাণ্ডে ইনভল্‌ব হয়েছেন। ফলে ব্যাংকের উচ্চতম সিঁড়িতে তিনি পৌঁছে গেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূলত ঐতিহ্যবাদী মানুষ। তাঁর মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সুদৃঢ়। তবে তিনি ঐ দলে নন:

www.pathagar.com

কবে সে খোয়ালী বাদশাহী
সেই সে অতীত আজও চাহি
যাক মুসাফির গান গাহি
ফেলিস অশ্রু জল।

না, তিনি অশ্রু ফেলেন না। তবে ঐতিহ্য প্রীতি তাঁর হৃদয়ে নিয়ত রক্তক্ষরণ ঘটায়। সে কারণে তাঁর মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিছুটা অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি। জানার পেছনে ছোটেন। শুধু শুনে শুনে তৃপ্ত হন না। বইয়ের পর বই ঘাটতে থাকেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যাই জাতিকে ঐতিহ্য-বিরাগ করে তুলেছে। ঐতিহ্য অনুসরণের অনীহা জাতিকে গন্তব্য থেকে লক্ষ্যচ্যুত করেছে। সমসাময়িক সমাজধারা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটা বিরহ, একটা যন্ত্রণা এবং একটা প্রেমাবেগ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। শুরু হয় ইতিহাস চর্চা। দিনে কট্টর প্রফেশনাল আর রাতে প্রেমান্ধ গবেষক। গত প্রায় সিকি শতাব্দীর সময় পটে এই হলো মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের আদল।

ব্যাংকের অনেক সহকর্মী তাঁকে ইতিহাসবিদ বলে এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। আবার ইতিহাস গবেষকরা তাঁকে ব্যাংকার হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আজিজুর রহমান মলিক, জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বা প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন তাঁর বইয়ের ওপর ভূমিকা, উপক্রমনিকা ও মতামত লিখে তাঁকে আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান ইতিহাসবিদ গবেষক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অপরদিকে যে সব ব্যাংকার তাঁকে ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক বলে এক পেশে অভিধায় অভিসিক্ত করেছিলেন তারাও নিশ্চয়ই এখন নিজেদের ভুলটা ধরতে পেরেছেন। একজন ইতিহাসবিদ হয়েও তিনি ভালো ব্যাংকার হয়েছেন। আবার একজন সফল ব্যাংকার হয়েও তিনি যথার্থ মাত্রায় ইতিহাসবিদও হয়েছেন। এ এক সফল মানুষের প্রতিকৃতি। দুনিয়ার প্রায় সকল সফল মানুষের মধ্যে একাধিক গুণের প্রোজ্জ্বল সমাবেশ দেখা যায়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

আসলে দুটি বড় কাজকে তিনি একই কাজ হিসেবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। যেমন কোনো কোনো ওয়াশিং মেশিন কাপড় ধোয় এবং শুকায়ও। এই দুটি কাজকে আবার একটি কাজও বলা যায়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূলত ঐতিহ্যপ্রিয় আধুনিক মুসলিম। ঐতিহ্যকে ধারণ করে সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। একজন আধুনিক শিক্ষিত মননশীল মুসলিম হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁকে নিবিড় গবেষক বানিয়েছে। এবং গবেষণা তাকে ইতিহাসবিদ বানিয়েছে। মহান আলাহ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা এবং সর্বোত্তম পন্থায় জাতিকে খেদমত করার সুযোগ নিয়ে আলাহর ইচ্ছেকে বিজয়ী করার সতত আকাংখা ও পরিশ্রমের মধ্যেই তাঁর যাপিত জীবন। এ জীবন সুন্দর, এ জীবন স্বচ্ছ, এ জীবন পবিত্রময় এবং দেশ ও জাতির জন্য প্রেমময়ও।

সদ্য যৌবনে যখন তাঁকে দেখেছি তখনও ছিলেন দেশপ্রেমিক। দেশ ও জাতির কল্যাণে সত্তর দশকে আইউব বিরোধি মিছিলের অগ্রভাগে যেমন তিনি ছিলেন, তেমনি দেখেছি দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে বিশাল মিছিলের অগ্রভাগে এবং ৭ই নবেম্বরের সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে সারা দিনমান বক্তৃতা করতে। একজন সাহসী যথার্থ দেশপ্রেমিকের প্রতীক হলেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। আমি এখনও বিশ্বাস করি, খোদা না করুন, দেশ যদি বহি:শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বিবেচনায় আসবে না সমাজে তাঁর অবস্থান এখন কোথায়। তিনি ঠিকই ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর মোকাবেলায়। এবং জীবন দিয়েই প্রমাণ করবেন তিনি একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক।

দেশপ্রেমিক হিসেবে মাতৃভূমির গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে তিনি অনেকগুলো বই রচনা করেছেন। নামের ফিরিস্তি দিয়ে নিবন্ধের পরিসরকে দীর্ঘ করতে চাই না। তবে একটা বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো, শিশু সাহিত্যিক না হয়েও শিশু কিশোরদের জন্য তিনি বই লিখেছেন। বইগুলো সমাদৃতও হয়েছে। সে সব বইতে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ফুল, পাখি, লতা-পাতা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা তথা বাংলাদেশের অপার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সম্পদ ও

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের কথা। উঠে এসেছে অনার্য বাঙালীদের হাজার বছরের জীবন-যৌবন, শৌর্য-বীর্যের কথা। উঠে এসেছে বাংলাদেশের মমতাময় আচার-আচরণ, চাল-চলন, তথা বহমান জীবনাচরণের কথা। বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত শক্তি ও অমিত সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে তার কলমে। দেশকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক না হলে মননশীল কলমে ঐভাবে সৃজনশীল লেখা বের হয়ে আসতো না।

অনেকে নানা কারণে লেখেন। কিন্তু আবদুল মান্নানের লেখা পড়লে প্রতি ছত্রে ছত্রে দেশপ্রেমিক সুলভ এক মহান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই। তাঁর লেখা ও গ্রন্থরাজি নিয়ে আমি বেশী কিছু লিখলাম না। কারণ আমি জানি এসব নিয়ে আমাদের অনেক বন্ধু লিখবেন। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় 'আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ও 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'র জন্য তিনি অনেকটা কাল স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

যেমন লিখতে পারেন, তেমনি বলতেও পারেন। গুছিয়ে গুছিয়ে এমন সুন্দরভাবে বলেন যে, মনে হয় যেনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল প্রফেসর। আমি নিজে তাঁর একজন মুগ্ধ শ্রোতা। একটু দীর্ঘ হলেও যে কোন বিষয়কে তিনি সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। সকল বক্তা সকল স্তরে বলতে পারবেন এমন কোন কথা নেই। কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মসজিদের খুৎবা যেমন দিতে পারেন, তেমনি সেমিনারে, আলোচনা সভা, জনসভা, পথসভা, গোলটেবিল তথা সব ধরনের সভায় তিনি বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত। প্রফেশনের কারণে বর্তমানে হয়তো পথসভা ও জনসভায় বক্তৃতা করছেন না, কিন্তু প্রয়োজন হলে করবেন না, এমনটি নয়।

সংগঠক হিসেবে তার একটা পরিচিতি আছে। বহু সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু ঠিক স্ব-উদ্যোগে কোন সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন কি না আমার জানা নেই। ষাটের দশকের শেষভাগে 'জাতীয় যুব সংঘ' এবং ৭৫ সালে 'ইয়ংমেনস মুসলিম এসোসিয়েশন' নামে দুটি সংগঠনের তিনি কর্ণধার ছিলেন। এখনও কবি গোলাম মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন ও জাতীয় নাগরিক ফোরামের কর্ণধার ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এসব সংগঠন তাঁর একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি। এসব তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের কর্পোরেট ভাবনার ফসল। সাংগঠনিক যোগ্যতা থাকার কারণেই তাঁকে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বানানো হয়েছে। সাংবাদিকতা ও ব্যাংকিং-এর মতো অনির্দিষ্ট সময়ের অহর্নিশ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে বড়ো সংগঠক হতে পারেন নি। ঘন্টা মাপা একটু হালকা মানের প্রফেশনাল হলে তিনি অবশ্যই বড় সংগঠক হতেন। বড় সংগঠকের সকল যোগ্যতা তাঁর আছে। ব্যাংকের মত শত ব্যস্ততা ও লেখালেখি সত্ত্বেও সাংগঠনিক কাজে তিনি এখনও সময় দেন। তার সাংগঠনিক পরামর্শের কারণে তাঁর পরিমণ্ডলে অনেক সংগঠন বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। তাঁর চিন্তা, মনন ও পরিশ্রমে মাঝে মধ্যেই ঝলসে ওঠেছে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ, নাট্য মঞ্চ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, আলমানার অডিও ভিজিউয়াল সেন্টার, ফুলকুঁড়ি আসর, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ও সিএনসি।

একবার ব্যবসায়ীও হতে চেয়েছিলেন। বাবুর হাটে কাপড়ের দোকান দিয়েছিলেন। এটা তাদের পারিবারিক ব্যবসা। মনে করেছিলেন রক্তে ব্যবসায়ের অনুকণা আছে। হয়তো পেরে উঠবেন। কিন্তু পারেন নি। ছোট ভাইদের হাতে ব্যবসা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক জীবন মাত্র ক'সপ্তাহের। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন।

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মরহুম শাহ আবদুল হালিমের সাথে 'বাংলাদেশ লেবার কেসেস' নামে একটি মাসিক ইংরেজি পত্রিকায়ও বেশ কিছু দিন কাজ করেছেন। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ইংরেজী জানার বেইজটা এখানেই শক্তভাবে গড়ে উঠেছিল। শাহ আবদুল হালিম সাহেব আবদুল মান্নানকে ভালবাসতেন আবার সমীহ করতেন। অল্পদিনেই আবদুল মান্নান 'লেবার কেসেসের' বিষয়টি রপ্ত করতে পেরেছিলেন বলে শাহ আবদুল হালিম যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন। এখানে আইন-কানুনের বই নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে আবদুল মান্নান মোটামুটিভাবে আইনজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। আইনের ভাষাও তিনি আয়ত্ত করছিলেন। প্রফেশনাল লাইফে এসব তাঁর বিপুলভাবে কাজে লেগেছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জনপ্রিয়তা দেশে আঁচ করতে না পারলেও বিদেশে আঁচ করেছি। তিনি প্রায় পাঁচ বছর মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

২০০০ সনে তাঁর প্রবাস জীবন শেষ হয়েছিল। ঠিক সে সময়ই তাঁর ও দৈনিক সত্যের আলো সম্পাদক বন্ধুবর মুহম্মদ শরীফ হুসাইনের উদ্যোগে সউদী আরবে আমার প্রবাস জীবন শুরু হয়। এ সময় দু পর্বে একসাথে আমরা কিছুদিন কাটিয়েছি। প্রথমবার আমি রিয়াদে তাঁর মেহমান হয়েছিলাম এবং দ্বিতীয়বার তিনি ক'দিনের জন্য সৌদি আরবে গিয়ে আমার মেহমান হয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর যে জনপ্রিয়তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা ভোলার নয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন। তারা তাঁকে স্বজন-পরিজন হিসেবে ভক্তি, সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর সুনাম ছাড়া কোন দুর্নাম ছিলো না। বলতে দ্বিধা নেই, আবদুল মান্নানের বন্ধু হিসেবে সারা সৌদি আরবে আমিও যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছি। অনেকেই মনে করেন, আবদুল মান্নানের স্বভাব, আচরণ, ব্যবহার ও পরিশ্রমের কারণেই ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স অনেক গুণ বেড়েছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কাছে জীবনের জন্য আমার একটা বড় ঋণ রয়েছে। সে ঋণ কোন দিন পরিশোধ হওয়ার নয়। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৯৯ সনে আমরা একসাথে হজ্জ সমাপন করি। এটা ছিল আমাদের এক সময়ের শপথ। ইচ্ছা ছিল, আমার উদ্যোগেই এই শপথ পূরণ করবো, কিন্তু দেখা গেল উদ্যোগটা নিলেন তিনিই। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও তাঁর কাছে আমি হেরে গেলাম।

একটা শপথ অবশ্য তিনি এখনও পূরণ করতে পারেন নি, তা হলো সাংবাদিকতায় লেগে থাকা। আমি যেনতেন প্রকারে হলেও এ শপথ পূরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এ কারণে দেশ ও জাতির তেমন কিছু একটা হের-ফের হয় নি। তিনি লেগে থাকলে বা ফিরে আসলে এ ক্ষেত্রে যে একটা নবতরঙ্গ সৃষ্টি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মৌচাকে ম্যানেজার থাকাকালে এগারো-বারো জন সাংবাদিককে বাড়ি করার জন্য তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন। বেশ রিস্ক নিয়েই তিনি বিনিয়োগ করেছেন। না করলে এঁদের অনেকেরই হয়তো বাড়ি হতো না। কারণ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স থেকে তারা ঋণ গ্রহণ করতেন না। ১৯৭৮-৭৯ সালে আবদুল মান্নানসহ আমরা চার-পাঁচ বন্ধু মিলে সাভারে প্রায় দু'শ বিঘা জমি বরাদ্দ-বন্টন করেছিলাম। একটা কো-অপারেটিভ করে তার নাম দিয়েছিলাম "দিগন্ত হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইট লি:"। এর সভাপতি ছিলেন তথ্য উপদেষ্টা আকবর কবীর। মূলত: বিসিএস (তথ্য) সমিতির উদ্যোগেই এসব জমি সংগ্রহ করা হয়। আমার সহকর্মী মরহুম সৈয়দ জিনাত আলী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। সে সময়ও লক্ষ্য করেছি সাংবাদিক ও সাহিত্যিকসহ ছা-পোষা মানুষদের তিনি সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। কাজটি করার সময় তিনি জল বসন্তে আক্রান্ত হন। সে সময় তিনি বার বার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এ-যেন বাদ না যায়, ও যেন বাদ না যায় ইত্যাদি। এখনও মাঝে মাঝে সে সব কথা আমার কানে বাজে।

সাংসারিক জীবনে আবদুল মান্নান অত্যন্ত সুখী মানুষ। তিন মেয়ে, দুই জামাই এক নাতিন এবং জীবন সঙ্গিনী নিয়ে তাঁর সংসার জগত। এ জগতে আবদুল মান্নান শ্রদ্ধা, ভক্তি, মমতা ও ভালবাসার পাত্র। রিয়াদে বসে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন ঃ 'আপনজন ও পরিজনদের কাছে আমি একজন সফল মানুষ। তাঁদের একশতভাগ বিশ্বাসঃ আমি হালাল রুজি করি, আমি অসত্য কথা বলি না, আমি অপব্যয় করি না, সংসারের প্রতি আমার অকুণ্ঠ দরদ আছে। তারা বিশ্বাস করে, আমি আমার সাধ্যমত তাদের দেখা-শুনা করি। আমার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। তারা হর-হামেশা আমার জন্য দোয়া করে, আমার জন্য গর্ব করে। আমাকে ঘিরেই আমার পরিবারের সকল জল্পনা ও কল্পনা। আমাকে পেয়ে তারা সন্তুষ্ট, আমিও তাদেরকে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

আবদুল মান্নান কী কারণে সেদিন আমাকে এসব কথা বলছিলেন, আমার জানা নেই। আজ উপলব্ধি করি তাঁর সফলতার পেছনে এটাও বোধ হয় একটা বড় কারণ। আমার জানা মতে, তাঁর বাবা-মাও তাঁর ওপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনজনরা সবাই যাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তাঁর ওপর মহান আলাহ তায়ালা কী সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন?

আবদুল মান্নানের সংগে বহুকাল ধরেই আমার দেখা-সাক্ষাত বা যোগাযোগ হয় মাঝে মাঝে, বেশ বিরতিতে। তিনি আমার ওপর বিতশ্রদ্ধ। কেন আমি সরকারী চাকুরী ছেড়ে নিজের জীবনকে তছনছ করলাম, কেন আমি শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেয়ে ঋণগ্রস্ত হলাম! তাঁর মতো আমার পরিবার-পরিজনদেরও একই

www.pathagar.com

অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের চার্জশিটতো দাখিল করার মত নয়। সবই নিয়তি। আর তা ছাড়া প্যান করে তো আমি সরকারী চাকরিতেও যাইনি। গিয়েছিলাম একজন মহান মানুষের কল্যাণময় হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। ব্যবসায় তো ছিলামই। বৃহদাকারের শিল্প-বাণিজ্যে এসেছিলাম আরেকজন স্বপ্নচারী মহৎ মানুষের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। যাই হোক, একজন এ্যামেচারের স্বাধীনতা ও সুখ-দুঃখকে একজন সফল প্রফেশনাল যে দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেন, আমার ক্ষেত্রেও সে ঘটনাটি ঘটেছে।

যৌবনকালের অনেক আনন্দ ও সুখ-স্মৃতি উত্তর-যৌবনে কষ্টের পাহাড় হয়ে দাঁড়ায়। সে কষ্ট প্রত্যেককে একাই উপভোগ করতে হয়। এখনও মায়াময় ভোরে, ক্লান্ত দুপুরে, রেশমী অপরাহ্নে, সুপ্তিময় সন্ধ্যায় বা নিথর রাতে যখন একা কাজ করি তখন কখনও কখনও জীবন সঙ্গীনীর আশ-পাশে আমার এককালের সাথী-বন্ধু মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মুখও ভেসে ওঠে। দেশ-বিদেশে যখন ভ্রমণে থাকি তখনও তাঁর অনুপস্থিতি পলে পলে অনুভব করি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যখন বেহাল হয়ে পড়ি, তখনও তাঁর প্রয়োজন তীব্রভাবে উপলব্ধি করি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁকে আর এসব জানাই না। কেন না, জানি যে, জানিয়ে কোন ফল হবে না। তিনি এখন অন্য কোন খানে অন্য কিছুতে ব্যস্ত।

লেখক : সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক-দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

মান্নান সাহেবের ঘর-সংসার

মাকসুদা বেগম

১৯৭৮-৭৯ সালের কথা। ভার্সিটি থেকে বড়পা'র বাসায় গেছি। বড়পা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, স্বামী হিসাবে কেমন মানুষ পছন্দ তোর? অনেকেই কিন্তু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে!' মনে মনে খুশী হলাম। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আমি। আমার পছন্দের কি কোন দাম আছে? দ্বিধা ঝেড়ে সাথে সাথে বললাম ঃ 'অবশ্যই চাকুরিজীবী। আমার স্বামীর অঢেল টাকা-পয়সার দরকার নেই। তবে একটা সুন্দর গাড়ী থাকবে। সারাদিনের কাজ শেষে বিকালে অফিস-ফেরত স্বামীকে নিয়ে লং ড্রাইভে বের হবো।' যেমন বয়স তেমন চিন্তা। একদম টিভি-নাটক আর কি!

১৯৮০ সালে সাংবাদিক স্বামীর ঘরে এসে গাড়ি ঠিকই পেলাম। তবে সেটা ছিল পঞ্চাশ সিসি হোন্ডা। সে গাড়িতে চড়ে আমি ঘুরে বেড়াইনি। তবে স্বপ্নাহতও নই। কারণ ছিল অন্যখানে। বিকালে ঠিক বেড়াতে বের হওয়ার সময়টাতে আমার স্বামী কাগজপত্র গুছিয়ে পত্রিকা অফিসে ছুটতেন। সারাদিনের যোগাড় করা খবর প্রকাশ করার তাগিদে। অনেক রাতে যখন ঘরে ফিরতেন, আমরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

বেড়াতে যে আমরা একদম বেরুতাম না, তা নয়। সরকারী ছুটির দিন আর সাংবাদিকের 'অফ ডে' এক নয়। তার সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিতে আমরা দল বেঁধে এনজয় করতাম মাঝে-মধ্যে। গ্রীন রোডে আমাদের টিনের বাড়ীর সামনে প্রশস্ত সবুজ লন। সেখানে আমাদের ঢাকার আত্মীয়-স্বজনরা মাঝে-মধ্যে একত্রিত হতেন। মান্নান সাহেব কদাচিৎ যোগ দিতে পারতেন সে-সব অনুষ্ঠানে। তিনি কখনো দাওয়াত খেতে যেতেন রাত একটায় অফিস শেষ করার পর! ছুটির দিনেও বাইরে তার নানা রকম কমিটমেন্ট থাকতো।

সাংবাদিকের বউ হিসাবে কেটেছে আমার বিবাহিত জীবনের তিন বছর। এখনও আমি সেসব দিন-রাত্রির কথা আমার মেয়েদের শোনাই। আমার মেয়েরা ভাবতেই পারে না ওদের এই ভারিক্কী বাবা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মোটর সাইকেলে চড়ে ঢাকা শহরের এধার-ওধার চষে বেড়িয়েছেন। কি উচ্ছলতা ছিল সেই দিনগুলিতে। রাতে এসে কখনো হয়তো বলতেন, 'জানো, আজ অফিসে তোমার দেয়া এ গেঞ্জিটার দাম দিতে হয়েছে বেতনের কিছু অংশ।' মানে! Chief সাহেবের Cheap বেতনের একটা অংশ যদি কর্তন হয়ে যায়.....।' তিনি বর্ণনা করতেন সাংবাদিক বন্ধুদের বায়নার কথা। ঢুকামাত্রই ওরা সব না-কি হৈ চৈ করে উঠেছিলো ঃ 'মান্নান ভাই, আপনার গেঞ্জিটা জোস! আজ খাওয়াতেই হবে।'

এ ধরনের ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক। তিনি সুন্দর করে তার সহকর্মীদের বর্ণনা দিতেন। আমি হেসে খুন হতাম। সাংবাদিকতা পেশায় কাঁড়ি কাঁড়ি নগদ কড়ি ছিল না। কিন্তু সেখানে নিত্য প্রাণের সম্ভার ছিল। সাংবাদিক জীবনের কত খুঁটি-নাটি ঘটনা, কত হাসি-আনন্দের ভাগীদার আমি। ভাবতেই মনটা ভরে যায়।

তরুণ সাংবাদিকরা দল বেঁধে মাঝে-মধ্যে হানা দিতেন আমাদের বাসায়। আজাদ-বাবর-মঞ্জু-আজম-ফারুক ভাইদের জন্য আমাদের ঘরের আঙিনা কখনো অপ্রশস্ত ছিল না। সময়ে-অসময়ে তাদের দাবি আর আবদার সমান উপভোগ করতাম। যেমন, একদিন খুব সকালে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ভাই বায়না ধরলেন, আমাদের বাসায় নাস্তা খাবেন। বাসায় কিছুটা সমস্যা ছিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। সাত সকালে এ অবস্থায় হঠাৎ মেহমান নিয়ে আসতে চাননি মান্নান সাহেবও। বললেন, বাসায় কাজের মেয়েটার জ্বর...। কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু ভাই বললেন, 'চলুন একটার জায়গায় দু'টা প্যারাসিটামল খাওয়াবো, দেখবেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে যাবে।' এর পর আর কি করা! সেদিন অনেক নাস্তা দিয়েছিলাম টেবিলে। এমনি সব মজার ঘটনা প্রায়ই ঘটতো।

বড় উপভোগ্য ছিল আমাদের সেই সব দিন-রাত্রি। এখন যারা জাঁদরেল সব সাংবাদিক, কত সহজ ছিল তাদের সেই জীবন। কত আনন্দ-ফুর্তি নিয়ে কাজ করতেন তারা। এখনও নিশ্চয়ই করেন। তবে

www.pathagar.com

তার অনেক কিছুই এখন আর আগের মতো টের পাই না আমি। এখনকার মান্নান সাহেব আর তখনকার সাংবাদিক মান্নান সাহেব, খুব কি বদলেছেন?
সাংবাদিকতা পেশার ঝুঁকির সাথেও আমি মাঝে-মধ্যে পরিচিত হয়েছি।

১৯৮০ সালের ২৩ মে। খন্দকার মোশতাকের জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ও সাপ ছেড়ে দেয়ার ঘটনা।... এখনও মনে হলে গা শিউরে ওঠে। আমি ছিলাম দাদীর কাছে গ্রীনরোডের বাসায়। সন্ধ্যার পরে খবরটা যখন পৌঁছলো তখন আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তখন তো এখনকার মতো মোবাইল ফোনের সুযোগ ছিল না। মান্নান সাহেবের সাথে ফোনে যোগাযোগ হলো বেশ কিছুক্ষণ পর। তিনি ফোনে খুবই সহজভাবে কথা বললেন। যেন কিছুই হয়নি। নিজেরটা বাদ দিয়ে অন্যদের কথাই বেশী বললেন। আর আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'সকালে গ্রীনরোডে দেখা হবে'।

২৪ মে সকালে পায়ে স্পিন্টারের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তিনি আমাদের বাসায় এলেন নিজে মোটর সাইকেল চালিয়ে। আমি তো হতভম্ব। পরে শুনেছিলাম সারাপথ গাড়ি চালিয়ে এসেছে আমার ছোট দেবর হালিম। বাসার কাছে এসে মান্নান সাহেব চালকের আসনে বসেছেন। কারণ আমি তখন আমাদের বড় মেয়ে নিতুর মা হতে চলেছি। তখন আমার স্বস্তির দরকার, সাহস দরকার। অথচ সেদিনের পত্র-পত্রিকায় আহতদের মধ্যে তার নাম আর ছবি ছাপা হয়েছে। ভেবে অবাক হয়েছি, কেমন করে সম্ভব এসব।

১৯৮০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে তার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পর পরীক্ষা যায় পিছিয়ে। এখন বিয়ের তারিখ পিছানোর কথা ওঠে। মান্নান সাহেব না-কি সবাইকে আশ্বস্ত করেন, পরীক্ষার কারণে বিয়ে পিছানোর দরকার নেই। ...বিয়ের এক সপ্তাহ পর পরীক্ষা শুরু হয়। মান্নান সাহেব আমাকে বললেন, জীবনে কোন পরীক্ষায় 'ফেল' করিনি। এবার 'ফেল' করলে সব দোষ তোমার হবে। কাজেই যতক্ষণ পরীক্ষা দেব, জায়নামাজে বসে দোয়া করতে থাক। দোয়া তো বাধ্য না হলেও করতাম। এখন বাধ্য হলাম। তিনি এ পরীক্ষায় প্রথম হন। এটাই না-কি তার জীবনের সবচে ভালো রেজাল্ট। আর এর কেরামতি সব না-কি আমার। এ যে ঝড় ছাড়া বক মরার ঘটনা!

নানা দিক থেকেই ১৯৮০ সাল আমাদের জীবনে ঘটনাবহুল বছর। ১৯৮০ সালের ২৭ নভেম্বর আমাদের বড় মেয়ের জন্ম হয়। এ বছরই মান্নান সাহেব সারা দেশের সাংবাদিকদের ভোটে বিএফইউজের সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হন।

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে উলনের ছোট্ট একটা বাসায় শুরু হয় আমাদের আলাদা সংসার। ছোট্ট একটা টিনশেড বাসা। যার সামনে ছিল বেশ প্রশস্ত খোলা জায়গা। এখনকার তুলনায় মাঠই বলতে হয়। লাগিয়েছিলাম পুঁই, ঢেঁড়স। কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে দিয়েছিলেন মান্নান সাহেব। আমার শ্বশুর, যাঁকে আমি 'বাবা' ডাকতাম, আর তিনি আমাকে ডাকতেন 'মা', তিনি ছিলেন আমার পিতা ও সন্তান দুই-ই। তাঁর সাথি ছোট্ট নিতু। আর আমরা দু'জন। চারজনের সেই সংসারে প্রায়ই আমরা বিকালে চা খেতাম আর উপভোগ করতাম সবজী বাগানের পাশে লাগানো কলাবতী আর দোলনচাঁপার সৌন্দর্য। আমি প্রায়ই নতুন নতুন ফুলের গাছ নিয়ে আসতাম কার্জন হলের মালীকে দু'চারটা পয়সা দিয়ে।

এখন আমাদের দক্ষিণমুখী এপার্টমেন্ট। বাতাসে ভরপুর বারান্দা। ফুলের টবে গাছ লাগালেই তরতরিয়ে বেড়ে উঠবে। কিন্তু সময়ের বড় অভাব। গাছের যত্ন নেয়ার চেয়ে মান্নান সাহেব এখন মানুষের যত্ন নিচ্ছেন। নানা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিল্প-কারখানা আর সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির যত্ন নিচ্ছেন। চেষ্টা করছেন গোটা দেশ জুড়ে অন্যরকম ফুল-ফল শোভিত বাগান রচনা করতে।

১৯৮৩ সালে মান্নান সাহেব হলেন ব্যাংকার। ব্যাংকার মানে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা। সাংবাদিকের বউ থেকে হয়ে গেলাম ব্যাংকারের বউ। খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, মান্নান সাহেবের অফিসের এখন একটা নির্দিষ্ট সময়সূচী থাকবে। সরকারী ছুটির দিন থাকবে। বিকালে অফিস থেকে ফিরার পর সবটুকু সময় আমাদের হবে। কিন্তু এ ভুল ভাঙলো তার ব্যাংকে যোগদানের সাথে সাথে। আগে কখনো দিনের একটা অংশ তাকে বাসায় পাওয়া যেতো। এখন

www.pathagar.com

সাত সকালে অফিসে যান। ফিরেন রাত এগারোটা-বারোটায়। বলেন, 'সম্পূর্ণ নতুন ব্যাংক। নতুন ধ্যান-ধারণার ব্যাংক। আমাদের শত বছরের স্বপ্নের এ ব্যাংক। এ ব্যাংকের সাথে আম-জনতাকে পরিচিত করার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর। কিছুদিন একটু বেশী কষ্ট করতে হবে। তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

তার কাজের সুবিধার জন্য আমাদের বাসা বদল করা হলো। উলন থেকে আমরা গেলাম আরামবাগে একটি দু'রুমের বাসায়। চার তলায় বাসা। বারান্দা থেকে তার অফিস দেখা যেতো। কিন্তু তাকে দেখা যেতো না। কখনো সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটায় অফিসে পৌঁছতেন। নিজেই টেবিল-চেয়ার ঝাড়া-মোছা করে কাজে লেগে যেতেন। গভীর রাতে বাসায় ফিরে শোয়ার পর আবার হঠাৎ কখনো বিছানা ছেড়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসতেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'অফিসের কাজের কিছু জরুরী বিষয় মনে পড়েছে, নোট করে রাখলাম।' সে সময় তিনি 'ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন' নামে একটি বই সম্পাদনা করার কাজ নিয়ে কয়েক রাত ঘুমাননি। অনুবাদটি সকলের বোধগম্য করার জন্যই তিনি তা করেন। এ ধরনের অবস্থা চলে ইসলামী ব্যাংকে তার যোগদানের পর পুরো একটি বছর বা তারচে' বেশী।

ইসলামী ব্যাংকে তিনি এতো কি কাজ করেন? মাঝে-মধ্যে এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম। জানতে চাইতাম, সবাই কি তোমার মতো একইভাবে দিন-রাত পরিশ্রম করেন। বলতেন, 'আমি তো বেতন পাই। অনেকে বিনা বেতনে এরচে' বেশী পরিশ্রম করেন।' তিনি প্রায়ই আমাকে সে দিনগুলোতে ইউনুছ ভাইয়ের গল্প শুনাতেন। জনাব আবদুর রাজ্জাক লশকর, আলহাজ্জ মফিজুর রহমান সাহেব, রশীদ চৌধুরী ভাই কিংবা আযীযুল হক স্যারের কথা বলতেন। আগে সাংবাদিক মান্নান সাহেবের কাছে নায়ক ছিলেন সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন। এখন জনাব আযীযুল হক নতুন নায়ক। নতুন হিরো। মান্নান সাহেবের কাছে শুনে শুনে এসব লোককে তখন আমিও ভালোবেসে ফেলেছি।

আমার এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মান্নান সাহেব আমাকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর একটি ট্রেনিং-এ অংশ নিতে বাধ্য করলেন। বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের (বিবা) পক্ষ থেকে তখন নিয়মিত ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হতো। মান্নান সাহেব এ কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তারা বিভিন্ন ব্যাংকের মহিলা কর্মকর্তাদের জন্যও সে সময় একটি কোর্সের আয়োজন করেন। পুরানা পল্টনে জনতা ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পাঁচ সপ্তার সে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সেই ওরিয়েন্টেশন কোর্সে মান্নান সাহেব আমাকে ঢুকিয়ে দেন। আমি ছাড়া আরো একজন নন-ব্যাংকার ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার সাহেবের স্ত্রী। আমরা প্রথমে বাধ্য হয়ে, পরে উৎসাহের সাথে সে প্রোগ্রামে যোগ দেই। সেখানে জনাব এম. খালেদ, আযীযুল হক স্যার ও শাহ আবদুল হান্নান সাহেবসহ অনেক গুণীব্যক্তির আলোচনা থেকে আমরা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। সে কোর্সে অংশ নেয়ার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে মান্নান সাহেবের দিন-রাত ব্যস্ত থাকার কারণ বোঝার কিছুটা সামর্থ্য অর্জন করি।

আমার সংসার জীবনে সবচে' শোকাবহ ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৪ সালের ৪ ডিসেম্বর। এ দিন সন্ধ্যায় আমার শ্বশুর ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাঝেই আমি আমার হারিয়ে যাওয়া পিতাকে ফিরে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে বাবা ডাকতাম। আর তিনি আমাকে মা ছাড়া অন্য কোনভাবে কোনদিন সম্বোধন করেননি। তাঁর কাছে জীবনে যে আদর-ভালোবাসা আর সহানুভূতি আমি পেয়েছি তার কোন তুলনা করা যাবে না। আমি তাঁকে মান্য করতাম। তাঁকে আদর করতাম। তাঁকে শাসন করতাম। তিনি নাশতার টেবিলে, দুপুরের খাওয়ার টেবিলে কিংবা বিকালের চায়ের আড্ডায় আমার সাথি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমার জীবনের অনেকখানি অংশ শূন্যতায় ভরে দেয়। আর আমাদের নিতু হারায় তার সবচে' প্রিয় বন্ধুকে।

মান্নান সাহেব ১৯৮৭ সালে এসপিও হওয়ার পর আমরা আবার বাসা বদল করি। পুরানা পল্টন লাইনে আমাদের নতুন বাসাটিকে সবাই বলতেন স্বপ্নপুরি। পাঁচ তলার বিরাট বাড়ির ছাদের অর্ধেকটা নিয়ে আমাদের বাসা। বাকিটা খোলা ছাদ। চাঁদনী রাতে সে ছাদে মাঝে-মধ্যে গল্পের আসর বা সাহিত্যের আড্ডা জমে উঠতো। কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের অনেকের আনাগোনা ছিল সে বাসায়।

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালে মান্নান সাহেব জনসংযোগ থেকে গেলেন ব্যাংকিং-এর মূল স্রোতে। বছর শেষ হবার আগেই তাকে ম্যানেজার করে পাঠানো হয় যশোরে। সেখানে তাকে একটি নতুন শাখা খুলতে হবে। যশোরের বিরাট বড় সেই সুন্দর বাসায় যখন দু'মেয়েসহ প্রথম পা রাখলাম, তার চেহারাটা ছিল অপরাধীর মত। তার বদলীর কারণেই আমাদেরকে ঢাকা ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমাদের কষ্ট হয়নি, তবে দুশ্চিন্তা ছিল। জন্ম ঢাকায়, সব আত্মীয়-স্বজন ঢাকায়। একান্ত কাছের মানুষগুলো ঢাকায় রেখে যশোরে কিভাবে থাকবো আমরা।

আমার শাশুড়ী যথেষ্ট সমঝদার, সমাজ সচেতন, কল্যাণব্রতী আর ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন বেজায় সাহসী। তারপরও তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মা গো। আমার ছেলেকে যারা ট্রান্সফার করলো সেই লোকেদের কি মা নেই!' মা'কে বুঝিয়েছি এটাই নিয়ম মা। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।' মুখে বোল ফোটার আগেই আমার মা চলে গেছেন পরপারে। বিয়ের পর থেকে তাঁকে মা সম্বোধন করেই মা ডাকার প্রশান্তি পেয়েছি আমি।

আমি নিজেও খুব বিব্রত। জীবনে কখনো আরিচা পার হইনি। আলাহই জানেন অজানা পরিবেশে কেমন করে চলবো। কিন্তু আমরা যশোর পৌঁছার আগেই মান্নান সাহেব সব কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখেন। যশোরে আমাদের অভ্যর্থনা ছিল চমৎকার আন্তরিকতাপূর্ণ। তিনি যেখানে যান, মনে হয় সেখানে তার চেনা-জানা লোকের কোন অভাব নেই। শুধু কি তাই? বাড়ী থেকে বের হয়ে গেটের সামনেই দেখতাম রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। কি কারণ? রিক্সাওয়ালা বলতো, 'ম্যানেজার সাহেব এত ভালো মানুষ! আমার একটা একাউন্ট করে দিয়েছেন। এ পথ দিয়ে চলাফেরা করলেই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি! যদি আপনারা বের হন।' হতভম্ব আমি!

দু'বছরের কম সময় যশোরে ছিলাম। এর মধ্যেই যশোর আমাদেরকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলো। মাঝে-মধ্যে যেন ভুলেই যেতাম আমি ঢাকার মেয়ে। ঢাকা ফিরে আসার সময় একেকটা পরিবার থেকে যে অভিব্যক্তি পাই তাতে মনে হয় তাদের নাড়ি ছিঁড়ে চলে আসছি আমরা। মুস্তানুর রহমান সাহেব বা মহসিন আলী সাহেবদের পরিবার, কারবালার 'হক মহলে'র মনুজান খালাম্মা। আরো কত পরিবারের সাথে সম্বন্ধসূত্রে আটকে গেছি আমরা। কাকে রেখে কার কথা বলবো?

যশোরের পর মৌচাক। মগবাজারের ডাক্তারের গলি। রাজনৈতিক নেত্রী আমেনা বেগমের বাড়ি। সেখানে আমাদের নতুন বাসা ও তার পাশে বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর অফিস। কবি-সাহিত্যিকদের চমৎকার এক মিলন মেলা। তার পর গ্রীনরোডে আমাদের দিন-রাত। সৌদি আরবে মান্নান সাহেবের প্রবাস জীবন। ...তারপরও বিরামহীন পথ চলা। দিন যায়, দায়িত্ব বাড়ে...। কিন্তু ক্লান্তি নেই তার। হাসিমুখে যে সব দুঃখ-বেদনা ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে দেয় তাকে আর বাঁধবে কে? স্পষ্টতই মান্নান সাহেবের কাঁধে এখন বড় দায়িত্ব। ...সাংবাদিক মানুষ ব্যাংকার হয়ে কাজ করছেন সকাল থেকে গভীর রাত অবধি। ছুটে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। পৃথিবীর এধার থেকে ওধার। এতটুকু ক্লান্তি নেই তার। নেই কোন বিরক্তির চিহ্ন। পাছে আমরা বিচলিত হই, এই ভেবে রাত এগারোটায় ঘরে ফিরলেও মুখে হাসির রেখাটা ধরে রাখতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি ঃ 'কেমন মানুষ তুমি, ক্লান্তি নেই তোমার?' কখনো প্রশ্ন এড়িয়ে যান। কখনো সুন্দর করে হেসে জবাব দেন, 'বিশ্বাস করো, আমার মনে হয় আলাহ আমাকে একটা অনেক বড় মিশন দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমাকে এ মিশনে সাকসেসফুল হতেই হবে।'

চেহারায় মাত্রাতিরিক্তি ক্লান্তির ছাপ দেখে মাঝে-মাঝে পরিবারের সবাই মিলে হৈ চৈ করি। তখন হেসেই উড়িয়ে দেন তিনি। সবাইকে বোঝাতে থাকেন, 'সময় কাজে লাগাতে হবে। অনেক কাজ করতে হবে। কাজ করার কারণে আলাহ যদি আমার ভাগ্যে অসুস্থতা রেখে থাকেন তো তোমার-আমার কিছুই করার নেই। ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা তো যাবে না।' তার এক কথা, 'সময়কে মূল্য দিতে হবে। সময় কাজে লাগাতে হবে।' তার আরেকটা যুক্তি হলো, 'এ পৃথিবীতে ভালো আর বড় কাজ করার সুযোগ ক'জন পায়? সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষের জন্য কিছু না কিছু করে যেতে হবে।'

মাঝরাতে ঘুমানোর অভ্যাস তার সেই সাংবাদিকতা জীবন থেকেই। সেই অভ্যাসটাই বোধ হয় বদলাতে পারেন না তিনি আজো। এখনও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখি পড়ার টেবিলে। বিশ্রামের জন্য

www.pathagar.com

তাগাদা দিতে হয় তাকে। এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। কেমন করে পারেন তিনি? ইচ্ছা করলেই তো কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারেন। কিন্তু না, তিনি যেন সম্পূর্ণ এক ধ্যানী জীবন বেছে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে তার তৎপরতায় আমিও উদ্বুদ্ধ হই। লেখার চেষ্টা করি। প্রস্তুতি নেই। নোট নেই। কিন্তু সেভাবে হয় না। ভাবি, আলাহর পথের এ বিরামহীন ট্রেনের গতির সাথে আমি তাল মেলাবো কেমন করে!

ছয়টি কর্মব্যস্ত দিনের পর আসে শুক্রবার। আজ তো বিশ্রামের দিন। অথচ তিনি এই একটি দিন বেশী সময় ব্যস্ত থাকেন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-সভা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা তার স্টাডিতে। বাসায় থাকলে দুপুরে একটু বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে নিলেই পারেন। কিন্তু না! সারাটা দিন কলম আর বই নিয়ে কি এক গভীর সাধনায় একাগ্র তিনি। এই লোকের হাতে কি করে বাজারের ব্যাগ তুলে দেই আমি। কি করে বলি, সামাজিকতা বলে কিছু আছে। মানুষের অসুখ-বিসুখ হয়। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। কিন্তু সেখানেও মনে হয়, এসব কিছুর উর্ধ্বে তিনি।

সংসার বিরাগী নন তিনি। আমাদের এই ছোট্ট সংসারের সব কিছুই আমাদের যৌথ প্রযোজনা কিংবা বলা যায় সম্মিলিত প্রণোদনার ফসল। বাসার ছোট-বড় ফার্নিচার, এমনকি ডাইনিং রুম, বেড রুমের ওয়াল পেইন্টিং নির্বাচনে আমরা তার পছন্দকে অগ্রাধিকার দেই। সময়ের অভাবে তিনি মার্কেটে যেতে পারেন না। তবে আমরা, মা-মেয়েরা জিনিস পছন্দ করে বর্ণনা দেই, তিনি বুঝে-শুনে আমাদেরকে সম্মতি দেন। কিংবা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। আমরা সেটা কিনে আনি। ঘরের বড় বড় জিনিস কিনতে অবশ্যই জোর করে ধরে নিয়ে যাই তাকে।

মেয়েরা বলে, আব্বুর পছন্দের কোন জুড়ি নেই। আর আমি বলি, তাদের আব্বুর পছন্দেই তাদের জীবন চলার সাথী নির্বাচিত হয়েছে। তারা কি সে কারণে তাদের আব্বুর ওপর খুশী, না-কি ওদের আব্বু আমার মতো মা-কে নির্বাচন করতে পেরেছেন বলে খুশী তারা? এ নিয়ে এখনও আমাদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা চলে। মান্নান সাহেবকে আমরা আমাদের সাথে পাই না, এ অভিযোগ যতটা সত্য, তারচে' বেশী সত্য হলো তিনি যতক্ষণ আমাদের সময় দেন, উজাড় করে দেন। হাসি-ঠাট্টা-গল্প-গুজবে ভরে ওঠে আমাদের আসর। তখন মনেই হয় না, এ মানুষটা অফিসে বা বাইরে সমাজের কঠিন কঠিন কাজ সেরে এইমাত্র ঘরে ফিরেছেন।

আমাদের আসরে এখন নতুন যোগ হয়েছে ফুলের আদলে আরেক অতিথি, নুয়াইমা। সে দিনের চব্বিশ ঘন্টায় হয়তো এক ঘন্টাও তার নানাকে পায় না। কিন্তু যে সময়টুকু পায়, সবাইকে ছেড়ে ছুঁড়ে যেভাবে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে দৃশ্য দেখার মত। এখানেই মান্নান সাহেবের সার্থকতা। বাসার ছোট্ট কাজের মেয়েটির ধারণা, খালু কত ভালো আর কাজপাগল মানুষ। অথচ খালাম্মা দুপুরে খাবার জন্য তাকে কত অল্প পরিমাণ ভাত আর কত সাধারণ তরকারি অফিসে পাঠায়।

সকালে রমনা পার্কে হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত যাদের সাথে দেখা হয়, তারা ভাবেন, ভাই-ভাবীর তো পৃথিবীর কারো দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। আর আমি জানি, এই একঘন্টা সময়ই একান্ত আমার। এখন আমাকে সব কিছুর হিসাব-নিকেশ সারতে হবে। সব প্যান-প্রোগ্রাম জানাতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে। সব কিছু....। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে পার্কের বেঞ্চে বসি আমরা। সময় কাটাই, গল্প করি। ভালোই কেটে যায় আমাদের এই সব দিন-রাত্রি।

তারপরও মাঝে মাঝে রাগ করি। চাওয়া-পাওয়ার অংক করি। বলি ঃ 'জানো, সেদিন একজন বললো, স্যারের স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কটা বোধ হয় ভালো না। নয় তো স্যার এত রাত পর্যন্ত অফিসে থাকেন কি করে?'

মান্নান সাহেব আমার কথার জবাবে হেসে বলেন, 'দাওয়াত দিয়ে বাসায় খাইয়ে দাও। তখনই বুঝবে কেমন স্বর্গে বাস করি আমরা।'

মাঝে-মাঝে ভাবি, আসলেই তো স্বর্গে বাস করি আমরা।

মাকসুদা বেগম ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সহধর্মীনী

www.pathagar.com

আব্বুকে ভালোবাসি

মোহসিনা মাহমুদা ফেরদৌস (নিতু)

বিয়ের পর থেকেই প্রবাসী আমি। ফলে আব্বুর খুব কাছাকাছি থাকা হচ্ছে না। এ মুহূর্তে লিখতে বসে মনে পড়ছে হাজারো স্মৃতি। আর আমার বোনদেরকে খুব হিংসে হচ্ছে।

আম্মু-আব্বুর কাছে ছোটবেলার গল্প শুনতে শুনতে জেনেছি, আব্বু আমাকে মোটর সাইকেলে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যেতেন। শুরুটা ভালোই হতো। কিন্তু ফেরার পথে প্রায়ই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আমাকে জাগিয়ে রেখে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে তাঁকে বেশ কসরত করতে হতো।

মোটর সাইকেল চালানো সাংবাদিক আব্বুর গল্প শুধু মুখেই শোনা। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আব্বুকে দেখেছি ইসলামী ব্যাংকের পথে সকাল আটটায় ব্রিফকেস হাতে ছুটছেন। আর বাসায় ফিরছেন অনেক রাতে।

আমার আব্বু কাজ-পাগল মানুষ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তেমনি আমাদেরকেও সবসময় সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। এখনও মনে পড়ে যশোরে বি.এ.এফ. শাহীন স্কুলে যাওয়ার দীর্ঘ পথে আব্বু রিক্সাওয়ালাকে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছেন। আর ছোট্ট আমি বুঝতে পারছি না, আমার সাথে গল্প না করে আব্বু রিক্সাওয়ালার সাথে গল্প করছেন কেন?

এখনও যখন লন্ডনে আসেন, কখন আব্বুর একটু ফুরসত হবে আর আমি তাকে আমার লন্ডন-জীবনের গল্প শোনাব, সে অপেক্ষায় থাকি। ২০০৬ সালে আমার গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি অ্যাটেন্ড করার জন্য আব্বু লন্ডন এসে ক'দিন ছিলেন। আমাকে হাসিমুখে বললেন, 'আট তারিখে তোমার সেরেমনির পুরো দিনটা তোমার জন্য রাখলাম। রাতে অবশ্য আমার একটু কাজ আছে। কি খুশিতো!' আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। ক'দিনের জন্য ব্যক্তিগত সফরে লন্ডনে এসেও ব্যাংকের কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তিনি। আর ব্যাংকের কাজ নিয়ে কিছু বললেই আব্বু বলেন, 'এটি আসলে ইসলামেরই কাজ। এ কাজের জন্য ঘন্টামাপা কোন সময় নেই।' ফলে আমাদের বলার কিছু থাকে না। আমরাও বুঝি, আব্বু নিজের জন্য তো আমাদের বঞ্চিত করছেন না।

আব্বুর সাথে সম্পর্কটা আমাদের সব সময়ই বন্ধুর মতো। মনে পড়ে আমার লন্ডন যাওয়ার আগেকার দিনগুলোর কথা। সারাদিন আব্বুর জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম। কখন তিনি বাসায় ফিরবেন, আর আমরা তখন আমাদের সারাদিনের ফিরিস্তি শোনাব। খাবার টেবিলে বসে চলত হাসি-ঠাট্টা আর কথার ফুলঝুড়ি। কে আগে কার কথা শোনাব, এ নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। কারণ, আমাদের সকলেরই জানা, খাওয়া শেষ করেই আব্বু চলে যাবেন তাঁর লেখার টেবিলে। এরপর চলবে দু-তিন ঘন্টা একটানা পড়াশোনা আর লেখালেখির কাজ।

রাত বারোটা বাজলে আমরা আব্বুকে শুয়ে পড়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকি। আর আব্বুর তখন একটাই উত্তর, 'আর এক মিনিট'! এখনও মাঝে মাঝে লন্ডন থেকে বাসায় ফোনে কথা বলার সময় শুনতে পাই,

www.pathagar.com

মিতি আর মাহদিয়া আব্বুকে টেবিল থেকে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। আমিও সুদূর প্রবাস থেকে মাঝে মাঝে ফোনে সে চেষ্টায় যোগ দেই। দূরে থাকি বলে আমার কথা হয়তো ফেলতে পারবেন না, এই আশায়।

ছুটির দিনেও দেখেছি দুপুরের খাওয়ার পর আব্বু বই নিয়ে বসেছেন আর বই হাতেই চেয়ারে বসে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। বিছানায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার কথা সাজেস্ট করতেই সাথে সাথে তিনি একদম চাঙ্গা। আবার বই দাগিয়ে চলেছেন। বইতে যে আব্বুর কি অসম্ভব নেশা! মনে পড়ে, আব্বু বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর আমরা প্রায়ই তার ব্রিফ কেস চেক করতাম। আমাদের জন্য সে ব্যাগে চকলেট না থাকলেও তাতে দুই-একটা নতুন বই পাওয়া যাবে, তা ছিল নিশ্চিত।

আব্বু সৌদি আরব যাওয়ার পর আমার সবচে ছোটবোন মাহদিয়ার জন্য একবার সেখান থেকে কয়েকটা খেলনা পাঠিয়েছিলেন। আমি আর মিতি হতভম্ব। আব্বু খেলনাও কিনতে পারেন!

আমরা অনেক দিন ভাড়া বাসায় থেকেছি। বাসা বদলানোর সময়টাতে আব্বু ফার্নিচার প্যাক করার ব্যাপারে সাধারণত হাত লাগাতেন না। সে কাজ অন্যরাই সারতেন। আব্বু বাড়ির অন্যসব আসবাবপত্রের ব্যাপারে তেমন কিছু বলতেন না। কিন্তু মামাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিতেন, 'মনির ভাই, বইগুলো একটু আস্তে বাঁধবেন, দাগ যেন না পড়ে যায়। আর সব যায় যাক'। এই নিয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হাসাহাসি হতো।

আব্বু সবসময় আমাদেরকে লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। যে কোন ঘটনার ব্যাপারে কিংবা কোথাও থেকে ঘুরে এলেই বলতেন, ঘটনাটা নিয়ে দু'কলম লিখতে। অফিস থেকে ফিরে আবার দেখতে চাইতেন লেখাটা। এ ছাড়া প্রতিদিন বিশ্বে কি ঘটছে না ঘটছে এ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল আছি কিনা তা নিয়ে মাঝে-মধ্যে আমাদের জেরা করতেন। মনে পড়ে, আব্বুর ঘরে ফেরার সময় হলেই খবরের কাগজ নিয়ে আমার আর মিতির হুড়োহুড়ি লেগে যেত। অবশ্য এ ব্যাপারে আম্মুর সহযোগিতায় আমরা পার পেয়ে যেতাম। আম্মু খবরের কাগজ খুটিয়ে খুটিয়ে পড়তেন আর সন্ধ্যায় তা আমাদের সংক্ষেপে ব্রিফ করতেন। একে আমরা বলতাম 'আম্মুর নকল সাপাই' কর্মসূচী।

আব্বু সপ্তাহে এক দিন পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে বৈঠক করতেন বাসায়। সে বৈঠকে মাঝে মাঝে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করাতেন। কোরআন শরীফের তাফসীর করতে হতো। পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। পুরস্কারের লোভে আমাদের বাসার ও আশপাশের ভাইবোনদের মাঝে বই পড়া, কোরআন-হাদীস পড়া ইত্যাদির প্রতিযোগিতা লেগে যেতো।

লেখাপড়ার ব্যাপারে কখনো আমাদের চাপ দেন না তিনি। সব সময় বলেন, 'সমাজে যদি ভালো কন্ট্রিবিউশন রাখতে পার, সেটি আমাকে তোমাদের স্কুল-কলেজের যে কোন ভাল রেজাল্ট থেকে বেশী আনন্দ দেবে।' তবে আমরা স্কুল কলেজে ভাল ফলাফল করলে তিনি খুব খুশী হন। তাঁর আনন্দের প্রকাশটা এত ভাল লাগে যে নিজের জন্য না হলেও আব্বুর জন্য চেয়েছি সব সময় ভাল রেজাল্ট করতে। আমাদের ছোট-খাট অর্জনকেই আব্বু অনেক বড় করে দেখেন। তা আমাদেরকে আরো ভাল করার জন্য সবসময় উৎসাহ যোগায়।

আব্বু ব্যাংকের কাজে সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে আমাদের কাছে প্রায়ই ষোল-সতেরো পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি লিখতেন। আম্মুর কাছে একবার লিখেছিলেন সাতান্ন পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ চিঠি (বুঝতে পারছি না এ তথ্যটা এখানে দেয়া ঠিক হলো কিনা!)। আমাদেরকে লেখা চিঠিগুলো আসলে ছিল একেকটা প্রবন্ধের মতো। চিঠিগুলোতে থাকতো আব্বুর বিভিন্ন এক্সাইটিং ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আর সেগুলো পড়তে পড়তে মনে হতো আমরাও যেন ঘুরছি সৌদি আরবের পথে-প্রান্তরে।

ভ্রমণে আব্বুর সীমাহীন আগ্রহ। সুযোগ পেলেই আমাদের ঘুরিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। সৌদি আরবে একমাসে আব্বু আমাদের এত জায়গায় নিয়ে গেছেন যে ওখানে দশ-বারো বছর যাবত থাকা পরিবারগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। সৌদি আরব থেকে একমাসের ছুটিতে এসে আব্বু একবার সারাদেশে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে নিলেন আমাদের।

www.pathagar.com

পঁচিশটির মতো জেলা ঘুরে বেড়িয়েছি সেবার। আব্বু বলছিলেন, 'বিভিন্ন দেশ ঘোরার ভাগ্য তোমাদের হয়তো ভবিষ্যতে হবে, ইনশাআলাহ। কিন্তু আগে নিজের দেশটা দেখে নাও'।
এই হচ্ছেন আমার আব্বু। প্রতিটি মুহূর্তকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, আর প্রতিটি কাজকে কিভাবে আরো গঠনমূলক করা যায় এ-ই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। আর তাইতো তিনি সকল ক্ষেত্রেই সফল।

ছোট্ট একটা লেখার মধ্যে তাকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে চাই ঃ আমার দেখা তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, আদর্শ মানুষ। আলাহ তায়ালা তাঁর প্রতিটি কাজকে গ্রহণ করুন এবং তাঁকে আরো অনেক দিন মানুষের জন্য, ইসলামের জন্য, দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার তওফিক দিন।

আর হ্যাঁ, তোমাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, আব্বু!

মোহসিনা মাহমুদা ফেরদৌস (নিভু)
ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধীনে ইম্পেরিয়াল কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ছাত্রী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর বড় মেয়ে

www.pathagar.com

আব্বু যখন ঘরের মানুষ

মোহসিনা মাহবুবা ফেরদৌসি (মিতি)

আব্বুকে নিয়ে লিখতে হবে। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না, আব্বুর কোন্ দিকটি নিয়ে আমি লিখব। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আব্বুর দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের কিছু দিক তুলে ধরবো। কেননা, তার এসব ব্যাপার তো অনেকের অজানা।

সকালে আব্বুর অফিসে যাওয়া

খুব ছোটবেলা থেকেই ঘুম থেকে উঠে আমরা আব্বুকে পড়ার টেবিলে দেখতাম। আগে ভাবতাম, আব্বুও বোধ হয় আমাদেরই মত কোন স্কুলে পড়েন। সে জন্য আব্বু তার পড়া তৈরি করে নিচ্ছেন। পরে বুঝলাম, ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সময়টা আব্বু লেখালেখির কাজে ব্যয় করতে চান।

অফিসের কাজ ও লেখালেখির কাজ দু'টিই আব্বুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কোনটাতেই তিনি একটুও ত্রুটি রাখতে চান না। পড়ার টেবিলে তিনি অনেক মনোযোগের সাথে লেখালেখি করেন। তারপর আব্বু যখন অফিসে সময়মত পৌঁছার জন্য তাড়াহুড়া করেন, সেই দৃশ্যটি সত্যিই উপভোগ করার মত। পৌনে আটটায় গিজার ছেড়ে আব্বুকে স্মরণ করাতে হয় গোসলের জন্য। তিন-চার মিনিটে গোসল, বাকী ছয়-সাত মিনিটে খাওয়া-দাওয়া, পাস কাপড় পরা। এ সময়টা আব্বুর কাছে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং সবদিক গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

একদিন আব্বু অফিসে বেল্ট পড়ে যাননি। কারণ আম্মু সেটা হাতে তুলে দেননি। আরেকদিন আব্বু লিফটের কাছ থেকে ফিরে আসেন। কারণ সিঁড়িতে জুতার শব্দ না শুনে আম্মু পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন আব্বু ঘরের স্যান্ডেল পড়ে রওনা দিয়েছেন অফিসে।

সব সময় এ কাজগুলো আম্মুই করেন। তবে গত বছর আম্মুর এক মাস লন্ডনে থাকার সময়টা এ দায়িত্ব ছিল আমার। আব্বুর সকালের নাস্তা, ওষুধ, অফিসের খাবার, শার্ট-টাই ইত্যাদি দেয়া, সব মিলিয়ে আধ ঘন্টার একটা ছোট-খাটো exercise হয়ে যেতো আমার। এ ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। কারণ স্যান্ডেল পায়ে, বেল্ট ছাড়া আব্বু আমার ...। বিদায়ের সময় আম্মুর মতই ছন্দ বলতাম, মোবাইল, ঘড়ি, চশমা।

আব্বুর রাত করে বাসায় ফেরা

ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরতে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। আব্বুকে ফোন দিয়ে জানালাম বাসায় নেমে আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। আব্বু বললেন, তার কাজ প্রায় শেষের দিকে। তাকে তুলে নিলে ভালো হয়। আমার তখন সেকেন্ড মিড-টার্ম পরীক্ষা চলছে। মনে ভয়, কারণ, সাড়ে নয়টা-দশটার আগে আব্বু বাসায় ফেরেন না। তাও ভাবলাম, আমি গেলে আব্বু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবেন। আমার আস্থা ছিল, রাতে যেভাবে আব্বুকে পড়ার টেবিল থেকে তুলে আনি সেভাবেই অফিসের টেবিল থেকে তুলে বাসায় নিয়ে যাব। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, সেদিন নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারতাম না।

একটার পর একটা ফাইল-এর চলাফেরা, সাথে দুটি মোবাইল ফোন ও অফিসের দুটি ল্যান্ড ফোন-এর অবিরাম ডাকাডাকিতে আব্বু যেন আমার সামনে ভীনদেশের মানুষ হয়ে গেলেন। আব্বুর সামনে কিছু লোকজন ছিলেন। এর মাঝখানে আব্বুকে আমার কিছু বলার স্কোপ ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা পর ৮:৩০ টায় আমার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ফাইল জমা রেখে আব্বু আমার সাথে বের হন। সেদিন আব্বুর যে অবস্থা দেখেছি, তা থেকে উপলব্ধি করেছি, আমাদের মনে মাঝে মাঝে যে ধারণা উঁকি মারে, আব্বু হয়তো একটু চেষ্টা করলেই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে পারেন আর আমরা সবাই মিলে family occasion গুলোতে সময়মত পৌঁছতে পারি, তা ঠিক না। আব্বু আসলেই অফিসে খুব ব্যস্ত থাকেন। এ জন্য আব্বুকে দোষ

www.pathagar.com

দেয়া যায় না।

শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আব্বু যখন বাসায় ফিরেন আমরা বিছানার সাইড টেবিল থেকে বইপত্র সরিয়ে রাখি। নয়তো দেখা যাবে এগুলো নিয়েই আব্বু বসে যাবেন পোশাক বদল না করেই।

রাতে আমরা খেয়ে আধ ঘন্টার মত গল্প করি। এরপর আব্বু ব্রিফকেইস নিয়ে স্টাডি রুমের দিকে রওনা দেন। তখন আমাদের সান্তনার জন্য আব্বুর প্রতিদিনকার একটা কমন কথা–'একটা ছোট্ট কাজ, জাস্ট গুছিয়েই চলে আসব।' আব্বু একবার টেবিলে বসলে সেখান থেকে নিজে থেকে শেষ করে উঠে এসেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। এ ক্ষেত্রে আব্বুকে স্টপ করানোর দায়িত্বটা আমার। কৌশলটা হলো, প্রথমে সময় বলে আসি, দ্বিতীয় বার সতর্কবাণীতে বলি লাইট অফ হয়ে যাবে। চলতি পাতার কাজ শেষে চলে আসতে হবে। আর তার পরে গিয়ে সত্যিই লাইট অফ করে দিলে আব্বু করুণ হাসি দিয়ে উঠে আসেন।

আব্বুর জন্য স্পেশাল ঘড়ি

সময়কে ঠিকমতো কাজে লাগাতে ঘড়ি অনেককেই পাঁচ-দশ মিনিট ফাস্ট করে রাখতে দেখা যায়। লিখতে বসলে আব্বু যেহেতু পাঁচ মিনিটের কথা বলে অনেক বেশী সময় কাটান, তাই আব্বুর জন্য বিশেষ অবস্থায় ঘড়ি বাড়ানো-কমানো হয়। আব্বুর স্টাডি রুম-এর ঘড়িটা এক সময় আমি আর আম্মু আধ ঘন্টার মত ফাস্ট করে রেখেছিলাম। পরে অবশ্য এটা পরিবর্তন করা হয়। কারণ রাতে সেটা সুবিধা দিলেও আমরা ভাবতাম আব্বু সকালে সময়ের আগেই অফিসে যাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করবেন।

ভুলো মনা আব্বু

স্কুল জীবনে প্রায়ই দেখা যেত আব্বুর কারণে আমি একই ক্লাসে দুই-তিন বছর বেশী পড়ছি। আব্বু সৌদি আরবে থাকার সময় আমি হয়তো পড়ি ক্লাস ফোরে, আব্বু অন্যদের বলতেন আমার মেঝ মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে। একবার এক আঙ্কেল আমাদের বাসায় এসে আমি কি পড়ি তা জানতে চান। জবাবে যখন বলি আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি, তখন পাশে বসা আব্বু বলে উঠেন, 'তোমার তো এখন এইটে পড়ার কথা। গত বছরই তো আমি রিয়াদে সবাইকে বলে এসেছি, তুমি ক্লাস সেভেনে পড়।' এটা আমার অন্য বোনদের ক্ষেত্রেও হতো। আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম, আব্বুর পরিচিতজনরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাববেন, এ মেয়েগুলো স্কুলের পরীক্ষাতে ঠিকমত পাশ করতে পারে না।

অল্প সময়ের প্রাপ্তি

সাধারণত বেশী আকাংখিত কোন কিছু অল্প সময়ের জন্য পাওয়া হলে, সেই প্রাপ্তির আনন্দ বেশী হয়। আব্বুর ব্যাপারটা আমাদের কাছে সে রকম। ছুটির দিনে আমরা পরিবারের সবাই যখন একসাথে চা খাই বা গল্প করি তখন আমাদের কাছে সে সময়টুকু বাইরে গিয়ে কোন অনুষ্ঠানে ব্যয় করার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দের হয়।

আমরা আব্বুকে অল্প সময়ের জন্য কাছে পাওয়ার ফলে আমাদের তিনবোনের জন্য সুবিধার দিক হলো, আব্বুর কাছ থেকে কখনও আমরা বকা খাই না। শাসনের ভারটা যেহেতু আম্মুর একারই, তাই আম্মু সব সময়ই বলেন, আমরা নাকি আব্বুকে আম্মুর চেয়ে বেশী ভালবাসি। এটা সত্য না। পৃথিবীতে সবাই ইউনিক। আব্বু-আম্মুর দু'জনের আলাদা আলাদা বিশেষত্ব। আব্বু তার নিজস্ব জগতে ব্যস্ত থাকায় সংসারের অনেক কিছুই হয়তো খেয়াল দেয়া সম্ভব হয় না। সে অভাব পূর্ণ করছেন আম্মু। আমি শুধু মাঝে মাঝে ভাবি, আম্মু এমন একটিভ না হলে আমাদের life style টা এত সুন্দর আর সহজ হতো না।

আব্বুর একটা সুন্দর গুণ হলো আব্বু ভাল দিকগুলো সবসময় প্রশংসা করেন। আমাদের সংসারে আম্মুর ভূমিকাকে আব্বু সব সময় বড় করে দেখেন। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কারণ কেউ কোন কাজ করে যথাযথ মূল্যায়ন পেলে, তবেই ভবিষ্যতের কাজের জন্য অনুপ্রাণীত হয়। আমাদের সাথে অল্প সময় কাটালেও আমাদের ছোট ছোট ভাল দিকগুলো আব্বুর নজর এড়ায় না।

আব্বুর সৌখিনতা

এত কর্মব্যস্ত একজন মানুষ তিনি। তারপরও আব্বুর একটা জিনিস আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় লাগে। তা হল আব্বু খুবই সৌখিন

www.pathagar.com

একজন মানুষ। আমাদের ঘরের আসবাবপত্র বা সাজসজ্জা সবকিছুই আব্বু-আম্মুর মিলিত পছন্দে হয়। আব্বু সব সময় আমাদেরকে সামর্থ অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো জিনিসটা দেয়ার চেষ্টা করেন। শুধু বাইরে নয়, বাসায়ও ভাল ড্রেস পড়তে বলেন। পোশাকের ব্যাপারে আব্বু অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর পছন্দের ওপর আমাদের পরিবারের সবাই আস্থাবান। আমার মনে হয় একজন মানুষের সব কিছুর ব্যাপারেই খেয়াল দেয়া উচিত। আলেকজান্ডার পোপের ভাষায় 'Charms strike the light, merit wins the soul'. আর merit এর সাথে যদি charm-ও থাকে তবে তা আরো সার্থক হয়। আমার কাছে আমার আব্বু ভেতরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রেই সুন্দর ও সফলকাম।

শেকড়-সন্ধানী আব্বু

নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে আব্বু সব সময়ই concerned। আব্বু সব সময়ই একটা কথা বলেন, 'মাটির সাথে, শেকড়ের সাথে সম্পর্কহীন মানুষ জীবনের সঠিক দিক-নির্দেশনা পায় না।' আমাদের দাদা-দাদী বেঁচে নেই, চাচারাও ঢাকায় থাকেন। ফলে গ্রামের বাড়ীতে খুব বেশী যাওয়া হয় না। তবু আমাদের মাঝে-মধ্যে এক-আধ বার গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাবার ব্যাপারটিকে আব্বু একটা special occasion হিসেবে treat করেন।

সম্প্রতি আমাদের গ্রামের বাড়ীর পৈত্রিক ভিটায় আব্বু একটি ফ্রি কোচিং হোম করে দিয়েছেন। এখানে কিছু কলেজগামী মেধাবী ছাত্র গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়। এইতো সেদিন আমরা ও আমাদের দুই চাচার পরিবার সেই কোচিং সেন্টারটি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে এখন একশ-সোয়াশ শিক্ষার্থী জমা হয়। সেটি খুব বড় না হলেও অনেক organized। মাঝখানে সারি করে কাঠের চেয়ার-টেবিল আর চারপাশে রয়েছে কাঠের বুক শেলফ্। আব্বু ভালো ভালো বই ওখানে পাঠান। সেগুলো পড়ে গ্রামের অনেক ছেলে-মেয়ে উপকৃত হতে পারে।

আমরা যখন গিয়েছি, সেটি ছিল একটি অনুষ্ঠানের মত। গ্রামের অনেকে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে আব্বু আমাদের প্রত্যেককে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গ্রামের ছোট ভাই-বোনদের উদ্দেশে আমাদের কিছু বলতে বললেন। আব্বুর এ ধরনের কিছু কাজে আমরা প্রায় বিব্রতবোধ করি। কিন্তু এটা যে কতটা helpful সেটা আমি university তে উঠে বুঝেছি। অনেকের সামনে এখন presentation করতে হয়। তখন সেটা আর নতুন লাগে না। কারণ এমন অনেক presentation ই আমি আগে করেছি, যেখানে faculty ছিলেন আব্বু।

লেখার উপরের অংশটি আমার বিয়ের আগের। এখন শ্বশুর বাড়ীতে বসে তা শেষ করছি। লেখাটি পড়ে এ মুহূর্তে আব্বুর ছোটখাটো ঘটনা-দুর্ঘটনাগুলো মনে পড়ছে। কিছু কথা ভেবে ভালো লাগছে। কিছু কথা মনে করে আবার খারাপও লাগছে। মনে হচ্ছে এই সময়গুলো কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সকাল হলেই এখন মনে পড়ে আব্বুর অফিসে যাওয়ার সেই ব্যস্ততার দৃশ্য। আবার রাতেও, নয়টা-দশটা বাজলে আব্বুর ঘরে আসাটাকে এখন অনেক miss করি। আমার বড় বোন নিতুর মত যদিও আমি আব্বুর কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকি না, তবু শাহবাগ-পরিবাগ থেকে উত্তরার দূরত্বও কম মনে হয় না।

আমি আব্বুর উপর খুশী যে, আব্বু তার কথা রেখেছেন। নিতুর বিয়ের পর ও দূরে থাকাতে ও-র জন্য আমরা খুব মন খারাপ করতাম। আব্বু সব সময়ই বলতেন, 'তোমাকে আমি দেশেই বিয়ে দেব। যেন ইচ্ছা হলেই দেখে আসতে পারি।' এখন দুই বা তিন দিন পরপরই আমার পরিবাগে আসা হয়। মন খারাপ হলেই তাদের কাছে চলে যাই।

আমি সত্যিই একজন গর্বিত মেয়ে। আমি আব্বুর মত একজন মানুষকে আমার বাবা এবং guide হিসেবে পেয়েছি। আলাহ আমার আব্বুকে সুস্থ্য জীবন দান করুন, যেন আব্বু মানুষের কল্যাণে, দেশের প্রয়োজনে আর ইসলামের খেদমতে তার কাজ দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখতে পারেন।

মোহসিনা মাহবুবা ফেরদৌস (মিতি)
মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দ্বিতীয় মেয়ে

www.pathagar.com

Story of 'Ekmatro Chhoto Meye'

Mohsina Mahdia Ferdous

Few days back, one of abbu's friends called to tell us that they were going to publish a souvenir on abbu and it would be great if we could contribute there too. From that time on I have been thinking and thinking about what I should write or whether I should write an essay on abbu as I did in school when I had to do a project on my favourite person. Also there were so many things that I could write about him, I was thinking what I could include and what not, how long a souvenir could be after all. Anyway, finally I have decided, I would present him as a dad, as other people might know him as a writer or a banker but how great he is as a father that may not be known to others.

When I was very young, my dad was transferred to Saudi Arabia. Back then I could not even talk properly. I used to call him *'Nannam'*. Ammu told me whenever any of his friends came to our house; I used to tell them, *'Nannam nai, Nannam Makka.* As I grew up, I used to stand in our balcony on Fridays, from where our local mosque could be seen. I used to feel sad because I could see many people going in and coming out of the mosque but my father was missing.

I don't remember many things from my childhood but I remember missing my abbu and the sadness I used to feel every time he returned to Saudi Arab after visiting us.

In 1997, my mother, two sisters (Nitu apu and Mity apu) and I went to visit him in Saudi Arabia. He received us in the airport. He also brought pockets full of chocolates because he knew that chocolates came second in my list of favorite things, obviously he came top. I was overjoyed at the amount of chocolates he brought in one go, which ammu did not buy me in one year (this is because I had allergy).

When abbu used to visit us in Bangladesh from Saudi Arabia we all used to sit around in a circle and he used to talk about the different things in Saudi Arabia, what kind of work he did, many stories of Saudi Arabia, etc. Sometimes when he would get tired he would start snoring but when we would nudge him a little he would wake up and would start the stories from the beginning.

When I was small, my mother used to pick me up from my school. Whenever I used to get in the car, sometimes I would ask for an ice-cream but she did not buy me any (as I have already said that it was because of my allergy). But one day abbu went to pick me up from my school. He bought me every single thing I wanted.

www.pathagar.com

I think in our family my father loves me more than he does to others. He calls me his 'Ekmatro Chhoto Meye'. Whenever ammu scolds me or my sister (Mity apu) has a fight with me, abbu always comes to my rescue, and even if I am at fault, abbu tells them to ignore it for that one time (this happens a lot by the way).

Abbu has a big study-room where he goes everyday after coming from his office. It amazes me all the time how after a long day of hard work in his office he still has the energy to work in his study-room. We all know that he gets very tired so we call him to go to sleep. Whenever ammu or my sisters call him he does not get up but whenever I call him he gets up at once. Then I feel very happy that he listens to me more than he does to them.

But I have only one problem with him ... he always puts me in the wrong grade. Let's say that if I am in 7th grade, he either tells people that I am in 6th grade or 8th grade. That is why whenever he is talking to a friend about us I start reminding him from the beginning that I am in the 7th grade.

I think he has all the best qualities a father could have. I think I am very lucky to have a father like him.

Mohsina Mahdia Ferdous : Student of Class VII at Mastermind, youngest daughter of Mohammad Abdul Mannan

www.pathagar.com

সামনে চলার পথে পিছনে তাকাই

মীযানুল করীম

আজ থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী আগের কথা। তখন আমি সবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করে ঢাকায় এসে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছি। ভার্সিটিতে '৭৭ সাল থেকে সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলাম শখের বশে। যা হোক, ১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম-এর বার্তা বিভাগে আমার কর্মজীবনের সূচনা।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যাবেলায় অফিসে গিয়ে কাজ শুরু করেছি। সবাই কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে এক সময়ে এলেন একজন সুশ্রী-সুদর্শন যুবক। দেখলাম, আমার 'বস'-দের তিনি খুব পরিচিত। আর উনিও বেশ আপন-জনের মতো সবার সাথে কথা বলছেন; রিপোর্টিং সেকশান ও ডেস্ক মিলিয়ে নিউজরুমের এমাথা-ওমাথা সবার সাথে হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন। আমি নবাগত। আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। জানতে পারলাম, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। পয়লা সাক্ষাতেই তাঁর দিলখোলা আচরণে মুগ্ধ হলাম। বুঝলাম, অন্যকে আপন করে নিতে তাঁর বেগ পেতে হয় না। জনসংযোগের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আর আবদুল মান্নান ভাই তখন নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা।

সে '৮৩ সালে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাংবাদিক পরিচয়ের সাথে জনসংযোগ পেশাজীবীর পরিচয় যোগ হয়েছিল। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। মেধা, প্রতিভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, সর্বোপরি নিষ্ঠা ও আদর্শবাদিতার বলে আজ তাঁর অনেক পরিচয়। তিনি এখন একাধারে ব্যাংকার, লেখক, ইতিহাস গবেষক, সাংস্কৃতিক জগতের সংগঠকও।

শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ভাইয়ের সাথে গত ২৫ বছরে বহুবার দেখা ও কথা হয়েছে। তাঁর অনেক লেখাই পড়েছি। পড়েছি একান্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে। যতই দিন গেছে ততই তাঁর সম্পর্কে জেনেছি আরো বেশী। এই আড়াই দশক সময়ে বুড়িগঙ্গায় বয়ে গেছে অনেক পানি; দেশের সরকার বদলে গেছে পাঁচবার। আর আমাদের সবার জীবনেই প্রকৃতির স্বভাবনিয়মে ঘটেছে রূপান্তর ও পালাবদল। সমকালের এই পরিধিতে মান্নান ভাই ইসলামী ব্যাংকের চাকরিতে মূল ব্যাংকিং-এ যোগ দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে গেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে বর্তমানে তিনি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা উপব্যবস্থাপনা পরিচালক। পেশাগত জীবনের এই উত্তরণের পাশাপাশি লেখালেখির অঙ্গনেও তিনি এগিয়েছেন প্রত্যাশিতভাবে। অথচ ব্যাংকিং-এর মতো অর্থনৈতিক পেশায় বড় বড় দায়িত্বপালনে একজন কর্মকর্তাকে কত বেশী ব্যস্ত থাকতে ও পরিশ্রম করতে হয়, তা সবার জানা।

একবার কী একটা সেমিনার বা আলোচনা সভা শেষ করে রাতে অফিসে ফিরছিলাম। মান্নান ভাই গাড়িতে পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের বক্তা-অতিথিদের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার ও ইতিহাস-গবেষক অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ। নাম আসলে ওবায়দুলাহ,

www.pathagar.com

যদিও তা জানেন কম লোকই। বয়সে প্রবীণ হলেও উদ্যমে নবীন। যা হোক, প্রথমে তাঁকে গ্রীনরোডের বাসায় নামিয়ে দিতে হবে। গাড়িতে আসকার ইবনে শাইখ তাঁর জোরালো গলায় বলছিলেন নানা কথা। একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ লেখক তাঁকে তদবীরের জন্য ধরেছিলেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক হবার উদ্দেশ্যে। সে কথাও বললেন।

একটি দিনের কথা আমার মনে আছে মাস-তারিখ হিসেবে। ২০০২ সালের ২৫ আগস্ট। মতিঝিলে ভর-দুপুরে গিয়েছিলাম ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে। সেখানে ব্যাংকের গবেষণা জার্নালে আমার অনুবাদ করা একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। সে ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। তখন আবদুল মান্নান ভাই হেড অফিস কমপেক্স ব্রাঞ্চের দায়িত্বে। তাঁর রুমে দেখা করতে গেলাম। ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর কাছে ফোন এলো। বললেন কিছু কথা। এরপর জানালেন, ফোন করেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও কলামিস্ট আরিফুল হক।

এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কয়েক বছর আগে থেকেই আমেরিকায় থাকতেন। ২০০১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশে ফিরেছিলেন। আশা ছিল, এবার দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির অনুকূল পরিস্থিতিতে জাতির জন্য কিছু অবদান রাখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু সরকারের সংশিষ্ট মহলের আদর্শিক সচেতনার অভাবে এবং অদূরদর্শিতার দরুন আরিফুল হক হয়ে রইলেন উপেক্ষার পাত্র। শেষ পর্যন্ত অভিমানে দেশ ছেড়ে ফিরে গেলেন প্রবাসে। যাওয়ার আগের দিন তিনি ফোন করেছিলেন মান্নান ভাইকে। আর ঘটনাক্রমে আমি সেখানে ছিলাম হাজির। তিনি খুব আফসোস করেছিলেন আরিফুল হকের মতো যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সংস্কৃতির অঙ্গনে সরকার কাজে লাগাতে না পারায়। আরিফুল হক ফোনে জানতে চেয়েছিলেন বিশেষ কিছু বই সম্পর্কে। প্রবাসে অধ্যয়নের জন্য এগুলো তিনি নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। মান্নান ভাই তাঁকে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য দিলেন বই কেনা বা সংগ্রহের ব্যাপারে।

সে দিন একই সাথে কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করেছিলাম। প্রথমতঃ আবদুল মান্নান ভাইয়ের পরিচয় ও যোগাযোগের পরিধির ব্যাপকতা এবং বিশেষ করে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে ঘনিষ্ঠতা। দ্বিতীয়তঃ আদর্শনিষ্ঠ ও ঐতিহ্যানুগ সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রসারের জন্য তাঁর আগ্রহ-অনুভূতি। তৃতীয়তঃ তাঁর গ্রন্থপ্রেম, তথা পড়াশোনার ব্যাপকতা (যার খবর গুণগ্রাহীরা ঠিকই রাখেন)।

আবদুল মান্নান ভাইর বিশেষ অবদান যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তা হলো ইতিহাস চর্চা। এ নিয়ে বছরের পর বছর বই-পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ, অধ্যয়ন, মূল্যায়নের ফল তাঁর একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ। আজো এই দেশ ও জাতির অতীতের উপর তাঁর পড়া এবং সে সম্পর্কে লেখা, দুটোই চলছে। তিনি বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে অতীতকে দেখছেন। আর এটা করছেন ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ দেয়ার লক্ষ্যে – বিগতকালে ফিরে যেতে নয়।

মান্নান ভাইর মানস মূলত গবেষণাপ্রবণ। ইতিহাস বিষয়ক বই বেরুবার আগেই তাঁর 'গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি' বেরিয়েছিল। এর মধ্যে প্রকাশনাজগতে লেখক পরিচয়ে তাঁর নিয়মিত পদার্পন। এর অর্ধযুগ পূর্বে 'বাংলাদেশের পুলিশ' নামে একটি বই প্রকাশ পেলেও তার খবর অনেকটা অজানা।

ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কিত গবেষণার যে বই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে 'পাদপ্রদীপের আলোয়' এনে দেয়, তার শিরোনাম 'বাংলা ও বাংগালী: মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' (১৯৯১)। সুবৃহৎ বইটি 'প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বাইরের এক নতুন আলোকদিশা' হওয়ায় প্রকাশমাত্রই ব্যাপক আলোড়ন তোলে। 'এ বইতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর অনুসন্ধিৎসা, সত্যের অন্বেষণ এবং ঐতিহাসিকদের কাছে প্রত্যাশিত, কিন্তু দুর্লভ পক্ষপাতহীনতা।' বইটির সৌজন্য সংখ্যা আমাকে দিয়েছিলেন লেখক মান্নান ভাই। এর ওপর 'রিভিউ' লিখেছিলাম। ছাপা হয়েছিল দৈনিক ইনকিলাব-এর সাহিত্য পাতায়। তখন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন মরহুম শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজ। [সংক্ষেপিত]

লেখক : সহকারী সম্পাদক- দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

একজন বন্ধুবৎসল ভাল মানুষ আবদুল মান্নান

সৈয়দ লুৎফুল হক

আমরা এই মহাবিশ্বে নানা কিছুর মোকাবিলা করছি বেঁচে থাকার তাগিদে। তার মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় আর বাকী কিছু অপ্রয়োজনীয়। যেমন- খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও প্রকৃতি থেকে আমরা অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করে থাকি। আল্লাহ সৃষ্ট এই বিশ্ব থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন শেষ হবে কি-না জানি না। তবু প্রকৃতি আমাদের চাহিদা প্রতিনিয়ত পূরণ করে যাচ্ছে। একেকজন মানুষ একেকভাবে তাঁর প্রয়োজন মিটাচ্ছে। কেউ সাহিত্য, কবিতা, চিত্রাঙ্গন ইত্যাদি জীবনের পেশা বা নেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে পেশা হিসেবে কবিতা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি গ্রহণ করা একটি দূরহ কাজ। তবু একজন সৃজনশীল মানুষ বার বার ফিরে যেতে চায় তাঁর সৃষ্টিশীল জগতে।

তেমনি একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব গবেষক, সাংবাদিক, ব্যাংকার আবদুল মান্নান সৃজনশীল মানুষ। কর্মজীবন শুরু সাংবাদিকতায় আর মিশন হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে ব্যাংককে। ছাত্র জীবনে ধ্যানে, জ্ঞানে, চেতনায় একজন প্রগতিশীল কর্মী ছিলেন। জীবনের যাঁতাকলে বেছে নিতে হয়েছে হিসেব-নিকেশের জগতকে। জীবনে সাফল্য এসেছে, প্রাপ্তির সুফল হয়তো ভোগ করেছেন, তবু যেন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও মনে হয়েছে কি যেন ফেলে এসেছি ? বার বার যেন তাড়া করে বেড়ায় সৃষ্টিশীল চেতনা।

যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একজন সৃজনশীল প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিভূ। ব্রহ্মা হয়তো বারবার মান্নান সাহেবের ঘাড়ে ভর করে। শুধু মান্নান সাহেব কেন- সকল সৃষ্টিশীল ব্যক্তি মাত্রই এমনটি হয়ে থাকে।

আমি যতদূর তাঁকে চিনি, ছাত্র জীবনের প্রগতিশীল রূপকে বাস্তবতার নিরিখে দেখার ক্ষমতা তার আছে বলেই তিনি জীবনকে সুন্দর করে গড়ে নিতে পেরেছেন। বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। বাকী অংশ পূরণ করা কেবল তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেনঃ যদি জোটে একটি কড়ি খাদ্য কিনিও, যদি জোটে দুইটি কড়ি ফুল কিনিও হে অনুরাগী' অর্থাৎ হযরতের বাণীর দ্বিতীয় অংশটি পূরণ করার সময় এসেছে জনাব মান্নানের। ফুল মানবজীবনের শিল্পরূপ (সৃষ্টিশীল রূপ) যা তাঁর বাকী জীবনের ক্রিয়া হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

একজন সদালাপী, বন্ধুবৎসল, গুণী মানুষ সমাজে বিরল। তার মাঝে মান্নান সাহেবকে আমরা পেয়েছি। শিল্পরসিক এই ব্যক্তির ভবিষ্যত আলোকময় হয়ে জ্যোতির্মান থাকুক সৃজনশীল, প্রগতিবাদী, ধার্মিক চেতনা জাগ্রত থাকুক তাঁর সারা জীবনের চলার পথে। যার স্পর্শে আমরাও যেন গৌরবান্বিত বোধ করি। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব হোক চির অম্লান। তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি

লেখক : প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী, কবি, নাট্যকার, সংগঠক ও সংস্কৃতিসেবী

www.pathagar.com

বিষয় নির্বাচনে সচেতন একজন গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনশীলতা জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষের মাঝে লুকানো থাকে। পারিপার্শ্বিকতা আর সময়-সুযোগমত তার বিকাশ ঘটে। মানুষের যেমন চেহারার ভিন্নতা, ঠিক তেমনি তার পছন্দ অপছন্দের মাঝেও আছে পার্থক্য। সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবেশ এগুলোও তাকে প্রভাবিত করে। সব মিলে সময়ের বিবর্তনে পূর্ণ বয়সে এসে আমরা একেক বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হই। লেখক, গবেষক, কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার, অভিনেতা, নির্মাতা, সাংবাদিক, শিল্পী ইত্যাদি অনেক পরিচয়েই পরিচিত হয়ে যাই আমরা। কেউ কেউ এগুলোকে পেশা হিসাবে নেন, কারো বা নেশা। একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে উলেখিত পেশার সৃজনশীল মানুষেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

মানুষ মাত্রেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার রাখেন। অধিকারকে যারা দায়িত্বপালনের সাথে যুক্ত করে নেন তাদের লেখায় তা সংগত ভাবেই ফুটে ওঠে। আর যারা সেটা করেন না তারা পাঠককে কোথায় নিয়ে যেতে চান তা সম্ভবত নিজেরাও জানেন না। সে অবস্থায় কবি কল্পনা-বিলাস করে করে সৃষ্টিকর্তাকেও হার মানাতে উদ্ধত হন, লেখক স্বাধীনতার পক্ষে লিখে লিখে নিজেই অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে ফেলেন, উপন্যাসিক কাহিনী সৃষ্টির নামে গল্পকে এগিয়ে নিতে নিতে অল্প-বয়সী কাউকে আত্মহত্যায় ইন্ধন যোগান, নাট্যকার বা নির্মাতা সামাজিক ছবি নির্মাণের নামে আমাদের পরিবারগুলোকেই বিপর্যস্ত করে তুলেন। একজন লেখকের যদি বিবেকের দায়বদ্ধতা থাকে, সমাজের, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে তাহলে তিনি উদ্দেশ্যহীন হতে পারেন না। তার লেখার প্রতিটি বিষয় হবে সুনির্বাচিত। লক্ষ্য হবে সুনির্দিষ্ট।

আমার লেখার শিরোনাম ঃ 'বিষয় নির্বাচনে সচেতন একজন গবেষক ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।' প্রায় দুই দশক ধরে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। সে আলোকে তার লেখালেখি সম্পর্কে আমি উপরোক্ত শিরোনাম সংগত মনে করেই দিয়েছি। এ বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে কবি আল মাহমুদ আবেগ ভরা কণ্ঠে অশ্রু সিক্ত চোখে বলছিলেন, "একজন কবির জন্য একটি স্বাধীন দেশ বড়ই প্রয়োজন।" তিনি আরো বলছিলেন, "পরাধীনতা কি তা স্বাধীন দেশে বাস করে বুঝা যায় না। একজন মানুষের জন্য স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ।"

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এজন্যই যে তিনি তার লেখার যাবতীয় বিষয়বস্তুর কেন্দ্র বানিয়েছেন বাংলাদেশকে। তার জীবন লেখা-লেখি দিয়েই শুরু। কর্ম-জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতা, সেখানেও বিষয়-বাংলাদেশ। পরবর্তীতে ব্যাংকার। অত্যন্ত মেধাবী মানুষ হিসাবে তিনি তাঁর সকল প্রফেশনে হয়েছেন সফল। দেশের বৃহত্তম বেসরকারী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর মতো ব্যস্ততাপূর্ণ দায়িত্বপালন করেও তিনি তার কমিটমেন্ট থেকে বিন্দুমাত্র সরেন নি। সারা দিনের ব্যস্ততা ও ক্লান্তির পর একান্ত বিশ্রামের সময়টিকে তিনি বেছে নিয়েছেন লেখা-পড়া ও গবেষণার জন্য। সে পরিশ্রমের ফসলরূপে আমরা একে একে পেয়েছি 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' প্রভৃতি অতি মূল্যবান বই।

ছোট সময়ে আমার ইতিহাস পড়তে ভালো লাগতো না। স্কুলের সিলেবাসে থাকায় পড়তে হতো। পানিপথের যুদ্ধ কবে হয়েছিল সেই সনটা মনে রাখতে হয়েছিল বেশ কষ্ট করেই। সেই যাত্রা কোন মতে পার করে একটু বড় হতে না হতেই 'প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কেন

www.pathagar.com

হয়েছিল? এত লোক কেন মারা পড়লো?' এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে অজান্তেই ইতিহাস ভালো লেগে গেলো। আমেরিকা-ইউরোপের শত শত বছরের গৃহ যুদ্ধ আর সেগুলোর ইতিহাস নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রেও বেশ আকৃষ্ট হলাম। আমার অল্প-বিস্তর পড়ার সাথে রুটস্ ছবির কাহিনী মিলালাম। এভাবে জানার পরিধি কিছুটা বাড়লো। বলা যায় অনেকটা বিচ্ছিন্ন পাঠক হলাম ইতিহাসের।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বিশেষত্ব হচ্ছে ইতিহাসের সব বিষয়কে তিনি তার জন্য নির্বাচন করেন নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল, শত বছরের গৃহযুদ্ধের পর ইউরোপের উন্নতি কিভাবে হলো সে কথা তিনি লেখেন নি। তিনি লিখেছেন একান্তভাবে আমাদের এ পাললিক ব-দ্বীপ ভূখন্ডের ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাস। তার অর্থ এর বাইরের ইতিহাস গুরুত্বহীন তা সঙ্গত নয়। বরং আমার মনে হয় তিনি গবেষক হিসাবে তার কর্মক্ষেত্রের একটি পরিসর সুনির্বাচিত করে নিয়েছেন। একজন ব্যক্তি মানুষের সময়ের সীমাবদ্ধতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। এক মানুষের পক্ষে সব দিক হাতড়াবার সুযোগ নেই। তিনি তার নির্বাচিত কাজটুকু সুচারুরূপে করে যাচ্ছেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক চিহ্নিত করে তার ওপর তিনি আলোক সম্পাত করছেন।

গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, তিনি ইতিহাসের সেই দিকটাই আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা বর্তমান সময়ে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তার সাবলিল উপস্থাপনা গুণে পাঠক অতীত পাঠ করে বর্তমানে তার করণীয় সম্পর্কে অবশ্যই দিক নির্দেশনা পাবেন।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। বিশ্বের মানচিত্রের ছোট্ট এই ব-দ্বীপটি চারিদিক থেকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ দ্বারা বেষ্টিত। তা কিভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো? বিশ্বের অন্য অধিকাংশ মুসলিম দেশের সীমান্ত যেখানে পাশাপাশি সেখানে বাংলাদেশ ঐ সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও আজ পর্যন্ত কিভাবে মুসলিম জাতিসত্তা নিয়ে টিকে থাকলো এবং বিকশিত হলো, সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পূর্বেই যে এদেশে ইসলামের দাওয়াতের কাজ হয়েছে, এ দেশের মানুষ ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছিলো, সে কথা জেনেছি তার কাছ থেকেই। এদেশে ইসলাম প্রচারক সুফী-সাধকরা যে এক এক জন মুজাহীদ ও প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামী ছিলেন সে তথ্য ও তত্ত্ব আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি। বৃটিশদের অধীনে দু'শ বছরের গোলামীর কারণ যেমন তিনি চিহ্নিত করেছেন পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে এ অঞ্চলের মানুষরাই করেছেন সে কথা তিনি লিখেছেন বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ দিয়ে।

বলা হয়ে থাকে সব ঐতিহাসিকেরই কিছুটা পক্ষপাত থাকে। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে তিনি সে ভাবেই দাঁড় করান। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকেও আমি পক্ষপাত মুক্ত বলবো না। তবে তার পক্ষ বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার কখন কিভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে সে সত্য তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ব্যাপী সত্য ও মিথ্যা, জালেম ও মজলুমের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা তার আগে এমন স্পষ্টভাবে আর কারো কাছ থেকে জানতে পারিনি। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে আমি প্রত্যয়ের সাথে আশা রাখছি, একদিন মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এই সব গবেষণা কাজের আরো মূল্যায়ন হবে।

বর্তমান বাংলাদেশ একটা ঝুঁকিপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। এই উপমহাদেশে অতীতে স্বাধীনতার সূর্য কেন এবং কিভাবে অস্তমিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আছে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বইয়ে। সেই ইতিহাস সামনে রেখে বর্তমানের সময়কে মূল্যায়ন করে আমরা সঠিক ভূমিকা রাখতে পারি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সর্তক কলম আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতিসত্তা বাঁচিয়ে রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। সে পাহারা উত্তরোত্তর আরো জোরদার হবে, তার সাধনা ও পরিশ্রমের পথ ধরে আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন, এ কামনা করছি।

লেখক : গীতিকার, সুরকার, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সভাপতি, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার, খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও সুসাহিত্যিক। আমার দৃষ্টিতে প্রথমত তিনি ইতিহাস গবেষক আর ব্যাংকার হয়েছেন বোধ করি কিছুটা সময়ের প্রয়োজনে এবং কিছুটা জীবিকার প্রয়োজনে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি সুগভীর ও স্বচ্ছ এবং বাস্তব জীবনে এই উপলব্ধির সার্থক প্রয়োগের বিচারে তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। শেকড়ের সন্ধানে তাঁর যে ক্লান্তিহীন অভিযাত্রা তা আর সবার মত আমাকেও মুগ্ধ করে। আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ পরিস্ফুটনে তার পারঙ্গমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বহু মাত্রায় কাজ করছেন। তাঁর কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গ্রন্থি উন্মোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়েও তাঁর বেশ কিছু তথ্যবহুল প্রবন্ধ ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে যে বিষয়টি অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করার মতো তা হলো, তিনি ইতিহাস লিখুন, সাহিত্য লিখুন কিংবা ব্যাংক ব্যবস্থা লিখুন সব লেখাতেই ফুটে উঠে তাঁর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর সব আলোচনা ও লেখালেখিতে দর্শনের একটা ছোঁয়া অনুভব করা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে যাত্রা শুরু করে তিনি দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে দেশে-বিদেশে মাঠ পর্যায়ে যেমন নীতি-নির্ধারণী পর্যায়েও তেমনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে তাঁর সে অভিজ্ঞতারই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

গত চার দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী একটি টেকসই, সম্ভাবনাময়, যুগোপযোগী ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এই অসামান্য সাফল্য ও সমাদর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এখানেই সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তির কোন অবকাশ নেই। বর্তমানে যেখানে ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের পাশাপাশি পরিচালিত হচ্ছে সেখানে কাম্য অবস্থা হলো, ইসলামী ব্যাংক প্রতিটি মুসলিম দেশের একমাত্র জাতীয় ব্যাংক ব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হবে। সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের অগ্রনায়কদের শুধু পদ্ধতি পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ না থেকে ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপও নিতে হবে। কারণ আমরা মনে করি, ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন ইসলামী সামাজিক আন্দোলনের একটি মঞ্জিল মাত্র– শেষ গন্তব্য নয়। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা যতদিন জাতীয় সুদী ব্যবস্থার পাশাপাশি একনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে কাজ করবে ততদিন ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে না এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃত কল্যাণরূপ গণমানুষের সামনে প্রতিভাত হবে না।

সমগ্র বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও সাফল্যের ধারা যেন রূপকথার মত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এক দল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরন্তর সযত্ন প্রয়াস এবং সর্বস্তরের জনগণের বিপুল সাড়া ও সমর্থন পুঁজি করে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম আশাতীত বিস্তৃতি লাভ ও সফলতা অর্জন করেছে। মাত্র দুই যুগের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যাংক ব্যবস্থার বলিষ্ঠ অবদান এ দেশের অর্থনীতির ধারায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। (সংক্ষেপিত)

www.pathagar.com

মুখোমুখি ইতিহাস
একান্ত সংলাপ

আতা সরকার

মুখোমুখি বসে আর চট করে ওঠা যায় না। অন্য প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো তরতর চলে যায়। কোন জবরদস্তি নেই। মুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়ে জমে যেতে হয় তুমুল আড্ডায়। আড্ডা জমে ফোনেও। তাঁর অনেক ব্যস্ততা। দায়িত্বের গুরুভারে এত ব্যস্ততা যে ২৪ ঘন্টার দিনটিকে যদি ইলাস্টিক টেনে বাড়িয়ে দেয়া যেত! এতেও কি ব্যস্ততার সাশ্রয় হত? এর মাঝেও মুখোমুখি হওয়া। ফোনেও হওয়া যায় মুখোমুখি। ওতেও জমে যায় আড্ডা।

আড্ডা কি অকেজো অলস লোকদের কলরব? নাকি সৃজনশীলতার আকর? তাঁর সাথে কথা বলতে সৃষ্টির আনন্দটুকু পাওয়া যায় বারবার। ফিরে ফিরে বসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে মুখোমুখি হতে। কথা বলতে। যতবার কথা ততবার পাওয়া যায় নতুন কোন সংবাদ। নতুন কোন তথ্য। ইতিহাসের গর্ভ থেকে খুঁজে পাওয়া চমকে দেয়ার মত কোন উপাত্ত, যার বিশেষণ ইতিহাস-পাঠে নতুন মাত্রা যোগ করে, খুলে দেয় নিজেকে চেনার নতুন কোন আকাশ।

আজ মনে নেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে কবে কোথায় দেখা হয়েছিল। দেখা শুধু পরিচয়ের বেষ্টনীতেই আবদ্ধ থাকেনি, তাঁর মোহময় আকর্ষণ পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা রচনায় পলক-সময়ও নেয়নি। পরিচয়টি ঘটে একটি আড্ডায়। হিসেব কষে দেখি সময়টা চার দশক পেরিয়ে গেছে, আড্ডা যে এখনও চলছে, এটি বুঝি এখনও ফুরোবার নয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাহচর্য নানা কারণে আমার কাছে তাৎপর্যময়। অর্থবহও। এটি যেমন আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জীবনের চলার পথেও। এসব বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক ধরনের ধারা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এ শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে এর অর্থটিকে বোধহয় পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর সম্পর্কের বুনিয়াদটি যদি হয় গভীর তাহলে সেটাকে কোন্ শব্দ দিয়ে সাজিয়ে প্রকাশ করব !

২.

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের পরিচয় বহুমাত্রিক। তিনি সাংবাদিক ছিলেন। একবার যিনি সাংবাদিকতায় ঢোকেন, পরবর্তী জীবনে পেশা বদলালেও তাঁর মননে-সত্তায় এর বদল ঘটে কমই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় এ পেশাটি বাস্তবতই ছিল সাফল্যের সোপান। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আমার একটা মিল দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের আগে যেমন সাংবাদিক ছিলাম, পাঠ শেষেও তাই। এখনো কি আমরা সে গন্ডী পেরিয়ে যেতে পেরেছি? সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক। কবি আল মাহমুদের মত তিনিও সাংবাদিকতার কেন্দ্রস্থল প্রুফ রিডিং সেকশন থেকে পেশা শুরু করেছেন। ছিলেন রিপোর্টার। চীফ রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। সহকারী সম্পাদক। এমনকি সম্পাদকও।

এরও আগে টগবগে তারুণ্য তাঁর দেখেছি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ঢাকার রাজপথে তাঁকে উদ্দীপ্ত দেখেছি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে। দেখেছি রাজনৈতিক যুক্তিতর্কে মুখর থাকতে। পুরোন ঢাকার তরুণ কিশোরদের সংগঠিত করতে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কি বয়সের আগেই পেকে গিয়েছিলেন? তরুণ কিশোর। গোঁফের রেখা দেখা যায় কি যায় না, সেই বয়সে তাঁকে দেখেছি বয়স্কদের সাথে কাঁধে কাঁধে কাজ করে যেতে। বাক বিস্তার করতে। পরামর্শ দিতে। কখনো তাঁদের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাঁকে দেখেছি নতুন পটভূমিকায় তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন কলম। কলামিস্ট ও সাংবাদিকতায়। নাকি তাঁর এ ভূমিকটি আরেকটু আগেই শুরু হয়েছিল? স্বাধীন দেশে কলম উজাড়

www.pathagar.com

করে তিনি লিখেছেন তীর্যক ভাষায়। কখনও রিপোর্টিং, কখনও উপসম্পাদকীয়-সম্পাদকীয়, কখনো কলাম। আবার কখনও 'গুলবাজখাঁর হপ্তানামা' নামে জনপ্রিয় কলামও। সে সময় সাংবাদিকতা ঠিক পেশা হিসেবে ছিল না। ছিল সামাজিক দায়িত্ববোধ উৎসারিত। সময়ের আবেগ তাড়িত। ভালবাসার বিশেষ টান। সেটিই পর্যায়ক্রমে পেশাদারী দায়িত্বে রূপ নেয়।

এভাবে তিনি সময়ের সাথে নিজেকে বদলে বদলে নিয়েছেন। কাজ করতে করতেই তিনি একাডেমিক লেখাপড়া শেষ করেছেন। বিচরণ করেছেন জ্ঞান ও শিক্ষার বিভিন্ন চারণ-ভূমিতে। গ্রহণ করেছেন বিচিত্রমুখী শিক্ষা। দেশের প্রতি ভালবাসা, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, জনগণের প্রতি মমত্বই কি তাঁকে ইতিহাসমুখি করে তুলেছে? প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়েছে হতভাগা জাতির সামনে তার গৌরবোজ্জল ইতিহাস তুলে ধরার, কবি আল মাহমুদ যাঁকে বলেছেন 'জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠক ও পুনরাবিষ্কারক'।

এখন ইতিহাস চর্চা তাঁর মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাঁর ভিতরে বহুমাত্রিক স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, তাঁর শিখা ছড়িয়ে যেতে থাকে নানান মাত্রায় বিভিন্ন দিকে। এজন্যে লেখক-সত্তা স্ফূরণের শুরুতেই তিনি লিখে ফেলেন পুলিশদের হ্যান্ড বুক। সেই ১৯৮৩ সালে 'বাংলাদেশের পুলিশ'। এ বইটি সে সময় আইনরক্ষাকারীদের জন্য অত্যন্ত কেজো বই হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিভিন্ন মাত্রার লেখালেখি এর মাঝেও চলতে থাকে। এর বেশ কিছু পরে ১৯৯০-এ বেরোয় গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তিকা 'গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি'। এ পুস্তিকা তাঁকে অন্য আরেক পরিচয়ে অভিষিক্ত করে।

কিন্তু মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের অন্তর্জগতের রক্তক্ষরণ বহু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে খুলে দিয়েছিল তাঁর দেখার অন্তর্দৃষ্টি। নিরাসক্ত নির্মোহ এক বোধ নিয়ে বিবেকের তাড়নায় তিনি তখন নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন নিবিড় ইতিহাস চর্চায়। গবেষণার উপর পুস্তিকা প্রকাশের এক বছরের মাথায় প্রকাশ পায় তাঁর ইতিহাস গবেষণায় গভীরতার স্বাক্ষর 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'। এ বইতে এ কোন্ ইতিহাসের সন্ধান তিনি দিয়েছেন? বাঙালীর মুক্তির সংগ্রাম চলছে দিনের পর দিন। যুগ যুগ ধরে চলছে জনগণের এই সংগ্রাম। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধ।

এরপরই শিশু-কিশোরদের জন্য অসাধারণ বই প্রকাশ পায় 'এই আমার বাংলাদেশ'। এরপর 'জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'। পুরোনো দিনের কলামগুলোর সংগ্রহ নিয়ে বাজারে আসে 'গুলবাজ খাঁ'র হপ্তানামা'।

ইতোমধ্যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের পেশা বদল হয়েছে। তিনি যোগ দিয়েছেন একটি বেসরকারী ব্যাংকে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে। সেখান থেকেই পুরোদমে ব্যাংকার। শাখা ব্যবস্থাপক, ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান, প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং উইং-এর প্রধান, বিনিয়োগ উইং-এর প্রধান। ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের একজন। একজন লেখক-সাংবাদিক শুধুমাত্র সাধারণ ব্যাংকারের মত জীবন ও কর্ম নির্বাহ করতে পারেন না। এক্ষেত্রেও তাঁর সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বহুমাত্রিকতার প্রকাশ দেখা যায়। প্রকাশ পায় উলেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বই 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' এবং 'সৌদী আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা'। ব্যাংকার হিসেবে ইরান সফরের অভিজ্ঞতা 'পারস্যের প্রান্তরে'। আমার জানা মতে, আরো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে।

৩.

সব পরিচয় ছাপিয়ে আমার বিশ্বাস, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন লেখক যিনি বিবেকের তাড়নায় সত্যের অনুসন্ধান করেন। এক্ষেত্রে লেখক-সত্তায় তিনি সমাজ-বিচ্ছিন্ন শিল্পবাদী নন, তিনি আদর্শের প্রতি সনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধানী বেদুইন। আর এ জন্যেই তিনি যে ধরনের সাহিত্যই রচনা করুন না কেন তা তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টিশীলতার আধার হিসেবে উপস্থাপিত হয়। পাঠক আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করে। মুখোমুখি হয় নিত্য-ইতিহাসের। আমিও অপেক্ষায় থাকি তাঁর ইতিহাস থেকে পাঠ নেয়ার জন্য, যা আমাকে কথাসাহিত্যে অনুপ্রাণিত করে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে।

www.pathagar.com

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'-এর লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ব্যক্তি ও অভিব্যক্তি

রিয়ার এডমিরাল এম. এ. তাহের এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ)

সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার' কর্তৃক সংবর্ধনা স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এ কারণে যে, সত্যিকার একজন ঐতিহাসিক ও লেখককে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থখানি আমি আদ্যপান্ত পড়ে অভিভূত হয়েছি। একজন লেখক হিসেবে তিনি ইতিহাসকে সঠিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি ঘটনার বিশেষণ করেছেন এবং এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্মুখের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য বিড়ম্বনার করুণ অধ্যায়সমূহের সঠিক চিত্র এ গ্রন্থের পরতে পরতে অঙ্কিত হয়েছে। এ সকল তথ্য ও বিশেষণ আমাদের জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের হাতে এ গ্রন্থখানি গুরুত্বের সাথে তুলে দিতে হবে – যাতে তারা ভবিষ্যত বাংলাদেশের অবকাঠামো গঠনে সঠিক প্রেক্ষাপটে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির জাতীয় ইতিহাসের নানা অধ্যায়, আদি-অন্ত ইতিহাস জেনে বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে সত্যের অবতারণা বর্তমান সময়ে খুবই দুরূহ ব্যাপার বলে আমি মনে করি। গভীর বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এই 'মরু গিরি কান্তার' পার হয়ে এই দুরূহ কাজটি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এ কাজের প্রত্যাশায় জাতি সত্যিই উন্মুখ ছিল।

'বঙ্গভঙ্গ' আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক পটভূমিকা – যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির স্মরনিকা, আলোকবর্তিকা। যারা 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ'-এর কথা বলে মাতম করেছেন–তারা ইতোপূর্বেকার তিন-তিনবার মানচিত্রের পরিবর্তনকে প্রশাসনিক পরিবর্তন বলে মেনে নিলেও, ঢাকায় রাজধানী করে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনার বিষয়টিকে মেনে নিতে আপত্তি তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা করেন তারাই, যাতে পূর্ব বাংলা তাদের সমপর্যায়ে যেতে না পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিম জমিদারগণের নিকট থেকে সুকৌশলে কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা জমিদারীর দখলদারিত্ব অর্জন করেছিল বলেই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তারা নতুন প্রদেশ তথা পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশের বিরোধিতা করে এবং তা রদ করতে সমর্থ হয়। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভাঙ্গন ও বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। তা আজো জোড়া লাগেনি।

এসব যুগান্তকারী ঘটনার যথার্থ উপস্থাপন আমাদের দেশ, জাতি, জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে – যা বর্তমান সময়ের বড় দাবী।

আমি মনে করি, ঢাকা কেন্দ্রিক ইতিহাসের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি উপস্থাপিত করেছেন তা সত্যাশ্রিত ও সরলতায় পূর্ণ। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও পক্ষপাতহীন উপস্থাপনা গ্রন্থটিকে অমরতা দান করেছে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সফলতা এই যে, অধিকাংশ বর্ণ হিন্দু লেখকের লেখা থেকেই তিনি সকল ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করেছেন–যা গ্রন্থটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা দান করেছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর চিন্তা, চেতনা এবং তৎপরতায় গ্রন্থটিকে দেশ ও জাতির কল্যাণে উপস্থাপনের যে সুকঠিন ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন–তা সফল ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর এ প্রতিদান সমগ্র জাতি যেন বুকে ধারণ করে অগ্রসর হতে পারে, আমাদের এ চেষ্টা করতে হবে। তাঁর সমগ্র জীবন আমাদের জন্য যেন আরো পথ ও পাথেয় সৃষ্টি করতে পারে, সেজন্য দোয়া করছি। আলাহ তাঁকে এ পরিশ্রমের সকল পুরষ্কার দান করুন। আমীন।

লেখক : রিয়ার এডমিরাল এম. এ. তাহের, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ)
সাবেক নৌবাহিবী প্রধান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী

www.pathagar.com

সেদিনের তরুণ সাংবাদিক আজকের ইতিহাস গবেষক-ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

গিয়াস কামাল চৌধুরী

অধ্যবসায়, পরিশ্রম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও কঠোর অনুশীলন একজন মানুষকে সাফল্য এনে দেয়। সফলতার চাবিকাঠি একজন মানুষ খুব সহজে পায় না। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সৎ হিসেবে আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে প্রথম দেখি। সে সময় তিনি বয়সে আরো তরুণ ছিলেন। এখনও তরুণই। একজন তরুণ সাংবাদিকের যা যা গুণ দরকার সবই আবদুল মান্নানের মধ্যে ছিল। একটু বেশিই ছিল। আড্ডাবাজ, সদা হাস্যোজ্জ্বল, জনদরদী, সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়ার অসম্ভব ক্ষমতা তাঁর মাঝে দেখেছি। রিপোর্টিং-এ তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রিপোর্টার। তাঁর অনেক প্রতিবেদন সত্তরের দশকেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নেতৃত্ব দেয়ার সহজাত প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে কাজ করতো। এখনও করে বৈ কি। বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে)-এ তিনি সহকারী মহাসচিব-এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৮০-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন ১৯৭৭ সালে। ১৯৬৭ সালে যে তরুণ এসএসসি পরীক্ষা দেয়, সেই তরুণের ১৯৭৭ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, পঞ্চাশোর্ধ অনেক প্রতিথযশা সাংবাদিক আছেন, যারা এখনও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন নি। অথচ নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমী সাংবাদিক হিসেবে তরুণ বয়সেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একমুখী জীবন পরিচালনায় বিশ্বাসী নন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবদুল মান্নান রিপোর্টিং-এ যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শুধু তা-ই নয়, তিনি একজন সৃজনশীল মানুষ। সৃষ্টির নেশা তাঁকে তাড়িত করে। অক্লান্ত আবদুল মান্নান সারাদিন জীবন-জীবিকার জন্য পরিশ্রম করলেও রাতে তিনি ঠিকই সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৃষ্টি সুখের উলাসে মেতে ওঠেন বলেই আমরা তাঁর বেশ কিছু অসামান্য গ্রন্থ পেলাম। এ মুহূর্তে যে গ্রন্থগুলো দেখছি তা হল : বাংলাদেশের পুলিশ (১৯৮৩), ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি (১৯৮৮), বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা (১৯৯১), আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা (১৯৯৪), সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী : একটি সরেজমিন সমীক্ষা (২০০১), এই আমার বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংকিং : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (২০০৫), বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ (২০০৭), বাংলার মুসলিম জাগরণের দুই পথিকৃত : শাহ ওয়ালী উলাহ দেহলভী ও জামাল উদ্দিন আফগানী (২০০৭), ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা (২০০৭), সোনার দেশ বাংলাদেশ, গুলবাজ খাঁ'র হপ্তানামা (রম্য রচনা) (২০০৮)।

পেশায় ব্যাংকার কিন্তু ইতিহাসের কঠিন পথে স্বাচ্ছন্দ্যে পথ চলে অনেক গবেষণা করে ঠাসা তথ্যে লিখেছেন 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'। বইটি তথ্য সমৃদ্ধ। তরুণ প্রজন্ম তাদের হারানো ইতিহাস

www.pathagar.com

জানতে এবং রেফারেন্সের জন্য এ গ্রন্থখানি কাজে লাগাতে পারে। বিশেষত ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশুনা করে সেই সব শিক্ষার্থীর জন্য এটি একটি অবশ্য পাঠ্য বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীতে জীব মাত্রই মরণশীল। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষ হারিয়ে যায় কিন্তু রেখে যায় স্মৃতি ও কাজ। যে কোনো মহৎ ও সৃজনশীল কাজ মানুষকে যুগ-যুগ বাঁচিয়ে রাখে। আর গ্রন্থ সেটি যদি হয় মহৎ তা হলে লেখক অমরত্ব লাভ করেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লেখালেখিতে যে বিষয়টি বেছে নিয়েছেন তা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। তবে যেভাবে লিখে চলেছেন তথ্য ও উপাত্তের সংযোজন ঘটিয়ে, আমরা আশা করতেই পারি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী সকল ঐতিহ্য অন্বেষণকারীর জন্য তাঁর গ্রন্থ হবে অত্যন্ত দরকারী। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লেখালেখির জগতে কালোত্তীর্ণ হবেন।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের হাত বেয়ে সমগ্র জাতি তাদের প্রকৃত ইতিহাস সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনীতির আলোকে বিশেষণসহ পাবে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মত ইতিহাস গবেষকদের আজ বড্ড প্রয়োজন। আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

গিয়াস কামাল চৌধুরী ঃ জাতীয় প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, সম্পাদক, দৈনিক খবরপত্র

www.pathagar.com

ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

মোস্তফা কামাল মজুমদার

ব্যাংকিং-এর হিসেব-নিকাশের পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা করার কথা শুনেছি। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ব্যাংকারও আছেন। কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থাপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা এবং বই রচনা সত্যি শ্রমসাধ্য কাজ। আর এ কাজেই সফল হয়েছেন আমার বন্ধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

ছাপ্পান্ন বছর বয়েসী আবদুল মান্নানের ইতিহাস গবেষণার প্রেরণা এসেছে তার জীবনের প্রথম পেশা সাংবাদিকতা থেকে। ছাত্র জীবন থেকে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হয়ে এ পেশায় তিনি প্রায় দেড় দশক বিচরণ করার পর ব্যাংকিং-এ আসেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ইতিহাস গবেষণার মূল লক্ষ্য স্বদেশের শেকড় সন্ধান।
'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ', 'সোনার দেশ বাংলাদেশ', 'পলাশী থেকে লালবাগ', 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'চার শ বছরের ঢাকা', 'আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'আমাদের শিক্ষার ইতিহাস', 'মুজিব আমলের বাংলাদেশ', 'মওলানা ভাসানীর রাজনীতি' ও 'বাংলাদেশের পুলিশ' আবদুল মান্নানের শেকড় সন্ধানী গবেষণার ফসল।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত ১৬টি গ্রন্থের মধ্যে আরো রয়েছে সৌদি আরব ও ইরান সফর-ভিত্তিক বই - 'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা', ভ্রমণ কাহিনী 'পারস্যের প্রান্তরে' এবং 'ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা'। তিনি আরো প্রায় তিন ডজন বইয়ের কাজ হাতে নিয়েছেন।

প্রশ্ন আসতে পারে, স্বদেশের শেকড় সন্ধানে কতটুকু সফল হয়েছেন। এখানে যে কথাটা প্রাসঙ্গিক তা হল সমসাময়িককালে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের কাজ যখন শুরু হয় তখন এ নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। কখন থেকে এ ইতিহাসের পত্তন হয়েছে? অনেকে বলতে চেয়েছেন, 'আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের শুরু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে, তার আগে কি হয়েছে জানতে চাই না' ইত্যাদি। ইতিহাস রচনার ব্যাপারে একটা কথা প্রচলিত আছে। যে কোন বিষয় বা ঘটনা নিয়ে তাৎক্ষণিকের বা অল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা ইতিহাস আবেগে আপুত হতে বাধ্য। তাই আবেগ থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক শর্তের মধ্যে একটা হল একটু সময় নিয়ে সব কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশেষণ করে লেখা। কোন ঘটনা সম্পর্কে কে কখন লিখেছেন তার উপরও নির্ভর করে, লেখাটি আবেগতাড়িত না-কি বস্তুনিষ্ঠ। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সাধারণভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সূত্র ধরে এগিয়েছেন। তার লেখা বাংলাদেশের মানুষের স্বপক্ষে। একজন দেশপ্রেমিকের।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখার বৈশিষ্ট্য হল তার সব যুক্তি-তর্ক দালিলিক সমর্থনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তথ্যনির্ভর হওয়ায় তার বইগুলো ভবিষ্যতে গবেষণার কাজে আসবে। ইতিহাস গবেষণায় তার সাফল্য এসেছে তার মূল পেশা ব্যাংকিং-এ সফলতার পাশাপাশি। প্রায় পাঁচ বছর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের জনসংযোগ বিভাগে কাজ করার পর তিনি একই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ব্যাংকিং শুরু করেন। সফল ব্যাংকার হিসেবে দু'বার স্বর্ণ পদক পেয়ে পেশায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সফলতার সিঁড়ি বেয়ে বর্তমান পদে আসীন হয়েছেন। বলা যায়, আবদুল মান্নান তার কর্ম জীবনের এক সন্ধিক্ষণে উপনীত। আরো সফল অবদান রাখার তার এখনি সময়। এ ব্যাপারে তিনি সচেতন। আমরা আশা করব, তার গবেষণা লব্ধ লেখার হাত আরো প্রসারিত হবে। সাথে সাথে ব্যাংকিং পেশায়ও আসবে আরো সফলতা।

গৃহবধূ স্ত্রী ও তিন কন্যা নিয়ে আবদুল মান্নানের সুখী সংসার। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। সদা হাসিমুখ, সদালিপি ও বন্ধুপ্রিয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সবার কাছে আপন। আবদুল মান্নানের পৈত্রিক ভিটেবাড়ী নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার থানায়। ইতিহাস গবেষণায় নিবেদিত আবদুল মান্নান তার নিজস্ব পরিমন্ডল নির্মাণ করে নিয়েছেন। সুনাম কুড়িয়েছেন। এ সুনাম অব্যাহত রেখে আরো নতুন সম্মান লাভ করবেন–এটাই সবার কাম্য।

মোস্তফা কামাল মজুমদার ঃ সম্পাদক, ইংরেজী দৈনিক নিউ নেশন

www.pathagar.com

সাংবাদিক মান্নান ভাই দক্ষ নেতা ও সাচ্চা রিপোর্টার

সালাহউদ্দিন বাবর

কুঁড়েঘরে শুয়ে প্রাসাদের স্বপ্ন দেখা। বহু ব্যবহৃত একটি প্রবাদ বাক্য। প্রবাদ বাক্য হলেও এমন স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। আবার এমন লোকও আছেন, প্রাসাদে শুয়ে কুঁড়েঘরের স্বপ্ন দেখেন। আক্ষরিক অর্থে না হলেও মানসিকভাবে তারা এমন চেতনাকে ধারণ করেন। এমন চেতনার একজন ধারক ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় তিন দশকেরও বেশি সময় আগে যখন তিনি ছিলেন যুব নেতা, সাংস্কৃতিক সংগঠক এবং বোদ্ধা লেখক। এর পর তিনি হয়ে ওঠেন পুরোদস্তুর একজন পেশাদার সাংবাদিক। অবশ্য তাঁর সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল যৌবনের প্রারম্ভে পাকিস্তান আমলে।

মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার বহু স্মৃতি জড়িত। তিনি একটি যুব সংগঠনের নেতা, আর আমি তাঁর একজন কর্মী ছিলাম। সে সময়ই সংগঠক হিসেবে তাঁর প্রশংসনীয় দক্ষতা লক্ষ্য করেছি। সংগঠনের প্রতি তাঁর যে মমতা ও ত্যাগ আমি দেখেছি, সেটা অতুলনীয়। তিনি একা নন, তাঁর পরিবারের সবাই প্রাণ উজাড় করে সংগঠনের কাজ করেছেন। ইয়ংমেন্স মুসলিম এসোসিয়েশনের নেতা হিসেবে ১৯৭৫-এর পূর্ববর্তী বাকশালের দিনগুলোতে এমন কাজ করা যে কত কঠিন ও প্রতিকূল ছিল তা এখন কল্পনাও করা যাবে না। মান্নান ভাইকে তখন দেখেছি অকুতোভয় যুব নেতা হিসেবে। সার্বক্ষণিক একটি অস্থিরতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করতাম। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, গণমানুষের দুর্ভোগ, নানামুখী আগ্রাসনের কারণেই তাঁর মধ্যে এই অস্থিরতা বিরাজ করত।

সাংবাদিক হিসেবে তাঁকে প্রথম দেখি সাপ্তাহিক সোনার বাংলার নির্বাহী সম্পাদকরূপে। এরপর পাই অধুনালুপ্ত ঐতিহ্যবাহী দৈনিক আজাদের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে। প্রাচীনতম দৈনিক আজাদ দেশের অসংখ্য সাংবাদিক তৈরির সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। তারপর তিনি যোগ দেন দেশের অন্যতম প্রাচীন দৈনিক সংগ্রামে। সেখানে এক সাথে দীর্ঘ সময় কাজ করেছি আমরা। তিনি সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার, সে সময় তাঁকে ঘিরে রয়েছে আমাদের অনেক স্মৃতি।

১৯৮০ সালের ২৩ মে খন্দকার মোশতাক আহমদের পল্টনের জনসভায় যে বোমা হামলা হয়, সে স্মৃতি ভুলবার নয়। ঘটনার আগের দিন সভাকে সফল করার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ও মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মান্নান ভাই তা কাভার করার জন্য এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন আমাকে। সন্ধ্যায় অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লিখে তাঁর কাছে জমা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রিপোর্টারের স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে মান্নান ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, মোশতাকের জনসভা কাভারের যে টিম হবে, তাতে আমাকে রাখার জন্য। তিনি মৃদু হেসে বললেন, আপনার এ্যাসাইনমেন্ট পার্লামেন্টে, আমি নিজেই যাব জনসভা কাভার করতে। সাথে মাসুদ নিজামী ও সামাদ থাকবে (নিজামী ভাই ও সামাদ আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন, আজ তাঁদের কেউই এ পৃথিবীতে নেই)।

মোশতাকের জনসভা নিয়ে নগরীতে নানা গুঞ্জরন ছিল। তাই জনসভা কাভারের বিষয়টি হয়ে উঠেছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি তখন একজন জুনিয়র রিপোর্টার। সভার গুরুত্বের কারণেই সম্ভবত সেদিন আমার পরিবর্তে অপর দুই সিনিয়র রিপোর্টারের সাথে মান্নান ভাই নিজেই গিয়েছিলেন এ্যাসাইনমেন্টটি কাভার করার জন্য।

আমি যথারীতি পার্লামেন্ট কাভার করতে চলে গিয়েছিলাম। আসরের নামাজের বিরতির সময় সংসদে খবর এলো, খন্দকার মোশতাকের জনসভায় গ্রেনেড হামলা হয়েছে। তাতে সাংবাদিকসহ বহু লোকের হতাহত হবার ঘটনা ঘটেছে। আমরা সাংবাদিকরা সংসদে আমাদের সহকর্মীদের জন্য দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি সংসদ থেকে অফিসে টেলিফোন করে আমাদের সহকর্মী যারা সভা কাভার করতে গিয়েছিলেন তাদের খবর জানতে চাইলাম। ফোনের অপর প্রান্তে সংগ্রামের টেলিফোন অপারেটর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বললো, 'আমরা শুনেছি, আমাদের চীফ রিপোর্টার স্যার আর বোধহয় বেঁচে নেই'।

www.pathagar.com

এ খবর পেয়ে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ছুটে আসলাম পার্লামেন্টের প্রেস গ্যালারিতে। সেখানে দায়িত্বপালনরত আমার সহকর্মী আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুকে মান্নান ভাইয়ের খবর জানিয়ে বললাম, "আমি আর থাকতে পারছি না, আপনি কষ্ট করে একাই সংসদ কাভার করুন। আমি ফিরে যাচ্ছি অফিসে।"

দ্রুতবেগে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে অফিসে ফিরছিলাম আর ভাবছিলাম, আমিতো জনসভায় যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মান্নান ভাই আমাকে না পাঠিয়ে নিজেই সেখানে গিয়ে জীবনকে বিপন্ন করলেন। একথা ভেবে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারছিলাম না।

অফিসে ফিরে দেখলাম, মান্নান ভাইকে রিপোর্টিং ডেস্কে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শুনলাম আহত হবার পর তাকে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর তিনি সব কিছু অগ্রাহ্য করে সাথিদের সহযোগিতায় সরাসরি অফিসে চলে আসেন। এখন স্থানীয় একজন ডাক্তার তাঁকে শুশ্রুষা করছেন। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দুই পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁর এ অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সাথে সাথে আলাহর শোকর আদায় করলাম। যে খবর পেয়েছিলাম তা সত্য হয় নি। আর অপর দুই সহকর্মী মাসুদ নিজামী ভাই ও আবদুস সামাদ ভাই অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

কিছুক্ষণ পর আবারো অবাক হওয়ার পালা। আমাদের অফিসের প্রবীণ পিয়ন সাত্তার ভাইকে (মরহুম) লক্ষ্য করে মান্নান ভাই বলেন, "সাত্তার ভাই, আমাকে প্যাড আর কলম দিন। আমি জনসভায় গ্রেনেড হামলার ওপর বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করব।"

আহত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে তিনি গ্রেনেড হামলার ঘটনাটি নিয়ে একটি অপূর্ব চিত্রধর্মী রিপোর্ট রচনা করলেন। সভার পুরো একটি দৃশ্য পাঠকের সম্মুখে ওঠে আসে সে রিপোর্টে। পরদিন অন্যান্য জাতীয় দৈনিকের কোনটিই এমন চমৎকার ব্যতিক্রমধর্মী রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারে নি। একজন সাচ্চা রিপোর্টারের ভূমিকা এমনই হয়।

মান্নান ভাই সে সময় শুধু একজন প্রখ্যাত রিপোর্টারই ছিলেন না, সাংবাদিকদের নেতাও ছিলেন। আজকে আমরা সাংবাদিকরা দুঃখ করি, আমাদের এই পেশায় যারা ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন, পেশাগত দিকে তাদের তেমন কোন অবদান নেই। কিন্তু সে সময় সাংবাদিক নেতা হিসেবে তারাই নির্বাচিত হতে পারতেন, যারা পেশায় দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত। মান্নান ভাই ১৯৮০ সালে সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ ফোরাম বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে)-এর সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে প্যানেল থেকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তৎকালীন দৈনিক বাংলার নির্বাহী সম্পাদক জনাব আহমেদ হুমায়ুন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন ভাই ছিলেন আমাদের পেশার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এক মিডিয়া পার্সোনালিটি। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আজকে সাংবাদিক ইউনিয়ন বিভক্ত, অথচ সেদিন এমন বিভাজন সাংবাদিকদের মধ্যে ছিল না। ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়নের নেতা নির্বাচিত হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। পেশার মর্যাদা ও সাংবাদিকদের রুটিরুজির আন্দোলনে যারা সত্যিকার অর্থেই নিবেদিত তারাই শুধু নির্বাচিত হতে পারতেন। মান্নান ভাই সে মানের সাংবাদিক ছিলেন।

সংবাদপত্রে যারা কাজ করেন তারা এ পেশায় বুঁদ হয়ে যান বা ভালবাসায় মাতোয়ারা হয়ে যান। কিন্তু কেন? আজো আমি এর কারণ আবিষ্কার করতে পারিনি। আমার কোন সহকর্মী তা পেরেছেন কিনা তাও জানি না। আমি নিজে কখনো সাংবাদিক হতে চাইনি। কিন্তু সাংবাদিক হয়ে যাওয়ার পর এখন মনে হয় এর বাইরে আর কিছুতেই আমি শান্তি পেতাম না। ঢাকার নবাব পরিবারের এক সদস্যের সাথে আমার পিতার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সে সুবাদে তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমার জন্য তিনি দু'বার দুটি ভাল চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আর কিছু দিন সাংবাদিকতা করে তবে ভিন্ন চাকুরীতে যাব। জবাবে নবাব পরিবারের আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি বলেছিলেন, 'তুমি এ পেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, এ থেকে তুমি কখনই বেরুতে পারবে না।'

এ কথা আমার জীবনে সত্যি হয়ে গেছে। এ জন্য আমার দুঃখ নেই বরং তৃপ্তি রয়েছে। আমার এই তৃপ্তির ভাগিদার যদি আর কাউকে করতে হয়, তবে যে নামটি উচ্চারণ করতে হবে, সেটা মান্নান ভাইয়ের নাম। সংবাদপত্রের চৌহদ্দিতে তিনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৭৪-এর দিকে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, মান্নান ভাই তখন

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক সোনার বাংলার নির্বাহী সম্পাদক। সোনার বাংলায় আমার প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। এ লেখাটি তৈরি করার জন্য মান্নান ভাই আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর আরও বহু লেখা তৈরি করে মান্নান ভাইকে দিতে হয়েছে। এভাবেই তিনি আমাকে সাংবাদিকতার মধ্যে টেনে নিয়ে যান।

এ লেখার পাঠকদের মধ্যে হয়ত এমন প্রশ্ন তৈরি হতে পারে ঃ মান্নান ভাই সাংবাদিকতা ছেড়ে চলে গেলেন কেন? এর সঠিক জবাব হয়ত মান্নান ভাই দিতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় প্রচন্ড একটি দুঃখবোধ ও অভিমান নিয়ে তিনি সংবাদপত্রের দফতর ছেড়েছেন। এ লেখার শুরুতে বলেছি, অনেকে প্রাসাদে শুয়েও কুড়েঘরের শান্তির কথা ভাবেন। আমি জানি তিনি সেই চেতনার মানুষ। আজকে তার অর্থ-বৈভবের কোন কমতি নেই। কিন্তু তারপরও হৃদয়ের গভীর তলদেশে যে শীতল স্রোতস্বিনীটি বহমান, তাতে তিনি গভীর মমতায় যে তরীটি ভাসান, তা নিউজপ্রিন্টে তৈরি। এখন তিনি বহুতল ভবনের সুসজ্জিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসকক্ষে বসে কাজ করেন। কিন্তু এর আগে তিনি র‍্যাংকিন স্ট্রীট, ঋষিকেশ দাস রোড, কেজি গুপ্ত লেন, বাংলা বাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, আরমানী টোলা, ঢাকেশ্বরী রোড, বংশাল রোড ও মগবাজারে সংবাদপত্রের অতি সাধারণ অফিস কক্ষের ততোধিক সাধারণ চেয়ার টেবিলে বসে গরমে ঘেমে কাজ করেছেন। সেই দিনগুলোকে তিনি কোনভাবেই ছোট করে দেখেন না। সে সব দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতেই তিনি বরং বেশী আনন্দ বোধ করেন। এখনো রিপোর্টার জীবনের স্মৃতি স্বপ্নের মাঝে তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

আমরা সাংবাদিকরা বিশেষ করে রিপোর্টাররা প্রতিদিন ঘটে যাওয়া দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাগুলো নিয়ে শব্দের মালা গাঁথি। এসব লেখা ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। আগামী দিনের ইতিহাস রচয়িতা বা গবেষকদের জন্য তা মূল্যবান দলিল। কিন্তু তারপরও এসব রিপোর্টের কোন স্থায়ী মূল্য নেই। মান্নান ভাই একজন জাত রিপোর্টার ছিলেন। সেই সাথে তাঁকে দেখেছি একজন ইতিহাস সচেতন মানুষ হিসেবে। এই সচেতনতা তাঁকে ইতিহাসের একজন বোদ্ধা পাঠকই করেনি, ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আর ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব লক্ষ্য করার মত।

মান্নান ভাই ইতিহাস রচনা ও বিশেষণ করেছেন একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি নিজে ইতিহাসের শিক্ষাকে উপলব্ধি করেছেন; সে সম্পর্কে নিজস্ব বিশেষণ দিয়ে জাতিকে সতর্ক করেছেন ও পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেই মান্নান ভাইয়ের বিশিষ্টতা। উচ্চ পদস্থ ব্যস্ত ব্যাংকার হয়েও তিনি নিরলসভাবে ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন। জাতির প্রতি এবং তাঁর নিজ লেখক সত্তার প্রতি সুদৃঢ় কমিটমেন্ট ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণেই এ কঠিন কাজে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত রাখতে পেরেছেন।

মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার এমন কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি রয়েছে, যা ভুলবার নয়। ১৯৮০ সালে তিনি যখন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন, সে বার আমিও বি এফ ইউ জে-এর ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। '৮১ সালের মার্চ মাসে খুলনায় বি এফ ইউ জের নির্বাহী কমিটির তিন দিনব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে উপলক্ষে আমরা সবাই খুলনা গিয়েছিলাম। প্রথম দিনটি ভালই কাটলো। দ্বিতীয় রাতে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। এ সময় আহমেদ হুমায়ুন ভাই, আনোয়ার জাহিদ ভাই, নির্মল দা (শ্রী নির্মল সেন) ও মান্নান ভাই আমার রুমে এলেন। হুমায়ুন ভাই বললেন, বাবর আপনার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি রাতেই ঢাকায় চলে যান। মান্নান আপনার সাথে যাবেন।

সে রাতে মান্নান ভাই পরম স্নেহে আমাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। সারা পথে আমাকে বুঝতে দেননি যে, আমার পিতা সে রাতে মারা গেছেন। ঢাকার বাড়িতে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি পিতৃহারা হয়েছি। সেদিন মান্নান ভাইকে দেখেছিলাম একজন স্নেহপ্রবণ অভিভাবক হিসেবে।

এ সব ছাড়াও মান্নান ভাইকে নিয়ে আরো অনেক কথাই রয়েছে, যা লেখা যেত। কিন্তু সব কথা ধরানোর মত জায়গা কোথায়?

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক- দৈনিক নয়াদিগন্ত

www.pathagar.com

একজন শেকড় সন্ধানীর কথা

মাসুমুর রহমান খলিলী

সাংবাদিক গবেষক ব্যাংকার এই তিন পেশার সফল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হয় গভীরে অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য ও তথ্যকে উদঘাটিত করা। এ কাজে তিনি যত সফল হন পেশাগত জীবনে সাফল্যটাও তত বেশি আসে। এজন্য প্রয়োজন হয় গভীর অনুসন্ধিৎসা, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা আর প্রকৃত সত্যে পৌছানোর ঐকান্তিক ইচ্ছা। এসব বৈশিষ্ট্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে সাফল্যের অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। নিজে রিপোর্টার ছিলেন শুধু তাই নয়, রিপোর্টারদের শিক্ষকও ছিলেন। সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখা প্রশাখাতেও তার বিচরণ ছিল একইভাবে। তিনি কলাম লিখেছেন, লিখেছেন রম্য রচনা, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়। আবার মানুষের সুখ দুঃখের চিত্র তুলে ধরেছেন রিপোর্টিং এর মাধ্যমে। এরপর ব্যাংকিংকে যখন পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন তখন কর্মক্ষেত্রে তাকে দেখা গেছে একজন পরিপূর্ণ ব্যাংকার হিসাবে। ব্যাংকিংয়ের রীতিনীতি, প্রকল্প মূল্যায়ন, ব্যবসার সম্ভাব্য লাভ ক্ষতির মূল্যায়ন, আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রহিতা নির্বাচন সবক্ষেত্রে ঐকান্তিক থেকে তিনি ব্যাংকিং পেশার শীর্ষ পর্যায়ে পৌছেছেন। গবেষক হিসাবে তিনি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন হয়ত নিজের অজান্তেই। ইতিহাসের মিসিং লিংকগুলো তুলে এনে তিনি এমনভাবে পরম্পরা সাজিয়েছেন যাতে তার গবেষণার ফল সম্পর্কে কেউ দ্বিমত প্রকাশ করলেও তাকে উপেক্ষা করার সুযোগ পাবেন না। কারণ সত্যের প্রতি অনুগত ইতিহাসবিদকে উপেক্ষা করা যায় না।

লেখক আবদুল মান্নানের আনুগত্যটা যেন একান্তভাবে তার প্রিয়– দেশ মাটি ও মানুষের প্রতি। এ কারণে তিনি অন্ধকার নিয়ে চর্চা করেননি। চেয়েছেন জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়াকে অমোঘ ভাবার হঠকারিতার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন। তার 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' পড়ে এ দেশের শিশু কিশোররা মসলিন যুগের স্মৃতিতে ফিরে গিয়ে স্বপ্নলক্ষ্য অর্জনের জন্য দীপ্তিময় হতে পারবে। হাজার বছর আগে সন্দ্বীপে জাহাজ নির্মাণের কাহিনী জানতে পারবে। জাতিকে স্বপ্ন দেখানোর মানুষের প্রচন্ড অভাবের মধ্যে আব্দুল মান্নান এগিয়ে এসেছেন। পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি জাতির প্রতি করণীয়কে ভুলে যাননি কোন সময়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা', 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা' বা 'বঙ্গবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'– প্রতিটি বইয়ে পাওয়া যায় এক শেকড় সন্ধানী ইতিহাসবিদের সত্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার অনুসন্ধানী মূল্য যেমন অনেক তেমনি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনুদঘাটিত সত্যে উপনীত হবার গবেষণা মূল্যও কম নয়। একই সাথে সংস্কৃতির পরিচয় নির্ণয়েও এসব বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বর্তমান পেশাগত পরিচয় ব্যাংকার। একটি সফল ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় পদে কর্মরত রয়েছেন তিনি। ব্যাংকিং এর উপর একটি আলোচিত বইও রয়েছে তার। রিপোর্টার হিসাবেও তিনি আলোচিত, খ্যাতিমান। আবার গবেষক হিসাবেও তার মূল্যায়ন হবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একান্তভাবে একাডেমিক গবেষণার ছকে তার ইতিহাসের সত্য সন্ধানী বইগুলো লিখেননি। তিনি গবেষণার রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। এর উপরও তার গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে। তিনি হয়ত সচেতনভাবে একাডেমিক গবেষণায় যেতে চাননি। তবে গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামোতে ফেললে প্রতিটি বইয়ের জন্য তিনি পিএইচডি'র মত ডিগ্রী পেতে

www.pathagar.com

পারতেন। হয়তবা একাডেমিক ডিগ্রীর চাইতে তিনি সত্য এবং নিজ জাতি ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় অনুসন্ধানকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

কর্মজীবনের শুরুতে আব্দুল মান্নান যখন সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন তখনও তার লেখার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। সংবাদপত্রের চলমান নানা বিষয়ের উপর এ সময় তিনি লিখেছেন। সমাজ সংস্কৃতি সংকট ইত্যাদি তার লেখায় এসেছে। রম্য রচনা লিখে সমাজের, রাষ্ট্রের, শাসকদের অসংগতিগুলোকে তিনি নির্দেশ করেছেন। তার এ সময়ের কিছু লেখা নিয়ে 'গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা' নামে একটি বই প্রকাশ হয়েছে। ১৯৭৪ এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জুন পর্যন্ত সময়ে ছদ্মনামে লেখাগুলো সে সময়ের সমাজ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। ৭৪ এর দুর্ভিক্ষের আগে এক ভয়াবহ বন্যায় সর্বস্বান্ত হয় বাংলাদেশের হত দরিদ্র বিপুলসংখ্যক কৃষিজীবী। স্বাধীনতা উত্তরকালের নজীরবিহীন মূল্যস্ফীতিতে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরেই যখন অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য তখন বন্যা ও খরার ধাক্কা '৭৬ এর মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি করে স্বাধীন বাংলাদেশে। দেশের মানুষেরা খেয়ে না খেয়ে যখন রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা তখন শাসক কূলের ভাবনা চিন্তা আর বাস্তব কর্মকান্ডের অবস্থাটা ফুটে উঠেছে 'বন্যায় কন্যাদান' শীর্ষক রম্য লেখায়। লেখার শুরুটা ঠিক এরকম ঃ

'সারা দেশটায় তুলকালাম কারবার শুরু হইছে। যেদিকে যাই খালি দেখি আনন্দের জোয়ার। খুশির ঝর্ণা, মউজের তুফান, আর ফুর্তির হ্যারিকেন। চারিদিকে নাচানাচির ঢল। আন্ধাইরা নাচ, বান্দইরা নাচ, আমড়া নাচ, কাঠাল নাচ, কুমড়া নাচ, পাতিল নাচ, হাতি নাচ, লাম্বা নাচ, খাড়া নাচ।..... চারিদিকে শুরু হইছে রুনা লায়লা রজনী, ববিতা সন্ধ্যা, আলভিয়া দুপুর, রাজ্জাক বিকাল, কবরী সকাল, আজাদ রহমান নাইট, নট নটিদের ফাইট।' পরেই এক জায়গায় বলা হচ্ছে– 'আপনারা বন্যারে অভিশাপ দিয়েন না। বরং দোয়া করেন, দেশ থেইকা এই বন্যা যেন আর না যায়। আরো বন্যা, বেশি বন্যা আহুক । বন্যা যত বেশি হৈব, ততই বেশি বেশি নাচ দেখন যাইব। মউজ করণ যাইব।' শেষটা ঠিক এভাবে– 'আসেন সবাই মিলে নিবেদন করি, এসো বন্যা, এদেশে তুমি প্রলয় হইয়া আস। কেয়ামত হইয়া আস!!"

চুয়াত্তর এর দুর্ভিক্ষের সমাজ বাস্তবতা বুঝবার জন্য এ ছোট্ট রম্য লেখা গবেষকদের জন্যও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সে সময়ের দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং মন্ত্রী মিনিস্টারদের কর্মকাণ্ডে তথ্যগত বর্ণনার সাথে এ রম্য রচনাটিকে মিলালে অদ্ভূত মিল পাওয়া যাবে। এ সময়ের কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট সংকট, অভাব দুর্ভিক্ষ, সতিত্ব বিকিকিনি, মন্ত্রি তনয়দের দাপট অনাচার, ক্ষমতার জোরে লুটপাট, মজুতদারি মুনাফাখোরিসহ নানা অসঙ্গতি তিনি তুলে এনেছেন রম্য ঢংয়ে। সমসাময়িককালের জাতীয় বিষয় ছাড়িয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলের নানা বিষয়ও তুলে এনেছেন তিনি গুলবাজ খাঁর হপ্তানামায়। ভিয়েতনামে আমেরিকার লেজে গোবরে দশা, কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রাম, ইন্দিরা প্রেম, ফারাক্কার পানি, হোয়াইট হাউসের হালচালসহ বিচিত্র বিষয় তিনি তুলে এনেছেন ৭৫ পূর্ববর্তী নানা লেখায়। সাহিত্যের নানা শাখার মধ্যে রম্য লেখার শক্তিকে একটু আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। আবদুল মান্নানের লেখায় রম্যের অসাধারণ তিক্ষ্ণতা ও শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তার অগ্রজ সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমেদের লেখায় যেমন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মিশেল করা এ রকম তিক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায় তেমনটি পাওয়া যায় আবদুল মান্নানের লেখায়ও।

ইতিহাস চর্চায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের স্বকীয়তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'বাংলা ও বাঙালীঃ মুক্তির সংগ্রামের মূলধারা' বইটিতে। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বইটির যথার্থই মূল্যায়ন করে বলেছেন যে, 'এ অঞ্চলের মানুষের একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা যেটি পাল আমল থেকে গড়ে উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও সতর্ক বিবেচনা রয়েছে এই বইয়ে। বইটি এই ক্ষেত্রে পথিকৃত বলা যেতে পারে।' এই বইটিতে বাংগালীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি দিয়ে শুরু করে ১৭৫৭ সালে স্বাধীন বাংলার পতন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস-সংস্কৃতিকে তুলে এনে একটি পরম্পরায় সাজিয়েছেন তিনি। এ দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও বই পুস্তক থেকে তিনি প্রকৃত সত্যকে তুলে এনে বাঙালী মুসলমানদের স্বাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অবলোকন ও বিচার করেছেন। তার এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রচলিত ইতিহাসবিদদের অনেক বক্তব্যকে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। তবে যুক্তির বিচারে তার বিবেচনাকে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। তিনি সমসাময়িককালের ইতিহাস রচয়িতা ও পরবর্তী যুগের স্বীকৃত ইতিহাসবিদদের তথ্য থেকে উদ্ধৃত করে তার লেখার ভিত্তি রচনা

www.pathagar.com

করেছেন। 'বাংগালাহ' শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে তিনি এর নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি তুলে এনেছেন। এ ভূখণ্ড যে অত্যাচারিতদের আবাসস্থল, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাদের হাজার বছরের ইতিহাস তা বিধৃত করেছেন এভাবে ঃ

'সংস্কৃতভাষী মাত্র ৭ ভাগ মানুষ নিজেদের উচ্চ শ্রেণী বলে পরিচয় দিত এবং সে পরিচয়ে আধিপত্য চালাত তিরানব্বই ভাগ নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপর। এই অবজ্ঞাত তিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ যাদের পরিচয় ছিল 'বাংগালাহ' তারাই ছিলেন সত্যিকার বাংগালী সংস্কৃতির *ধারক।'* জনাব মান্নান এ বক্তব্য একান্তভাবে নিজের অবলোকন থেকে তুলে ধরেছেন এমন নয়। তিনি ডক্টর আহমদ হাসান দানী, ডক্টর এম এ রহীম, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, ড. মোহাম্মদ মোহর আলী, ডঃ নীহারঞ্জন রায়ের মত ইতিহাসবিদদের গবেষণালব্ধ অনুসিদ্ধান্তকে উদ্ধৃত করেছেন এখানে।

বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিগত এ ভিত্তিকে মেনে নিলে পরবর্তী ইতিহাসকে দেখা ও পর্যালোচনা করার একটি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিলোক তৈরি হয়। ইতিহাস চর্চাকারী হিসেবে এটি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের নিজস্বতা। এ ভূখণ্ডে যারা রাজকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের বিভাজন এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি করেছেন। আর্যরা এ ভূখণ্ডে এসেছেন দখলদার হিসাবে। আর অত্যাচারিত সাধারণ বাংগালীদের পক্ষ থেকে হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিরোধ।

আর্য আক্রমণে হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেছেন পাল শাসকরা। সুদীর্ঘ ৪শ' বছরের পাল শাসনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ সমর্থন যুগিয়েছে। রাজবংশের উত্থান পতনের অমোঘ নিয়মে পাল শাসন এক পর্যায়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সৌর্য-শক্তি কমার এ সুযোগে সেন বর্মনরা অভিযান চালিয়ে বাংলা অধিকার করে নেয়। পাল শাসনামলে বাংগালীরা যে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ লাভ করেছিল তার অবসান ঘটে। ডক্টর নীহারঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েই জনাব মান্নান বলেছেনঃ বাঙ্গালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ, বাঙ্গালীর এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি পাল রাজত্বের ৪শ' বছরে গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালীর অত্যাচারিত সাধারণ নৃতাত্ত্বিক অবস্থানের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের অশ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তা বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রাথমিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি করেছে। বাংলাদেশে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এ সময়। পাল রাজাদের পতনের সাথে মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতির বিষয়টি সক্রিয় ভূমিকা রাখে। অহিংস ধর্ম বৌদ্ধে বিশ্বাসী হয়েও পাল রাজারা শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্রেণী বিভাজনের অভিজাততন্ত্র তাদের আচার আচরণে ভর করে। শেষ পর্যন্ত সেন বর্মনদের আক্রমণে অবসান ঘটে পাল শাসনের। সেন রাজত্বের সূচনা বাংলার এক রাজবংশের পতনের পর আরেক রাজবংশের সূচনামাত্র ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর আধিপত্যে বিশ্বাসী সেনরা রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মচর্চায় শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। সমাজের সর্বত্র চলে ভাঙা গড়ার খেলা। এ বিভাজন-মেরুকরণ চলে বর্ণ ও শ্রেণীর ভিত্তিতে। অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতির চাবিকাঠি চলে যায় উচ্চ শ্রেণীর হাতে। সেনদের রাজত্ব কুলিন ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্টত বিভাজন তৈরি করে। সাধারণ মানুষের জীবন উচ্চতর শ্রেণীর নিপীড়নে বিপন্ন হলে শুরু হয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন সংগ্রামের ধারা। শোষিতদের পাশে এসে দাঁড়ায় ইসলামের ভাবাদর্শ। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শ সাধারণ বাঙ্গালীদের সাথে একাত্ম হতে শুরু করে। ব্রাহ্মণ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দু জনতার প্রতিবাদী চেতনার নেতিবাচক উপাদান ছাড়াও ইসলামী আদর্শের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করে। জনাব আবদুল মান্নান এটাকে বর্ণনা করেছেন 'নীরব বিপ্লবের ধারা' হিসাবে। এ ধারা বাংলাদেশে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের পটভূমি রচনা করে। এ পটভূমিই বিভাজন তৈরি করে সেন ও মুসলিম আক্রমণের মধ্যে। সেন বা মুসলিম কোন অভিযানকারীই বাংলার নিজস্ব ভূখণ্ডের সন্তান ছিলেন না। কিন্তু সেনরা এসেছেন শ্রেণী বৈষম্য শোষণ শাসনের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্যদিকে মুসলিম আগমন ঘটেছে অত্যাচারিদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে। ফলে সেনদের আগমনে যেখানে শোষণ বঞ্চনা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে খিলজির আগমন এক নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি সৃষ্টি করে। সম্পদ সংস্কৃতির ওপর সাম্য ভ্রাতৃত্ববোধের ছায়া বিস্তার করে। শ্রেণী বর্ণভেদ গৌণ হয়ে যায়। [সংক্ষেপিত]

লেখক : বার্তা সম্পাদক- দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান পরম শ্রদ্ধেয়

মতিউর রহমান মল্লিক

আমি তাঁর কাছে ঋণী।
আমি ছাত্রের মতো– শিক্ষক তিনি।
আমি ইতিহাস পাঠের প্রেরণা-স্বাদ
তাঁর বই পড়ে পেয়েছি– দু'হাতে চাঁদ।
চিনেছি স্বদেশ, জাতিকে চিনেছি আরো;
আলোয় ভরেছে এ-মন অধিকতর।

আমি তাঁরে চিনি, চিনি–
পরম যত্নে বিলান সঞ্জীবনী
অর্ধমিরিত চেতনা ও নি:শ্বাসে–
প্রগাঢ় সাধনা, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসে।
পড়ার ধৈর্যে, লেখার ধৈর্যে তাঁর
উপমা বিরল– গাঢ় সহিষ্ণুতার!

তাঁর নদী নিরবধি
দিয়ে যায় স্রোত-পলিমাটি-বোধ-বোধি
অথবা ফসল ফলানোর মৌসুম,
নয়ালী প্রেরণা : ভাঙাতে মরণ ঘুম,
সংবিত্তির কড়া নাড়ানোর গতি,
পদলেহনের কঠোর অসম্মতি।

তাঁর সব সঞ্চয়–
কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়;
ভাটি বাংলার মানুষেরা চিনে নিক
জাতিসত্ত্বার দূর-দিগন্ত-দিক,
ঐতিহ্যের সোনালী রেখা ও বাঁক,
বাংলাদেশের মধুময় মৌ-চাক।

তাঁর সব সঞ্চয়–
কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়।

লেখক : কবি, ছড়াকার, গীতিকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

আল মুজাহিদী

আমি এখানে আমার কথামুখ আরম্ভ করতে চাইছি ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও তাঁর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি নিয়ে।

আমরা বাইরের দিক থেকে যাকে যতোদূর দেখি, জানি–ভেতরের দিক থেকে তাকে ততোখানি দেখতে, জানতে পারি না। কিন্তু কাউকে কাউকে ভেতরের দিক থেকেও কিয়দংশ জানা যায়। বেশ খানিকটা আঁচ-আন্দাজ করা যায়।

সব মানুষেরই মনুষ্যত্বের একটা আবরণ থাকে। আবার আভরণও থাকে মানুষটার ভেতরে, বাইরে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সেই ধরনেরই একজন মানুষ। চৌকষ ব্যক্তি। যার মানবিক আভরণের পাল্লাটা একটু ভারিই হবে। অন্তত আমার বিবেচনায়।
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন ইতিহাসবিদ; সজ্জন, সুন্দর, সহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, সম্পর্ক অনেক দিনের। বলতে গেলে খুব মজবুত সুতোয় গাঁথা ফুলমালার মতো। ছিঁড়ে যাবার মতো নয়। কখনোই।

সেই কবে কোনো এক দুপুরে তাঁর ৩৭, গ্রীন রোডের বাসায় গিয়েছিলাম। তাঁর পারিবারিক সৌজন্যতা, সৌমনস্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। তাঁর হার্দিক, হাস্যস্নাত সরস ব্যবহারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারবো না। একটুও বিস্মরণের মতো নয় সেটা। তাঁর বাসায় ভুরিভোজন হলো। তাঁর সহধর্মীনির ঐকান্তিকতার কথাও বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর সলজ্জ, সবিনয় আচরণে আমি সেদিন ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলাম। এ যমানায় এমন সজ্জন মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। আজকের দিনে এ রকম পারিবারিক সখ্য কম কথা নয়। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে এমন সখ্যভাবের আদান প্রদান হলে- প্রাতিস্বিক উদ্বোধন ঘটলে একটি সর্বতোসুন্দর বাঙ্গালী মানব পরিবার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আবহমানকালের সেই সম্প্রীতির বাঙ্গালী সমাজজীবনই আমরা চাই । মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা মাখা পরিবার রচনার লক্ষ্যে একযোগে যদি আবার আমরা নতুন করে হাতে হাত রাখতে পারি। তাহলে আমরা কতো অনাবিল, উচ্ছল, অফুরন্ত জীবন-ঐশ্বর্য অর্জন করতেই না পারবো। আমরা আমাদের হৃদয়ের উপাদান আর রসায়নে সুসিক্ত করতে পারবো এই মানবজীবন।

মানুষের বৃহৎ সমাজ নিয়েই ইতিহাসের কথা। কায়-কারবার। আবদুল মান্নানও সেই ইতিহাসের বিষয়-আশয় নিয়েই কথা বলেন। বিশ্লেষণ করেন। তবে এই উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক, সামাাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক, রাষ্ট্রিক ও জাতিসত্তাগুলোর ইতিহাস পরম্পরা নিয়েই তিনি কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। ইতিহাসের পাঠ থেকে শিক্ষা নিতে আমরা তো পিছিয়ে যাই। এ কথাও উঠে এসেছে তাঁর ইতিহাসজাত বিশ্লেষণে,

"What Experience and history
teach is this that people and
governments never have
learnt anything from history
or acted on principles
deduced from it." (Philosophy of History)

www.pathagar.com

মানুষের সমাজ ওতপ্রতোভাবে যুক্ত ইতিহাসের সঙ্গে। সহযোগ ও সংঘর্ষ–দ্বান্দিক সম্পর্ক আমাদের সমাজ-সংসারে স্পষ্ট ও প্রতীয়মান। সহযোগ, সহ-অবস্থানের অবয়বে একটি নতুন সমাজ কায়েম করা যায় বটে। যদি সেই কল্পনা ও প্রায়োগিক আদর্শ আমাদের ভেতরে বলবৎ থাকে। সামাজিক ঐক্য, অসাম্যের পথে কখনো কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং তখনকার বৃটিশ-ভারতে সেটা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত। ভারতীয় জন-সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেই সামাজিক অনৈক্য ভারত ডোমিনিয়ন বিভাজনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সামাজিক সাম্যের ভিত সেদিন রচিত না হওয়ার ফলে উপমহাদেশীয় রাজনীতি প্রচন্ডভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। জাতিভেদপ্রথা, জাতপাতের অন্ধগলিতে প্রবেশ করেছে স্বদেশী ও বিদেশী সকল রাষ্ট্র-প্রভাব শক্তির বলয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক অধিকারের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েছে বৃটিশ বেনিয়ার পদলেহনকারী, আনুগত্যকামী শক্তি।

'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' (ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক) গ্রন্থটি হাতে পেয়েছি মাত্র ক'দিন আগে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর এই গ্রন্থটি পাঠ করার পর আমার মনে হয়েছে আমাদের জাতীয় ইতিহাস, জাতিসত্তার নতুনতর বিশ্লেষণে লেখক তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসার আলো ফেলেই এগিয়ে গেছেন সর্বতোভাবে সম্মুখের দিকে, আগামীর পথে। তাঁর ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্য-সন্ধান করা, সততা ও অকপটতার নিরিখে। এ পথে তাঁর স্বাচ্ছন্দ বিচরণ আমাকে আশাবাদী করে তুলেছে বিপুলভাবে।

ইতিহাসের প্রধান সত্যগুলি খুঁজে বের করার ভেতরই নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রকৃত সার্থকতা। জনাব মান্নান সেই সত্য ও সততার নবতর উদ্বোধন ঘটিয়েছেন তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে। এই সত্যভাষণ থেকে আগামী প্রজন্ম তাদের অভিযাত্রিকতায় শক্তি ও সাহসের মাত্রা খুঁজে পাবে। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' ৩৩৬ পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবরের এই গ্রন্থে মান্নান আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন 'চেতনা-ফলক' স্থাপন করার প্রয়াস করেছেন, এটা নিঃসন্দেহে আশা-উদ্দীপক।

লেখক ২২ টি অধ্যায়ে জাতীয় এবং উপমহাদেশীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও অনুষঙ্গগুলি বলতে গেলে বিশদভাবেই যোজনা করেছেন। সূচীক্রমে যেভাবে উঠে এসেছেঃ ১. শুরুর কথা, ২. বঙ্গ কখনো ভঙ্গ হয়নি, ৩. ঢাকা-মুরশিদাবাদ-কলকাতা ঃ আবর্তিত ভাগ্যের তিন নগরী, ৪. সৌখিন বিদেশী ফুলের মতো বেড়ে ওঠা কলকাতা, ৫. কলকাতা যখন পাল্কির পিছে, গ্রাম বাংলা তখন যুদ্ধ-সাজে, ৬. উনিশ শতকের এশিয়াটিক সোসাইটি ঃ সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ, ৭. আঠারশ' একাত্তর ঃ মুসলিম সমাজে নব চেতনার হাতছানি, ৮. পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ ঃ চতুর্থ বঙ্গভঙ্গ, ৯. ঢাকা কেন্দ্রীক নতুন প্রদেশ ঃ কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ, ১০. 'বঙ্গভঙ্গ' রুখতে 'স্বদেশী' শোরগোল, ১১. অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা বিরোধী বোমা রাজনীতি, ১২. 'স্বদেশী' সন্ত্রাস ও ক্ষুদ দিয়ে কেনা ক্ষুদিরাম, ১৩. উনিশ শ পাঁচ সালের খামার বাংলায় নতুন সূর্যোদয়, ১৪. 'বঙ্গভঙ্গ' রদ থেকে ভারত ভাগের সূচনা, ১৫. ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রতিপক্ষ যখন কলকাতা, ৪৬. অখন্ড 'হিন্দু' ভারতে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচের সংগ্রাম, ১৭. সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুট ঃ কে নায়ক কে ভিলেন? ১৮. উনিশ শ চল্লিশ ঃ পথ যখন ভাগ হলো, ১৯. সাতচল্লিশের 'বঙ্গভঙ্গ' ঃ বানরে সংগীত গায় শিলা ভাসে জলে, ২০. সাতচল্লিশের ঢাকা ঃ ফের শূণ্য থেকে শুরু, ২১. পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, ও ২২. এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

সূচীপত্রের এই সব পর্ব-বিন্যাস থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, 'বাংলা-ভারত-পাক' এই উপমহাদেশীয় রাজনীতির একটি ধারাক্রম এই গ্রন্থে বিস্তারলাভ করেছে। ইতিহাসের তত্ত্ব-তথ্য ও সত্য এই গ্রন্থে অনেকাংশে বিধৃত হয়েছে–এটাই আমাদের সকলের জন্য সুখকর ও আনন্দের বিষয়। ইতিহাসের সত্যকেই সত্য জ্ঞান করতে হবে। কেননা ইতিহাসকে বিকৃত, বিস্রস্ত করে দেখাতে চাইলে সে ইতিহাস গ্রাহ্য হবে না। ইতিহাসের কোনো পর্বকে পড়ন্ত বেলার অস্পষ্ট আলো আঁধারির খোয়ারির ভেতর ফেলে দেয়া যায় না। বিচার করা যায় না। দেখতে হয় দিব্য, দীপ্র মধ্যদিনের দিবালোকের উজ্জ্বলতায়-প্রখরতায়। ইতিহাসের সত্যকে কোনোভাবেই পাল্টানো যায় না। বিসমার্কের প্রসিদ্ধ উক্তির স্মরণ নেবো এখানে।

"God can not alter the past,
but historians can."

ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার করা কখনো সঙ্গত ও সমীচীন নয়। কিন্তু নানা ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, খর্ব-খন্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ সেটা করেও থাকেন, করেছেনও অবলীলাক্রমে। এই ক্ষীণ-কটু-দৃষ্টি-

www.pathagar.com

স্বভাব ঐতিহাসিকের দায় ও বিশ্বস্ততাকে কেউ আমলেই আনতে পারেন না। ঐতিহাসিক মান্নান সেই স্থূলদৃষ্টি কিংবা সংকীর্ণতাকে জয় করতে পেরেছেন তাঁর নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ- সত্যানুসন্ধানের প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়ে। এজন্য ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের ধন্যবাদার্হ। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' বইটি পাঠ করে এমন উপলব্ধি ও অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছি আমি এখানে। বইটির গ্রন্থনা, প্রকাশনা সৌকর্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং অনির্বচনীয়ও বটে। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'- এটি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ। তবে একমাত্র গ্রন্থ নয়। আরও বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা তিনি।

লেখক : কবি, কথা সাহিত্যিক, সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক

জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দীন সরকার-এর কাছ থেকে ইতিহাস গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ স্মারক সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

শিকড় সন্ধানী শুদ্ধতম পুরুষ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম

ক. শিকড়ের সন্ধানে মানুষের অনুসন্ধিৎসা সহজাত। পাশ্চাত্যে সাম্প্রতিককালের শিকড় সন্ধানী পুরোধা পুরুষ আলেক্সী হেলির নাম বিদ্বজন সমাজে সমধিক পরিচিত। মার্কিন নাগরিক আলেক্সী হেলি তাঁর শিকড় সন্ধানে ব্রতি হয়েছেন। নির্মাণ করেছেন পৃথিবীর সাড়া জাগানো চিত্রকর্ম রুটস (Roots)। কয়েক বছর আগে বিটিভিতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। হেলি তাঁর শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে কেনিয়ার কুনতে কিনতে গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন, যেখান থেকে তিনি ও তাঁর পরিবার এবং প্রতিবেশীরা কয়েকশ বছর পূর্বে পশ্চিমী আদম বেনিয়াদের সৌজন্যে (!) আমাদের মৎস্য শিকারীদের কায়দায় ধৃত এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত হয়েছিলেন। উদাহরণটি প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে এর পরপরই প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে পলিটিক্স অব আইডেনটিটি (Politics of Identity) বা জাতিসত্তার পরিচয় বিষয়ক অধ্যয়ন, গবেষণা ও অনুশীলন জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশী জাতিসত্তার অনুসন্ধান বিশেষতঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশে-বিদেশে এ নিয়ে বিস্তর গতানুগতিক গবেষণা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী, মৌলিক ও বিশুদ্ধ গবেষণার পথিকৃৎ হচ্ছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। জনাব মান্নানের পড়াশুনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। কিন্তু তিনি বিচরণ করেন ব্যাংক ব্যবস্থাপনায়। বাংলাদেশের স্বরূপ সন্ধানে তাঁর এই সাহসী ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস বাংলাদেশের জাতিসত্তার অধ্যয়নক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. ব্যক্তিগতভাবে যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি জানি তার জন্য অবশ্য এটি অসম্ভব ঘটনা নয়। সমাজে যে সমস্ত মানুষ কেবলমাত্র নিজ মেধা, মনন, বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বস্ততা এবং অসম্ভব পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় হয়েছেন ইনি তাদের একজন। সে ক্ষেত্রে আদর্শবাদ তার জীবনপথে অনুঘটক এবং আকর হিসেবে কাজ করেছে। He is a self made man.

গ. জনাব মান্নানের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। পর্বটা একটু ইন্টারেস্টটিং। ১৯৭৩ সাল। ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার পর অলস ঘোরাফিরা করছি। ছোটবেলা থেকেই আমার সংবাদপত্রের প্রতি গভীর টান। ইতিপূর্বে আমি বি.এম কলেজে দৈনিক পূর্বদেশের নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলাম। সাংবাদিক হওয়ার একান্ত খায়েশ। আমার তৎকালীন অভিভাবক অধ্যাপক হারুন খানকে আগ্রহের কথা জানালাম। তিনি সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। এখন যারা বিখ্যাত, এমন সব প্রতিভাধর সাংবাদিক তখন সোনার বাংলায় কাজ করেছেন। আমিও একটু-আধটু লিখি। তাতে মন ভরে না। হারুন ভাইকে বল্লাম, ষোলআনা সাংবাদিক হতে চাই। তিনি আমাকে ৩৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ 'সাপ্তাহিক বঙ্গদর্পণ' পত্রিকায় নিয়ে গেলেন। সেখানে সুন্দর গোলগাল চেহারার, সুন্দর কথা বলেন, চমৎকার ব্যবহার করেন এমন একজন করিতকর্মা ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি খোলামেলা কথা বল্লেন-'কাজ করতে হবে বিনে পয়সায়। শিখতে হবে অনেক। এটাকে বলে শিক্ষানবিসকাল (apprenticeship)'

পরে জানলাম, জাসদের তৎকালীন কারাবন্দী নেতা জনাব রুহুল আমীন ভূঁইয়ার এ পত্রিকা। চালাচ্ছেন তার শাগরেদ গোলাম মোস্তফা ভূঞা। বিপ্লবী মোস্তফার সাথে পরিচিত হলাম। পয়সা না দেয়া বা না

www.pathagar.com

দিতে পারার কথা তিনিও বল্লেন। মাস যেতে না যেতেই মান্নান ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম। তিনি আমার জন্য বেতনের সুপারিশ করলেন। ফলে গোলাম মোস্তফা ভূঞা ৭৫-১০ (৭৫ দিয়ে পরে ১০ ধার নিলেন) টাকা বেতন দিলেন আমাকে।

এইভাবে মান্নান ভাইয়ের সাথে কর্মপর্ব শুরু হলো। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও কর্ম প্রবাহে মান্নান ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। আমার ধারণা ছিল মান্নান ভাই বি.এ/এম.এ পাশ। একদিন মান্নান ভাই এস.এম হলে গেলেন। বল্লেন, জগন্নাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছেন। আমাকে এক রকম বগলদাবা করে তাদের মতিঝিলের বাসায় নিয়ে গেলেন। অখন্ড নিরুপদ্রব পড়াশুনার সময় পেলাম। সারাক্ষণ ২৪ ঘন্টা এক সাথে থাকি আর একসাথে খাই। বেশী দিন ওখানে না থাকলেও একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা উভয়ে বি.এস.এস অনার্স এবং এম.এস.এস পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হই।

এই সময়ে এবং পরেও মান্নান ভাই সার্বক্ষণিক সাংবাদিক ছিলেন। আমিও কিছুকাল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলাম। আমার এটা খুব ভাল লাগতো যে মান্নান ভাই সাংবাদিকতায়ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। সাংবাদিক ইউনিয়নে (অবিভক্ত) তাঁর একটা মজবুত অবস্থান করে নিয়েছেন। আমি ক্যাডেট কলেজে এবং পরে সরকারী কলেজে চাকুরী নিয়ে মফস্বলে যাই। একদিন শুনতে পেলাম মান্নান ভাই ব্যাংকিং-এ যোগদান করেছেন। আমি অসম্ভব দুঃখ পেলাম। এ রকম একজন 'বনের পাখী' কি করে 'সোনার খাঁচার পাখী' হতে পারেন! আমি হবাক হলাম। আমাকে অবাক করে কুশলী এই ব্যক্তি ব্যাংকিং সেক্টরেও অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আসলে পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং মৌলিকত্ব সবকিছুই সম্ভব করতে পারে।

ঘ. মিলাদ পড়তে মৌলভীর গীত হলো হয়তো। বলছিলাম মান্নান ভাইয়ের জাতিসত্তার সন্ধানে অবদানের কথা। তিনি ইতোমধ্যে ডজনখানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থ জাতিসত্তার অনুসন্ধানে অনুলিখিত। আমার সংশ্লিষ্টতা একাডেমিক কারণে এই তিনটিতেই সীমাবদ্ধ থাকলো।

বাংলাদেশী মানুষের উৎস সন্ধানে তাঁর প্রধান গ্রন্থ ঃ বাংলা ও বাংগালী মুক্ত সংগ্রামের মূলধারা। 'লেখক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করেছেন এ ভূখন্ডের অতীত ইতিহাসের গভীরে। বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রবহমান মূলধারায় তিনি নিদের্শ করেছেন বাংলাদেশের উৎস স্থলকে।' (এ.আর মল্লিক : ৯১) প্রাগ ঐতিহাসিক আমল অর্থাৎ আর্য আগমনের পটভূমি থেকে পলাশীর প্রান্তর পর্যন্ত প্রসারিত এই গ্রন্থ। ইতিহাসের গহীন গভীরে তাঁর এই অনুসন্ধান যে কোন বিবেচনায় পৃথকধর্মী, অভূতপূর্ব, মৌলিক এবং অসম্ভব পরিশ্রমসাধ্য। এখানে জনাব মান্নান আবির্ভূত হয়েছেন একজন নিখুঁত ইতিহাসবিদ হিসেবে। অন্যত্র ছিঁটেফোটা কাজ হলেও সমসাময়িক কালে যথার্থভাবে তিনি এই প্রত্যয়টি প্রমাণ করেছেন– এ দেশে ইসলাম প্রচারকরাই মুক্তিসংগ্রামের ভিত রচনা করেছেন। ইতিহাস যদি রাজা-বাদশাহর কাহিনী না হয়ে জনগণের যাপিত জীবনের আলেখ্য হয়, তাহলে, নিঃসন্দেহে এটি 'পিপলস হিস্টোরি'–সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান যথার্থভাবেই একে 'পথিকৃত গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন।

ঙ. প্রথম গ্রন্থ 'মূলধারা'য় ১৭৫৭ পর্যন্ত ইতিহাস বিধৃত। সেক্ষেত্রে এটিকে অসমাপ্ত ইতিহাস বলা যেতেই পারে। ঐ গ্রন্থেই ইঙ্গিত আছে লেখক আরও দু খন্ডে ইতিহাস পরিপূর্ণ করবেন। পরবর্তী গ্রন্থ 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' ঐ প্রতিশ্রুতিরই পরিপুরক। এই গ্রন্থে প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত মূলধারার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি। এই গ্রন্থের দুটি বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণ মানুষের আন্দোলন, সংগ্রাম, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ, অভ্যুত্থানকে মুক্তিসংগ্রামের মূলধারার আরও উপাত্ত আরও যৌক্তিকতা দিয়ে উপস্থাপন। দ্বিতীয়তঃ আপোসহীন সাম্প্রতিক ধারার বাস্তব ইতিহাসের বর্ণনা। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারায় বাস্তবভাবেই জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্রমধারা সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত হয়েছে। গণেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান থেকে ১৯৭৫ এর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান পর্যন্ত শিলায়িত হয়েছে এই জাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাস।

চ. জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এই ধারায় সর্বশেষ এবং সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ সংযোজন 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'। এই গ্রন্থটির আর একটি উপনাম আছে ঃ 'ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক'। যারা ইতিহাসের চর্চা করেন স্বাভাবিক উপসংহারই তারা ধারণ করেন ঃ বঙ্গভঙ্গই আজকের বাংলাদেশের নেতিবাচক উৎসমূল। ইতিহাসের বিচিত্র বাঁক অতিক্রম

www.pathagar.com

করে আমাদের রক্তার্জিত স্বাধীনতাকে আবুল মনসুর আহমদের মত বলতে হয় ঃ The End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution.

ইতিহাসের ঐ সব অপ্রিয় নিরেট সত্য নিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূলতঃ বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। বঙ্গভঙ্গের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে বিরাট ফাটল ও ভাঙন সৃষ্টি হয় তা আর জোড়া লাগেনি। তার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূর প্রসারী। আমরা সাধারণ পাঠকরা সাধারণভাবে এটা বুঝতাম। কিন্তু জনাব মান্নান যে তত্ত্ব, তথ্য, প্রমাণপঞ্জি দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন– তা এত ভয়ঙ্কর, তা এত নির্মম–এই গ্রন্থ পাঠের পূর্বে তা অতটা উদ্ভাসিত হয়নি। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমাদের প্রতিবেশীরা বিশেষতঃ শ্রদ্ধার আসনে আসীন কুশীলবরা এতটা হৃদয়হীন হয়েছিলেন–ভাবতেই কষ্ট পাওয়ার কথা। তাই স্বীকার করতেই হবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 'অসাধ্য সাধন করেছেন।' কবি আল মাহমুদ 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটিকে "জাতির জন্য চৈতন্য উদয়ের একটি বৈদ্যুতিক স্পর্শ" বলেছেন।

ছ. এই তিনটি গ্রন্থে বিধৃত মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মনীষা নিঃসন্দেহে তাঁকে 'ইতিহাসের পুনর্গঠক' বা 'পুনরাবিষ্কারক' এবং জাতিসত্তার উৎস অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যথার্থভাবেই প্রমাণিত করেছে। তিনি আমাদের জাতীয় পরিচয়কে নতুন করে নির্ণয় করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা, জাতীয়তা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং জীবনবোধ যে একটি স্বকীয় ধারায় চির প্রবাহমান, কুশলী ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সে পুরনো পরিচয়কে নতুন পরিসরে বলিষ্ঠভাবে উদঘাটন করেছেন। আত্মবোধ বিমুখ এ জাতি সতত তাঁর কাছ থেকে আলোকরশ্মি লাভ করুক এই মোনাজাত আমাদের সকলের।

লেখক : প্রফেসর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কবি আল মুজাহিদীর জন্ম দিনে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

প্রবাসীদের কল্যাণব্রতী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ড. তাসনিম সিদ্দিকী

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। পেশাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও আমি তাঁকে আমাদের একজন সহকর্মী বলে মনে করি। মান্নান সাহেব একজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যস্ত ব্যাংক কর্মকর্তা। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান। মান্নান সাহেব রামরুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন। এ কারণে রামরু তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি দেশের একজন শীর্ষ পর্যায়ের ব্যাংকার। ব্যাংকিং পেশায় যাওয়ার আগে তিনি দীর্ঘ সময় সাংবাদিকতা করেছেন। সাংবাদিকদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের তিনি সহকারী মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। ব্যাংকিং পেশায় যুক্ত হওয়ার পরও তিনি নিজেকে লেখালেখি থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। বরং ভিন্নমুখি গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

জনাব মান্নানের সাথে অনেক দিন কাজ করে তার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী যেটা মনে হয় তা হলো তিনি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক মানুষ। তিনি দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তার সকল কাজে সে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে। যে কোনো ভালো বা কল্যাণকর কাজে তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে জড়িত হন। শুধু কাজের জন্য কাজ তিনি করেন না। তিনি একটা কিছু সৃষ্টির নেশায় কাজ করেন।

মানুষের জন্য কাজ করা এবং তাদের কল্যাণ করার ব্যাপারে জনাব মান্নানের কমিটমেন্ট অত্যন্ত দৃঢ়। সে কমিটমেন্টের কারণেই তিনি ব্যাংকের কাজে দীর্ঘ সময় নিয়োজিত থাকার পরও সময় বের করে বই লিখেন। মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা বিষয়ে তিনি বই লিখেছেন, বাংলাদেশের জাতিসত্তা ও বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস কেন্দ্রিক বেশ কিছু বই লিখেছেন, তিনি বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বই লিখেছেন। বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে তার বই রয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর একটি চমৎকার বই রয়েছে 'সোনার দেশ বাংলাদেশ'। এ ছাড়া তাঁর রম্য রচনার একটি সংকলন রয়েছে 'গুলবাজ খাঁর হপ্তানামা' নামে। এ সব কারণে আমি তাঁকে ব্যাংকার পরিচয়ের বাইরে একজন লেখক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক হিসাবেও মূল্যায়ন করি।

আমাদের সাথে অর্থাৎ রামরুর সাথে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের পরিচয় ঘটে আকস্মিকভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর ড. সি. আর. আবরার ও আমি ১৯৯৯ সালে আই এল ও-র জন্য মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস রেমিটেন্স এন্ড মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ বিষয়ে একটা রিসার্চ করছিলাম। সে সময় আমরা বিভিন্ন ব্যাংকের কিছু বাছাই করা কর্মকর্তার ইন্টারভিউ নেই। সে উপলক্ষে প্রফেসর আবরার জনাব মান্নানের একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সে সাক্ষাতকারে জনাব মান্নান প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রাকটিক্যাল রিফর্মের প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য আমাদেরকে রীতিমত চমকে দেয়। অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষ করে সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রবাস জীবনের বাস্তব চিত্র তিনি জীবন্ত করে তুলে ধরেন। তার সাথে সাক্ষাতকার নিতে গিয়ে আমরা শুধু চমৎকৃতই হই না, আমরা বুঝতে পারি অভিবাসীর রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে জনাব মান্নান হচ্ছেন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন যথার্থ রিসোর্স পারসন; এক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং প্রবাসীদের কল্যাণ চিন্তায় ব্রতী এক বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার। আমরা সিদ্ধান্ত নেই, তাকে রামরুর কাজের সংগে যুক্ত করতে হবে। তার প্রত্যক্ষ ও গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে তুলে ধরতে হবে।

এর পর থেকে মাইগ্রেশন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আমরা আমাদের লেখায় নানাভাবে উপস্থাপন করতে

www.pathagar.com

শুরু করি। আমরা অনুভব করি যে, প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জনাব মান্নানের বিশাল অভিজ্ঞতা ডকুমেন্টেড হওয়া দরকার। আমরা তাঁকে অনুরোধ করি প্রবাসীদের ব্যাপারে তার কোনো লেখা থাকলে তা আমাদেরকে দেয়ার জন্য। তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। তার একটি বই আমরা 'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা' নামে প্রকাশ করি। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি সাময়িকপত্র। সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশীরা কি অবস্থায় কি পরিবেশে কাজ করেন, তাদের সমস্যাগুলো কেমন, সৌদী শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা কি, সেখানকার শ্রম বাজার ধরে রাখার জন্য আমাদের কী করা উচিত, প্রবাসে আমাদের লোকদের কি করা অনুচিত, কিভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে চলতে হবে এমনি নানা বিষয় তিনি তার বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা দেখছি, যারা সৌদি আরব নিয়ে এখনো কাজ করেন তারা জনাব মান্নানের এই সাময়িকপত্রটিকেই মূল দলিল হিসেবে মনে করেন। এই সাময়িকপত্রটি আমাদেরকে লিখে দেয়ার জন্য রামরু তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব, বিশেষত ব্যাংকারদের করণীয় সম্পর্কে তিনি শুরু থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখে আসছেন। একটি প্রশ্নে তিনি বলেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশীগণ যেসব দেশে যে পরিবেশে কাজ করেন আর যে কঠোর পরিশ্রম করে তারা দেশে অর্থ পাঠান সে সম্পর্কে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এবং আমাদের দায়িত্বশীল মহলে যথাযথ সংবেদনশীল মনোভাবের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তার ফলে দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে 'লিপ সার্ভিস'-এর বেশী কিছু প্রবাসীদের কপালে এখনো জুটছে না। প্রবাসী গ্রাহকদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবার জন্য তিনি বেসরকারী ব্যাংকিং সেক্টরকে একাজে অধিকতর সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তার মতে বেসরকারী ব্যাংকসমূহের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে রেমিট্যান্স আহরণে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে এখনো স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই। এ কারণে প্রবাসীদের আয়ের একটি বিরাট অংশ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাহিত না হয়ে হুন্ডি বা অন্যপথে চলে যায়। তাই তিনি প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরির কথা বিভিন্ন সময়ে বলে এসেছেন।

আরেকটি নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সব সময় গুরুত্ব সহকারে বলে থাকেন। তাহলো বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বল্পশিক্ষিত। ব্যাংকিং লেনদেন সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ব্যাংকিং লেনদেন সংক্রান্ত নানারূপ সেবা ও সহযোগিতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ব্যাংকগুলো যখন এত বিপুল রেমিটেন্স বিদেশ থেকে আনছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত ব্যাংকগুলোকে তাদের নিজ খরচে সে সব দেশে তাদের ব্যাংকের প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ করে দেয়া। ফিলিপিনস বা শ্রীলংকার মতো দেশের প্রবাসীরা বাংলাদেশী প্রবাসীদের তুলনায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাদের পাশে সে সব দেশের ব্যাংক সমূহের বহু প্রতিনিধি রয়েছেন। আমদের দেশের শিক্ষায় কম অগ্রসর অভিবাসীদের পাশে, দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অনেক বেশী জরুরী বলে জনাব মান্নান মনে করেন।

তাঁর এই দুটি প্রস্তাব আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব প্রবাসীদের স্বার্থে ও কল্যাণে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যা আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ করি।

২০০২ সাল হতে রামরু অনেকগুলো মাঠপর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহণ করে। জনাব মান্নান আমাদের এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিকল্পনা হতে পরিচালনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করছেন। আমাদের ধারাবাহিক অব্যাহত প্রচেষ্টার ফল হয় আশাতীত। ২০০৪ সাল নাগাদ আমরা উপলব্ধী করি যে, রামরুর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছোট কক্ষ থেকে আমরা যে কাজ শুরু করেছিলাম, ইতোমধ্যে তার ফল পাওয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের গবেষণা ও সুপারিশসমূহের আলোকে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেছে। এ ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি জনাব মান্নান রামরুর এই সফলতায় একজন বড় অংশীদার।

১৯৯৯ সালে মান্নান সাহেবের সাথে রামরুর পরিচয়ের পর থেকে রামরু তার পরামর্শের আলোকে নানা ধরনের কাজ করেছে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ, যারা বিদেশ যেতে চায়, তাদের জানাতে হবে বিদেশ যাবার সঠিক পদ্ধতি কি। ভুল লোকের খপ্পরে পড়ে তারা যেন প্রতারিত ও সর্বস্বান্ত না হয় সে ব্যাপারে তাদেরকে সচেতন করতে হবে। বিদেশ যাবার আগে তাদেরকে ব্যাংকে একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করে দিতে হবে। প্রবাসযাত্রীদেরকে জানতে হবে প্রবাসে তাদেরকে কি ধরনের পরিবেশে কাদের সাথে কাজ করতে হবে। এসব বিষয়ে আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিয়ে ট্রেনিং বা সচেতনতা সৃষ্টির কাজ শুরু করি। আমাদের এ ধরনের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই জনাব মান্নান বক্তব্য রেখেছেন।

জনাব মান্নানের বক্তব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো তিনি সহজেই অভিবাসীদের ব্যাপারে শ্রোতাদের মাঝে একটি সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তুলতে পারেন। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমি প্রায়শ উদ্ধৃত করি। তিনি তার আলোচনায় একটি কথা বলেন, তাহলো, 'বাংলাদেশী অভিবাসীরা যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায় তা দেখতে যত চকচকে, এর পেছনের মানুষটির চেহারা মোটেই তেমন চকচকে নয়। বরং প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে করতে সেই ব্যক্তির চেহারা কঠিন, কর্কশ রুক্ষ রূপ পেয়েছে। এই ব্যক্তি যে ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এবং জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে দেশে পাঠাচ্ছেন, আমাদের সকলের উচিৎ উপযুক্ত সেবা দিয়ে তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা।' ফলে বিদেশের মাটিতে প্রবাসীদের বাস্তব অবস্থার চিত্রটা তার বক্তৃতা থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

জনাব মান্নান শুধু আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচনা করে তার দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রবাসীদের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, রামরুর বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করতে, এবং সে কর্মসূচী কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, সে সম্পর্কেও তিনি নির্দেশনা দেন। সেই শুরু থেকে রামরুর বিভিন্ন সাব কমিটিতে তিনি শরীক থেকেছেন। মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। প্রবাসীদের মাঝে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে এবং একজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার হিসাবে তিনি আমাদেরকে তার মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তার মতামত ও পরামর্শ রামরুকে সামনে এগিয়ে কাজ করতে সহযোগিতা করেছে।

রামরু এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রেমিটেন্স পেমেন্ট এন্ড পার্টনারশীপ প্রজেক্ট এ কাজ করছে। দেশে-বিদেশে মেলা অর্গানাইজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নিয়ে মাইগ্রেন্ট প্রোটেকশন কমিটি গঠন করেছে। এসব কিছুতেই জনাব মান্নান আমাদের সহকর্মী। আমাদের ছোট-বড় যে কোন পলিসি ডায়ালগে তিনি সম্পৃক্ত হয়েছেন, অংশ নিয়েছেন, বক্তব্য দিয়েছেন। মোট কথা, আমাদের সকল কাজের মাঝে তাঁকে আমরা আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ সাথি হিসাবে পেয়েছি। আমি তাঁকে ইসলামী ব্যাংকের একজন বড় মাপের ব্যাংকার হিসেবে শুধু দেখি না, তাঁকে দেখি রামরুর একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে। যতোটা সংবেদনশীলতা দিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামরুকে গড়ে তুলেছি, একই রকমের সংবেদনশীলতা দিয়ে তিনি আমাদেরকে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল কাজে সহযোগিতা করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে জেনেছি। সে আলোকে আমি মনে করি জনাব মান্নানের মতো এ ধরনের কর্মোদ্যোগী মানুষ সমাজে বিরল। তিনি যে কাজই করেন, সে কাজের প্রতি তার শতকরা একশত ভাগ কমিটমেন্ট থাকে। আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি, ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থেকে উঠে এসে তিনি আমাদের কোন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কখনো কখনো তিনি ঘামছেন। আমি বুঝতে পারছি, এভাবে কমিটমেন্ট রক্ষা করতে তার কষ্ট হচ্ছে। আমাদের প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার অন্য মিটিং এ যাবেন। তিনি শুধু তার কমিটমেন্টের কারণে, আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও রামরুর আমন্ত্রণ তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি। এ সব কারণে আমরা জনাব মান্নানের কাছে প্রচন্ডভাবে ঋণী। আর আমরা এটাও জানি, ভবিষ্যতেও আমরা তাঁর সঙ্গে কাজ করে যাবো।

আমরা মনে করি, এ ধরনের মানুষের জীবনী ও কর্মকান্ড সংকলিত হওয়া উচিত। ফলে আমাদের সমাজে ভালো মানুষ ও আলোকিত মানুষের উদাহরণ তৈরি হবে। আমরা প্রায়শ সে কাজ করতে জানি না। আমার মনে হয় জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এমন এক আলোকিত মানুষ যাকে আমরা জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে পারি। আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করার সাথে সাথে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক : প্রফেসর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ই.সি মেম্বার রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সময়ে স্পষ্টতা ও দৃঢ়তা অনাকাংখিত। সত্য তাই অসময়ে বিদায় নিয়েছে; 'উচিত' পলাতক হয়েছে ভন্ডামীর চাপে। মুনীর চৌধুরীর 'কবর'-এর বদলে এখন তাই রচিত হচ্ছে 'পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল'।

সুতরাং সম্পূরক অর্থে বলা যায় ঃ মান্নান ভাইদের মত উঁচু-পদে যেয়ে এখন আর কেউ সিরাজুদ্দৌলা বা তিতুমীরকে চর্চা করে না। সেটা 'মানানসই' নয়। এই 'ভব্যতা' আমলাদের মত লেখকদের সত্তাকেও বিচ্যুত ও বিনষ্ট করেছে। শব্দের ওজনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে পদের ভার। 'পাছে লোকে কিছু বলে' বা 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'-থেকে এখন লেখকদেরই বার বার শিক্ষা নিতে হয়। এই অপরিপক্কতা ও অর্বাচীনতা বার বার আমাদের জাতিসত্তাকে লজ্জিত ও হেয় করেছে। কারণ কি? শুধু প্রতিভার অভাবই কি আমাদের মধ্যে মুনীর চৌধুরীদের জন্ম দিচ্ছে না, না-কি আমাদের দায়বদ্ধতাই বেশি দায়ী? দায়ী আমাদের রসে-বশে থাকার অত্যধিক প্রবণতা, না-কি ভাগ্যই বিরূপ?

এসব প্রসঙ্গ চিন্তা করেই আমি নিজের জীবনকে বিবেচনা করি; তুলনা ও বিচার করি মান্নান ভাইদের মত অগ্রজকে।

আমাদের কালের অন্যতম সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবনের দিকে তাকালে আমি এসবের একটা সরল জবাব পাই। সত্তর দশকেই যিনি উত্তরাধুনিকতা দিয়ে তাড়িত, বিতর্কিত ও উত্তীর্ণ; যিনি বাংলাভাষার অন্তত দু'জন লেখককে পুনর্জন্ম দিয়েছেন (জীবনানন্দ দাশ ও বেগম রোকেয়া); যিনি লিখেছেন কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর মত কাব্য এবং প্রেম-এর মত গদ্য ; তিনি কেন একটি মুখ্য পরিচয়ে সমুজ্জ্বল নন ? কেন বুদ্ধদেব বসুর মত তিনিও শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগেই সীমাবদ্ধ ? এর প্রধান একটি কারণ আমার মনে হয়, লেখকের অনাহূত চাঞ্চল্য। ক্রীয়াশীল মানুষ মাত্রই ছটফটে। কিন্তু এই ছটফটানি সৃষ্টিতে নয়, জীবনে ; অভিভাষণে নয়, আড্ডায়। একই নামে নাম আরেকজনকেও আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনি– আবদুল মান্নান তালিব। তাঁরও চিত্তচাঞ্চল্য নেই বলে যা-কিছু তিনি করেছেন, সাফল্য পেয়েছেন।

মান্নান ভাইয়ের প্রতিও আমার মুগ্ধতা ঐ স্থিরতায়।

ঢাকা কলেজে প্রথম সিদ্ধার্থ বইটি পড়ি, ১৯৭৯-তে ; এবং হেরমান

প্রিয় মান্নান ভাই

বুলবুল সরওয়ার

কবে, কখন, কিভাবে প্রথম তার সাথে পরিচয় হয়েছিল, আজ আর মনেও নেই; তবে এটুকু মনে পড়ছে– সেটি ১৯৮৫-৮৬'র আগে হবে। হয়ত কোনো সাহিত্য সভায়, কিংবা পত্রিকার কোনো বারান্দা বা প্রেসের অন্ধকারে। মাহবুব ভাইদের 'চক্রের' অনেকেই ধীরে ধীরে নিকটতর হয়েছেন; কেউ কেউ পরিণত হয়েছেন 'ভাই'-এ। সকলের সাথেই অবিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হয় নি ; সম্ভব হয়নি টান-টান সুসম্পর্ক ধরে রাখা। তবে যে ক'জন এখনো বুকের কাছেই আছেন – মান্নান ভাই তাদের অন্যতম।

ধনু রাশির একটি বিপদ হচ্ছে ভয়াবহ স্পষ্টতা। মুনীর চৌধুরী আর আমি জন্মেছি একই দিনে; প্রায় একই সময়ে। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমার বিশ্বাস– তার স্পষ্টতা তার মৃত্যুই ডেকে আনতো। আক্ষরিক বা প্রতীকিভাবে। কারণ, যতই যুগের দোহাই দেয়া হোক, আমার এ-বিশ্বাস আজ প্রায় ধর্মে পরিণত হয়েছে যে সময়ের বিচারে কাল এগিয়ে গেলেও সভ্যতার বিচারে সে আজও বড় নাজুক। এ ভঙ্গুর

www.pathagar.com

হেসে আমাকে ম্যাজিকাল অ্যালিগরীতে টেনে ধরেন। সেই টানের প্রাবল্য আজও অমলিন। 'গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি' নামের ক্ষুদ্র একটি অনুবাদ পড়েই মান্নান ভাইয়ের লেখার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মায়; যা ধীরে ধীরে 'সোনার দেশ বাংলাদেশ'-এ এসে মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যের স্বার্থে তাকে আমার নিকট-সান্নিধ্যে দেখার সুযোগ হয়েছে বলেই বলছি না, বরং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি তার নিবিড় নিষ্ঠা অনুভব করেই আমি নৈকট্য বাড়িয়েছি। এজরা পাউন্ডের সাথে এলিয়টের সম্পর্কের মত আমাদের বন্ধুত্বও অসম, কিন্তু সৃজন বৈশিষ্ট্যে একমেবদ্বিতীয়ম।

আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। কারণ, আমার ক্ষুদ্র জীবনে সাহিত্য-সমালোচনা শুরু করেছিলাম তাঁকে দিয়েই। সাজ্জাদ হোসাইন খান সেই লেখার রেশ ধরে পরিচয় করে দিয়েছিলেন দু'জনের। তারপর কত বোশেখ-আষাঢ়-ভাদ্র পেরিয়ে গেল, কিন্তু সমালোচনা কারো কাছেই 'আলোচনা' বলে কদর পেল না। ব্যাকরণবিদরা একে 'সম' বললেও, মানুষ তাকে অসম করেই চিনেছে। কিন্তু ভাগ্য ব্যতিক্রমকেও দেখায়। সেটাই ঘটেছে মান্নান ভাইয়ের ক্ষেত্রে। সম্ভাব্য সকল শরেই আমি তার দুর্বলতা বধ করতে চেয়েছি আর ভয়ে ভয়ে ভেবেছি, এই বুঝি তিনিই বাঁধন ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু না, মাহবুবুল হকের মত তিনিও বোধ হয় মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন – এই ছোঁড়াকে ছাড়া যাবে না, যতই ঠোঁটকাটা হোক। এভাবেই ভ্রাতৃত্ব গিয়ে পৌঁছেছে এমন স্তরে– যখন লিখতে গেলে শংকা হয় ঃ এ লেখা ঠিক হলো না। বন্ধুত্ব দাবী করে যে নিবিড় পারিবারিক নৈকট্য ও প্রেম– তাকে অমান্য করা সত্যিই কঠিন!

লুৎফর রহমান সরকারকে দেখেছি লেখক থেকে গভর্নর হয়ে যেতে আর দেখতে দেখতে মান্নান ভাই সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যাংকার এবং লেখক হয়ে গেলেন। বড়ই বিচিত্র এ দেশ (–সেলুকাস? বলা বোধহয় ঠিক হবে না !)। তাই এ বিবর্তন নমস্য। কীর্তি যত ক্ষুদ্রই হোক, লক্ষ্যটাই আসল। সরকার সাহেবের নোটে স্বাক্ষর ছাড়া কিছু না টিকলেও, মান্নান ভাই'র টিকে থাকবে 'ইতিহাস'। এ উত্তীর্ণ-লক্ষ্যই তাকে পরিণতি দিয়েছে ; করেছে সাধারণের মধ্যে অনন্য।

মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা লিখবার ইতিহাসটা মনে পড়ে এখনো আমার হাসি পায় ও কষ্ট হয়। আমি তখন সৃজন-এর কৃশকায়-সম্পাদক, আর মান্নান ভাই যশোরের এক নব্য-ব্যাংকার। আজন্ম ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে লালিত লোকটি রাজধানী ছাড়তে পেরেছিলেন বলেই জাতির দূরবর্তী ধমনীতে হাত রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি নিয়েও আমরা সৃজনবাসী প্রায় সাত মাস 'পণ্ডশ্রম' করেছি ; চেয়েছি ভবিষ্যতের পুরো-মান্নানকেই একটি গ্রন্থে ঢুকিয়ে দিতে। পরবর্তী দশ বছর (১৯৯১-২০০০) আমি নিজেও ছিলাম গ্রামে-গঞ্জে। চিলমারী থেকে পঞ্চগড় অবধি সর্বত্রই আমার সঙ্গী ছিল 'মূলধারা'। আমি রাঢ় বাংলার সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে স্পর্শ রেখে টের পেয়েছি–মান্নান ভাই কি বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছেন প্রচলিত ধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি জানি – সমস্ত সত্যের উৎসই হলো 'অস্বীকার'। মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা ছিল মান্নান ভাইয়ের প্রথম 'না'। বিপদ ছিল, ছিল অপ্রচলের হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা; কিন্তু মাহবুব ভাই'র মতো আমিও নিশ্চিত ছিলাম যে মূলধারা হচ্ছে মান্নানের মুক্তি সংগ্রামের শুরু– যাতে শক্তি যোগাবো আমরা সবাই।

তবে হ্যাঁ, আশংকার কথাও অস্বীকার করা ঠিক হবে না যে– আমরা প্রাক্তন গভর্নরের মুছে-যাওয়া দেখে ভয় পাইনি। আমরা ভয় পেয়েছি, ফররুখ আহমদের সকরুণ পরিণতিতেও। কিন্তু সবাইকে আশ্বস্ত করে মান্নান ভাই আমাদেরকে সোনার দেশ বাংলাদেশ-এ নিয়ে এসেছেন। আজ তাকে সাধুবাদ জানাবার জন্য সবাই উন্মুখ। সবার কণ্ঠে একই কোরাস ঃ এর জন্যই তো মুক্তি সংগ্রাম; এর জন্যই তো লাল-সবুজ পতাকা!

মান্নান ভাই ও মাহবুব ভাই'র সাথে আমার জীবনের অনেক স্তর জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক। মা বেঁচে থাকতে প্রায়ই খোঁচাতেন–তোর বন্ধুরা সব দাদার বয়সী। কথাটায় এক ধরনের আশ্বাসও ছিল। সেই নির্ভরতা জীবনের কত পিচ্ছিল কর্দমকে পার হয়ে যেতে সাহায্য করেছে– আজ তার হদিসও নির্ণয় করতে পারি না। তবে এটুকু বুঝি, সব রঙই ফিকে হয়ে যায়– রক্ত ও বন্ধুত্বের রঙ ছাড়া। যারা সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী – টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ – তারা এ সত্যকে নিবিড়তায় উপলব্ধি করে গেয়ে উঠেছেন ঃ বাড়ির পাশে আরশী নগর...।

আমি নিজেকে সর্বদাই সৌভাগ্যবান মনে করি – নজরুল ও সৈয়দ মুজতবা আলীর পরে জন্মের জন্য এবং সমকালের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধজনের স্পর্শ-ধন্যতায়। সুন্দর ও সত্যের যে মেলবন্ধনে পরম সত্য অনুধাবনযোগ্য– সেই খানেই লুকিয়ে থাকে প্রেম ও বন্ধুত্ব। বলা

www.pathagar.com

বাহুল্য, এই অদৃশ্য-সূতার প্রধান নিয়ামকই সাহিত্য। মান্নান ভাইয়ের মূলধারা আমাকে সেই মধুস্পর্শেই আকৃষ্ট করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় জাতিসত্তার বিকাশধারা, এই আমার বাংলাদেশ, পারস্যের পথে প্রান্তরে (পাণ্ডুলিপি) এবং বাংলা কেন ভাগ হলো (যন্ত্রস্থ) হয়ে পৌঁছে যাই তার বিবিধ-বিক্ষিপ্ত রচনায়। মূলধারা বা জাতিসত্তা দেখে যত মুগ্ধ হই, ততই মনে শংকা জাগে– এই লোকের কাজ কি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী হওয়া, না ইতিহাস বিনির্মাণ? তখনই রূঢ় হয়ে ওঠে আমার কণ্ঠ; অবাস্তব কল্পনাবিলাসে আক্রমণ করি অগ্রজের শ্রম ও সাধ্যকে ; অশ্রুজলে অসমাপ্ত সেই বেদনাই হাফেজকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

'ইন্দ্রপুরী ও স্বর্গের পরী
সাধুদের থাক। আমি মনে করি
শরাবখানাই সে অমরাবতী
সাঙাতেরা অপ্সরা-অপ্সরী।
পেয়ালা ওঠাও ঢোলকের তালে;
করো না আদৌ মেজাজ খারাপ;
কেউ যদি বলে, 'খেয়ো না শরাব'
বলবে– 'খোদার কাছে সব মাফ।'
বিচ্ছেদে বুক ফেটে যায় বলে,
হাফেজ, চোখের জল কেন ফেলো?
বিরহে নিহিত রয়েছে মিলন
কালো পর্দাটা সরালেই আলো॥'
(সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত)

(কিন্তু) শেষ পর্যন্ত থিতু হয়ে ভাবি, মানুষ তার নিয়তিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না বলেই ব্যাংকার-মান্নান শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টা ; আল মাহমুদের অভিধায়– ইতিহাসের পুনর্গঠক।

দিনলিপি না দেখে হয়ত বলতেও পারবো না মান্নান ভাইয়ের জন্ম কবে। তা হোক। পঁচিশে বৈশাখ ছাড়াও তো আমাদের অনেক দিন আছে! তো, যেদিনই তার জন্ম হোক না কেন– সেদিনই আমাদের সুবর্ণ-দিন। ব্যক্তি হিসাবে সেদিন আমি শুভেচ্ছা জানাবো তাকে ও তার পরিবারকে; আর নৈর্ব্যক্তিক আমি উচ্ছ্বসিত হবো তার সৃষ্টিতে, নৈপুণ্যে, উজ্জ্বল উপস্থাপনায়। বার বার আকাংখা করবো তার নব-নব জন্মের জন্য; যা শত ধারায় প্রবহমান জাতির মধ্যে এনে দেবে ঐক্যের সুর। বিভেদ ও নৈরাজ্যের বাইরের চিরায়ত শান্তির দিকে আমাদেরকে আহ্বান জানাবে আর এই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম। আমাদের শরীর কিংবা মন যখনই অসুস্থ বা বিভ্রান্ত হবে– মান্নান ভাইয়ের ঔদার্য ও স্পর্শে আমরা সুস্থ হয়ে উঠবো। খন্ডিত হৃদয় নিয়েও কলম ধরবো আজকের মতই ; বার বার।

প্রিয় মান্নান ভাই, লিখতে থাকুন। সুস্থ থাকুন। শতায়ু হোন।

লেখক : কবি, কথা সাহিত্যিক

www.pathagar.com

সময়ের সফল ব্যবস্থাপক একজন আবদুল মান্নান

কাজী মোর্তুজা আলী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন মেধাবী ছাত্র, সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর পেশা জীবন শুরু। ইতিহাস গবেষণায় তিনি একনিষ্ঠ। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তার অবাধ বিচরণ। তিনিই যখন একজন ব্যাংকার হিসেবে সফলতার সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে তর তর করে উঠে যান উপরে, তখন তাঁর কোন্ দিকটি নিয়ে আলোচনা করা অধিকতর সমীচিন হবে তা আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। জনাব মান্নান এমনি একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন জীবনের নানা অঙ্গনে। সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও একজন হৃদয়বান মানুষ বলতে যা বোঝায় আবদুল মান্নানকে নিশ্চয় সেই কাতারে ফেলা যায়। তাঁর বহুবিধ গুণের মধ্যে কোন্ গুণটি তাঁকে এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে তা কিভাবে নির্ণয় করি?

আমি গবেষক নই। সাহিত্যের জগতে আমার বিচরণ একেবারে শূন্যের কোঠায়। সংস্কৃতির বিশাল চারণ ভূমিতে পদার্পণ করার সুযোগ আমার হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় হলেও এস.এস. সি পরীক্ষায় আমি সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছিলাম পৌরনীতিতে। এর পর আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ার স্বপ্ন আর দেখিনি। আমার আরো একটি দুর্বলতা, আমি কখনো ইতিহাসের পাতায় আনন্দ অনুভব করিনি। রাজাদের ইতিহাস জেনে প্রজাদের কি লাভ? এই প্রশ্নই জেগেছে আমার মনে বার বার। এছাড়া অতীত রোমন্থন করে নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হতে আমি চাইনি। ইতিহাস থেকে না-কি কেউ কোন শিক্ষা নেয় না। তা হলে ইতিহাস চর্চা করা ও নষ্টালজিয়ায় ভোগা কি একই পর্যায়ের রোগ? আমি এসব নিয়ে ভাবি না। তবে আবদুল মান্নানের মত একজন সাংবাদিক-কাম-ব্যাংকার কেন জাতিসত্তার সন্ধানে এত তাকিদ অনুভব করেছেন তা আমার এবং সম্ভবত অনেকের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। মূলধারা আবিষ্কারে এত একনিষ্ঠ ও মগ্ন হবার অনুপ্রেরণা তিনি কোথায় পেলেন? আমাকে এবং আরো অনেককে যা স্পর্শ করে না, মান্নান কোন্ আকর্ষণে সেখানে বিচরণ করেন। কেন তিনি শেকড়ের সন্ধানে বিনিদ্র রাত কাটান? তা বুঝবার মতো বোধ আমার নেই। তবে অনুমান করি, তিনি যা করছেন এবং করতে চাচ্ছেন তা তার হৃদয় মথিত কান্নার আকুতি। এখানে প্রবেশের অধিকার আমি রাখি না। শুধু জানি, একজন সৎ মানুষ, অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে একটি মহৎ চিন্তার চাষ করে চলেছে নিষ্ঠার সাথে।

আবদুল মান্নানের সাথে কবে, কোথায় আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আজ তা সঠিক মনে নেই। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে আমি ঢাকায় এসেছিলাম। সাংবাদিকতার হাতে খড়ি নিলাম দৈনিক সংগ্রামে। মান্নান তখন ছাত্র-সাংবাদিক। সম্ভবত তার সাংবাদিকতার হাতে খড়ি হয়েছে আমার পূর্বেই। সাংবাদিক হিসেবে মাত্র মাস কয়েকের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আমি উড়াল দিলাম করাচীর পথে। করাচীতে হাবিব ব্যাংকের প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসেছিলাম এই বাংলার উত্তর জনপদে। এরপর চাকুরীর সুবাদে ঢাকা ফিরে এলাম ১৯৭৪-এর জুন-জুলাইয়ে। প্রায় সাড়ে চার বছর ব্যাংকের অভিজ্ঞতা আমি কোন কাজে লাগালাম না। নতুন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য যোগ দিলাম বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা হিসেবে। তখনই মান্নানের সাথে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা। আমার অন্তর্মুখী স্বভাবের কারণে নিজেকে আমি যথাসম্ভব গুটিয়ে চলতেই অভ্যস্ত হয়েছি। বন্ধুবর জনাব মাহবুবুল হক ও অন্যান্য করিৎকর্মা সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক বন্ধুর প্রচেষ্টায় সে সময় গড়ে তুলেছিলাম "স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ"। তোপখানা রোডে "ঢাকা ডাইজেস্টের" অফিসকে কেন্দ্র করে ব্যাংকার রশীদ চৌধুরী (যিনি ছিলেন ভ্রাতৃতুল্য)'র নেতৃত্বে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম

www.pathagar.com

আমরা চালাতাম। সিদ্দিক বাজারে ও শিল্পকলা একাডেমীতে নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। "স্বদেশ সংস্কৃতি" নামে অনিয়মিত পত্রিকা বের করতাম। সাপ্তাহিক বৈঠকে সাহিত্য আলোচনা হতো আমাদের। আবদুল মান্নান স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। আমাদের প্রয়াস ছিল অনেক। কিন্তু সফলতা ছিল সামান্য। সে সময় র‍্যাংকিন স্ট্রীটের হান্নান ভাইয়ের বাসায় নাটকের মহড়া দিতাম আমরা। আমি, মান্নান, হান্নান সবাই ছিলাম অকৃতদার। কোন পিছুটান ছিল না আমাদের। খুব অল্প সময়ের জন্য আমি স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলাম। আমি নামেই ছিলাম সভাপতি। কার্যক্রম প্রায় সবই পালন করতেন আবদুল মান্নান। কিন্তু মজা হচ্ছে, আজ এতদিন পরেও প্রসঙ্গে আসলে মান্নান সাহেব কোথাও আমার পরিচিতি দেবার সময় হাসিমুখে বলে ওঠেন উনি আমার সভাপতি। আমি তাঁর অধীনে সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। এটি হচ্ছে জনাব মান্নানের বিনয় প্রকাশ করবার একটি ভঙ্গি। সতীর্থদেরকে সম্মান করবার একটি সহজাত স্বভাব রয়েছে তাঁর মধ্যে। সেই সাথে রয়েছে দায়িত্ব পালনের প্রতি অকুণ্ঠ আগ্রহ। আমার মনে হয়, এ কারণেই তিনি অনেকের নিকট প্রিয় হতে পেরেছেন। কোন কাজের দায়িত্ব নেবার পর তা পালনে কখনোই কোন কুণ্ঠা দেখিনি আমরা। পরবর্তীতে ব্যাংকার হিসেবে সফলতার পেছনে সম্ভবত এই গুণটি তাঁর খুব কাজে লেগেছে। সুনিপুণ কাজের ছেলেকে কে না পছন্দ করবে!

কর্মপ্রিয়তাই জনাব আবদুল মান্নানকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছে বলে আমার মনে হয়। এক যুগেরও বেশী সময় জনাব মান্নান বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। দৈনিক সংগ্রামের চীফ রিপোর্টার হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। আমরা ভেবেছিলাম, জনাব মান্নান সাংবাদিক হিসেবেই বাংলাদেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হবেন একদিন। কিন্তু আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি পেশা পরিবর্তন করে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন ইসলামী ব্যাংকে। এর পর তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি জনসংযোগ থেকে শুরু করে শাখা ব্যাংকিং ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং-এ সুনাম কুড়িয়েছেন প্রচুর। সেরা শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার। প্রবাসীদের টাকা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণের জন্য সৌদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, প্রান্তরে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ও সমাবেশ করেছেন। এককালের জনসংগোগ কর্মমর্তা বাস্তবে একজন ব্যাংকার হিসেবে জনসংযোগ করে বেড়িয়েছেন ও প্রভূত সফলতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয় সবচাইতে বেশী। যতদূর জানি, এর প্রধান কৃতিত্ব আবদুল মান্নানের। বছর দু'য়েক আগে সৌদি আরব সফরের সুযোগ হয়েছিল আমার। রিয়াদ, জেদ্দা, দাম্মাম, মক্কা, মদীনা মোবারক, যেখানেই গেছি সেখানেই শুনেছি আবদুল মান্নানের সুনাম। সৌদিআরবে জনাব মান্নান যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছেন তার পেছনে রয়েছে সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তরিক সমর্থন। তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সবাই। এখানেই আবদুল মান্নানের কৃতিত্ব! তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য মানুষের অভাব হয়নি কখনো। দেশে কিংবা বিদেশে সর্বত্র তিনি পেয়েছেন চেনা-অচেনা মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা। মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মিশবার যে ক্ষমতা মহান আল্লাহ আবদুল মান্নানকে দিয়েছেন, সে ক্ষমতার বলেই মানুষের নিকট থেকে আন্তরিকতা তিনি পেয়েছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যাংকের আমানত বাড়াবার জন্য মান্নানকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিতে হয়নি। বরং যে শাখায় আবদুল মান্নান ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁর পরিচিতজনেরা সেখানেই তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করেছেনে। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতিফলন তিনি এভাবেই পেয়েছেন। পরিচিত আপনজন ও আবদুল মান্নান পরস্পরের সহযোগী। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই মানুষ তাকে ভালোবাসে। এর প্রমাণ আবদুল মান্নান। সাংবাদিকতা থেকে জনসংযোগ এবং জনসংযোগ থেকে জন-ব্যাংকিং-এর মধ্যে একটি যোগসূত্র আমরা পেতেই পারি। কিন্তু যখন দেখি যে তিনি রচনা করেছেন, 'বাংলাদেশের পুলিশ' নামক একটি তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ, তখন সংযোগ বের করতে আমি গলদঘর্ম হয়ে পড়ি। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি রচনায় তিনি কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন আমি সঠিক জানি না। আমার মনে হয়, এ দেশের জন-মানুষের নিকট বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই তিনি এ গ্রন্থ রচনা করে থাকতে পারেন। এখানেও কিন্তু মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ কাজ করেছে। সম্ভবত সে কারণেই তিনি 'শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক' বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। আবদুল মান্নানের চিন্তায়-চেতনায় রয়েছে মানুষ। বিশেষ করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এ কারণে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে, 'সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা।"

দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার বছর তিনি ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাটিয়েছেন

www.pathagar.com

সৌদি আরবে। প্রায় ৪০/৫০ লাখ বাংলাদেশী বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মরত । এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা ভিটে-মাটি বিক্রি করে সৌদি আরবে প্রায় ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করছেন। গৃহ পরিচারিকা নামে যে সব বাংলাদেশী মেয়েরা সৌদি আরবে আছেন, তাদের করুণ আর্তনাদ ও নির্যাতনের কিছু কিছু খন্ড কাহিনী আমি শুনেছিলাম রিয়াদের বাংলাদেশী দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে। আবদুল মান্নান তাঁর দীর্ঘকালীন সৌদি অবস্থানের ফলে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক বেশী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গবেষণাধর্মী এই সব রচনা তাঁকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা। নিজে গবেষণায় যেমন উৎসাহী, তেমনি অন্যকে উৎসাহিত করতে তিনি রচনা করেছেন, "গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি।"

সুশৃংখল ও পরিপাটি জীবনে অভ্যস্থ মান্নানের রচনায় ধরা পড়েছে সে প্রতিচ্ছবি। একের পর এক গবেষণাধর্মী লেখায় তিনি ইতোমধ্যে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। গবেষণার প্রতি তার রয়েছে একটি সহজাত আকর্ষণ। সম্ভবত এ কারণেই তিনি ইতিহাস চর্চাকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, "ইতিহাস চর্চার সরল অর্থ হচ্ছে অতীত সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান।" অতীত সম্পর্কে গবেষণায় অনুরাগের কারণেই তিনি শেকড়ের সন্ধানে ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছেন কিনা তা আমি জানি না। তবে "মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" গ্রন্থে তিনি চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি বিশেষজ্ঞ নই, পাঠক। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহে আমি ইতিহাস পড়েছি। পরস্পর বিরোধী তথ্য ও মন্তব্যের কারণে আমার এ কৌতুহল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাজীবি ঐতিহাসিকদের অবচেতন ত্রুটি ও পন্ডিতমন্য, বুদ্ধিজীবিদের ইতিহাস বিকৃতি এই অনুসন্ধিৎসাকে আরো তীব্র করেছে। বলা যায়, এই ক্ষোভ থেকেই লেখার সূচনা।" শুধু কি ক্ষোভ, না সত্যের অন্বেষায় তারুণ্যের এক প্রচন্ড বিদ্রোহ? আমার মনে হয় আবদুল মান্নান ইতিহাসের একপেশে পন্ডিতদের বিরুদ্ধে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে লড়াই শুরু করেছেন। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত "বাংলা ও বাঙ্গালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" গ্রন্থের রচনার মধ্যে দিয়ে লেখকের সে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আজো সেই সংগ্রাম তিনি অব্যাহত রেখেছেন। সত্যানুসন্ধানী এক সংগ্রামী তরুণের নাম আবদুল মান্নান। হাঁ, আবদুল মান্নানকে আমি আজো তরুণ মনে করি। কারণ তারুণ্যের প্রাণ আছে বলেই তিনি আজো বিদ্রোহী ও সংগ্রামী।

১৯৯৪ এ প্রকাশিত হয়েছে আবদুল মান্নানের "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা"। এই মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য, "এই বইতে আমি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সংগ্রামের ধারাবহিকতার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরে আমাদের জাতিসত্তা বিকাশের ধারাক্রমকে চিহ্নিত করেছি। এই জাতিসত্তার সুরক্ষা ও বিকাশ দানের মধ্যেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের ও অহংকারের বীজ নিহিত। এ জন্য আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সংগ্রাম করেছেন। এ জন্য আমরা লড়াই করছি এবং আমাদের এ সংগ্রাম অব্যহত থাকবে। কেননা, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চাইতে মহত্তর আর কিছু নেই। এই সংগ্রাম কারো বিরুদ্ধে নয়। এই সংগ্রাম আত্মরক্ষার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের। কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং কেন এই সংগ্রাম তাঁর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন লেখক। নেহায়েত আত্মরক্ষার জন্য ও নিজের অস্তিত্বের জন্যই কি এই সংগ্রাম? না, আমি তা মনে করি না। লেখকের সংগ্রাম মূলত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। অন্ধকারে যে সত্য ছাইচাপা পড়ে গেছে, সেই সত্যকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবি আল-মাহমুদ, আবদুল মান্নান সম্পর্কে এ কথাটিই বলেছেন, "তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল অনুসন্ধিৎসা, একই সাথে সত্যের সততাপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা।" জনাব আবদুল মান্নান আমাদেরকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। যে সত্যের সন্ধানে তিনি নিজেকে ব্যপৃত রেখেছেন তা এতদিন আমদের অবহেলায়, অযতনে ছাইচাপা পড়েছিল। তিনি সত্য তথ্য শুধু তুলে ধরেছেন তা নয় বরং তিনি এর ফলে আবেগকে আরো ঘনীভূত করেছেন। ঘনীভূত আবেগের বস্তুনিষ্ট ও তথ্য নির্ভর নির্ঘন্ট রচিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ সমূহে।

গত বছর (২০০৭) ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে আবদুল মান্নানের "বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" নামক গ্রন্থ। "মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা", "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা" এবং সদ্য প্রকাশিত "বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" একই সত্যকে কেন্দ্র করে অবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার কিংবা পাশ কাটিয়ে যাবার যে প্রবণতা একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে কাজ করেছিল সেই সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে । সত্যকে তুলে ধরেছেন তিনি, আবেগ, প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষোভ থেকে। লেখক আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রায় হাজার বছরকে ধারণ করতে চেয়েছেন তিনটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থে। প্রাণের আকুতি দিয়ে তিনি রচনা করেছেন পলি-বিধৌত বাংলার গণ-মানুষের সংগ্রামী জীবনধারা। সত্য সন্ধানের গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁর রচনাসমূহকে পরিণত করেছে এক বিরাট মহীরুহে। তিনি চিহ্নিত করেছেন বাংলাদেশের মানুষকে চির স্বাধীনতাকামীরূপে। তাঁর কথায়, "সকল প্রকার আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এদেশের জন চরিত্র লাভ করেছে এক চিরায়ত বৈশিষ্ট্য।" তাঁর মতে, "হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে লালিত একটি সুচিহ্নিত

www.pathagar.com

জীবনদৃষ্টিই বিকশিত করেছে এ এলাকার মানুষের জাতিসত্তাকে। এই সত্তাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রসত্তা। নিজস্ব পরিচয়, ভাব ও গৌরব নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ একটি শক্ত, মেরুদন্ডবান জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল রূপে। আমাদের জাতিসত্তার এই ভিত যতদিন অটুট থাকবে, আমরা আমাদের স্বাধীন মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব ততদিন অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবো। এই ভিত্তি নষ্ট হলে এদেশের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হারিয়ে যাবে।"

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একদিকে যেমন আবেগ মথিত হয়ে বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয়, তাদের সংগ্রামময় জীবন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন, তেমনি তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি বিধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থসমূহে। আমাদেরকে তিনি চোখে আংগুল দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন আজকের বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও তাৎপর্য্য। বাংলাদেশের বাস্তবতা একটি আদর্শের ও ঐতিহ্যের ফসল এবং ধারাবাহিক সংগ্রামের বর্তমান পরিণতি। বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি দীর্ঘ সফরের দলিল। এই দলিলকে তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার আলোকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন নিষ্ঠার সাথে। তার লেখার মধ্যে দিয়েই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টাসমূহ অবশ্যই একটি বিশেষ মনস্তাত্বিক অবস্থা হতে উদ্ভুত। আবেগ, ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া তাঁর মনস্তাত্বিক অবস্থান তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এ জন্য কি লেখককে দায়ী করা যায়? তিনি যে নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন, তা কি কোন ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি? লেখক এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং আছেন বলে মনে হয়। তাই তো তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উপাদানের সম্মিলিত প্রবাহের সাহায্যে আমি একটি নিরপেক্ষ বিবেচনায় অগ্রসর হয়েছি। বলা বাহুল, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণেই মুসলিম জনগোষ্টীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার অবচেতন মনে একটি প্রতিক্রিয়াও কাজ করেছে।" লেখকের এই স্বীকৃতি তাকে দুর্বল করেনি বরং মজবুত করেছে। তিনি পেশাজীবি ঐতিহাসিক নন। আবেগতাড়িত হলেও অসচেতন নন। তাঁর ত্রুটি বা পক্ষপাত তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন। কতজন লেখক, বুদ্ধজীবি, পন্ডিত পেরেছেন এরকম অকপট স্বীকৃতি দিতে?

আবদুল মান্নান চেয়েছেন বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামকে ধারাবাহিকভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রন্থিত করতে। "মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারায়" তিনি প্রথম সোপান নির্মানে সক্ষম হয়েছেন। দ্বিতীয় সোপানে তিনি জাতিসত্তা বিকাশের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এদেশের সাধারণ মানুষের দুর্নিবার ও নিরন্তর সংগ্রামকে। তাঁর ভাষায়, "বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষদের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এ সংগ্রামের রয়েছে এক বিস্ময়কর ধারাবহিকতা ও অসামান্য বহমানতা।" তার মতে, "হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে লালিত একটি সুচিহ্নিত জীবনদৃষ্টিই বিকশিত করেছে এ এলাকার মানুষের জাতিসত্তাকে।" মান্নান তাঁর গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সেই সুচিহ্নিত জীবন দৃষ্টি হচ্ছে "ইসলাম"। মান্নানের সহজ সমীকরণ, "ইসলাম এদেশের সামাজিক অচলায়তন গুড়িয়ে দিল এবং নেতৃত্বের তথাকথিত প্রাচীরও অপসৃত করলো। ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী বংশ বর্ণ চেতনার অবসান ঘটলো। গোড়াপত্তন হলো জীবন-দৃষ্টি, বিশ্বাস ও আদর্শের ঐক্যের ভিত্তিতে এক নতুন জনগোষ্টির। জেগে উঠল এক নতুন জাতিসত্তা এই বাংলার মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ ও পরবর্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক সূত্রে গাঁথা। "বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ" গ্রন্থে আবদুল মান্নানের অতি সহজ অনুসিদ্ধান্ত "১৯০৫ সালের "বঙ্গভঙ্গ" বর্তমানে বাংলাদেশের ভিত্তি। ১৯০৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গঠনের মধ্য দিয়েই বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"

বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন ১৯৭০ এর সূচনা লগ্নে হলেও মান্নানের দৃষ্টিতে "ইসলাম" নামক এক মহান আদর্শের বিজয় পর্ব ও সংগ্রামের ঐতিহ্যে গ্রথিত হয়েছে বাংলাদেশের হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন। এই দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েই তিনি তাঁর লেখনী চালিয়েছেন।

জীবিকার তাকিদে একদিন তিনি প্রবেশ করেছিলেন ব্যাংকিং এর জটিল হিসাব নিকাশের জগতে। সে জগত নিয়ে তাঁর ভাব-ভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছেন তিনি "ইসলামী ব্যাংকব্যাস্থা" নামক গ্রন্থে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রযাত্রাকে অধিকতর ফলপ্রসূ, টেকসই ও গতিশীল করার মানসে তিনি রচনা করেছেন "ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা"। জনাব মান্নান অনেকের মত মনে করেন যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত ইসলামের আর্থ সামাজিক কর্মসূচীর একটি অংশ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যে আন্দোলন দেশে দেশে চালু হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে ইসলামী বীমা বা তাকাফুল বিকাশ লাভ করেছে মুসলিম বিশ্বে। বাংলাদেশেও ইসলামী বীমা, বিশেষ করে ইসলামী জীবন বীমা যে ভাবে সফলতা অর্জন করতে

www.pathagar.com

যাচ্ছে, ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষকে তা আশান্বিত করেছে। ইসলামরে আর্থ সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা পাশাপাশি, পরস্পরের সহযোগী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশ্চাত্য বিশ্বে Bankassurance সফলতা অর্জন করায়, Bankatakaful প্রচলন করার উদ্যোগ অনেক দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে। আবদুল মান্নানের মত গুণী ব্যাংকার ও ইসলামী বীমার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহ পরস্পরের সহযোহগী হয়ে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে অধিকতর কল্যাণ মূখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনাব মন্নান অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি। জনাব মান্নান ও আমার দাপ্তরিক অবস্থান একশ গজের মত দুরে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বছরে একবার হয় কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি মন্নান পরীবাগে, যেখানে আবাসন গেড়েছেন তার দুরত্ব আমার বাসা থেকে দুইশ গজের মধ্যে, কিন্তু তাঁর পরেও নিয়মিত যোগাযোগ বা আলাপচারিতা একেবারেই নেই বলা চলে। মিসেস মান্নান ও মিসেস মোরতুজার মধ্যে কিছুটা ক্ষীণ হলেও যোগাযোগ আছে। কিন্তু তাদের সাহেবরা এত ব্যস্তবাগীশ যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি বেমালুম ভুলে থাকেন। ফলে ভাব-ভাবনার আদান-প্রদান তাদের মধ্যে নেই। বাস্তবে দুই জন দুই জগতের বাসিন্দা না হলেও সময় তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বিভিন্ন কাজে, বিভিন্নস্থানে। এই তো বছর তিনেক আগে মান্নানের সাথে দেখা হলো কুয়ালালামপুর। গিন্নীদের মধ্যে যোগাযোগের ফলে জানতে পারলাম যে আমরা দুজনেই মালয়েশিয়ায় রয়েছি। আমি লংকাভীতে তাকাফুলের উপর এক সম্মেলনে গিয়েছিলাম আর জনাব মান্নান মালয়শিয়ার অন্য প্রান্তের এক শহরে উচ্চমার্গের এক প্রাশিক্ষণ বা কর্মশালায়। মুঠোফোনের বদৌলতে যোগাযোগ হলো এবং একই সন্ধ্যায় আমারা ঘটনা চক্রে কোয়ালালামপুর আসলাম। পরস্পরের সাথে দীর্ঘদিন পরে যোগাযোগের সুযোগ হাতছাড়া করলাম না আমরা। আমিই গিয়ে উঠলাম মান্নান সাহেবের জন্য বুক-করা হোটেলে। ডঃ মাসুমবিল্লাহ আমার জন্য অন্য একটি হোটেল ঠিক করেছিলেন। যেহেতু অতি সকালে আমার ঢাকা ফিরে আসার টিকেট নিশ্চিত করা ছিল, সেহেতু পরস্পরের সাথে দেখার সুযোগ আমরা গ্রহণ করলাম।

দীর্ঘ রাত অবধি তিন দশক আগের মত নানা বিষয়ে কথা হলো। তবে মান্নান-এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই কথা হলো বেশী। এর পর গত তিন বছরে তাঁর সাথে তিন বার দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ আমাদের মধ্যে আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। বিগত-১৮-১১-২০০০ তারিখে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর প্রকাশিত "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা" গ্রন্থটির একটি শুভেচ্ছা কপিতে লিখেছিলেন, "আমার আত্মার আত্মীয় কাজী মোরতুজা আলীর হাতে প্রীতি মুগ্ধ.....।" ব্যাপারটা এমন যে আত্মার আত্মীয়দের সাথে বাহ্যিক যোগাযোগ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সামাজিকতা রক্ষা বা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ না ঘটলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকে।

সে যাই হোক, আবদুল মান্নান যে আমার পারিবারিক বন্ধন তৈরিতে যে নেপথ্য নায়কদের ভূমিকা রেখেছিলেন তা কিন্তু আমরা স্মরণ করি কৃতজ্ঞ চিত্তে। অবশ্য এখানেও বন্ধুবর মাহবুবুল হক ছিলেন মূল নায়ক। মরহুম ইউনুস ভাই ও অন্যরাও ছিলেন সক্রিয় সহযোগী। দুই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে আমার পারিবারিক সানন্দ জীবনের। জীবন সাথী নির্বাচনে ও বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার বন্ধুরা বিশেষ করে মাহবুব ভাই ও মান্নান ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। অসুস্থ শরীর নিয়ে ঢাকা থেকে মাহবুব ভাই মান্নানকে সাথে নিয়ে রাজশাহী এসেছিলেন, সেখানে থেকে জয়পুরহাট। জয়পুরহাট থেকে রাজশাহী হয়ে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে তাদের যে কি কষ্ট হয়েছিল তা ভাবলেই আমি লজ্জায় ও কষ্টে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি আজও। বিয়ের নানা ধরনের বিড়ম্বনায় আমি ছিলাম বিব্রত। আমার পক্ষে তাঁদের ঠিকমত খোঁজ-খবর নেয়াও সম্ভব ছিল না। মান্নান অসুস্থ মাহবুব ভাইকে সময় দিয়েছেন, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। আত্মার আত্মীয়রাই পারে নেপথ্যে কাজ করে যেতে হাসি মুখে।

মান্নানের কথা লিখছি যখন, তখন বার বার আর একজনের কথা মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন মান্নানের 'মা'। মান্নান তার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই তার উপর দায়িত্ব ছিল অনেক। মান্নানের ছোট ভাইয়েরা ব্যবসা করতো। তাদের যে কোন সমস্যা মান্নানকেই দেখতে হতো। মান্নান হাসিমুখে শত ব্যস্ততার মাঝেও সেগুলো সামলাতো। বর্তমানে তাঁর পক্ষে সব দিক সামলানো সম্ভব হয় কি-না জানি না, তবে সংসার জীবন, পেশা জীবন, লেখক জীবন এই তিনটিকে তিনি খুব সুন্দর-ভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। কোনটির সাথে কোনটির কোন সংঘাত হয়েছে বলে কোন দিন শুনিনি। স্ত্রী ও তিন

www.pathagar.com

কন্যা নিয়ে সুখী জীবনের সফল ও সার্থক এক পুরুষ তিনি। হয়তো তাঁর বাবা-মায়ের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তাতে। আমরা মাঝে মাঝে মান্নানের বাসায় (বিয়ের আগে) যেতাম। মান্নানের মায়ের সযতনে বানানো নানা ধরনের পিঠা-পুলির স্বাদ গন্ধ সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করতো। ভোজনে আমি তৃপ্ত হতাম। সেই মায়া স্নেহে আজো আমরা আপ্লুত হই। সময় কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মান্নান এখন নানা হয়েছেন। সুদূর বিলেতে মেয়ে-জামাই-নাতনী থাকে। মান্নান আজ শুধু তাঁর পিতা-মাতার সফল সন্তান নন বরং কন্যাদের গর্বিত পিতা। তাঁর সুখের সংসারে, অবশ্যই অবদান রয়েছে তাঁর সহধর্মিনীর। স্ত্রীর আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহযোগিতা ছাড়া আজকের লেখক-গবেষক-ব্যাংকার মান্নান হওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। আমার মনে হয়, এর সবকিছুতেই রয়েছে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। যারা সৎ ও সুন্দর জীবনের অভিলাষী, সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই তাদেরকে সেই পথে এগিয়ে নিতে সবদিক থেকে সাহায্য করে থাকেন।

এই লেখার পুরো কৃতিত্ব আমাদের অতি পরিচিত সজ্জন, বন্ধুবর জনাব হান্নানের। তার ক্রমাগত তাগিদ ও বারংবার অনুরোধের ফলেই এই লেখা সম্ভব হয়েছে। মান্নান একজন সময়ের সফল ব্যবস্থাপক। সময়ের প্রতিটি সুযোগ তিনি কাজে লাগিয়েছেন। হান্নান ভাই আমাকে সময় ব্যবস্থাপনায় (Time Management) অধিক মনোযোগী হতে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। অতএব মান্নান সম্পর্কীয় লেখার জন্য হান্নান ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে কৃতজ্ঞ চিত্তে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, গবেষক, সংস্কৃতিসেবী

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে ব্যাংকিং খাতে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় নজরুল সমাজের সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
আমার সাক্ষ্য

মো: আবদুল হামিদ

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ছোট্ট ক্যানভাসে দেশ-বিদেশের অসংখ্য-অগণিত মানুষের ছবি ক্যামেরাবদ্ধ আছে। অনেকের ছবিই স্মৃতিপটে ভাসে। শত চেষ্টা করেও আবার অনেকের ছবিই রোল থেকে বের করতে পারি না। একটি ছবি আমাকে দিন-রাত চব্বিশটি ঘন্টা নাড়া দেয়। সে ছবিটি হচ্ছে আমাদের নারায়ণগঞ্জ জেলার কৃতি সন্তান, পরশ পাথরের গুণ ও চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব, সফল ব্যাংকার, ঈর্ষণীয় ইতিহাস গবেষক, আমাদের দেশের গর্বের ধন মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের।

যাঁর কাছে এসে কেউই খালি হাতে ফেরে না। কাজে না পারলে অন্তত দু'টি ভালো কথায় তিনি মানুষকে তৃপ্ত করে তবেই তাঁর চেম্বার থেকে বিদায় করেন। তাঁর সাথে উঠ-বস করা মানে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র আর মিল্লাতের অতীতের সোনালী ইতিহাসের পাতাগুলোতে চোখ বুলানো। অজানা অনেক কাহিনী গোগ্রাসে গেলা। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের হাজারো-লাখো বিষয়কে তিনি চলমান প্রেক্ষাপটের জন্যে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর সামনে বসা আমরা গোবেচারা মানুষগুলো তখন হা করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি, আর বুঝতে চেষ্টা করি। শিখতে উদ্বুদ্ধ হই। কিছু করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি কর্মের ময়দানে। একটুও ভাবি না, সাত সমুদ্র তের নদী আমি কিভাবে পার হবো। আবার সমুদ্র-খাল-নদী-বিলের পারে এসে সব সময়ই দেখি কোন পর্যায়েই আল্লাহ ঠেকিয়ে রাখেননা, সব সময়ই মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালাকে পাই, তিনি অসীম দয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন বলছেন: বান্দা! তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। আর আমার হক ও বান্দার হক একটু ক্ষণের তরেও ভুলো না। তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হারাতে হবে, বুঝলে।

ঘুরে-ফিরে আবার ছুটি আমি মান্নান সাহেবের কাছে। তাঁর সান্নিধ্য আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। আমি যদি বাকী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে পারতাম। তা হলে আমার মনে হয় অনেক কিছু শিখতে পারতাম। অনেক পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা পেতে পারতাম। অনেক ভাল কাজ করার দিক-নির্দেশনা পেতে পারতাম। জীবনকে আরও সুন্দর করে সাজানোর সুযোগ পেতাম। আমার মনুষ্যত্ব আরও বাড়ত। তাঁর মতো আমার মনও অনেক বড় হতো, যার তুলনা চলে একমাত্র বিশাল আকাশের সাথেই।

কোন্ দিক নেই তাঁর মধ্যে? ব্যাংকার ও গবেষক এই ব্যক্তিত্বকে আমি কখনো পাই সবুজ-অবুঝ দুরন্ত শিশু হিসেবে। তাঁকে দেখি হিলফুল ফুজুলের অধুনাকালের চৌকষ সদস্য হিসেবে। তাঁকে কখনো মনে হয় অভিজ্ঞ রাজনীতিক কিংবা ভবিষ্যত দ্রষ্টা রাষ্ট্রনীতিক। এক সময় ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। এখন তাঁকে দেখি ইতিহাসের সত্য-সন্ধানী অকুতোভয় সিপাহসালার হিসেবে। তাঁকে পাই মমতাময়ী বাবা হিসেবে। তাঁকে পাই প্রেমময়ী স্বামী হিসেবে। তাঁকে পাই সফল বড় ভাই হিসেবে। তাঁকে পাই জনকল্যাণে আর মানুষের জন্য কিছু করার মিছিলের প্রথম সারির কোমল হৃদয়ের একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে। তাঁকে দেখি ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বাস্তবায়নের সংগ্রামে অগ্রণী অবস্থায়। তাঁকে দেখতে পাই সাহায্য প্রার্থী যে কোন বনী আদমের কথা শুনতে, বুঝতে এবং কোন না কোন পথ বাতলে দিতে। এতো সফল মানুষ তো ইদানিং আমি দেখিনি। এমন মানুষের কথা তো আমরা কেবল বই-পুস্তকেই পড়ে আসছি।

২০০৩ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। 'পড়ে না চোখের

www.pathagar.com

পলক...' আর কি। সেই যে দেখেছি, আঁকড়ে ধরেছি, আর চোখ ফিরিয়ে কোথাও তাকাইনি। ছাড়িনি একটু ক্ষণের জন্যেও। তিনি এমন অব্যর্থ তীর আমার বুকে বিদ্ধ করেছেন, এ শিকার আর পালাবে কোথায়!

ইসলামী ব্যাংক-এর সাথে আমার ঘর করা শুরু হলো। ও-মা, এ তো দেখি আরেক পৃথিবী! এখানে সবার কপালেই দুটো চোখ, হাতও দুটো। আমরা তো জেনে আর মেনেও আসছিলাম, এসব পেশার লোকদের অনেক অনেক চোখ আর হাত আছে। যখন যেটা ব্যবহার করা দরকার, সেটা তখন তারা ব্যবহার করে। কিন্তু না, এখানে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের মনে করা হয় এ ব্যাংক-পরিবারের সদস্য হিসেবে। ক্লায়েন্টদের দুঃখের সাথী তাঁরা, সমব্যথী তাঁরা। মনে হয় আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। এখানে মন খুলে সব কথা বলা যায়। সাহায্য চাওয়া যায়, কিন্তু সাহায্য করা যায় না। সত্যিই কি বিচিত্র সেলুকাস!

এখন আমি আমার অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে আফসোস করে মরি, ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই কেন এ ব্যাংকের সাথে ব্যবসা আরম্ভ করার সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ১৯৮৩ সালে এ্যাকাউন্ট করতে না পারার জন্যে মাঝে-মধ্যে নিজের চুল নিজেই ছেঁড়া ছাড়া আর উপায় বা কি? আল্লাহ তো রাহমানুর রহীম। তিনি হয়ত আমাকে ক্ষমা করে দিতেও পারেন। আল্লাহ! তুমি আমার জীবনে জানা-অজানা
গুনা-খাতা ক্ষমা কর।

আমরা হলাম খেটে খাওয়া মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য করে, আয়-উৎপাদন করে ব্যাংকের টাকা ফেরত দেয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। তিনি আমাকে বোঝালেন আল্লাহর বিধান মেনে মানুষ দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা যে কাজই করবে তা-ই ইবাদত। তিনি বোঝালেন ব্যবসার পাশাপাশি সমাজে আরো অনেক কাজ করার আছে। এ জন্যে অন্যান্য কাজের সাথে বিকৃত সংস্কৃতিকে ঠিক করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সে জন্যে বঙ্গভঙ্গ শতবার্ষিকী র‍্যালির সামনের কাতারে থাকতে তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। ভালই লাগলো, জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বার্থের পক্ষে বুকটান করে দাঁড়াতে। হৃদয়টা আমার ভরে গেল।

ইসলামী ব্যাংক এ দেশকে ফলে-ফুলে সাজানোর জন্য খাতওয়ারী বিনিয়োগ দিয়ে থাকে। সাধারণ এসব ব্যাংকিং কাজের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য। ব্যাংকের পঁচিশ বছরের পথচলায় প্রায় প্রতি বছরের ক্যালেন্ডারই বেরোয় সুন্দর ক্যালিগ্রাফি দিয়ে। সেই ক্যালিগ্রাফি আমি মান্নান ভাইকে দেখিয়ে বাঁধাই করে রাখি। এর পর ঢাকায় অনেক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী হয়েছে। এ প্রদর্শনীর সময় পাগলের মতো ছুটে গিয়ে কিনে এনে ঘর-বাড়ি, অফিসে লাগাতে থাকি। এখন আর ফালতু কোন ছবিই আমার দেয়ালে শোভা বর্ধন করে না। আল্লাহর কালাম এখন আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর। তাই আমি আমার ফ্যাক্টরি আর অফিসের সামনে 'হাজা মিন ফাজলে রাব্বি'র ক্যালিগ্রাফি খোদাই করেছি- আলহামদু লিল্লাহ।

মান্নান সাহেবের সাথে উঠ-বস করতে গিয়ে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পর্কে আমার অন্তর চক্ষু খুলে গেল। এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ! এ চলাকে দুর্বার করে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলনে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রেমিক আর নিখাদ মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব, এটাই তাঁর দীক্ষা। এসব ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ নিতে এসে তাঁকে আমার মনে হয়েছে নিতান্ত বাস্তব মানুষ তিনি। লক্ষ্যে অবিচল এ মানুষটি ধারণাতীত পরিশ্রমী। তাঁর এমন ভাবনা-চিন্তা আর জ্ঞানের গভীরতার ছোঁয়া আমাকে কিছু একটা করার জন্য করেছে উদ্বুদ্ধ। অনেক দিন তাঁর অফিসে খেয়ে দেয়ে চেয়ারের উপর ঘুমাতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে। আশ্চর্য এ লোকটি যথাসময়ে যথা শব্দ প্রয়োগে দিক-নির্দেশনা দেন। তাঁর কথা শুনলে শূন্য থেকে গোলা ভর্তি হয়ে যায়। এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে ভুরি-ভুরি। আখিরাতকে বাদ দিয়ে তাঁর দুনিয়া নয়। আবার দুনিয়া বাদ দিয়ে তাঁর আখিরাত নয়। আস্তিক মানুষের চব্বিশ ঘন্টার সব কাজই ইবাদত। হালাল মানতে হবে, হারাম করতে হবে বর্জন।

তাঁর প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা আমার চোখ-কান খুলে দিয়েছে। তিনি তাঁর অধীনস্থ সহকর্মীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন তা সত্যিই দেখার ও বোঝার বিষয়। প্রফেশনাল স্কিলের পাশাপাশি লেখাপড়া এবং হাটা-চলায় স্মার্ট হতে হয় তাদের।
বিনিয়োগ তিনি দেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ বিনিয়োগ ব্যাংকের চল্লিশ লাখ লোকের আমানতের অর্থ। সে জন্যে এ আমানতের কোনভাবে অন্যথা না হবার ব্যাপারে তিনি সব সময় এমনভাবে সিরিয়াস–তাঁকে মনে হয় প্রকৃত লৌহ-মানব।

www.pathagar.com

তিনি আমাদের ফ্যাক্টরী ভিজিটে আসেন। উট পাখির ডিমের ন্যায় চোখ দুটো বিস্ফারিত করে দেখতে থাকেন। একের পর এক পরামর্শ দিতে থাকলেন। বললেন, অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের কল্যাণে আয় করতে হবে। আর অকাতরে জনকল্যাণে বিলাতে হবে তা থেকে। দেশের মানুষের চেহারা পাল্টে দিতে হবে। ১৫ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। গ্রহিতার হাতকে দাতার হাতে পরিণত করতে হবে। এসব করার জন্য সুস্থ-সবল থাকতে হবে।

আমি পড়ুয়া ছিলাম না। তিনি আমাকে বই-পত্র পড়তে উদ্বুদ্ধ করলেন। এলাকায় বেশ কিছু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বই দিতে পরামর্শ দিলেন। দিলামও। আমার ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরও তাঁর চোখ পড়তে ভুল করলো না। এবার কর্মচারীদেরও শেখানোর পালা।

বকলম এই আমি শত বোমা মারলেও যার মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না। তিনি টার্গেট নিলেন আমাকে, বক্তা বানিয়েই ছাড়বেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে দিতে থাকলেন। শুধু তা-ই নয়, ইসলামী ব্যাংকের প্রবেশনারী অফিসারদের এবং ইন্টার্নী ছাত্র-ছাত্রীদের দল বেঁধে পাঠাতে থাকলেন আমার ফ্যাক্টরী ভিজিটে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে আমার। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনর্গলবর্ষী বক্তা হয়ে গেলাম।

তিনি আমাকে গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দিতে, বই কিনে দিতে, পোশাক তৈরি করে দিতে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। করলামও। ভাল লাগছে, আমার মতো এমন নাখান্দাও সমাজের একটু হলেও কাজে আসতে পারলাম। আমাকে হাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে গরীব ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদী করিয়ে দিতে এগিয়ে দিলেন। ঘূর্ণিঝড়-সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা, ঘর-বাড়ী তৈরি করার কথা বললেন। ভালো লাগছে, আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন করার। তিনি বললেন, গরীব বেকার যুবকদের রিক্সা-ভ্যানগাড়ী-ঠেলাগাড়ী তৈরি করে স্বাবলম্বী করতে। করেছি। অনেকেই উপকৃত হয়েছে।

এমনিভাবে আমার জীবন-জিজ্ঞাসার এমন দিক নেই যেখানে তাঁর ছোঁয়া নেই। আমি নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত ছিলাম না। তাঁর ছোঁয়ায় এসে এখন তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাঁর কথায় আমি ২০০৪ সালে পাগলের মতো ছুটে গেছি পবিত্র হজ্বে। সে কি যে প্রশান্তি পেয়েছি, আর তাঁর জন্য মন ভরে দোয়া করেছি।

আমি ছিলাম চেইন স্মোকার। তিনি আমাকে ধূমপানের ক্ষতির দিকগুলো বোঝাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে ধূমপান বর্জন করতে বাধ্যও করলেন। হজ্জে যাওয়ার আগে এলাকার সবাইকে দাওয়াত দিলাম। তাঁকে সে জিয়াফতে অনুনয়-বিনয় করে হাজির করালাম। জিয়াফতের এক পর্যায়ে আমার এক বন্ধু আমাকে একটি সিগারেট ধরাতে বাধ্য করলেন। কোন ফাঁকে তিনি তা দেখে দেখে ফেললেন। আর তো রক্ষা নেই। এতবেশী রাগ করলেন, এমন রাগতে তাঁকে আমি আর কখনো দেখিনি। বেশ ক'দিন তিনি আমার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কটুকুও রাখেননি। পরে অবশ্য আমি ঠিক করে ফেলেছি।

অবাক বিস্ময়ে ভাবি, এতো কিছু করার কথা তিনি আমাকে বললেন, কিন্তু নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা, কিংবা নিজের কোন সমস্যার কথা কোন দিন, কখনো তো বললেন না। তাঁর সহকর্মীদের মুখেও কোন দিন হা-হুতাশ শুনিনি। কাজ পাগল এ মানুষগুলোর কারণেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর সৌন্দর্য আর শ্রেষ্ঠত্ব আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষ দলে দলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের ছায়াতলে।

তাঁর মেয়ের বিয়ে। ভাবলাম, দাওয়াত তো পাবোই। আমার সামনে সহকর্মীদের অনেককেই কার্ড দিলেন। আমাকে দিলেন না। ক'দিন গেলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, দাওয়াত দিতে ভুল করলেও যেতে ভুল করবো না। এক পর্যায়ে কার্ড চাইলাম। বললেন, ব্যাংকের কোন গ্রাহককে তিনি বিয়েতে দাওয়াত করছেন না। তবু আমি দাওয়াত চাইলাম। তিনি কিছু বললেন না। দেশের বাইরে থেকে এম.ডি. সাহেব আসার পর সম্ভবত তার সাথে পরামর্শ করে আমার মতো দু'একজন গ্রাহককে দাওয়াত দিতে রাজী হলেন। ভাগ্যগুণে একটি কার্ড আমি পেলাম। বিয়েতে যেতে পারলাম।

আরো কত কথাই তো তার সম্পর্কে বলা যায়। কিন্তু না। এ মুহূর্তে আমি আমার পরমাত্মীয় মান্নান ভাইয়ের নিরোগ দীর্ঘায়ুর জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে আঁজলা ভরে প্রার্থণা জানাই।

লেখক : বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পপতি; সদস্য, নারায়ণগঞ্জ ক্লাব, সহ সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, গোদনাইল হাইস্কুল ও সভাপতি গোদনাইল ইসলামী পাঠাগার

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বাংলাদেশ গবেষণা

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

কোনো মানুষের সাধনার প্রতিটি ধাপ সরব। কেউ কেউ নীরবে পালন করেন জাতির জন্য সুমহান দায়িত্ব। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নীরব অভিযাত্রীদের একজন। অনেকের দৃষ্টির আড়ালে বাংলাদেশের মানুষের শিকড় সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তিনি। কিন্তু কী তাঁর অনুসন্ধান! কি তাঁর বিশাল গবেষণার ভান্ডার! বোকা বনে গেছি!

আমি শুধু তাঁর ইতিহাস অনুসন্ধান বিষয়ে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এ কথা ঠিক যে, আজ যা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, আগামীকাল তা ইতিহাস। সে ইতিহাসের অনুসন্ধান যখন চলে তখন কেউ কেউ ইতিহাসের গতিধারা তাঁর নিজের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়ে দিতে চান, কেউ কেউ থাকেন সঠিক পথনির্দেশের দিকে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দ্বিতীয় ধারার ইতিহাস গবেষক। 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা', 'মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা', 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' আর শিশুতোষ 'সোনার দেশ বাংলাদেশ' বইগুলি আমার হাতে। এই বইগুলির পাতা যখন উল্টে গেছি, তখন গর্বে-গৌরবে ভরে গেছে মন, স্পৃহা জেগেছে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার। বারবার ফিরে গেছি আমার পূর্বপুরুষদের কাছে। যেন অনুপ্রেরণার সন্ধান চেয়েছি তাদের কাছ থেকে।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'র শুরু কোথা থেকে হবে? অষ্টম শতকের আগে বাংলাদেশের ইতিহাস অস্পষ্ট। তার সুনির্দিষ্ট ধারাক্রম উদ্ঘাটন করা দুরূহ। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে এদেশে শুরু হয় পাল রাজাদের শাসনকাল। তারা বিদেশী শাসক ছিলেন না। তারা ছিলেন এদেশেরই মাটির সন্তান। আর সে সময়ে নগর সভ্যতার বিস্তার ঘটেনি বলে মানুষের সংস্কৃতি ছিল উদার ও লোক জীবনের অনুষঙ্গ। পাল রাজারা ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিলেন। তারা মানুষে মানুষের বিভাজন মানতেন না। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটেছিল। সেটা অবশ্য অনিবার্যই ছিল। কারণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকলে, জাতিগত বৈষম্য থাকলে নদী প্রধান বাংলাদেশ অঞ্চলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু দ্বাদশ শতকে বহিরাগত সেনরা আসে কর্ণাটক থেকে। তারা ছিল নিষ্ঠুর ও শোষক। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপৃত যে সংস্কৃতি ছিল এখানে, তারা তাকে উচ্ছেদ করতে চাইল। সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু করতে চাইল রাজসভা ও ধর্মমন্দিরে। এমনকি তারা ভাষায়ও আনতে চাইল পরিবর্তন। চালু করার চেষ্টা করল বাংলা ভাষার বদলে সংস্কৃত ভাষা। তারা যে সংস্কৃতির প্রচলন করতে চাইল, তা ছিল হিন্দু ধর্মাশ্রিত। তাও আবার কৌলিন্যবাদী ব্রাহ্মণদের। ফলে এখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ শ্রেণী ও অন্তজ শ্রেণীর হিন্দুরা পিছিয়ে পড়তে থাকল।

এ রকম একটি রুদ্ধশ্বাস নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ যখন এখানকার মানুষ তখন ১২০৩ সালে এলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। তারা যেহেতু মুসলমান ছিলেন, সুতরাং তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বৌদ্ধধর্মেও নেই। অপরদিকে সুবিধা বঞ্চিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও দেখলেন, নিপীড়ন নেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে। বরং সমানাধিকারের নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে। তাই সকল শ্রেণীর মানুষ সমর্থন জানালো বখতিয়ার খিলজীকে। মুসলমানরা একটি নতুন বিশ্বাস আনলেন, এ দেশের সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং একটি বিস্ময়কর মানবিক চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটালেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন পাল আমল থেকেই।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থের ভূমিকায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখেছেন, "বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হলো পূর্বপুরুষদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। সেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত হয় বর্তমান স্বাধীনতার শিকড়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এই সংগ্রামে রয়েছে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা ও

www.pathagar.com

অসামান্য বহমানতা। সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব-পতাকা হাতে এই ভাটি অঞ্চলের সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই করেছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এ জনপদ বিবেচিত হয়েছে উপমহাদেশের বিশাল মানচিত্রে আর্যপূর্ব সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলরূপে। এ এলাকার জনগণের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিকট অতীতে এ লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ও তাদের এ দেশীয় কোলাবোরেটর বর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্যরা তাদের অধিকার বিস্তৃত করে নানা ঘোরপথে যখন এ বদ্বীপে উপনীত হলো, তখন থেকে একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশের জনগণের আধিপত্যবাদ বিরোধী লড়াই পর্যন্ত এ জাতির সংগ্রাম ও সংক্ষোভের মূলধারা রচিত হয়েছে অভিন্ন প্রেরণার এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।'

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড এক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন, 'বর্তমান বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা দূর-অতীতে কখনও বাংলা, বাঙ্গালাহ কিংবা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না। বাংলাদেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক একীভূতকরণ সম্পন্ন হয়েছিল বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহের (শাসনকাল-১৩৩৯-১৩৫৮) শাসনামলে। তিনিই প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন আববাহিকার ব্যাপক এলাকাকে বাঙ্গালাহ নামে অভিহিত করেন। বাঙ্গালাহর সঙ্গে যুক্ত করেন বর্তমান উত্তরবঙ্গ লাখনৌতিকে। তার আমলেই প্রথম সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল একীভূত হয়। আর নিজের নাম দেন শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ।'

জনাব মান্নান বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তার বিকাশ অনুসন্ধান শুরু করেছেন বৌদ্ধ পাল আমল থেকে। পালদের শাসনকালে এদেশে সামাজিক সাম্য ও প্রায় অভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। প্রায় চার বছরের পাল শাসনামলেই আর্য আগ্রাসন রোধে যূথবদ্ধ হয়েছিল বাংলার মানুষ। আর্যরা সিন্ধু পাঞ্জাব উত্তর ভারত অধিকার করে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আর্যদের সে আগ্রাসন মেনে নেয় নি। তারা রুখে দাঁড়ায়। 'সদানীরার (করতোয়া) অপর পারে অবস্থিত বঙ্গ দেশের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।' তার কারণ বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় জাতিভেদ প্রথা মেনে নিতে চায় নি। তার অর্থ দাঁড়ায়, এ দেশের মানুষের যে সাংস্কৃতিক চেতনা তার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় আর্যদের, সে খৃস্টপূর্ব ৪০০ বছর আগে। তারপর মৌর্য ও পরে গুপ্তদের আমলে বাংলায় আর্য শাসন কায়েম হয়। অষ্টম শতকে এসে বাংলায় কায়েম হয় পুনরায় বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসন। তাদের চার শ' বছরের শাসনকালে মানুষ হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম আবিষ্কার ও আত্ম প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হন। গড়ে ওঠে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার। যে গুলো ছিল জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ।

পালরাজাদের অনেকেই শেষ দিকে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেন। তার প্রভাব শাসন ব্যবস্থায় পড়ে। এর পরিণতিতে পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা পালদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ক্ষমতা দখল করে নেয় বিজয় সেন (১১৫৮)। তারপর আবারও বিভাজন প্রক্রিয়ার শিকার হয় বাংলাদেশের মানুষ। অত্যাচার, নিপীড়ন শুরু হয় নতুন করে।

এ সময় ১২০৩ সালে বাংলা জয় করেন বখতিয়ার খিলজি। পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। বাংলায় মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিল সাড়ে পাঁচশ' বছর। এই সাড়ে পাঁচ শ বছরে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। মুসলমান শাসকরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান উপকরণগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এদেশের মানুষের জাতীয়তার বিকাশ ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে মুসলিম শাসনের প্রভূত অবদান রয়েছে।

সেভাবেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে বিশেষ সাংস্কৃতিক ধারা। সে ধারা রক্ষার জন্যই এখনও চলছে প্রতিরোধ যুদ্ধ। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিপুল তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাই বিবৃত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা

এ গ্রন্থে শিকড়-সন্ধানী গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একেবারে প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করেছেন তাঁর অনুসন্ধান। প্রায় দশ হাজার বছর আগে বাংলাদেশে মানুষের বসতি স্থাপিত হয়। তিন হাজার বছর আগে বাংলাদেশে বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল। তারা ছিল সভ্য ও জ্ঞান গরিমায় অনেক উন্নত। প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে এদেশের মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করে। বিভিন্ন স্থানে তার বহু প্রমাণ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। আর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে তারা ছিলেন দ্রাবিড়। তারা ছিলেন অসম সাহসী। কাঠের তৈরি নৌকায় তারা নদী-সমুদ্র পাড়ি দিতেন। কিন্তু আর্যরা সে সময় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চিন্তাও করত না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধও দীর্ঘকালের। সারা ভারতে এমন কি পশ্চিমবঙ্গ (রাঢ়) পর্যন্ত আর্যধর্ম সহজেই বিস্তৃতি লাভ করলেও বাংলাদেশে তার বিস্তার ঠেকিয়ে দিয়েছে এদেশের মানুষ। কেমন করে? ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "প্রথমত এত দূর দেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটাতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গভীর মধ্য থেকে প্রাণপণে ছোয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌম সমাজও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্য প্রাণপণে যুঝেছে এবং যখন আর পারেনি তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসাবার চেষ্টা করেছে।... চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামেশির ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে জাত ও বর্ণের বাছ-বিচার আযাবর্ত-দক্ষিণ ভারতের মতো অতোটা কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মধ্য-গাঙ্গেয় বা আর্য ভারতের সঙ্গে এ এলাকার ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ বন্ধনের অনেক অমিল দেখা যায়।"

আর্যরা প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইরান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল পৌত্তলিকতা নিয়ে। তারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। কিন্তু ছিল বর্বর। তারা প্রায় বিনা বাধায় ভারতবর্ষ দখল করে নিলেও বাংলাদেশে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যথার্থই এই প্রতিরোধকে বাংলাদেশের মানুষের প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশের মানুষের দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান উল্লেখ করেছেন সেন-বর্মন শাসনকালকে। এ সময়ে এক ও অভিন্ন জাতিসত্তাকে ভেঙে সেন রাজারা ছত্রিশ জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা চালু করে। তারা ছিল বহিরাগত। কিন্তু পালরা ছিল স্বদেশী। সেনরা অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ-নিপীড়নও চালাতে থাকল সমানে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সৃষ্টি হল চরম মন্দা। সে সময় মুসলমান ধর্ম প্রচারকরা এসে সাম্যের বাণী নিয়ে দাঁড়ালেন সাধারণ মানুষের পাশে। তাদের ভরসা দিতে থাকলেন, অণুপ্রেরণা যোগাতে থাকলেন। ফলে নতুন করে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ হল সাধারণ মানুষ। সেভাবেই বাংলাদেশে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। ফলে বখতিয়ার খিলজীর আগমনে জনরোষের ভয়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন লক্ষণ সেন।
তৃতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম পলাশীর যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের পরও থেমে যায় নি বাংলাদেশের মানুষ। মীর কাসিমের প্রতিরোধ, বক্সারের যুদ্ধ, শামস্-উদ্-দৌলাহ'র প্রচেষ্টা সব কিছু মিলিয়েই জারি থাকে আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম। সে সংগ্রামের ফসলই আজকের বাংলাদেশ।

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর এই বইয়েও বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ গঠনে ইতিহাসের অন্দিসন্ধি, অনুসন্ধান করেছেন। এর আগে জয়া চ্যাটার্জি তার 'বাংলা ভাগ হল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বঙ্গভঙ্গের পেছনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কী প্রবলভাবে কাজ করেছে। জয়া চ্যাটার্জি তার গ্রন্থ বঙ্গভঙ্গ বিষয়ের ওপরই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে সে ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটন হয়েছে আরও বিস্তারিতভাবে।

আর্যরা যা পারে নি, মুসলিম শাসনকালে যা সম্ভব হয় নি, ইংরেজদের আনুকূল্যে বাংলাদেশের ওপর বর্ণবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা কেন্দ্রিক প্রধানত বর্ণ হিন্দুদের জমিদারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গের দাবি মুসলমানগণ তখন উত্থাপন করেন নি। ইংরেজ উপনিবেশবাদী সরকার তাদের প্রশাসনিক স্বার্থেই বাংলাকে ভাগ করেছিল ১৯০৫ সালে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে মাত্র ছয় বছরের মাথায় বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করে এখানকার সাম্প্রদায়িক শক্তি।

আবার, যে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য এত আন্দোলন-সংগ্রাম, যে সন্ত্রাসবাদের উত্থান, ১৯৪৭ সালে আবার সেই বাংলাকে ভাগ করার জন্য প্রাণপণ দাবি তুলল একই গোষ্ঠী। এর সব কিছুর পেছনেই কাজ করেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর প্রায় সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠার বইয়ে সে ভেদবুদ্ধির চিত্রই সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থ তিনটি মিলিয়ে পড়লে, বাংলাদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তাদের সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, লড়াকু মনোভাব পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তেমনি বাংলাদেশ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে পাঠককে দৃঢ়ভাবে প্রেরণা যোগাবে।

ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দীর্ঘজীবী হোন।

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

আলোর ঝর্ণাধারা

মুহাম্মদ আবদুল হান্নান

বাঙালির সত্তাপরিচয় বিশ্বের পটে সমুজ্জ্বল করে তোলার একজন দক্ষ ও দূরদর্শী লেখক, গবেষক তথা ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে ষাটের দশকের শেষভাগে আমার পরিচয়। দিন-ক্ষণ যদিও আজ স্মৃতির অন্তরালে। যুগের ব্যবধানেও অনুজপ্রতিম বন্ধু মান্নান আজও লুকিয়ে আছেন অন্তরাত্মায়। বোধ-বিশ্বাস তথা আদর্শগতভাবে সমমনা হওয়ার সুবাদে যুগের ব্যবধানও বন্ধুত্বের সুদৃঢ় প্রাচীরে চিড় ধরাতে সম্পূর্ণ অসফল।

মহান বায়ান্নোর ৩০ জুন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জন্ম স্বতন্ত্রধারার শেকড়সন্ধানী সচেতন ইতিহাসবিদ তথা অগ্রসর সংস্কৃকি কর্মী মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সম্মানসহ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভের পর সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে পেশা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতাসহ ব্যাংকিং জগতে সফল পদচারণা। সাফল্য ঈর্ষণীয়। তবে তাঁর লেখক পরিচিতিটাই মুখ্য। স্বদেশের শেকড়-সন্ধানী গবেষণাই তাঁর স্বদেশী স্বজাতিত্ববোধ নির্মাণের মূল চালিকা শক্তি।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নয়, সময়কে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পেরেছিল বলেই ইসলাম কালজয়ী আদর্শ হিসেবে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। ইসলামের বিশ্ববিজয় সম্ভব হয়েছিল তার মানবতাবাদী সংস্কৃতির পথ ধরে। ইসলাম শুধু তৌহিদবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান বিস্তৃত করেছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে, সংগীতে-ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়-স্থাপত্যে মুসলমানদের অবদান না থাকলে বিশ্বে চারুকলার অন্ধকার যুগ অতিক্রান্ত হত না এবং বর্তমান সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ সম্ভব হত না।

একদিন বিশ্ব জয় করেছিল যে উন্নত ইসলামী সংস্কৃতি আজ তারই ধারক পরবর্তী প্রজন্ম শেকড়চ্যুত হয়ে সর্বহারার মত পরের দ্বারে উনবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির শাহেনশাহ মুসলমানরা আজ ভিক্ষাপাত্র হাতে অপরের অনুগ্রহ-প্রার্থী। সভ্যতাগর্বী স্পেন সাতশ' বছর শাসন করে কেন যে মুসলমানগণ সেখানে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, সেই কারণ অনুসন্ধানের বা পথ-নির্দেশনার চেষ্টাও বিশ্বের একশ' কোটি মুসলমানের মধ্যে নেই।

বিশ্ব মুসলমান আজ সাংস্কৃতিক জগতে এক দিশেহারা পথিক। ইসলামী সংস্কৃতি কেমন, কেমন তার চেহারা, অবয়ব, চরিত্র, কিছুই যেন জানা নেই মুসলমানের। ভিন্ন সংস্কৃতির গোলামীতে আচ্ছন্ন হয়ে মনে করছে এই তার সংস্কৃতি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগৎ তো আরও কুয়াশাচ্ছন্ন। আর তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন সেই জাতির ঘুম ভাঙ্গাতে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। হাতে কলম চাবুক।

www.pathagar.com

কমরেড জ্যোতি বসু উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কসবাদীগণের অন্যতম। তাঁর মন্তব্য, বিপ্লব রফতানী করা যায় না। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম ভারতের মাটির রূপ, রস, গন্ধকে আত্মস্থ করেই প্রতিষ্ঠিত হবে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দৃষ্টি তাই কেবল বালাকোটের রক্তাক্ত প্রান্তরেই স্থির নয়, প্রচন্ড গতিবেগে পলাশীর প্রান্তর ঘুরে ফকির মজনু শাহ, পীর দুদু মিয়া, হাজী শরীয়তুল্লাহ তথা শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় দৃঢ়ভাবে স্থিত। কেবল খেজুর গাছের পানে চেয়ে না থেকে হয়ে বুক বেঁধেছেন কালবৈশাখে। শেকড়ের সন্ধানে তিনি শক্ত হাতে খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলার সোঁদা মাটিতে কোদাল চালাচ্ছেন রূপ, রস, গন্ধ, রঙে জাতিকে রাঙিয়ে বাংলার মাটিতে বাঙালির সাংস্কৃকিত (ইসলামী) আন্দোলনের পতাকাকে বাংলার মাটির গভীরে স্থাপন করতে। এখানেই মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের স্বাতন্ত্র্য। এ জন্যই মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মহাতমসায় "আলোর ঝর্ণাধারা"।

লেখক : প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিসেবী

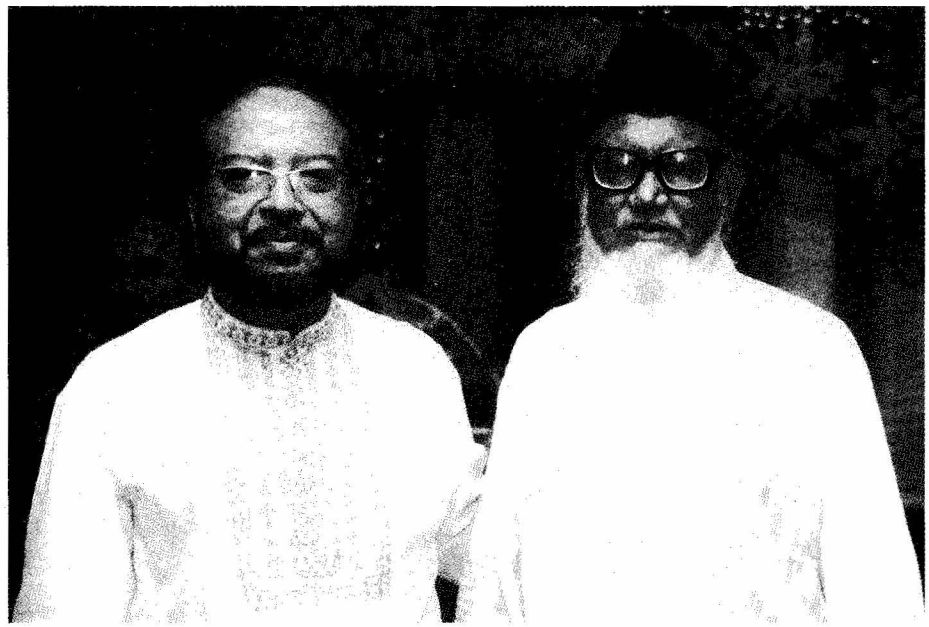

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর সাথে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

অতি ব্যস্ত টুপি বুনতে তালপাতায়। সাইমুম ঝড়ে দিশেহারা না

www.pathagar.com

অসত্য ইতিহাস শিক্ষা থেকে আমাদের বাঁচালেন মান্নান ভাই

বাছির জামাল

বিংশ শতাব্দীর উন্মেষলগ্নে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। মূলত নির্বিঘ্ন শাসন এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বৃটিশ সরকার বাংলা ভাগ করে। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বৃটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তাঁদের উন্নতির সোপান মনে করে স্বাগত জানায়। কিন্তু কপালে চিন্তার বলিরেখা পড়ে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদি কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর। তাদের প্রবল বিরোধিতায় তাদেরই দেয়া অভিশাপ 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয়।

কেন এবং কীভাবে রদ হয়েছিল তার আসল ইতিহাস জানা অনেক সময় অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, প্রামাণ্য গ্রন্থের বড় অভাব। উপরন্তু যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে তার দুষ্প্রাপ্যতা সত্য ইতিহাস নাগালের বাইরেই থেকে যায়। দীর্ঘদিনের এই অভাব দূর করার জন্য ইতিহাস গবেষক বিশিষ্ট ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ সম্পর্কিত একটি বই লিখেছেন। এর নাম 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা-কলকাতা কেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক।' বইটির শিরোনাম বঙ্গভঙ্গ হলেও, আলোচনায় লেখক বাংলাদেশ অর্জনের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেছেন।

বইটি পড়ে বেশ চমৎকৃত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রথম ক্লাসে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পড়াতে গিয়ে সৈয়দ মকসুদ আলী স্যারের কথাটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, এতদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে নীচের ক্লাসগুলোতে যা পড়ে এসেছো, তা ভুলে যাও। সে সব ক্লাসে অধিকাংশই তোমরা ভুল শিখেছো। এখন থেকে তোমাদের সঠিক শিক্ষা দেয়া হবে।

আমি তো অবাক। স্যারের কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে তিনিসহ অন্য স্যারগণ যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক সংজ্ঞাগুলো শেখাতেন, তখন মকসুদ আলী স্যারের কথাটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল।

বর্তমান বইটি পড়তে গিয়ে আমার তাই মনে হলো আগে যা পড়েছি, সেই জানা বিষয়গুলোও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের বইটিতে নতুনভাবে তুলে আনা হয়েছে। অবশ্যই ইতিহাসের সত্যতা সহকারে। বইটির স্বাতন্ত্র্য এবং গুরুত্ব হচ্ছে এই বাজারে পাওয়া যায় এমন সব বইয়ের মতো গতানুগতিক ধারায় তিনি তাঁর লেখা তৈরি করেননি। তিনি একই ইতিহাস লিখতে গিয়ে 'সত্য ইতিহাসের' উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এ জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। এবং সেসব গ্রন্থ থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাজটি যে পরিশ্রমসাপেক্ষ তা বলা বাহুল্য। অধ্যয়নে তাঁর কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়েছে– তা বইটির তথ্য সংগ্রহের পরিধি দেখলেই বোঝা যায়। এতে পাঠক লাভবান হয়েছে যথেষ্ট। বইটি পাঠ করলে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং একই সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের আকর গ্রন্থগুলো পাঠেরও স্বাদ পাওয়া যায়।

লেখক তাঁর বইয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের কারণে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদি গোষ্ঠীর ক্ষেপে ওঠার কারণ নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের এদেশীয় কিছু সহযোগীর অংশীদারী কারবারের ফসল আত্মসাত করে কঙ্কাল থেকে হঠাৎ যে কলকাতার উত্থান ঘটে, সেই কলকাতা এ এলাকার সকল কিছু একচ্ছত্রভাবে ভোগ-দখল ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠনের বিরোধিতার এ ছিল আসল কারণ।"

কলকাতা-কেন্দ্রিক ভ্রাহ্মণ্যবাদি গোষ্ঠীর যুক্তি ছিল বঙ্গভঙ্গের কারণে 'মা দূর্গার অঙ্গচ্ছেদ' হয়েছে। লেখক তাঁর বইয়ে ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, বাংলার কখনো অখন্ড ভূগোল ছিল না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ'র কারণে খোদ ইংরেজ আমলেই বাংলার রাজনৈতিক সীমানা তিন-তিনবার বদল হয়। তখন মা দূর্গার অঙ্গচ্ছেদ হয়নি।

www.pathagar.com

লেখক তাঁর বইয়ের ভূমিকাংশে লিখেছেন, 'দেশ ভাগ', 'ভারত ভাগ', 'বাংলা ভাগ' ও 'বঙ্গভঙ্গ' এসব শব্দ বিশেষ ব্যঙ্গাত্মসহ আমাদের ইতিহাসে হাজির করা হয়েছে।

এখানে 'ভাগ' বা 'ভঙ্গে'র ব্যাপারটির মধ্যে একটা দুঃখবোধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূলে ভারত একটি দেশ ছিলো না। বাংলারও অখন্ড ভূগোল ছিল না। ভারত কিংবা বাংলার ইতিহাস বরাবরই সীমানার পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।" তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজ আমলে ১৯০৫ সালের আগেই বাংলার রাজনৈতিক সীমানা তিন-তিনবার বদল হয়। তখন কিছু হয়নি। চতুর্থবার যখন ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হলো, তখন এটাকে অভিহিত করা হলো 'বঙ্গভঙ্গ' বলে। বলা হলো 'মা দূর্গার' অঙ্গচ্ছেদ। তাই এটা করা যায় না। কিন্তু এর মাত্র ৪২ বছর পর ভারত বিভাগ যখন অপ্রতিরোধ্য হলো, তখন তারা একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়িয়ে দাবি তুললো, 'বাংলাকে ভাগ করো।' ১৯০৫ সালে বাংলাকে যারা মা বলেছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাকে ভাগ করার দাবিতে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। (বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, লেখকের নিবেদন অংশ দ্র.)।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে রাজা পঞ্চম জর্জ যখন 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষণা করলেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, হিন্দু মধ্যবিত্ত একে উল্লসিত কণ্ঠে অভিনন্দন জানান। আর মুসলিম মানসে ব্রিটিশ বিরোধিতা আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দিল্লির দরবারে উপস্থিত মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব সলিমুল্লাহ ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আট দফা দাবী উত্থাপন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।' অনেকেই মনে করেন, নবাব সলিমুল্লাহর এই দাবির প্রেক্ষিতেই বুঝি ইংরেজ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে 'বঙ্গভঙ্গ রদ'-এর 'রাজকীয় ক্ষতিপূরণ' দিয়েছে।

ঘটনা আসলে তা নয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাসের সত্য তুলে ধরে লিখেছেন, "এই পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোনো 'রাজকীয় ক্ষতিপূরণ' কিংবা 'বড় লাটের অনুদান' ছিল না। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক প্রদেশ গঠিত হওয়ার কারণে মাত্র ছয় বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে এ অঞ্চলে যে ব্যাপক ও দ্রুত উন্নতি হয়, তার স্বাভাবিক ফল হিসেবে উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল। ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠারও ৩ মাস আগে আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে ক'টি সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেন, একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ছিলো অন্যতম। (বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা : ২০৪)

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর বইয়ে এমন আরো অনেক ভুলের অপনোদন করেছেন ইতিহাসের আলোকেই। তিনি ইতিহাস থেকেই 'চাপা পড়া এসব ঐতিহাসিক সত্য' তুলে এনেছেন। এতে আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি আরো শক্তিশালী হলো। আমরা বেঁচে গেলাম অসত্য ইতিহাস শেখার হাত থেকে।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের ইংরেজের যে রাজ্যাভিষেক ঘটলো, তা কি শুধু ইংরেজদের রাজ্য অধিকার করার মনোবৃত্তি না-কি অন্য কিছু? মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর বইয়ে এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বিমলানন্দ শাসমল-এর 'ভারত কী করে ভাগ হলো' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিলো। এতে এক শ্রেণীর হিন্দুদের ও বিশেষত বাঙালি হিন্দুদের উৎসাহ, প্ররোচনা এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল বেশি। যে মুসলমান প্রভুত্ব হিন্দুরা নিজেদের প্রয়াসে ধ্বংস করতে পারেনি, ইংরেজদের সাহায্যে এবং বুদ্ধিতে তারা সেই উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ধীরে ধীরে মুসলমান নেতৃত্ব লোপ পেল। ইংরেজ হয়ে উঠল দেশের প্রভু।' বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পেছনে এদেশের বাঙালি হিন্দুদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত যে সক্রিয়ভাবে কার্যকর ছিলো, তা আলোচ্য বইয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এমন আরো ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগতির সব পদক্ষেপকেই আটকে দেয়ার চেষ্টা করেছে কলকাতা কেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদি গোষ্ঠীটি। লেখক তাঁর গ্রন্থে এ প্রবাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ সরকার পূর্ব বাংলার একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এই গোষ্ঠিটি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিসহ তখনকার সময়ে হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় এমন কেউ বাকী ছিলো না যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেননি। তাদের যুক্তি হচ্ছে, 'এর ফলে বাঙালী জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বেড়ে যাবে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অধিকাংশই

www.pathagar.com

কৃষক, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে আদৌ কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না।' কী অকাট্য যুক্তি!

লেখক আক্ষেপ করে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, 'ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার সম্পদ লুট করেই গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠেছে কলকাতার সবকিছু। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কোনো 'অসাম্প্রদায়িক মানব হিতৈষী' ব্যক্তিকেই সেদিন এই হিন্দু মানসিকতার উর্ধ্বে উঠে এ ধরনের নিম্ন দাবির সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলতে দেখা যায়নি।' এর কারণও লেখক উদঘাটন করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এর দ্বারা দীর্ঘদিনের অবহেলিত মুসলমানদের কল্যাণ হবে– এটাই ছিল বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের আশংকার কারণ।' (বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ২১০)

তারপরও শত বাধার বেড়া টপকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় এই সমতলে একটি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ঢাকায় শনৈ-শনৈ উন্নয়ন ঘটে। ইংরেজ আমলের দু'শ বছর যে পূর্ব বাংলা ছিল কলকাতার পশ্চাৎভূমি, সেখানে পাকিস্তান আমলে গড়ে উঠে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের সত্তা ও মানসে তারা পূর্ব বাংলায় জন্ম দেয় এক নতুন রেনেসাঁ। অন্নদাশংকর রায় একে 'দ্বিতীয় রেনেসাঁ বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক তার বইয়ে অন্নদা শংকর রায়ের লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা তখন তো বাংলাদেশ নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় রেনেসাঁ। প্রথম রেনেসাঁর নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁদের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। প্রথম রেনেসাঁ ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁ হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক।'

লেখক বলেছেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ বস্তুত এই রেনেসাঁর এবং এই সামর্থ্যেরই ফসল। লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর বইয়ের শেষ অধ্যায়ে সামনে যে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ- সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।' মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থ 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একটি শব্দই বের হয়ে আসে, আর তা হচ্ছে, 'অপূর্ব'। কী তাঁর লেখা, কী তাঁর তথ্য সংগ্রহ– সবদিক দিয়েই গ্রন্থটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস যারা জানতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই বইটি পাঠ করা উচিত।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক

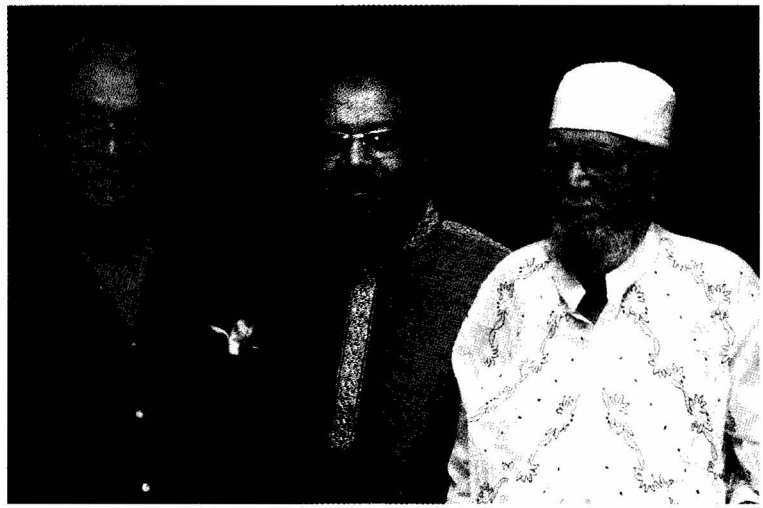

কবি আল মাহমুদ ও কবি বেলাল চৌধুরীর মাঝে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

ইতিহাসে প্রাজ্ঞপুরুষ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ওমর বিশ্বাস

দি হিস্টোরিজ হলো পৃথিবীর প্রথম লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। হিরোডোটাসের এই ইতিহাস গ্রন্থ হযরত ইসা (আ) এর জন্মেরও ৪০০ বছর আগে গ্রীকভাষায় লেখা হয়। হিরোডোটাস তার ঐতিহাসিক ও কালজয়ী গ্রন্থ দি হিস্টোরিজ-এ জনশ্রুতি থেকে, লোকমুখে শুনে শুনে, বক্তৃতার কথা থেকে উপাদানসমূহ নিয়ে যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি সামাজিক বৈচিত্র্য, রীতিনীতি, সংস্কার, ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব, ধর্মবোধ, যুদ্ধবিগ্রহ, সাফল্য-ব্যর্থতার সে সময়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইতিহাস রচনার এই ধারা পরবর্তীতে শুধু অব্যাহতই থাকেনি আরো বহুবিধ বিষয়ে নানা মাত্রায় এখন ঐতিহাসিকেরা কাজ করে যাচ্ছেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। তিনি যে কাজটি এ পর্যন্ত করেছেন তা আমাদের ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। তার ইতিহাস গবেষণা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের ওপর নতুনভাবে আলোক সম্পাত করেছে। একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ইতিহাসের দলিল উপস্থাপনে ঐতিহাসিককে প্রশ্নোত্তরের ধারা বা পরম্পরার আশ্রয় নিতে হয়। ঐতিহাসিক এতে তার নিজস্ব কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সেখানে তিনি অসংখ্য সোর্স বা সূত্রের সন্ধান করে থাকেন। এটা কোনো সহজসাধ্য কাজ নয়। সহজলভ্য বিষয় নয়। ইতিহাসের মূল নির্যাসকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তিনি ঘটনার দ্বারা উত্তেজনা অনুভব করেন বটে, কিন্তু কোনো প্রকার আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করেন না। আমরা আবদুল মান্নানের ইতিহাস গবেষণায় আবেগকে সংযত দেখি, বিষয়ের প্রতি দেখি গভীর মনোনিবেশ। তার ইতিহাসের বিষয় হলো এই দেশ, এই দেশের মানুষ, মানুষের কৃষ্টি-কালচার আর নিজস্ব সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে মাটির গভীর মমতা।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ভৌগলিক দিক দিয়েও এর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। হিমালয় তীরবর্তী অবস্থান ও বঙ্গোপসাগরের বুক ছুঁয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক এই অবস্থান যেমন বাংলাদেশের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর অবস্থানও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দীর্ঘ দিন ধরে এদেশ ছিল প্রাচুর্যে ভরা সুজলা সুফলা। বিদেশী বণিকরা এদেশে নৌপথ দিয়ে বাণিজ্যের নামে প্রতিনিয়ত আসত। এক পর্যায়ে তাদের লোভাতুর দৃষ্টির অনলে জ্বলতে হয়েছে এদেশকে। নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও সংগ্রামের পর আবার স্বাধীন ভূ-খণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ অস্তিত্বমান হয় বিশ্বের বুকে। এর জন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক রক্ত ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর এর মধ্যে দিয়ে আমরা বারবার এই প্রমাণই দিয়েছি যে আমরা লড়াকু জাতি। পরাধীনতা আমাদের জন্য নয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের এই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে জাতিকে তার সংগ্রামী অতীত ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তার চারশত বছরের ইতিহাস ধারণ করে স্বগৌরবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃটিশের কাছে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক ও ঢাকাকে নিয়ে কম রাজনীতি হয়নি। ঢাকার এখনকার স্বাধীন অস্তিত্ব এদেশের আম জনতার সংগ্রামের ফসল। এর জন্য কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদসহ সকল স্তরের জনগণের ধারা বাহিক সংগ্রাম সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার গবেষণার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জাতির সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে যে সকল পণ্ডিত

www.pathagar.com

ত্যাগ ও শ্রমের মাধ্যমে সত্যান্বেষী হয়েছেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি অন্যতম। তিনি নিঃসন্দেহে সার্থকতার সাথে তা তুলে ধরতে পেরেছেন। রাজধানী ঢাকার দীর্ঘ চারশত বছরের ইতিহাস আমরা তার কাছ থেকে পাই। তার বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা ও বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ আমাদের সেই দীর্ঘ ইতিহাসকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন এদেশ বাংলাদেশ, এর বাইরে কোনো বঙ্গ নেই। আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। তার মুকাবিলায় এ জনপদের মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন তার বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নামের চমৎকার গ্রন্থটিতে। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে এক জায়গায় বলছেন, ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ভাগ করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠনের সময় 'বঙ্গ' ভাঙ্গেনি। বঙ্গ তার আদি ও পূর্ণ সত্তা নিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের অংশ হয়েছে। পাকিস্তান আমলে 'বঙ্গ' ছিল পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ। আর এখন বঙ্গ তার সম্পূর্ণ সত্তা নিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ। সব মিলিয়ে বঙ্গ বা বাঙ্গালাহ পরিচয়ের মূল দাবিদার বর্তমান বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বাইরে কোনো 'বঙ্গ' নেই (পৃষ্ঠা - ৩২)।

সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণই পারে কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে। বিভিন্ন ইতিহাসবিদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ইতিহাসের খুঁটিনাটি পাই। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য করি। তবে আবদুল মান্নান বস্তুনিষ্ঠভাবে বাংগালী মুসলমান ও ইসলাম-এর উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। এ জনপদের মানুষ কিভাবে ইসলামকে অবলম্বন করে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেছে এবং এই জনপদ কিভাবে মুসলিম জনপদে রূপান্তরিত হলো তার প্রকৃষ্ট বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার সাফল্য অতুলনীয় বলে মনে হয়। সেই সাথে তিনি দেখিয়েছেন অত্র অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী সবচেয়ে ভাগ্যপীড়িত। তারাই বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার শিকার সবচেয়ে বেশি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো তার উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্য। তিনি নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে সঠিক তথ্য প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। তিনি নিজস্ব মন্তব্যের পরিবর্তে ইতিহাস নির্ভর দলিল দস্তাবেজের উপর নিজেকে নির্ভরশীল রেখেছেন বেশি। এতে পাঠক ঐতিহাসিকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে না। ঐতিহাসিক পাঠককে প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করেন। পাঠক নিজেই ঝুঁকে পড়ে ইতিহাসের দিকে এবং খুঁজে নেয় সত্যান্বেষী ঐতিহাসিককেই। এখানেও মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের কৃতিত্ব। তিনি এভাবেই তার ইতিহাসের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করে ইতিহাসের অজানার সন্ধান সার্থকভাবে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গবেষণালব্ধ ইতিহাস আমাদেরকে সজাগ করে আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে। আমরা তার কাছ থেকে তথ্য-উপাত্তবহুল এসব ডকুমেন্ট থেকে জানতে পারি আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে। এদেশের অস্তিত্ব বিনাশে যারা সচেষ্ট ছিল তাদের সম্পর্কে। আমরা যখন সে ইতিহাস পাঠ করি সেখানে নানা ষড়যন্ত্রের ছবিগুলো ক্রমশ স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। আমরা যে লড়াকু এবং সত্যাশ্রয়ী স্বাধীন জাতি সে কথা তার ইতিহাস গ্রন্থগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তার এই প্রচেষ্টার একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি নিজস্ব মতামতের পরিবর্তে ইতিহাসে সংঘটিত সূত্রগুলোকেই জোড়া দিয়ে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তথ্যনির্ভরতার ফলে তার ইতিহাস থেকে আমরা আমাদের ইতিহাসের ও সংগ্রামের মূলধারা চিহ্নিতকরণে বিশেষ সুবিধা পেয়ে যাই।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ইতিহাস গবেষণা সীমান্তের রেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে সমান্তরাল রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস তৈরি করে নিমিষে তা চেখে দেখা যায়, বোঝা যায়। সেটা তার বিশেষ কৃতিত্ব। এর মধ্যে থেকেও তিনি সমান্তরাল বরাবর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে এনে নিজেকে বিস্তৃত করে মেলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি ইসলাম, ইসলামের বিজয়কাব্যকে চিত্রাঙ্কনের তুলিতে স্পষ্ট করে জাতিকে পথ দেখানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এভাবে তার এই প্রচেষ্টা গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে বেজে চলছে। আমরা তার কাছে এজন্যই এক প্রশস্ত ইতিহাসের খোঁজ পাই। সেই পথ নির্মাণ করে আমাদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির মধ্যে এক শৈল্পিক সেতু।

ইতিহাস তো অতীত থেকে ভবিষ্যৎ জাগায়। আমরা তার এই আমার বাংলাদেশ গ্রন্থে বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে জানি। বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃত ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও জামাল উদ্দিন আফগানী গ্রন্থে আমরা আমাদের সংগ্রামী মুসলিম বীরদের খুঁজে পাই। এই ঐতিহাসিকের কাছ থেকে আমরা আমাদের

www.pathagar.com

গৌরবময় কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্বকে অনুভব করি। পলাশী, বাংলার কৃষক বিদ্রোহ সহ নানা সংগ্রাম, সংগ্রামী নেতা, আজাদী, মুক্তিকামী জনতার ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, ফকির মজনুশাহ, বাবা আদম শহীদ প্রমুখ মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কদের সংগ্রামী কাহিনী আমরা তার কাছ থেকে পাই।

ইতিহাস মূলত প্রবল আগ্রহের আর সাধনার ব্যাপার। সবাই কি এই পথ অবলম্বন করতে পারে? পারে না। এর জন্য চেষ্টা, শ্রম লাগে। একাগ্র ধ্যান লাগে। আবদুল মান্নানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় তিনি তার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন বলিষ্ঠতার সাথে। ইতিহাসের বিষয় উপস্থাপনে তার উপস্থাপনা কৌশল বেশ চমৎকার। যে কাউকে সহজেই তিনি ইতিহাসের সড়কে তুলে আনতে পারেন। তিনি খুব সহজে, সুন্দর ও সাবলীলভাবে কাউকে ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন।

আধুনিক কালে বৃটিশ সাংবাদিক উইলিয়াম ড্যালরিম্পল উপমহাদেশের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনীর সাথে বৃটিশ শ্বেত শোষকদের ইচ্ছাধীন লোকগোষ্ঠীর কর্মবল, প্রেম-বিরহ, ভাগ্যসূতিকার বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কাছ থেকে আমরা প্রেমকাহিনীর ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে উপমাহাদেশের মোগলদের অনেক অজানা কাহিনী, ইংরেজ ষড়যন্ত্রের জটিল, কুটিল নানা দিক এবং সে সব রোমান্টিক কাহিনীর অন্তরালের দ্বিবিধ চিত্র দেখতে পাই। আর মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মাধ্যমে আমরা অনেক অজানা তথ্যের, লুকিয়ে থাকা বিষয়াদির সন্ধান পাই। সেসব যাও ছিল তা আবার ছিল বিক্ষিপ্ত আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সব মিলিয়ে তিনি এ পর্যন্ত ইতিহাসের যে সকল বিষয় তুলে এনেছেন তাতে একথা বলা যায় যে, তিনি আমাদের জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিহাসের একজন প্রাণ পুরুষ ছিলেন মোহাম্মদ মোহর আলী। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তার দুই খণ্ডের হিস্টরি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল (১৯৮৫) নিয়ে। ১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলার মুসলমানদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক দিক তুলে ধরেন। একই ধারায় থেকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নতুন করে নিজস্বভাবে ইতিহাসের প্রাজ্ঞতা দেখিয়ে যাচ্ছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদের পূর্ব পুরুষদের সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে এনেছেন। আমাদের সেই সংগ্রাম আজো অব্যাহত আছে। সেই সংগ্রাম আমাদের জাতিসত্তার বিকাশমান ধারার। সেটা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের ও অহংকারের। সেই জাতিসত্তার সুরক্ষা ও বিকাশের মধ্যেই যে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও অহংকারের বীজ নিহিত সেই দিকটি তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন, 'নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চাইতে মহত্তর আর কিছু নেই। এই সংগ্রাম কারো বিরুদ্ধে নয়। এই সংগ্রাম আত্মরক্ষার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের।' (আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা গ্রন্থের ভূমিকা থেকে)

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাঁদের অব্যাহত সংগ্রাম ও অসামান্য সাধনার মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার যে উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটিয়েছেন তার ধারাবাহিকতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরা সংগ্রাম করছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সেন-বর্মন শোষণের বিরুদ্ধে এবং নিকট ইতিহাসে এই লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ওবর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্য আগমনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এ অব্যাহত ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা লাভ করেই আমরা আত্মপরিচয়কে উপলব্ধি করতে পারি। এ প্রেরণা থেকেই বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিক কার্যকারণ আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।'

ইতিহাস প্রসঙ্গে James Joyce এর বক্তব্য হলো, What follows are a series of quotations about history and the historian's craft. They have been culled from a variety of sources and they appear here in totally random order. Their purpose is to incite, energize and stimulate your historical imagination (www.historyguide.org/history.html). আমরা ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মধ্যে সেই দিকগুলো বিশেষভাবে দেখতে পাই। আমরা লক্ষ্য করি, আমাদের মূলধারার ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অনন্য।

লেখক : কবি, সংগঠক, সম্পাদক-চাড়ুলিয়া

www.pathagar.com

আমার চোখে বাবা

খুররম সিদ্দীক

২০০৬ সালে লেখা-পড়া শেষ করে দেশে ফিরার পথে আমি হজ্জ-এর সময় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করি। তখনি একটা লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম যে দেশে থেকে আমি ব্যবসা করব। আর সে ব্যবসা হবে ইসলামী শরীয়তসম্মতভাবে। সে উদ্দেশ্যেই আমি প্রথম ইসলামী ব্যাংকে যাই।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কাওসার-উল-আলমের মাধ্যমে। তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও কর্মনিষ্ঠ মানুষ। তার চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়। ব্যবসায়িক প্রসঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আলাপ হতে থাকে। তিনি আমাকে একদিন 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' নামে একটি বই উপহার দেন। কাওসার সাহেব জানালেন, বইটির লেখক এ ব্যাংকেরই একজন কর্মকর্তা।

বইটিতে আমাদের জাতির identity সম্পর্কে লেখকের যে অভিমত তার সাথে আমি আমার রফবধং এর মিল খুঁজে পাই। সেই সুবাদে লেখকের সাথে পরিচয়ের আগ্রহ জন্মে। নতুন বছর ২০০৮ সালের শুরুতে আমি ইসলামী ব্যাংকের হেড অফিসে লেখকের চেম্বারে আমাদের কোম্পানীর চেয়ারম্যানসহ (আমার আব্বু) দেখা করি।

ব্যাংকারদেরকে আমরা যেমন গুরুগম্ভীর মানুষ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, তিনি মোটেও সে রকম ছিলেন না। তাঁর চোখে ছিল আশার আলো এবং একজন young entrepreneur হিসেবে আমার প্রতি তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমি লক্ষ্য করি। এভাবেই লেখক ও ব্যাংকার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়।

এর পর আরো তিন-চার বার আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সাথে কথা হয়। বিভিন্ন ইস্যুতে একাত্মতা অনুভব করি। তাঁকে আমার কাছে একজন positive thinker এবং খুবই appreciative মনে হয়। তাঁর সাথে মন ও taste এর মিল খুঁজে পাই। সেই সুবাদে তাঁর সাথে বিভিন্ন সমসাময়িক সাহিত্য, বই, সিডি ইত্যাদি বিনিময় ঘটে। আমার ধারণা জন্মে, বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি multifaceted ভাবে চিন্তা করেন। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে আমার প্রিয় বিষয় 'history' মান্নান সাহেবেরও প্রিয় বিষয় এবং এটি তাঁর গবেষণারও ফোকাস।

শুরু থেকেই কেন জানি তাঁকে আমার 'স্যার' বলতে ইচ্ছা করতো না। এখন তো তাঁকে আমি 'বাবা' ডাকি। এ অধিকার আমি অর্জন করি ২০০৮ সালের ২৩ শে মে তারিখে। এখন তাঁকে আমার আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে। আগেও বিভিন্ন বিষয়ে মতের মিলের কারণে আমি একাত্মতা অনুভব করতাম। এখন দেখছি পারিবারিক পরিস্থিতিতেও আমার আর বাবার অনেক মিল।

তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঝে এখন আমার অনেক সময় কাটে। আগে তাঁর সাথে একটি formal relationship ছিল। সেখানে serious বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই খুশী থাকতাম। এখন serious কথার পাশাপাশি পরিবারের বাকি সদস্যদের সাথে একই খাবার টেবিলে বসে মজার মজার নানা গল্প করি। নারী সমাজের চার সদস্যের একটি শক্তিশালী দলের (মা, নিতু আপা, মিতি, মাহদীয়া) কাছে আমরা দু'জনই নিপীড়িত। এ সব কিছুই যেন স্বপ্ন মনে হয়। তাঁর study room টা দেখে আমার মনে হয়, আমি আমার জন্য যেমনটি কল্পনা করেছি এটি ঠিক সে রকম।

মিতি সব সময় বলে, ও নাকি ওর বাবার গুণাবলী সম্পন্ন একজন husband চেয়েছিল। আমি জানি, এটি অনেক বড় আর কঠিন একটি বিষয়। তবে মহান আল্লাহর কাছে আমি শোকর আদায় করি যে, আমি তাঁর মতো একজন 'বাবা' পেয়েছি।

মিতি বিয়ের দিন বিদায়কালে যখন কাঁদছিল, তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁর মেয়েকে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি দোয়া করি, আমি যেন সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর ইহকালীন ও পরকালীন সুখী-সুন্দর জীবন কামনা করি।

লেখক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দ্বিতীয় জামাতা

www.pathagar.com

মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিকতা

শেখ জেবুল আমিন দুলাল

আমি আমার দেশকে ভালোবাসি জীবন দিয়ে। স্বপ্ন দেখি দেশকে নিয়ে আজীবন। দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছি, করছি এবং করতে থাকবো জনমভর। আমার এই চিন্তা-চেতনার সাথে যাঁরা একমত, যদি লক্ষ্য হয় শুধুই মুক্তি সংগ্রাম, হতে পারে সকলের ক্ষেত্র ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, নীতি-চিন্তাধারা অন্যরকম, তাঁদের সকলকেই আমি মুক্তি সংগ্রামের সহ-যোদ্ধা মনে করি।

এই মুক্তি সংগ্রামের এক সহ-যোদ্ধা অগ্রজপ্রতিম মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, যাঁকে আমি 'মান্নান ভাই' বলে সম্বোধন করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। সাংবাদিক হিসেবে মুক্তি সংগ্রামে ২৫ বছরের যে অধ্যায় আমি অতিক্রম করে এসেছি তার বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে আছেন 'মান্নান ভাই'।

১৯৮০ সালে বায়তুল মোকাররম চত্বরে খোন্দকার মোশতাক আহ্‌মদের জনসভা কভার করার জন্য আমরা দু'জনই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সন্ত্রাসী বোমা হামলার আঘাতে আহত অন্যান্য সাংবাদিকদের মতো 'মান্নান ভাই' ছিটকে পড়েছিলেন তাঁর অবস্থান থেকে কমপক্ষে ১০ গজ দূরে। আহত 'মান্নান ভাই'কে টেনে-হিঁচড়ে আমি যখন বেবী ট্যাক্সিতে (বর্তমানে সিএনজি হিসেবে পরিচিত) উঠাচ্ছি তখনো তিনি তাঁর রিপোর্ট লেখা বন্ধ করেননি, অথচ তাঁর হাতের নোট বইটি রক্তে ভিজে লালে লাল। হাসপাতালে গিয়েও অপেক্ষা করেননি বেশীক্ষণ। জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভর্তি হবার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সরাসরি ফিরে এসেছেন পত্রিকা অফিসে। শুয়ে শুয়ে লিখেছেন সেদিনকার রিপোর্ট। যা তাঁর স্বনামে ছাপা হয়েছে পরের দিনের পত্রিকায়। সে সময় তিনি ছিলেন চীফ রিপোর্টার ও ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট।

কাজের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা তাঁকে একের পর এক অগ্রগতির সোপান পেরোতে রসদ যুগিয়েছে। দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা 'মান্নান ভাই'-এর হাতে তুলে দিয়েছে সূক্ষ্মদর্শীর এক বিশাল ক্ষমতা, যা দিয়ে তিনি সেলুলয়েডের ফ্রেমের মতো করে একে একে চিত্রায়িত করেছেন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার নিখুঁত ইতিহাস। তিনি একদল লাঞ্ছিত মানুষের ধারাবাহিক মুক্তি সংগ্রাম এবং বিজয়কাহিনীর বিশাল ক্যানভাসে তুলির স্পর্শ দিয়েছেন। সর্বোপরি একজন মুক্তি সংগ্রামীর মনোভাব তাঁকে রক্ত, ত্যাগ আর ক্রন্দন গাঁথা হাজার বছর ব্যাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের গভীরে অবগাহিত দুঃসাহসিক ছবি আঁকতে সাহস সঞ্চারিত করেছে।

অষ্টম শতকের পাল আমল বাঙালী জাতিসত্তার সুস্পষ্ট যাত্রা শুরু করিয়েছেন বাংলার ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এর মানে হচ্ছে অষ্টম শতকের আগেও বাঙালীর পদচারণা ছিল এ ভূমিতে, হয়তো ইতিহাসে তার সুস্পষ্ট কোন পদচিহ্ন স্পষ্ট রেখায় ভেসে ওঠেনি। কিন্তু সবকিছুর পরও ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে, অলিতে-গলিতে ঘুরে শিকড়সন্ধানী 'মান্নান ভাই' বলিষ্ঠ কণ্ঠে যে গান গেয়েছেন তা হলো 'আমরা ছিলাম-আছি-থাকবো, জাতিসত্তার মান রাখবো'।

লেখক : দৈনিক সংগ্রামের সাবেক চীফ ফটোগ্রাফার, বর্তমানে কানাডা প্রবাসী

www.pathagar.com

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন

সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার ১২ জুলাই ২০০৮ শনিবার বিকেল ৪ টায় জাতীয় প্রেসক্লাব কনফারেন্স লাউঞ্জে দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে সংবর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেন্টারের অন্যতম উপদেষ্টা ও দৈনিক যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক ড. মাহবুব হাসানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে কাঁঠাল চাঁপা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ, সভাপতি কবি বেলাল চৌধুরী, সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, কথাশিল্পী অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা, নিউনেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, ঢাকা ডাইজেস্ট-এর প্রধান সম্পাদক, স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের সাবেক সভাপতি, জনাব এম এ রশীদ চৌধুরী ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরীদউদদীন আহমাদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিক সৈয়দ লুৎফুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক, কবি এরশাদ মজুমদার, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. আবদুল লতীফ মাসুম, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সিনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার হাসনাত করীম (পিন্টু), আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানসুর।

তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আতিকুর রহমান খান খাদেম।

উপস্থাপনার শুরুতে ড. মাহবুব হাসান বলেন ঃ প্রথমে আমি কিছু কথা শুনাব সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার সম্পর্কে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ হলেন আমাদের পুরনো বন্ধু মনু ইসলাম। মনু ইসলাম বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের এক নিরলস কর্মী পুরুষ। তিনি নিরবে-নিভৃতে কাজ করতে পছন্দ করেন এবং খুব বেছে বেছে মানুষকে সংবর্ধিত করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বন্ধু এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, সংগঠনের সঙ্গে আমি জড়িত। আমরা উপদেষ্টা, উপদেশ দেই। হ্যাঁ, উপদেশ দেই এবং উপদেশ নেই, দুটোই হয়। আদান ও প্রদান, এ দু'য়ের ভিতর দিয়েই সিবিসি তার ছোট কিন্তু মনোগ্রাহী কার্যক্রম চালায়।

আপনাদের জানার স্বার্থে আমি তথ্য হিসেবে বলছি, এর আগে সিবিসি সংবর্ধিত করেছে কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হককে, কথা সাহিত্যিক রাহাত খানকে এবং শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হককে। আর চতুর্থ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা সংবর্ধিত করছি আজ আপনারা যার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন সেই ইতিহাসবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের জন্য চারটি অভিধান গ্রন্থ বেরিয়েছে। যা আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনকি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত চরিতাভিধানের পরে এই গ্রন্থগুলো খুবই কাজ লাগে আমাদের, যারা আমরা নিয়ত এই বিষয়ে, লেখকদের নিয়ে কাজ করতে চাই। তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, তাদের জন্ম সাল, তাদের রচিত বইয়ের নাম ও সন সম্পর্কে কোন তথ্য যখন আমরা খুঁজতে থাকি, তখন মনু ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত এই অভিধান গ্রন্থগুলো খুবই কাজে লাগে।

এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান প্রয়াত কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যার নাম ছিল "কিংবদন্তির কথা বলছি"। তরুণ কবি, সত্তর দশকের খুব জবরদস্ত কবি ত্রিদিব দস্তিদার অকাল প্রয়াত হয়েছেন। তার স্মরণ সন্ধ্যা আমরা আয়োজন করেছিলাম এখানে। এই কাজগুলো সিবিসি করেছে তার নিজের দায়িত্বে। মনে করেছে যে, এদেরকে যদি আমরা স্মরণ না করি, তা হলে তাদের কোন উত্তরাধিকারী তৈরি হবে না।

আজকে এই যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমরা সংবর্ধিত করতে যাচ্ছি, এর পেছনেও এ রকমই একটি মনোবৃত্তি ও দায়িত্ববোধ আমাদের মধ্যে কাজ করেছে। হ্যাঁ, সেই তাড়না ও দায়িত্ববোধ থেকেই আজকে মান্নান সাহেবকে আমরা সংবর্ধনা দিচ্ছি। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে। আমরা গ্রন্থটির উপর তখন একটি আলোচনা অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেই। এর পর আমরা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে তাঁর ইতিহাস বিষয়ক সামগ্রিক কাজের জন্য

www.pathagar.com

সংবর্ধনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেই। তারই বাস্তব রূপ হলো আজকের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজ পারভেজ। তিনি বলেন, আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক বেলাল চৌধুরী, প্রধান অতিথি দেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ, সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং আজকের এই বর্ষণ-সিক্ত অনুষ্ঠানে সমবেত বাংলাদেশের লেখালেখি, সাংবাদিকতা ও ব্যাংকিং জগতের সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ! সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

আজকের এই অনুষ্ঠানটি নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ অনুষ্ঠানটি এ মাসে হওয়া আরও তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে, কিছুদিন আগে আমরা পলাশীর ঘটনাকে অতিক্রম করেছি, আমরা সিপাহী বিপ্লবের দেড়শ' বছর পূর্তি উদযাপন করেছি এবং আমরা বাংলাদেশে এখন বিশ্বায়ন, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের শিকড় ও ঐতিহ্যকে সন্ধান করছি। এ অবস্থায় একজন প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানী, জাতিসত্তা ও আইডেনটিটি-র অনুসন্ধানে যিনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন, আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন পালাক্রম বা উত্থান আর পতনকে যিনি নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে নিয়ে আজকে কথা বলতে পেরে, তাকে ঘিরে এখানে সমবেত হতে পেরে আমরা মনে করছি বাংলাদেশের এই জাতিসত্তার পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এই কাজটি করার জন্য সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, যার সম্পর্কে কবি ও সাংবাদিক ড. মাহবুব হাসান কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, তারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রথমেই বলি, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছে মাত্র আড়াইবার। প্রথমবার গবেষক ও ঐতিহাসিক আশরাফুল ইসলামের মাধ্যমে, দ্বিতীয়বার কবি আনোয়ার আহমেদের সাথে, তৃতীয়বার গিয়ে আমি বসিনি, চলে এসেছি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ত্রিশ বছর ধরে মান্নান সাহেবকে আমি জানি। তিনি যখন সাংবাদিকতার শীর্ষপদ থেকে বেরিয়ে ব্যাংকিং জগতে প্রবেশ করেছেন, আমি তখন সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে জানলাম যে আমার চীফ রিপোর্টার সালাহউদ্দিন বাবরের আগে একই চেয়ারে ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেন জনসংযোগ বিভাগে এবং যশোর ও মৌচাক শাখা হয়ে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ, ডিপার্টমেন্ট, ডিভিশন, উইং ঘুরে ব্যাংকের শীর্ষপদে আসীন হন।

একটি মানুষ কিভাবে একটি পেশার চূড়ান্ত অবস্থা থেকে এসে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশায় নতুন করে শুরু করেন এবং সে পেশারও শীর্ষ স্থানে পৌঁছে যান, সে ব্যক্তিত্বের বিষয়টিকে আমরা যদি গভীরভাবে দেখি, এবং আমি বিশ্বাস করি, আজকে যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তারা নানাভাবে তাঁর সঙ্গে, তাঁর সাংবাদিকতা, ব্যাংকিং, তাঁর লেখালেখি, বিভিন্ন বিষয়ের সফলতার সাথে আপনারা পরিচিত ও জড়িত আছেন, তাকে নিবিড়ভাবে আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়কে ছাপিয়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ আমাকে প্রবলভাবে আপ্লুত করেছে।

আমরা যারা ব্যাপকার্থে সমাজবিজ্ঞান, বাংলাদেশের রাজনীতি, বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে কাজ করি, আমরা জানি যে আমাদের দেশে এখন তৃতীয় প্রজন্মের ইতিহাস চর্চা চলছে। প্রথমবার ইংরেজ বা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে যারা ইতিহাস লিখেছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে কলকাতা থেকে ভাগ হয়ে এসে যারা লিখেছিলেন। সচেতনভাবে অন্যের মুখে ঝাল খান না যারা, নিজেকে নিজের স্পর্শে দেখতে চান যারা, নিজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের দিগন্ত নির্মাণ করতে চান যারা, তাদের কাছে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

স্বাগত ভাষণে এর চেয়ে বেশী বলা আমি সংগত মনে করছি না। জনাব আবদুল মান্নানের মতো একজন ব্যক্তিত্বকে কি করতে হবে, তিনি কি লিখবেন–সেটা বলা আমি প্রয়োজন বোধ করি না। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাংবাদিকতায়, ব্যাংকিং-এ এবং বিভিন্ন ধরনের শীর্ষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভেতরে থেকে তাঁর নিজের আত্মার চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়ত লিখে যাচ্ছেন। অতএব আমরা বলি বা না বলি, তিনি লিখবেনই এবং লিখার মাধ্যমে তিনি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার আত্মাকে অনুসন্ধান করে যাবেনই।

তাঁর যাত্রাপথ প্রশস্ত হোক, দীর্ঘকাল তিনি জাগরুক থাকুন আমাদের

www.pathagar.com

সভাপতি ও প্রধান অতিথির কাছ থেকে সংবর্ধনা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ইতিহাসবিদ গবেষক সাংবাদিক ব্যাংকার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

জাতিসত্তার জীবনে, স্মৃতিতে ও সত্তায়–এ প্রত্যাশা আর এ কামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

এ পর্যায়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন কবি আল মাহমুদ ও কবি বেলাল চৌধুরী। তাঁকে শাল পরিয়ে দেন ও কলম উপহার দেন শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক। পোর্ট্রেট উপহার দেন ফটোগ্রাফার জনাব রোকন উদ্দীন। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের স্ত্রী মাকসুদা বেগমের হাতে উপহার হিসেবে একটি জামদানী শাড়ী তুলে দেন মোহসিনা মাহমুদা ফেরদৌস।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক

ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবদুল লতিফ মাসুম বলেন ঃ আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে বলি সিনিয়র ফ্রেন্ড। একটা সময় আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনারত তিনি তখন আমার একই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পরীক্ষা দেন। সে কারণে কিছুদিন তিনি ও আমি একসঙ্গে পড়াশুনা করি এবং তার মেধা বা মনন, তার সান্নিধ্য এগুলো নিয়ে আমাদের বছরগুলো চলে যায়।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আজকে সংবর্ধিত হচ্ছেন। এটি আমার কাছে একটি গৌরবময় ঘটনা। আমাদের সমাজে প্রকৃত গুণী ব্যক্তিদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে। তার

www.pathagar.com

বিপরীতে আজকের এ অনুষ্ঠান একটি উদাহরণ যে আমরা আমাদের যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান করতে জানি। এই ঘরানার মানুষেরা যে প্রাপ্য সম্মানটুকু পেতে পারে অন্যের কাছে, দেশের কাছে, মানুষের কাছে সাধারণত তা তারা পায় না। এই কারণেই মতাদর্শজনিত সঙ্কটের কারণে বা ঐ সমীকরণের কারণেই আবদুল মান্নানরা অনেক সময় অবহেলিত হন। সেক্ষেত্রে এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। আমাদের এটি অনুসরণ করা উচিত।

আমি মনে করি যে, সারা বাংলাদেশে জ্ঞান-বুদ্ধি চর্চা করার ক্ষেত্রে এ ঘরানার যে সংকীর্ণতা, যে অনগ্রসরতা এটি একটি সত্য কথা। আমরা যারা আদর্শে বিশ্বাস করি, তাদেরকে সব সময় আমি এ কথা বলে আসছি, নাটকের মোকাবেলায় আমাদের নাটক লিখতে হবে, গানের মোকাবেলায় গান লিখতে হবে। যাত্রার মোকাবেলায় যাত্রা করতে হবে। সিনেমার মোকাবেলায় সিনেমা তৈরি করতে হবে। তা যদি না পারেন, কারও মনে যদি সংকীর্ণতা থাকে, ইতস্তত ভাব বা বিব্রত অবস্থা থাকে তা হলে তাদেরকে নিয়ে সামনে আগানোর কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতি, বাংলাদেশের সমাজনীতি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিকের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন মোহাম্মাদ আবদুল মান্নান। আমরা জানি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আজকে Identity Politics খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকে পৃথিবীব্যাপী মানুষ জিজ্ঞেস করছে, আলেক্স হেলি নিজেকে জিজ্ঞেস করছেন, ডযড় ও ধস? প্রশ্ন করি নিজের কাছে, কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কে আমি? এই Identity Politics-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দ্বৈততা, বাংলাদেশের শতধা বিভক্তি, বাংলাদেশের অস্থিরতা আমরা সকলেই জানি, সকলেই বুঝি।

Identity Politics-এর ক্ষেত্রে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের যে অনন্য অবদান, সে সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করবেন। অনেকেই এ নিয়ে বলবেন। কিন্তু আমি আজ এখানে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, তার মূল বই 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা' আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ বই। একটি অসাধারণ সাধনা। আমাদের খান জাহান আলীরা, আমাদের শাহজালালরা, আমাদের শাহ মাখদুমেরা আমাদের জন্য যে সোনালী ইতিহাস তৈরি করে গেছেন, আমাদের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করে গেছেন সেই ঐতিহ্য, সেই নির্মাণ, সেই সংগ্রাম, সেই জিহাদ, সেই ইতিহাস, সেই আন্দোলন আমাদের কাছ থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস তুলে ধরার অসামান্য কাজটি বড় রকমের সাধনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ করেছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এছাড়া তিনি পরবর্তীকালের চিত্র-বিচিত্র রাজনীতির গতিধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ অনুসরণের চেষ্টা, ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম, ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন, তারই জের ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট এবং পরবর্তীকালে আরও অনেক অবাক হওয়ার মতো ঘটনা আমাদের জাগরণের এক একটি ধাপ, একেকটি স্তর, সেসব বিষয় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অত্যন্ত সফলতার সাথে তার 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আমার কাছে খুব দুঃখ লাগে যে, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি এই উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাকে দায়ী করা হয় যে, তার কারণে ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়। এত বড় ডাহা মিথ্যা কথা আমাদের ইতিহাসে আর হতে পারে না। আপনারা জনাব আবদুল মান্নানকে পড়েছেন। তিনি সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের মূল নায়কদের চেহারা তথ্য-প্রমাণ সহকারে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। গত পরশু একটি সেমিনার ছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে, সেখানে একজন গান্ধীবাদী যিনি ভারত থেকে এসেছেন, তার সব কথা দ্বারা এবং সমস্ত ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, It was only Gandhi and Gandhi alone was responsible for partition of Bengal. এখন এইসব কথা আমাদেরকে যুক্তি-তর্ক সহকারে, তথ্য প্রমাণ সহকারে জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে এবং আমি মনে করি যে, জনাব আবদুল মান্নান এখানেই থেমে থাকবেন না। তিনি এই জাতির জন্য তার সুযোগ্য সাধনার মাধ্যমে একটি প্রশস্ত পথ এবং সে পথ চলার পাথেয় তৈরি করবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করুন।

বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ্ মানসুর বলেন ঃ আজকের অনুষ্ঠানটি একটি মাইলফলকতুল্য অনুষ্ঠান। আজকের দিনটি একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের জন্য যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তা তো এক দিনের নয়। এর পেছনে অনেক সময়, অনেক ধারাবাহিক পরিশ্রম আছে, অনেকে কলম ধরেছেন, তারই

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতায় আজকের মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অসামান্য ঐতিহাসিক কাজগুলো করে যাচ্ছেন। তার কাজের মূল্যায়ন ভবিষ্যতে আরো হবে বলে আমি খুবই আশাবাদী। বিশ্রামের সময়টুকু কাজে লাগিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জাতির স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তা করে যেভাবে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, সে কাজটি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি। তাঁর এ সাধনা থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করব। আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ধন্যবাদ সকলকে।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিক সৈয়দ লুৎফুল হক বলেন ঃ সভাপতি কবি বেলাল চৌধুরী, দেশের খ্যাতিমান কবি আল মাহমুদ, উপস্থিত সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ! মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আজ আমরা সংবর্ধনা দিচ্ছি। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, আড়ম্বর যার ভিতরে নেই, একজন নিরব ও নিরলস কর্মী আবদুল মান্নান। সাংবাদিক কিংবা ব্যাংকার কিংবা ইতিহাসবিদ, যে নামেই তাকে আমরা মূল্যায়ন করি না কেন, সবখানেই তিনি সফল। আমি শুরুতে একটা তথ্য উল্লেখ করি। বৃটিশ আমলে, দু'শ বছরের পরাধীনতার সময় বাংলাদেশে, ভারতের কলকাতায় এবং ময়মনসিংহে বৃটিশ সরকার তিনটি জায়গায় তিনজন কালেক্টর নিয়োগ করেছিলেন। সেই তিনজনই শিল্পী ছিলেন, চিত্রশিল্পী ছিলেন। কেন বৃটিশ সরকার চিত্রশিল্পীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন? একটি কারণ হলো, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, চিত্রশিল্পী এবং লেখক, সাহিত্যিক, কবি ছাড়া ইতিহাসকে সংরক্ষণ করা যাবে না। সে কারণেই তারা যেমন লিখতেও জানতেন, ছবিও আঁকতেও জানতেন। এই তিন ব্যক্তিই একই ধারার প্রতিভাবান ছিলেন। একজন তদানিন্তন পুরস্কৃত শিল্পী ছিলেন, তারপরও তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন।

আমি একথা এ কারণেই বললাম যে, আজকে আবদুল মান্নান সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বকে যদি আমরা মূল্যায়ন করতে না জানি, তা হলে আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হব। আমাদের আজকের ইতিহাস রচিত হওয়া নিয়ে যারা কথা বলেন, এভাবে হতে হবে, ওভাবে হতে হবে, কিন্তু কাজটি কেউই করেন না। আমার মনে হয়, মান্নান সাহেব, আমাদের শ্রদ্ধেয় মান্নান ভাই, যাকে আমরা আজকে সংবর্ধিত করছি, তিনি সে কাজটি করেছেন, নিরবে-নিভৃতেই সে কাজটি করে চলেছেন।

আমি মনে করি, এই যে আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাচ্ছি, তাঁকে আরও অনেক বেশী সম্মান দেখানো উচিত ছিল। এটি ইতিহাস সচেতনতারই একটি কাজ। 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' সহ এমন ক'টি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, সে কারণে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা বলেন ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে অনেক দিন আগে দু-একবার দেখা হয়েছে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। তারপর অনেক দিন থেকে তার সঙ্গে আমার খুব কমই যোগাযোগ হয়েছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ করে যখন তার কিছু বই দেখলাম, আমাদের জাতিসত্তা, আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বেশ ক'টি বই, আমাদের জাতির দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস তিনি লিখেছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, নিরবে আমাদের দেশে কত গুণী ব্যক্তি বড় রকমের, অসামান্য অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছেন–এটা তারই উদাহরণ। অনেকেই হয়তো এভাবে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। এই 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' বইটি কয়েকবার ছাপা হয়েছে। তার আরও অনেক মূল্যবান বই রয়েছে।

আমি বিস্মিত হয়েছি যে, একজন ব্যাংকার কি করে ইতিহাসবিদ, গবেষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি একজন সাংবাদিক, সেটা ভুললে চলবে না। সাংবাদিকতাই তার মূল পেশা ছিল। তারপর তিনি টাকা-পয়সার রাজ্যে এসেছেন। কিন্তু তার মনটি রয়ে গেছে সাংবাদিকতায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ভালবাসায়। তার যে ক'টি বই আমি পড়েছি, আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের সোনালী কিংবা সংগ্রামী অতীতে। ইতিহাসের প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই দুর্বলতা আছে। হয়তো নানা রকম পেশাগত কারণে অথবা ব্যস্ততায় আমরা ফিরে যেতে পারি না সেই ইতিহাসে এবং ঐতিহ্যে। কিন্তু এই বইগুলো যতবার আমি নাড়াচাড়া করেছি এবং

www.pathagar.com

দেখেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে, সহজ-সরল ভাষায় এখানে কোন জাতিভেদ, কোন সম্প্রদায়গত চিন্তা বা ধর্মভেদ নেই। এই পুরো উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক চিন্তা-ভাবনার উত্থান-পতন খুব সরলভাবে তিনি আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। খুব অমনোযোগী পাঠকও আরেকবার ফিরে দেখবে, ভাববে–তাই তো, এটা তো আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাস কত সজীব এবং সত্য। প্রকৃত ইতিহাসকে কখনই কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

আজকে যখন তাঁর বই আমি দেখি, অনুষ্ঠানে আসবো বলে আজো তার কিছু বই নাড়াচাড়া করছিলাম, আমার মনে হয়েছে সেই দুঃখের এবং সুখের কথা। পাল বংশ দিয়ে তিনি শুরু করেছেন। মুসলিম সুলতানী আমল, পাঠান আমল, বারভূঁইয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। নওয়াব আমলের পর এলো পতন যুগ। আমাদের ভাষা সাহিত্যের যে ঐতিহ্য তা ধ্বংশ হলো, ইংরেজরা ফারসি ভাষাকে দূর করে দিল। অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজকে চেঞ্জ করে দিল। তাদের যে মনোভাব ছিল, তা মুসলমানদের শেষ করে দিতে উদ্যত হলো। হান্টারের বই 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' থেকে আমরা যা পাই, বৃটিশরা সবাইকে বিশ্বাস করতো, কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস করতো না। চিরকালের শত্রু মনে করতো। আমাদের ইতিহাসের এসব অন্ধিসন্ধির কথা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আমাদেরকে জানিয়েছেন। আরো অনেক বিষয়ে তিনি আমাদের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরুন না। আমি নিজেও শিক্ষক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বারবার ফিরে যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার গভীর আত্মীয়তা। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হবে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা দেশকে উন্নত করবে। সেখানেও কত বাধা। কারা বাধা দিল? এ ঘটনায় তাদের ব্যক্তিত্বের কি চিত্র উন্মোচিত হয়? এ এক অবাক কান্ড। ও ভাল করবে তা দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। এই যে অতিষ্ঠকর একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সেই চরিত্রের লোকদের পরিচয় জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখার মধ্যে এসেছে।

পূর্ব বাংলার স্বার্থে যখন বঙ্গভঙ্গ হল, এরপর কাদের বৈরিতায় বঙ্গভঙ্গ রদ হল? নবাব সলিমুল্লাকে সে ঘটনা গভীর বেদনার মধ্যে নিমজ্জিত করল। তার সঙ্গে যারা ছিলেন, নওয়াব আলী চৌধুরী এবং তাদের সংগ্রামী সাথিরা, আবদুল মান্নানের বই পড়লে মনে হবে, এদের প্রত্যেকের চরিত্রগুলো যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মানুষ যদি নিজের শিকড়কে সন্ধান না করে তা হলে তার ভিত্তি মজবুত হয় না। আর শিকড় খুঁজতে খুব বড় কিছু হতে হয় না। দেশ ও জাতিকে ভালবাসলেই চলে। দেশ এবং মাটির প্রতি কমিটমেন্ট থাকলেই চলে। আর এই ভালোবাসার অর্থ অন্যের প্রতি হিংসা বা ঘৃণা নয়।

রাস বিহারী ঘোষ ও তার বন্ধুরা কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন? তারা বৃটিশ রাজত্বের সামনা-সামনি হলেন এবং বললেন, মুসলমানরা চাষাভূষা, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দরকার নেই! আমি না চাইলেও তো হিংসা এসে যাচ্ছে ভাই। আমি না চাইলেও তো বিরূপ কথা এসে যাচ্ছে । কারণ তারাই আমাদের মাঝে এরূপ বিরূপ কথা এনেছেন। কেন আনলেন? একটা ছেলে পড়াশুনা করবে, মুসলমানরা পড়াশুনা করবে, তাতে আপনার হিংসা কেন? একজন গুণী আর একজন গুণীকে জায়গা করে দেবে–এটাই তো স্বাভাবিক। তারা আপত্তি তুলেছে যে, মুসলমানরা অধিকাংশই কৃষক এবং তখনকার সচিব লর্ড মর্লিকে তারা বলেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার চাষাভূষা মুসলমান প্রজারা লেখা-পড়া করে কোন লাভ হবে না। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন হচ্ছে? তাদের দাবি ছিল, বাংলার সবকিছুই সম্পূর্ণভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য যা কিছুই করা হোক না কেন! ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে হবে যদি আমরা পরস্পরে সহযোগিতার হাত না বাড়াই, গুনীর কদর না করি, অনেক গুনির দাম না দেই?

এখন বাইরের শক্তি এসে আমাদেরকে টোপ দেয়। একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। নানা চাতুরী, ছলনা ও প্রতারণার জাল বিছিয়ে আমাদেরকে তাদের দলে টেনে নেয়। আজও চলছে সেই চাপ। আমাদের আজ পরস্পরকে নির্মম সত্য মনে করিয়ে দেয়া উচিত। পরস্পরকে মনে করিয়ে দেয়া উচিত কত কন্টকাকীর্ণ কঠিন বন্ধুর পথ পার হয়ে আজকের বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই আমরা এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং আজকের এ পরিচয় চিহ্নিত করেছি। সেই চিহ্নিত পরিচয়কে এ ধরনের বই না পড়লে বোঝা যাবে না। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নানা বাধা অতিক্রম করে যারা আমাদের জন্য পথ তৈরি করে গেছেন- তাদের ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। তাদের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের

www.pathagar.com

মত গবেষক আমাদের প্রয়োজন। আমি মনে করি, বিবেক তাকে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমি তাকে অভিনন্দিত করছি। আজকের এ সংবর্ধনা সম্পূর্ণ সফল হোক।

আমি কখনোই দুঃখ করে বলব না, তার আরও পাওনা ছিল, তাকে আমরা এ দেইনি, ও দেইনি! এটা নয়। আমাদের এ জাত বড়ই আত্মঘাতি জাত। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আঘাত করার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। জাতিসত্তার এ দিকটি আমাদের স্বীকার কনে নেয়া ভাল। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের সবারই চেষ্টা করা উচিত। আমি মনে করি, এই ধরনের গুণীজন সংবর্ধিত হলে, তাদের কথা পরস্পরকে বলতে পারলে আমরা নিজেরাই ধন্য হবো।

আপনি আরো লিখুন। আপনাকে আমি অনুরোধ করি, আপনি আরও লিখুন। আপনি অপরিচিত এক বিরাট দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আমরা যারা এগুলো নিয়ে কাজ করি তারা তো অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং যারা সব সময় পড়াশুনা নিয়ে থাকেন না, তারাও কিন্তু এই বইগুলো হাতে পেলে খুশি হবেন এবং আমি মনে করি, আপনি অনেক বড় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ব্যাংকার মানুষ তো, টাকা-পয়সার মধ্যে ডুবে যাবেন না! দয়া করে আমাদের কথা, পাঠকদের কথা মনে রাখবেন। ইতিহাসের কথা মনে রাখবেন। আপনি আরও লিখুন। আপনার কাছ থেকে যাতে আরও সুন্দর সুন্দর লেখা পাই। সুন্দর লেখা? না বিবেক তাড়িত লেখা, দায়িত্ববান লেখা। যা পড়ে আমরা ধন্য হবো এবং সফল হবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রবীণ সাংবাদিক, বিশিষ্ট কবি, ছড়াকার, কথাশিল্পী, 'ঘর-বাড়ী' পত্রিকার সম্পাদক জনাব এরশাদ মজুমদার বলেন ঃ মান্নানকে মঞ্চের পেছনের ছবিতে যে রূপে দেখছি, আর মঞ্চে যে মান্নান বসে আছে এর ভিতরে একটু পার্থক্য দেখা যায়। ব্যানারের ছবিতে বেশ কালো দাঁড়ির মান্নান আর মঞ্চে উপবিষ্ট মান্নানের দাঁড়িতে কিছু সাদা আছে। ছবিটা ও রকম হলেই, মান্নান যেমন হাসছে, ওর হাসি হলেই ভাল হতো।

স্মারকে প্রকাশিত আমার লেখাটা ছোট। ড. ওয়াহিদ সাহেবের সন্ত্রাসী টেলিফোনে বাধ্য হয়ে ঐ লেখাটা তাড়াহুড়ার মধ্যে দিতে হয়েছে। মান্নানের সাথে আমার মিল হলো, মিল আছে বলেই ভালবাসা আছে, আমি ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পলাশী দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তখন কেউ কেউ বললেন, হঠাৎ করে পলাশী দিবস পালন করছো কেন? আমি বললাম, করছি, পরে আপনারা চিন্তা করেন কেন করছি? তারপর ঢাকার ৪০০ বছর নিয়ে বই লিখেছি, অনুষ্ঠান করেছি।

আমার মনের ভিতর সব সময় একটা জিনিস কাজ করে, যেটা মান্নানের ভিতরেও কাজ করে, সেটা হলো আপনি জমি কেনার সময় একেবারে তোলপাড় করে বায়া দলিল খোঁজেন, সিএস খতিয়ান খোঁজেন, আরএস খতিয়ান খোঁজেন! বিয়ে দেয়ার সময় দুনিয়ার পরিবার খোঁজ করেন। পরিবারের অতীত সম্পর্কে খোঁজ করেন। কিন্তু জাতির বায়া দলিল খোঁজেন না কেন? আমাদের জাতির বায়া দলীল তৈরী করার জন্য লোকের সংখ্যা খুবই কম। মান্নান সে কাজই করছে, সফলভাবে করছে। তার দ্বারা জাতির চাহিদার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা পূরণ হচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন ঃ মঞ্চে উপবিষ্ট ধীমান ব্যক্তিবর্গ, সংবর্ধিত ব্যক্তি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, সভাপতি আমার বন্ধু বেলাল চৌধুরী! আমি অনেক্ষণ ধরে বসে আছি। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে আমার শরীর কাঁপে। তাই আমি চলে যাব। তাই আমাকে এ সুন্দর অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হবে। আমার এ অপারগতা আপনারা দয়া করে ক্ষমা করবেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের জন্য এই যে এখানে আমরা সংবর্ধনার আয়োজন করেছি, এটা ছোট ঘটনা নয়। মান্নান এ জাতির জন্য বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। এ ভরাট অনুষ্ঠান তারই একটি স্বীকৃতি। এটি শেষ নয়, এ হলো একটি সূচনা বিন্দু।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আমি সত্তুরের দশক থেকে নিবিড়ভাবে চিনি ও জানি। তার জীবন সংগ্রাম আর সাধনার সাথে তো আমারও অনেক মিল রয়েছে। মান্নান গ্রাম থেকে শহরে এসে বাসা বেঁধেছে ঠিক আমারই মতো সংগ্রামশীলতার মাধ্যমে। মান্নান শুরুর জীবনে সাংবাদিকতার সেই পাটাতন থেকে কাজ শুরু করেছে, যেখানটা থেকে আমিও শুরু করেছিলাম। ধীমান ও সংগ্রামশীল মান্নান আমাদের কৃষি জমির আইল বেয়ে উঠে আসা গাও গেরামের সংগ্রামশীল মানুষদের

www.pathagar.com

একজন সফল প্রতিনিধি। পূর্ব বাংলা এভাবেই একেকজন আবদুল মান্নানের হাত ধরে শিহরিত হয়েছে এবং ক্রমশ জেগে উঠেছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখালেখির সাথে আমি দীর্ঘদিন পরিচিত। তার অনেক প্রবন্ধ সেমিনারে পঠিত হবার সাথে সাথে আমি তাকে অভিনন্দিত করেছি। বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে চৌদ্দশতক জাতীয় উদযাপন কমিটির সেমিনারে এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করার পর আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি তো ভেজাল ইতিহাসের খড়কুটোর স্তূপে দিয়াশলাই ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছো! তার 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পথিকৃত তুল্য এই গ্রন্থ এক সময় এ জাতির বড় রকমের মূল্যায়ন লাভ করবে বলে আমি মনে করি। তার জাতিসত্তার বিকাশধারা পাঠ করে আমি আপ্লুত হয়েছি। আর 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থটির সাথে তো আমার অসামান্য আবেগ মিশ্রিত সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সম্পর্কে আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে কালের শব্দে উচ্চকিত কান খাড়া একজন মানুষ। তিনি বঙ্গভঙ্গের উপর যে কাহিনী লিখেছেন সেখানে একজন দৃঢ়চেতা ইতিহাসবিদকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবদুল মান্নান দেশ ভাগ হওয়ার কাহিনীটা সোজাসুজিভাবে আমাদের হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমি আমার লেখায় তাকে 'মহা ভাঙনের কাহিনী' লেখার আহবান জানিয়েছি। আমি আশা করি, তিনি আমার অনুরোধে সাড়া দেবেন। কেননা, আমার মতে, এ কাজ করার সামর্থ্য তারই আছে।

আবদুল মান্নানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে অনলস পরিশ্রমের অনেক চিহ্ন। আমার মনে হয়, আজ না হোক কাল তিনি তার বর্তমান পেশার ওপর ইতিহাস রচনার ক্ষমতাকেই প্রধান করে তুলবেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যদি গোড়া থেকে আমাদের জাতির ইতিহাসের বিষয়গুলো সূত্রবদ্ধ করে একটি ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হন তা হলে সেটা হবে নিঃসন্দেহে তার ঐতিহাসিক অবদান। আমরা তাকে অনুরোধ করি, শুধু বঙ্গভঙ্গ নয় অনেক জিনিসই তো ভেঙেছে, আজো তার একটিও জোড়া লাগেনি। আমরা চাই আবদুল মান্নান সমস্ত ভাঙন সূত্রবদ্ধ করে একটি মহাগ্রন্থ রচনা করুন। বইটির নাম তিনি কি দেবেন জানি না, তবে আমরা এর নাম দিতে চাই 'মহাভাঙনের কাহিনী'। এ ব্যাপারে তিনিই যোগ্য লোক। আমাদের বিবেচনায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ কাজটি নির্ভুলভাবে আঞ্জাম দিতে পারবেন। এর মধ্যে তার যে সব বই বেরিয়েছে, প্রতিটিই দুর্মূল্য কিতাব। আমরা এই সব বইয়ের জন্য তার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। আশা করি, আমাদের অনুরোধ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান শুধু এ জাতির ইতিহাস প্রণেতা নন। তিনি এ জাতির সংগ্রাম ও আন্দোলনের একজন সম্মুখবর্তী সৈনিক। এ পর্যন্ত ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, যা মুসলমানদের স্বার্থে হয়েছে, তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা সেই সব আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে তার কাছে দাবি করি যে মহাভাঙনের কাহিনীতে তিনি অনেক কথাই সূত্রবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন।

কথাশিল্পী, দৈনিক সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুবুল হক বলেন ঃ ইতিহাসবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং আমার সামনে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আমাকে কথা বলতে হবে, এটা আমি জানতাম না। এসেছি তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসাবে যোগ দিতে। আমাদের দু'জনের মধ্যে ওয়াদা ছিল যে, আমরা একে-অপরের পক্ষে লিখব না। এটা ওয়াদা খেলাফের মতো হয়ে যাচ্ছে না তো আবার। কাফফারাটা কে দেবে জানি না। শুধু এটুকু বলব, আমরা যতদিন বেঁচে থাকব সাহিত্য রচনা থেকে, সাংবাদিকতা থেকে আমরা কখনও পিছপা হবো না।

আবদুল মান্নানের আব্বা ও আম্মা অনেক বড় মানুষ ছিলেন। অনেক বড় আবেদ ছিলেন। তাঁদের দোয়ায় এবং তাঁর নিজ অবিরাম প্রচেষ্টায় আবদুল মান্নান আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একসময় সাংবাদিকতায় ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক এখন ব্যাংকে এসে গেছেন। শুধু এটুকুই বলবো এটা আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে। এটা আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালা কাকে দিয়ে কখন কি কাজ করিয়ে নেবেন, তা তিনিই জানেন। ব্যাংকার হিসাবেও গত পঁচিশ বছরে অনেক বড় বড় কাজ করছেন আবদুল মান্নান। আর লেখক হিসাবে, ইতিহাসবিদ হিসাবে তিনি কত বড় কাজ করছেন, আমরা পাশাপাশি থেকেও সেটা বুঝতে পারিনি।

www.pathagar.com

তার কাজের মূল্যায়ন এক সময় নিশ্চয়ই হবে। দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই তিনি আরো অনেক বড় বড় কাজ করবেন ইনাশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘজীবী করুন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস জনাব এ কে এম ইয়াকুব আলী বলেন ঃ আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বই আগে পড়িনি। কিছুদিন আগে তাঁর বই হাতে পাই। পড়ে বুঝতে পারি তিনি গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে ইতিহাসকে আলোচনা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা অজান্তেই সৃষ্টি করে ফেলেছেন। আর একথা আমি এখানে বলতে চাই যে তাঁর এই ধারাটি আমার মতের সাথে মিলে যায়।

আমি ক'দিন আগে জানতে পারি, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে ইতিহাস গবেষণায় অবদান রাখার জন্য সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকের জন্য আমি একটি লেখাও দিয়েছি। আজকের এ অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেয়ে আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে দেখার জন্য এবং তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যই রাজশাহী থেকে এসেছি। অনুষ্ঠান শেষেই আবার রাজশাহী ফিরে যাব।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কূপমন্ডুকতার বেড়াজাল ভেদ করে মুক্ত ও আলোকিত মন নিয়ে ইতিহাস রচনার কাজে এগিয়ে এসেছেন এবং এক্ষেত্রে সমকালীন ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম থেকে উৎসারিত বাস্তবতার মূলধনকে পুঁজি করে তিনি আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার অন্বেষার সাথে সাথে মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার ওপর তথ্যভিত্তিক অথচ বিশ্লেষণমুখী আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তার 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' ও 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' বইতে।

আবহমান বাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান নতুন আংগিকে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' নামক গ্রন্থে। সবচে উল্লেখযোগ্য অথচ সবচে কম আলোচিত বিষয়টিকে তিনি এই বইতে যেভাবে তুলে এনেছেন, এবং সে বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি যে আংগিকে আলোক সম্পাত করেছেন, সেটি তার একটি প্রধান কৃতিত্ব। 'মূলধারা' গ্রন্থে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এসে তিনি শেষ করেছেন। আর 'বিকাশধারা' গ্রন্থে তিনি তার মূল বক্তব্য পলাশীর পর থেকে শুরু করেছেন। সে কারণে এই দু'টি বইয়ের মধ্যে বিষয় ও বক্তব্যের এবং জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অভিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।

এ দেশের মানুষ ও মাটির পরিচয়ে গড়ে ওঠা মুসলমানদের তাওহীদভিত্তিক জীবনবোধ ও সংস্কৃতি তাদেরকে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রতিকূলতা জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাত-কঠিন শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে তাদেরকে আগুয়ান করেছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সে সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'মূলধারা' ও 'বিকাশধারা'র সাথে উপসংহার হিসাবে যুক্ত হয়েছে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'। এই তিনটি গ্রন্থ একত্রে পাঠ করলে এদেশের জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার শিকড় সন্ধানের একটা চূড়ান্ত পর্যায় উপলব্ধী করা যায়।

আমি আশা করি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে মিশন শুরু করেছেন, তা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর কাছে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সিনিয়র সহ-সভাপতি নাট্যকার, কলামিস্ট খন্দকার হাসনাত করীম বলেন ঃ আমার সাংবাদিকতা জীবনের প্রথম নাম, প্রথম প্রেম আবদুল মান্নান। ইতিহাস বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে, কোন অলক্ষ্যে, তিনি নিজেও হয়তো জানতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের একজন ভাষ্যকার হয়ে গেছেন। এটা টয়েনবি খুব ভাল বলেছিলেন, আর তাকে সমর্থন করেছিলেন এ্যাকটন, লর্ড এ্যাকটন নয়, ইতিহাসবিদ এ্যাকটন। তিনি বলেছেন যে ইতিহাসবিদকে তাঁর সম-সময়ের জন্য দু'টি কাজ করতে হয়। একটি হলো জঞ্জাল সাফ করার কাজ, আর একটি হলো সত্যকে তার সাহিত্যের ভাষায়, তার ইতিহাসের ভাষায় লিখতে হয়। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব গভীর অভিনিবেশের সাথে, গভীর সাধনার সাথে, অত্যন্ত কষ্টকরভাবে এ দু'টি কাজ অত্যন্ত জোরালোভাবে, নিষ্ঠার সাথে করে চলেছেন।

www.pathagar.com

জীবনের সমস্ত বিষয়কে ইতিহাস Impressed করে। সেই ইতিহাসটা, আমাদের ইতিহাস, আমাদের এই মাটির ইতিহাস, আমাদের পৃথিবীর এই অংশের ইতিহাস, এর মূল আকর গ্রন্থগুলো, যেগুলো ফারসীতে ছিল, দুঃখজনকভাবে সেগুলোকে আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। আর সেগুলোকে উদ্ধার করেছে যারা, তারা তাদের মতো করে তাদের দিকটিকে তুলে ধরেছে। সেগুলো অনুবাদ হয়েছে। প্রথমে ইংরেজীতে, ইংরেজী থেকে বাংলায় আর উর্দুতে অনুবাদ হয়েছে। সেখানে আমাদের দিকটি অন্ধকার। আমাদের জাতির জীবনের যে ধারাক্রম সেটা সেখানে অন্ধকার রয়ে গেছে। সেই অন্ধকারকে একা মান্নান সার্থকভাবে দূর করার চেষ্টা করছেন।

লেখককে, কবিকে সংবর্ধিত করা হয়। কিন্তু গবেষণার জন্য স্বীকৃতি দেয়া, গবেষণার জন্য সংবর্ধিত হওয়া, এটা আমাদের জাতীয় মননের, জাতীয় রুচির, জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তির একটি নতুন বিন্যাস এবং একটি নতুন দিক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। আমি ইতিহাস গবেষক মান্নান ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ইতিহাসের অনুলিখনে, প্রতিটি পদে পদে এটি প্রমাণিত হবে কি হবে না-এই আতংকটা যেমন থেকে যায়, তার কারণে ইতিহাসবিদকে রেফারেন্স তুলে ধরতে হয়। আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথি একজন কলম যোদ্ধা, একজন সহকর্মী হিসাবে এই অনুরোধটা করব যে, আপনি আপনার মতো করে, আপনার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, লিখতে থাকুন, বলতে থাকুন। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি এবং আপনি আরও অনেক আবদুল মান্নানের সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন, সে আশায় আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডেইলি নিউ নেশনের সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন ঃ জনাব আবদুল মান্নান যে কাজ করছেন, এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। আমি অনেক খুশী এ জন্য যে, আবদুল মান্নান সাহেব লেখক হিসাবে সফল, ব্যাংকার হিসাবেও সফল, আর সাংবাদিকতায়ও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। আমি আশা করি, তাঁর লেখার হাত আরও চলবে। এখনও তাঁর হাতে অনেক বই আছে। গোটা ত্রিশেক বইয়ের উপর তিনি কাজ করছেন। এই বইগুলো আরও সুন্দর হবে, দেশ উপকৃত হবে, আমরা উপকৃত হব- এই কামনা করছি।

আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন ঃ যে সকল এজেন্ডা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য এবং জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন, বিভিন্ন পর্যায়ে আপনারা সকলে সে এজেন্ডাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবেন। আমি অনেকাংশেই অনুভব করি যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডাকেই আমরা এখন আর সচল আর সজিব রাখছি না। স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস আলোচনা করা এখন সময়ের দাবী। যারা আলোচনা করেন না তাদের কথা আলাদা। যারা আলোচনা করেন, তারা যদি তাদের আলোচনাকে জীবিত রাখার জন্য কাজ করেন তা হলে ক্রমশ স্বাতন্ত্র্যের বাতিগুলো জ্বলে উঠবে। আজকের অনুষ্ঠান সে ধারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান। আমাদেরকে এ কাজ এগিয়ে নিতে হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে তথ্যগুলো একত্র করেছেন, যে ভান্ডার দিয়ে বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে আমরা যে সকল চ্যালেঞ্জের সমস্যায় পড়ি, যেমন বাজারদরের একটা চ্যালেঞ্জ। একটা পণ্যের উৎপাদন মূল্য কত, কেউ জানে না। ৪ টাকার পণ্য ১৪ টাকায় বিক্রি হয়। আর ১০ টাকা দিয়ে ফাও সভ্যতা বানানো হয়। সভ্যতার বিভিন্ন জায়গায় চধুসবহঃ করা হয়, ঝঢ়ড়হংড়ৎ করা হয়। এ সকল বিশ্লেষণ আসা দরকার। এগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য আপনারা যারা বক্তৃতা দিয়েছেন তারা যোগ্য ব্যক্তি। বিশ্বের এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ জাতির সেন্টরে আপনারা থাকেন। আপনাদের এটা দেখা উচিত, কথা বলা উচিত। শেষ করব এ কথা বলে, ১৫ কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে এক ঢাকা নির্মাণ করে আপনারা জাতিকে রক্ষা করতে পারবেন না।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম. ফরীদউদদীন আহমাদ বলেন ঃ সাংবাদিক, গবেষক, ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এখনকার একটা পরিচয় তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আপনারা আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে সংবর্ধনা প্রদান করছেন, এজন্য আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতিহাসবিদ হিসাবে সংবর্ধিত হচ্ছেন। আমি মনে করি এখানেই শেষ

www.pathagar.com

নয়। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় ও ব্যাংকিংয়ে বিশেষ অবদান রাখার কারণেও তিনি সংবর্ধিত হবার যোগ্য। এমনকি পরিবার ব্যবস্থাপনায় তাঁর যে অসামান্য কৃতিত্ব, যে সম্পর্কে আমি ঘনিষ্টভাবে জানি, সেই বিরল কৃতিত্বের জন্যও তিনি সংবর্ধনা পেতে পারেন। আমার সাথে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সম্পর্ক বিগত ২৫ বছর ধরে, যা এখন আর অফিসিয়াল সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মান্নান ভাইয়ের বইগুলো পড়েছি। পড়তে গিয়ে দেখেছি, তিনি ইতিহাসকে সাধারণের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন, যা থেকে দেশ ও জাতি উপকৃত হতে পারছে। মান্নান ভাই আমাকে অনেকবারই লেখালেখির প্রতি উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্যাংকিং জীবনের প্রথম দিকে দু'জনের কর্মস্থল দূরে থাকলেও মনের দিক থেকে আমরা একে অপরের অত্যন্ত কাছে ছিলাম। আর বর্তমানে আমরা পাশাপাশি কক্ষে বসেও বাস্তব কাজের চাপে মনে হয় যেন দূরে অবস্থান করছি।

আমি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ইতিহাস গবেষণার এই কাজ আমৃত্যু করে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রতি। ধন্যবাদ জানাই সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচারকে। তাঁরা আমার ক্ষুদ্র কাজকে মূল্যায়ন করে আমাকে সংবর্ধিত করছেন। আপনারা যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করার জন্যে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আমি এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার বেড়ে ওঠার নানা ধাপে যারা আমাকে নানাভাবে হাত ধরেছেন, বাতি এগিয়ে ধরেছেন, তাদের প্রতি। আমার দাদা, বাবা-মা, চাচা-মামা, নানা-নানী, প্রাইমারী শিক্ষক ইসমাইল পন্ডিত হাইস্কুলের প্রিয় শিক্ষক আবদুস সামাদ খান সহ আমার স্কুল শিক্ষক, গ্রামের মুরুব্বীজন, সাথি ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে দারুণভাবে ঋণী। এর পর সোনাখালি নামের এক খাল পাড়ের সত্যভান্দী গ্রাম থেকে মায়ের বিয়ের সুটকেস হাতে ধান-পাট সরিষা ক্ষেতের আইল বেয়ে এসে ভুলতা স্টেশনে মোমিন কোম্পানীর বাসে চরে ঢাকা আসা। কমলাপুর রেল স্টেশন উদ্বোধনের দিনে সেই যে ঢাকা এলাম, সেই থেকে কত দুস্তর বাধা-সংকট পার হয়ে বর্তমান ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছেছি। আমার এ পথ পরিক্রমায় কত অসংখ্য মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহায্য, সহযোগিতা পেয়েছি! আবদুল মান্নান তালিব, অধ্যাপক আবদুল গফুর, এম. আযীযুল হকসহ কত মানুষের কাছে আমার অসামান্য ঋণ। আর আমার বন্ধুরা। আমি সব সময় বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান। তাদের ঋণও আমার পদে পদে। আজকে এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি আমার জীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত কাজ করেছি, বিশেষ করে বাংলা ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস সাধারণ জন-মানুষের কাছে তুলে ধরার যে চেষ্টা আমি করছি, তা আমি করছি আমার দায়িত্ববোধ থেকে। ব্যাংকিং পেশার প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও লেখালেখি থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকিনি। আমি আমার জীবনে সময়কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। বিশ্রাম ও অবসরের সময়কে কাজে লাগিয়ে যে কাজ আমি করেছি, তারই লিখিত রূপ হলো প্রকাশিত বইগুলো।

আমি যে কাজ করছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। আমি মনে করি, মুমিনের কোন রিটায়ারমেন্ট নেই। আমৃত্যু তাকে মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করতে হয়। আর তাই আমি চেষ্টা করছি দেশ ও মানবতার কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করতে। আমার এ কাজ করতে গিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি আমার অগ্রজ লেখক, সাংবাদিকদের কাছ থেকে। তবে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছি আমার পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে। আমি তাদের প্রাপ্য সময় কখনও দিতে পারিনি। কিন্তু তারা কখনোই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি, বরং সহায়তা করেছে সব সময়। আমি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমি নিজে কাজ করি। আমার আশ-পাশের মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি। আমি প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার ভিতরকার মহামানবকে তালাশ করি। সে মহামানবকে জাগ্রত করার জন্য চেষ্টা করি। এ চেষ্টা সফল হলেই জাতি বড় হবে। এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়াই করছি, তিনি যেন আমাকে আজীবন ভালো কাজ করার তৌফিক দান করেন। আপনাদের সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

কবি বেলাল চৌধুরী সভাপতির বক্তব্যে বলেন ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান একজন নিরব কর্মী। আড়ম্বর আর জৌলুসের বাইরে থেকে তিনি জাতির প্রতি অসামান্য দায়িত্ব সম্পাদন করে চলেছেন। আজকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকল বক্তব্য তার সেই নিরব ও অসাধারণ অবদান ও কর্মসাধনার সাক্ষ্য আমাদের সামনে হাজির করেছে। আর আজকের উপস্থিতিও অনন্য। একজন নিরব ইতিহাস গবেষক ও কর্মী মানুষকে সম্মান দেখাতে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এখানে হাজির হয়েছেন। এটাকে আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক একটি বিষয় হিসাবে বিবেচনা করি।

আজকের অনুষ্ঠানের আলোচকগণ মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বহু-বর্ণময় জীবনের নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের পাশাপাশি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লেখা-লেখির মাধ্যমে অনেক জ্ঞানগর্ভ ও সুখপাঠ্য বই পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তিনি ইতিহাস ও ব্যাংকিংয়ের ন্যায় সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বই আর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। তেমনি রম্য রচনায়ও তিনি সামর্থের পরিচয় দিয়েছেন। লেখালেখির পাশাপাশি সম্পাদনায়ও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে তার অনেক লেখা। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভ্রমণ, অনুবাদ। তার প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিষয়ে রয়েছে বৈচিত্র্য। সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিষয়ে তার প্রবন্ধ রয়েছে। বড়দের জন্য লেখার পাশাপাশি ছোটদের জন্য তিনি কলম ধরেছেন। ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে তার বহু লেখা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে ছাপা হয়েছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার বৈচিত্র্যময় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিংবা অনুরূপ সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে কাজ করছেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র 'নাট্যরূপ' দিয়ে গ্রামের কিশোর সাথিদের নিয়ে তা মঞ্চায়নের 'ব্যর্থ' প্রয়াস মান্নানের পঞ্চম শ্রেণীর ঘটনা। কিন্তু এরপর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যেখানেই হাত দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে সোনা ফলেছে। মানুষের কল্যাণই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। তার সংবর্ধনা সভায় দেশের ধীমান বুদ্ধিজীবীবৃন্দ তুল্য-মূল্য বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক। তাঁকে সংবর্ধিত করতে পেরে আমরাই আজ সংবর্ধিত হয়েছি, গৌরবান্বিত হয়েছি। তিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করবেন-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে সবাইকে আপ্যায়নের মাধ্যমে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আলোচকদের সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয় উপচানো কথামালা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্যামেরার ফ্লাস বাল্বের উপর্যুপরি আলোকসম্পাত, প্রেসক্লাবের লাউঞ্জ উপচে বাইরে ছড়িয়ে পড়া শ্রোতার সমাগম সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার-এর এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে অনন্য করে তোলে। শ্রোতাদের প্রায় সকলেই ছিলেন সমাজের মনন ও মনীষার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ। মনে হচ্ছিল প্রেসক্লাবের দোতলায় কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী আর পেশাজীবিদের মিলনমেলা বসেছে। সব মিলিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সংবর্ধনা ছিল এক সার্থক ও সর্বাঙ্গীন সফল আয়োজন।

www.pathagar.com

চিত্রশিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক সংবর্ধিত মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে শাল পরিয়ে দিচ্ছেন

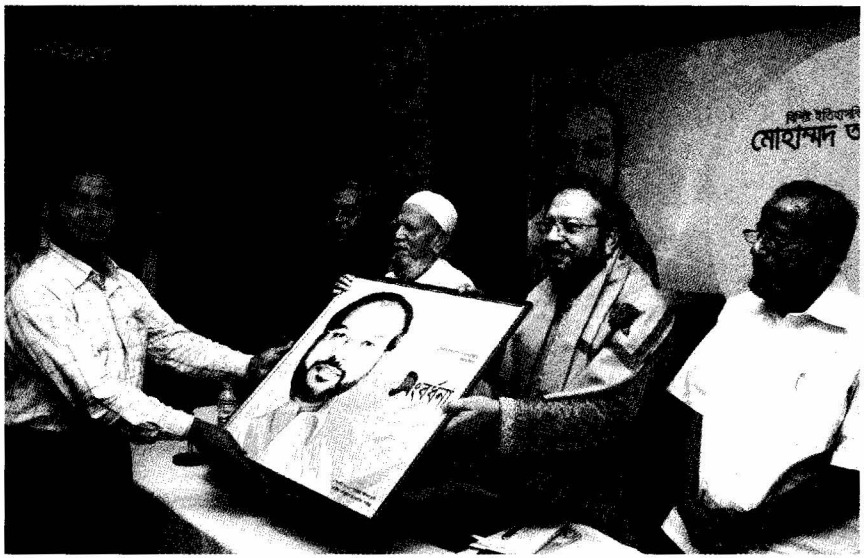

পোট্রেট উপহার দিচ্ছেন ফটোগ্রাফার জনাব রাশেদ রোকন

www.pathagar.com

প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ ও সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কুশল বিনিময় করছেন

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের একাংশ

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
এ বি ব্যাংক লিমিটেড
এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
সিটি ব্যাংক লিমিটেড
ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
আই এফ আই সি ব্যাংক লিমিটেড
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
শিল্প ব্যাংক
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড
ইবনে সিনা ট্রাস্ট
ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
বারাকাহ হাসপাতাল
আদদ্বীন হাসপাতাল
ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী
ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
স্পন্দন অডিও-ভিজুয়্যাল সেন্টার
ঝিঙে ফুল প্রকাশন
কামিয়াব প্রকাশনা লিমিটেড
পানাম প্রেস লিমিটেড
শাহীন পাবলিকেশন্স
কথামালা পাবলিকেশন্স
আল-বারাকা লাইব্রেরী
প্রীতি প্রকাশন
আশা পাবলিকেশন্স লি:
প্রফেসরস্ বুক কর্নার
আহসান পাবলিকেশন্স
মজিদ পাবলিকেশন্স
কালার বাজার

সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার
CENTRE FOR BANGLADESH CULTURE